ছ'টাকা

১২-এ কাশী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগুরুপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে
শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীমতী কমলা দেবী

মা,

তোমারই একান্ত আগ্রহে এই বই লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। তুমি এই বইয়েব প্রতিটি পৃষ্ঠা বচনাকালে উৎসাহ দিয়েছ। তাই আজ এই বই তোমাব' হাতেই দিলাম।

রোজভিলা
বাণীগঞ্জ

তোমার—
মীবা

ভূমিকা

প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সুবিপুল পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে, যুগের সঙ্গে তাহার রূপের বহিরঙ্গটি কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের সহিত পরিচযকালে নানা বৈপরীত্য লক্ষিত হইলেও একটি দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত—পাঁচালী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য এবং গীতি কবিতা। অনুবাদ সাহিত্য মৌলিক রচনার পর্য্যাযে পড়ে না। সুতরাং তাহাকে বাদ দিলে পাঁচালী এবং গীতি কবিতারই প্রাধান্য প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে সাহিত্যরসের সম্পদ গীতি কবিতা তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাণ্ডারেই সঞ্চিত আছে দেখা যায।

এই সাহিত্যরসের লক্ষণ এবং প্রকৃতি সকল কালে এক বলিযাই আমার নিকট প্রতিভাত হয। বৈষ্ণব সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের এইভাবে সাহিত্যগত তুলনামূলক আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে বলিযা আমার জানা নাই। সাহিত্যরস চিরন্তন এবং তাহার বহিরঙ্গে কালানুযাযী পার্থক্য ঘটিলেও মূলে তাহা অবিকৃত থাকে বলিযাই মনে করি।

ইতিহাসের পটভূমিকায, সামাজিক অবস্থাভেদে সাহিত্যের রুচি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন যুগে পরিবর্ত্তিত হইযাছে। কিন্তু তাহার ধারাটি যে একই ভাবে অব্যাহত রহিযা গিযাছে তাহা বিভিন্ন অধ্যাযের মাধ্যমে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিযাছি। এ বিষযে বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পদ এবং আধুনিক লেখকদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যজগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিযাছেন তাঁহাদের রচনাবলী পাশাপাশি রাখিযা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিযাছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস এবং কবিতা এই দুইটি প্রধান অঙ্গ। বাহুল্য না করিযা এই প্রধান দুইটি ধারাই গবেষণার বিষযরূপে গ্রহণ করিযাছি।

কোন্ পরিবেশে জনমানসে কাব্যশতদলের সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত হইযাছে বা দুর্গন্ধ কীটের প্রাদুর্ভাব হইযাছে তাহা জানিতে হইলে তৎকালীন ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমিকার বিশেষ প্রযোজন হইযাছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব এবং তাহার বিস্তার সম্বন্ধে প্রথম, দ্বিতীয, তৃতীয

এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' আমার পরম সহায় হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পুস্তকখানিই সমগ্র গবেষণার মূল কেন্দ্র বলা যাইতে পারে।

আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীবিমল সিংহের 'সমাজ ও সাহিত্য' এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' হইতে সাহায্য লইয়াছি।

তুলনামূলক আলোচনার প্রধান ধারা চারটি—দেহাতীত প্রেম, রোমান্টিসিজম্, মানবীয় রস এবং প্রাণধর্ম্ম। অষ্টম, নবম, দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব পদ, বিভিন্ন উপন্যাস এবং কবিতার পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক দুর্গতির ফলে বিভিন্ন যুগে সাহিত্য রসের অবনতি ঘটিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গবেষণার মূল কথাটি ব্যক্ত করিয়াছি।

ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা কালে 'Mediæval India', 'History of Brajabuli Literature', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তিনখণ্ড), 'বৃহৎ বঙ্গ', 'Advanced History of India', 'Western Influence in Bengali literature' প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং দর্শনবাদের ইতিহাস লিখিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি।

গবেষণাকালে যে সকল পুস্তকের প্রয়োজন পড়িয়াছে তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ করিলাম। এই পুস্তকের রচনা কালে কাহারও সহায়তা লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। দুঃসাহসে গুরুকৃপা সম্বলমাত্র করিয়া গবেষণার কঠিন দুস্তর পথ অতিক্রমে প্রয়াসী হইয়াছি। এই গ্রন্থটির বিষয় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নিজস্ব। নানা পুস্তকের তুলনামূলক আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় তাহার বিচার করিয়াছি। সাহিত্যরস চিরন্তন, নিত্য এবং শাশ্বত ইহাই আমার গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আশা করি বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে সেই মতটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুধাজনগ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবস্থা

বৈষ্ণবসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসকে বিচার এবং পর্য্যালোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্বাপর অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, কেননা বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্য নিবিড়ভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বেদান্ত দর্শনের মূল কথা কি, ইহা লইয়া শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন আচার্য্যগণের মধ্যে মতদ্বৈধের অবধি নাই। এই বেদান্ত দর্শনের মূল কথাটি,

উপনিষদের সত্য

ব্রহ্ম নির্গুণ বা সগুণ, জীবই শিব অথবা ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবিমাত্র, ইহা লইয়া যুগ যুগ ধরিয়া মতভেদের অন্ত নাই এবং ইহার সমাপ্তিও ঘটিবে না। যতদিন সৃষ্টির গতি অব্যাহত এবং বৈচিত্র্যময় থাকিবে, ততদিন সৃষ্টির মূলীভূত কারণ লইয়া বিতর্কের সমাপ্তি হইবে না। কিন্তু সকল ধর্ম্মের মধ্যেই একটি মূল তত্ত্বও পাওয়া যায় এবং তাহাই বেদান্ত দর্শনের মূল কথা বলিয়া মনে হয়। তাহা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "বহুস্যাং প্রজায়েয়" "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম, নানস্তি কিঞ্চন্"। কিন্তু এই মূল সত্যকে সকলে স্বীকার করিলেও ব্রহ্ম, জীব ও শক্তির রূপ ও প্রকৃতি লইয়া বিবাদ আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে।

কিন্তু কেন এই বিবাদ? আচার্য্য শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন তাহাকেই খণ্ডন করিয়া শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। রামানুজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মহাভারতে এবং যোগবাশিষ্ঠের স্থানে স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। রামানুজের পূর্ব্বে দ্রাবিড়দেশে

বৈষ্ণবীয় দর্শনবাদ

ভক্ত আলোয়ারগণের আবির্ভাব হয় এবং ইঁহাদের দিব্যজীবনের বিচিত্র আলেখ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তথা ভক্তিবাদের চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। তামিল-রমণী আণ্ডাল শ্রীরঙ্গনাথে তাঁহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। যামুনাচার্য্য চিৎ, অচিৎ এবং পুরুষোত্তম এই তিনটি পদার্থ লইয়া বিচার আরম্ভ করেন। রামানুজের মতবাদে ইহারাই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজের স্বকৃত নহে বটে, কিন্তু তিনি এই মতবাদকে শৃঙ্খলিত করিয়া পূর্ণতা সাধন করেন এবং সমাজের উপর

এই মতবাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। তাঁহারই জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নবজীবন লাভ করে এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করিয়া দেয়। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য এক অপূর্ব্ব যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে আচার্য্য শঙ্করের মত সমগ্র দেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এমন কি তাহা জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, অপর দিকে এই জ্ঞানবাদকে খণ্ডন করিতে ভক্ত আলোয়ারগণ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ সচেষ্ট হইযাছেন। অক্লান্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া রামানুজ এই সুপ্রসারিত ও সুপ্রচারিত শাঙ্কর মতকে বহু পরিমাণে বিধ্বস্ত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তথা ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। তাঁহারই মতবাদকে শিরোধার্য্য করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায় বৈষ্ণবদর্শন রচনা করিলেন এবং একদিন সমগ্র দেশ এই ভক্তি-গঙ্গার ধারায় প্লাবিত হইয়া গেল।

বৈষ্ণবদর্শন সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদ্ বলেন আদিতে ব্রহ্মই ছিলেন—আর কিছুই ছিল না। তারপর ব্রহ্ম বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন।

বৈষ্ণবীয় দর্শনবাদের ভিত্তি

"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

(ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৪)

অগ্রে কাম উচ্ছ্বসিত হইল। ইহাই মনের প্রথম বীজ।

ইহাই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা। তিনি কেন বহু হইলেন? উপনিষদ্ উত্তর দিতেছেন —"স বৈ নৈম রেমে। তস্মাদ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ স হ এতবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" পরমাত্মা প্রীতি অনুভব করিলেন না। সেই জন্য একাকী প্রীতি হয় না। তিনি দ্বিতীয়ের জন্য ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্বে তিনি একীভূত ছিলেন—যেন সংযুক্ত স্ত্রীপুরুষ, এখন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিলেন —যেমন পতি ও পত্নী।

বৈষ্ণবদর্শনে রাধাতত্ত্বের মূল কথাটিও তাহাই। ভগবান গোলকে রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তখন শ্রীরাধার আবির্ভাব হইল। সুতরাং বৈষ্ণব দর্শন এবং ধর্ম্মের আবির্ভাবের গোড়াপত্তন খুঁজিলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অবশ্য ঠিক কি ভাবে ধীরে ধীরে এই দর্শন ক্রমে দানা বাঁধিয়া দাঁড়াইল তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সেই যুগ হইতে দেওয়া সম্ভব নহে এবং ইহা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু নহে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মমত এবং দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদেরই মতবাদকে আশ্রয় করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণব মতবাদের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধন করেন। মহাপ্রভুর

পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

সমসাময়িক কালে এবং পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার দিব্য জীবনের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহার উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হয় এবং সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। এই ধর্ম্মমতের পরিপুষ্টির পথে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য, শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমধ্ব প্রথম পথ প্রদর্শন করেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে জীব বস্তুর অংশ। বস্তুর শক্তি মায়া এবং তাহা বস্তু হইতে অভিন্ন। বিষ্ণুস্বামী জীব ও ব্রহ্ম এক বলেন নাই। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ তাঁহাকে যুক্ত করে। ব্রহ্ম বদ্ধ জীব হইতে পৃথক্।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত

বদ্ধ জীবই সকল দুঃখ ও অজ্ঞানের মূলাধার। জীব যখন আপনাকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে তখন সে ব্রহ্মের নিত্যদাস। জীব ব্রহ্মের অণু এবং ব্রহ্মের নিত্যদাসত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াধীশ এবং স্বয়ং প্রকাশ, জীব মায়াবদ্ধ।

শ্রীনিম্বাচার্য্য জীব এবং ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনাকালে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম এক এবং জীব মায়াশক্তি দ্বারা বদ্ধ। জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য।

শ্রীনিম্বাচার্য্যের মত

শ্রীরামানুজও জীবের তিন প্রকার ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ভগবদ্ কৃপায় জীব এই মায়া হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই। মায়া ব্রহ্মের শক্তি, কিন্তু ব্রহ্ম সকল বিকারমুক্ত। বিষ্ণুপুরাণে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—এই তিন শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতে অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী, অপকরী ও মিশ্রা এই ত্রিবিধ শক্তি সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিত তোমাতে অবস্থান করিতে পারে না।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" শ্রীনিম্বাদিত্য স্বীকার করেন। নন্দসুত কৃষ্ণই পরমপুরুষ এবং বৃষভানুদুহিতা শ্রীরাধিকা তাঁহারই পরমাপ্রকৃতি। কৃষ্ণ সকল

সৌন্দর্য্য এবং রসের আধার (রসো বৈ সঃ)। সখীবৃন্দ পরিবৃতা শ্রীরাধিকা এই পরমপুরুষের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণই জীবের একমাত্র উপাস্য এবং লক্ষ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই জাতীয় ভাবের প্রতিধ্বনি নানাস্থানে শোনা যায়।

"কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ এক ধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ২।২০)

* * *

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান. পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ২।১৪)

* * *

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি-হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৪)

* * *

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীনিম্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোককে অনুসরণ করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সেই শ্লোকটিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিযাছেন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮)

ইঁহারা সকলেই পরমেশ্বরের অংশ এবং কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

শ্রীনিম্বাচার্য্যের মতে উপাসনা দুই প্রকার—বিধিমার্গীয় এবং রাগমার্গীয়। এই দুইয়ের মধ্যে রাগমার্গীয় উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। নবধা ভক্তিপথকে অবলম্বন করিলে অন্তরে অনুরাগের সৃজন হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই দুই প্রকার উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥"

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২২।৩৯০)

"ইষ্টে স্বরসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২২।৩৯৫)

আচার্য্য রামানুজের মত

আচার্য্য রামানুজের মতে তিনটি মৌলিক পদার্থ আছে—চিৎ (জীব), অচিৎ (জড়) এবং পুরুষোত্তম (ঈশ্বর)। তিনি বলেন মায়া ভগবানের শক্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রামানুজের বাণীরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনকালে মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন, তখন রামানন্দ বলিলেন—

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আন॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৮।২০৭)

আচার্য্য রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ব্রহ্ম শব্দগম্য অতএব ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন।

ব্রহ্ম শব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়া সংখ্যেয়কল্যাণ-গুণগণঃ পুরুষোত্তমঽভিধীয়তে—শ্রীভাষ্য।

রামানুজ বলেন সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মই বিষয়। নির্বিশেষ বস্তুকে প্রতিপত্তি করা সম্ভব নহে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত তর্ককালে মহাপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছিলেন।

"অপাণি শ্রুতি বর্গে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ॥"

অপাণি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

"অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৬।১৮২)

আচার্য্য রামানুজ বলেন ঈশ্বর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ, শ্রী, ভূ ও লীলাসহিত কীরিটাদিভূষণেভূষিত। পরব্রহ্ম, বাসুদেবাদির সৃষ্টির জন্য, বাসুদেব

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতিতে অবস্থান করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনাকালে মহাপ্রভু বলেন,—

"প্রাকৃত বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ মুখ্য চারিজন॥"

*　　*　　*

"আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২০।৩৫৬)

জীব ও ব্রহ্ম এক নহে, যদিও জীব ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব খণ্ডিত এবং ঈশ্বরের নিত্য দাস। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে মহাপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছিলেন,—

"ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেনশক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মাযাধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কত ত অভেদ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৬।১৮৩)

রামানুজের মতে ভগবদ্‌দাসত্বলাভই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জীব কখনও ভগবানের সহিত অভিন্নতা লাভ করিতে পারে না। কারণ, স্বরূপতঃ জীব নিত্য এবং পূর্ণব্রহ্মের অণুমাত্র। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ রামানুজের এই মতকেই ভিত্তি করিযা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোককে গ্রহণ করিয়াছেন।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মাণং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১১)

ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য দান করিলেও গ্রহণ করেন না।

রামানুজ বলেন ভক্তিবলে নারায়ণকে তুষ্ট করিলে তবেই বন্ধনের নিবৃত্তি ঘটিবে। সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। তিনি কৃপা করিয়া জীবকে উদ্ধার করিবেন। বৈষ্ণবগণও এই উক্তির

প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম কভু সাধ্য নয়।"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২২।৩৯০)

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণভাবে মায়াবাদের ভিত্তির উপর স্থাপিত। এইজন্য রামানুজ মায়াবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। রামানুজ বলেন অবিদ্যা বা মায়া এবং ব্রহ্ম পৃথক নহেন, কেননা পৃথক হইলে ব্রহ্ম অদ্বৈত হইতে পারেন না। অবিদ্যা অপৃথক হইতেও পারে না, কেননা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশ, সুতরাং অবিদ্যার বিরোধী। জীবাত্মা অবিদ্যার কার্য্যের ফল। সুতরাং অবিদ্যাকে ব্রহ্মাশ্রিত বা জীবাশ্রিত কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, সুতরাং অবিদ্যা কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না। অবিদ্যা কর্ম্মের ফল। সাধনা এবং ধ্যানের দ্বারাই ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে। এই অবিদ্যা বা মায়াকে অনির্বচনীয় বলাও চলে না। শঙ্কর বলেন বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রাতিভাসিক এবং অনির্বচনীয়, উহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল অস্তিত্বের ক্রমোৎপাদন করে মাত্র। কিন্তু রামানুজ বলেন উহা ভ্রম মাত্র, সুতরাং উহাকে অনির্বচনীয় বলা যৌক্তিক নহে।

নির্ব্বিশেষবাদীগণ ব্রহ্মকে অপ্রমেয় এবং নির্ব্বিশেষ বলেন, অথচ তাঁহারাই নির্দ্দেশ করেন যে ব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের যদি বিশেষণ থাকে তবে ব্রহ্ম কিরূপে নির্ব্বিশেষ আখ্যা লাভ করিবেন, কেননা এইগুলি তাঁহার বিশেষ ধর্ম্ম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। তিনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতকে বহুলাংশে স্বীকার করিযা ভক্তিবাদ প্রচার করিলেন।

শ্রী মধ্বাচার্য্যের মতবাদ

বৈষ্ণবীয ভক্তিবাদের উপর মধ্বাচার্য্যের মতবাদ বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিযাছে। পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুর মতবাদে মধ্বাচার্য্যের তথা রামানুজাচার্য্যের প্রভাব সুপরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওযা যায।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। জীব অণু এবং ব্রহ্মের দাস আচার্য্যপরম্পরা দার্শনিক তথ্যকে আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা একই ধারায় চিন্তা করিযাছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তীগণের চিন্তাধারাকে অধিকতর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য বলেন জীব নিজকে ব্রহ্ম ভাবিলে অপরাধগ্রস্ত হইবে। একমাত্র ভগবানের সেবাই জীবের নিত্য কর্ম। ভগবানের প্রসন্নতালাভই

জীবের একমাত্র পুরুষার্থ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ জীবের পুরুষার্থ লাভের সহায়ক নহে। বৈষ্ণবগণও ভগবদ্ প্রেমলাভকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

"পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন।" (শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২৩।৪০৭)

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটিকে পরম পুরুষার্থ বা চারি পুরুষার্থ বলা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে আত্মানুপলব্ধিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

আচার্য্য মধ্বের মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। বিষ্ণু বা পরমপুরুষ স্বতন্ত্র এবং জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র। কিন্তু রামানুজের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। রামানুজের মতে ঈশ্বর জগৎ পরিব্যাপ্ত। মধ্ব মতে জগতে ও ভগবানে পৃথকত্ব নিত্য। তবে উভয়েই ব্রহ্মকে সগুণ ও সবিশেষ বলিয়াছেন। রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্মে কেবল স্বগত ভেদ আছে, জাতিগত ভেদ নাই, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই চেতন। কিন্তু মধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক। উভয়ের মতে জীব ও ব্রহ্ম সেব্যসেবক সম্বন্ধ। উভয়ে বলেন ভগবান উপাসনায় প্রীত হইলে মুক্তি দেন।

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্ত কর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্ত্বং প্রতিপদ্যমানো মযাত্মভূয়ায চ কল্পতে বৈ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।৩২)

মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে আত্মনিবেদন করে তখন সে আমাকে আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে এবং আমার আত্মবৎ হইবার যোগ্য হয়।

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২২।৩৯০)

জীবের স্বভাব কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব, কেবল তাহার চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়। সাধনা বলে অন্তর শুদ্ধ হইলেই কৃষ্ণপ্রেম অন্তরে উদিত হয়।

আচার্য্য মধ্বের মতে ব্রহ্মা শিব হইতে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, কেননা শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরমপুরুষ এবং সকল দেবতাই তাঁহার অংশবিশেষ। মধ্বাচার্য্যের মতে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর অনন্ত নরক। কিন্তু ভারতীয় কোন ধর্ম্মমতে এরূপ কোন

কথা পাওয়া যায় না। ভারতীয় ধর্ম্মমত সকল ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং সকল পথেই অগ্রসর হইলে সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায় বলিয়াছেন। এই জাতীয় মতবাদই পরমত অসহিষ্ণুতার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। অপরের ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করিবার শক্তি সকল সম্প্রদায়ই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশ্য মহাপ্রভু স্বয়ং শিবকে উচ্চাসন দিলেও আমাদের মনে হয় মধ্বাচার্য্যের এই মত পরবর্ত্তী যুগে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে। সম্ভবতঃ এই জাতীয় মতবাদের জন্যই বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আপন আপন মতবাদই যথার্থ এই দাবী করিয়া ধর্ম্ম-কলহের কলুষিত ধূমে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ছিলেন। বেদান্ত দর্শনের মূলবাক্যটিকে বিস্মৃত হইয়া ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মের বহিরঙ্গ লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন। তাহার ফলে বৈষ্ণব এবং অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলি প্রাণহীন, শুষ্ক, তর্ককণ্টকিত মতবাদমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি আপনাদের প্রকৃত প্রাণশক্তিকে হারাইয়া ফেলিল এবং দেশবাসীও প্রকৃত ধর্ম্মের রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইল।

ধর্ম্ম কলহ

মধ্বাচার্য্যের মতে বিষ্ণুর সালোক্য ও সারূপ্য প্রাপ্তিই জীবের মুক্তি। ইহাই পরমপুরুষার্থ এবং লভ্য বস্তু, কিন্তু মহাপ্রভু সালোক্য সামীপ্য লাভ এবং মুক্তিকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। পতিজ্ঞানে মধুর রস আশ্রয় করিয়া সেই পরমপুরুষের সেবাই জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

পরমপুরুষার্থ

"আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৪৫)

"যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৬।১৮৮)

অনেকে মনে করেন মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম্মমত সম্পূর্ণভাবে মধ্বাচার্য্যের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই মহাপ্রভু যখন মধ্বসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী-

গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন সাধ্য সাধন বিষয়ে তাঁহাদের সহিত তিনি তর্ক করেন এবং তাঁহাদের যুক্তিকে খণ্ডন করেন।

মতভেদ

মধ্বসম্প্রদায়ীগণ পঞ্চবিধ যুক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনা করিলে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলকেই পঞ্চমপুরুষার্থ বলিয়া গণনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি স্বীয় মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। মধ্ববাদীগণ যে মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলেন তাহা যে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী তাহা মহাপ্রভু সপ্রমাণ করেন এবং মধ্ববাদীগণ তাঁহার তীক্ষ্ণ যুক্তির নিকট পরাস্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থলে মহাপ্রভুর এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১১)

ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত প্রদান করিলেও সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য গ্রহণ করেন না।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে মত প্রচার করেন, শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য তাঁহাদের মতবাদেই প্রভাবিত হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। অবশ্য

শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতবাদ

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য কোন কোন অংশে থাকিলেও সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

আচার্য্য বল্লভের মতে জীব ব্রহ্মের অণু ও সেবক। জগৎ সত্য কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রহ্ম। তিনি জীবের একমাত্র সেব্য। জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই শুদ্ধ। বল্লভ বলেন গোলকে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে সেবাই পরমপুরুষার্থ। মহাপ্রভু তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত বল্লভাচার্য্যের এই মধুর ভাবাত্মক শৃঙ্গাররসের সাধনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন। রামানুজ, নিম্বার্ক এবং মধ্বাচার্য্য ইঁহারা সকলেই জীবকে ঈশ্বরের দাস বলিয়াছেন। বল্লভাচার্য্য মধুর ভাবকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত দাস্য এবং মধুর ভাবকে গ্রহণ করিয়া শান্ত, সখ্য এবং বাৎসল্য ভাবকে সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

"দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥"

"নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করে।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩২)

বল্লভাচার্য্য কৃষ্ণ এবং ভক্তের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ভাব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু পরপতি ভাবটিকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাৎকারকালে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পরব্যসনিনী নারী লগ্নাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবস্বাদযতন্ত্যর্ণবসঙ্গ রসায়নম্॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ১।১৪০)

উপপতিতে আসক্তা রমণী গৃহকর্ম্মে যুক্ত থাকিয়াও অন্তরে উপপতি সঙ্গসুখ মনে মনে আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয়।

তাঁহার মতে বৈধী প্রেম অপেক্ষা অবৈধী প্রেমের তীব্রতা অধিক। সেই জন্য ভক্ত এবং ভগবানের পারস্পরিক প্রেম সম্বন্ধ অবৈধ হইলেই তীব্রতর হয়। শাস্ত্রানুমোদিত পথে মানুষের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি কিছু চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। ভগবদপ্রেমের তীব্রতা এমনই যে মানুষকে তাহা সকল কিছু বন্ধন হইতে আপনিই মুক্ত করিয়া তাহার পরম চরিতার্থতার পথে অগ্রসর করাইয়া দেয। মহাপ্রভুর মতবাদ ভারতীয় সমাজকে দুর্ব্বল করিয়াছে ইহা অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। মহাপ্রভুর মতবাদ জাতির জীবনে দুর্ব্বলতার সূচনা করে নাই এবং তাঁহার ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্মও নহে। তাঁহার মতবাদের বিকৃত রূপই জাতিকে দুর্ব্বল করিয়াছে। যাহা হউক, ইহা আমাদের বর্ত্তমান অধ্যাযের আলোচ্য বস্তু নহে, সুতরাং আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

আচার্য্য বল্লভের মতে ভগবানের ক্রীড়াতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। একাকী ক্রীড়া অসম্ভব তাই ভগবান ক্রীড়ার জন্য জীব এবং জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্যের এই মত উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধার বিষয়ে এই কল্পনাই করিয়াছেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৬৪)

বল্লভাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের মতানুযায়ী সালোক্য ও সারূপ্য প্রাপ্তিকে জীবের কাম্য বলিয়া মনে করেন না। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এবিষয়ে মধ্বাচার্য্যকে অনুসরণ না করিয়া তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য মহাপ্রভু স্বয়ং এই মত পোষণ করিতেন বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্য বলেন যে শুদ্ধ জীব সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া কৃষ্ণের প্রেমে তাঁহাকে স্বামীরূপে সেবা করিয়া পরমানন্দ রসে বিভোর থাকেন। মহাপ্রভু স্বজীবনে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ভ্রমে চটক পর্ব্বতকে আলিঙ্গন, সমুদ্রকে যমুনা ভ্রমে লম্ফপ্রদান, দিবারাত্র উন্মাদের মত প্রচেষ্টা, গম্ভীরাগৃহে রাত্রিকালে অলৌকিক বিরহের বেদনায় উন্মত্ত হইয়া আপনাকে আঘাত করা, বৃক্ষে বৃক্ষে কৃষ্ণ ভ্রম প্রভৃতি চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা তাঁহার স্বমুখোচ্চারিত উক্তিকেই সার্থক করিয়াছে।

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৬)

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৮।২১৬)

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪০)

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবানকে দেখিতে পান এবং আত্মার আত্মরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাসান্তর্ধান ঘটিলে গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে এতই উন্মত্ত হইয়া উঠেন যে তাঁহারা সর্ব্বভূতে এমন কি আপনাদের স্বয়ং কৃষ্ণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। 'সর্ব্বং

খল্বিদং ব্রহ্ম' উপনিষদের এই শাশ্বত বাণী যে চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনালেখ্যের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। মহাপ্রভুর মতবাদ তথা বৈষ্ণবীয় দর্শনবাদ সম্পূর্ণ-রূপে শ্রীমদ্ভাগবত এবং উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব

বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং দর্শনবাদ মহাপ্রভুর প্রভাবে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই এই ভক্তিবাদ পরিপুষ্টতা লাভ করিবার জন্য প্রস্তুতি কার্য্য চালিতেছিল। পূর্ব্বাচার্য্যগণ উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাপন মতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনা মহাপ্রভুর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী, যামুনাচার্য্য, শ্রীমদ্ নিম্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বৈষ্ণব দর্শনবাদের যে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং আচার্য্য রামানুজ তাহারই উপর বৈষ্ণব মতবাদের ধ্বজাকে প্রোথিত করিয়া উড্ডীন করিয়াছেন। শাঙ্কর মত তথা মায়াবাদকে বিধ্বস্ত করিয়া জাতিকে যে প্রেরণা তাঁহারা সঞ্চার করিলেন, তাঁহাদের জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রে নবভাবের বীজকে মহাপ্রভু আপনার হৃদয়ের উত্তাপে অঙ্কুরিত করিলেন। বাস্তববিমুখ, মায়াবাদী জাতি, যাহারা জীবনের সকল কিছুই অসার মনে করিয়া সংসারকে অবহেলা করিতেছিল, জীবনের প্রকৃত সত্যকে সুস্থ সহজ মনে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না, তাহাদের অন্তরে এক নব শক্তির আবির্ভাব ঘটিল। বৈষ্ণব মতবাদ জাতির জীবনকে প্রভাবিত করিল এবং জীবনীশক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলিল, জীবনের রুদ্ধ স্রোতধারার পথকে মুক্ত করিয়া অনন্তের পথে চালিত করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং দর্শনবাদের মূলকথা

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি শ্রীমদ্ রামানুজ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ যে মতবাদ প্রচার করেন, মহাপ্রভুর ভাবরসপুষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বৈষ্ণব দর্শনবাদের মূল কথাটি কি? সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য এই দর্শনবাদের উপরই দণ্ডায়মান। অবশ্য দর্শনবাদের নীরস তত্ত্ব বৈষ্ণব-কবিগণের শ্রীহস্ত স্পর্শে অপূর্ব্ব কাব্যে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যের এই সৌরভে কোন্ কোন্ উপাদান মিশ্রিত হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব কাব্যশতদলের মূল বৃন্তটিকে আলোচনা করা আবশ্যক।

ভূমিকা

বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি পরমপুরুষ। কিন্তু ইহাই তাঁহার পূর্ণ পরিচয় নহে, তিনি রসস্বরূপ (রসো বৈ সঃ)। পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা তাঁহারই শক্তি। সেই মহাভাব স্বরূপিনী নিরন্তর তাঁহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার সমর্থক একটি শ্লোক পাওয়া যায়, "লীলয়া বাপি যুঞ্জেরণ নিগু‍র্ণস্য গুণাঃ ক্রিয়া।" (৩।৭।২)। (লীলাবশে নিগু‍র্ণ ব্রহ্ম ক্রিয়া ও গুণান্বিত হয়েন।) লীলাবশেই তিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই সৃষ্টি একা সম্ভব নহে। আপনাকে আপনি সম্ভোগেচ্ছায় তিনি দুই হইলেন। এই দুইয়ের সম্ভোগে বহুর উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ রমণোৎসুক হইয়া দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধামূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

লীলার উদ্দেশ্য

> "স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ।
> রমণং কর্ত্তুমিচ্ছাংশ্চ তদ্বভূব সুরেশ্বরী॥
> ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্ব্বং তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ।
> এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
> দক্ষিণাঙ্গঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ বামাঙ্গং সা চ রাধিকা॥" (ব্রঃ বৈঃ)

পরমপুরুষ যাঁহাতে রমণ করেন, তিনিই পরমাপ্রকৃতি হ্লাদিনীশক্তি

শ্রীরাধিকা। প্রকৃতির সকল বস্তুই ব্রহ্মের বিভূতি। জীব ব্রহ্মের অণু, সেই কারণে এই ক্ষুদ্র সত্তা বৃহত্তর সত্তার সহিত মিলিত হইবার জন্য আকর্ষণ অনুভব করে। ব্রহ্মের রসাস্বাদ এবং মিলনানন্দ উপভোগ করাই জীবের শেষ লক্ষ্য, এই ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। শাস্ত্রানুমোদিত বৈধী ভক্তির পথে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, সকল প্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার, সাংসারিক লজ্জা, সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রেমে মত্ত হইলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম ও জীবকে কৃষ্ণ এবং রাধা বলেন। গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের লীলা ব্রহ্মের চিরন্তন লীলাকে প্রকাশ করিতেছে। ব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত—উপভোগ্য এবং উপভোক্তা। উপভোক্তা ব্রহ্ম কৃষ্ণ এবং উপভোগ্য ব্রহ্ম রাধা। তাই রাধাত্ব প্রাপ্ত হওয়াই জীবের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

জীবের লক্ষ্য

উপাসনা দুই প্রকার—বিধিমার্গীয় এবং রাগমার্গীয়। শাস্ত্রানুমোদিত পথকে অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র আচার বিচারের নিয়মাবলীকে মুখ্য করিয়া কর্তব্য বোধে ঈশ্বরের আরাধনাকে বিধিমার্গীয় উপাসনা বলা চলে। এই মার্গে অন্তরের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা বাহ্য আচার এবং আড়ম্বরই স্থান লাভ করে। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত এই শুষ্ক পথ মানুষের হৃদয়কে তাহার মানস ভোজ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দেয়। যে প্রেম শুষ্ক আচার বিচার, সামাজিক সম্ভ্রম কিছুই মানিতে চাহে না, সংসারের লাভ ক্ষতি সুখ দুঃখ যেখানে তুচ্ছ হইয়া যায়, কেবল এক কূলভাঙ্গা স্রোতের প্লাবন সেই মহারহস্যের দিকে সবেগে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা ত' বিধিমার্গীয় উপাসনায় পাওয়া যাইবার নহে। মানুষের মনোবৃত্তি চিরদিন বাঁধাধরা পথে পরিভ্রমণ করিতে চায় না! মানবীয় ভালবাসার মধ্যে আমরা এই উদ্দামতা, লাভালাভবিচারশূন্য উন্মত্ততা অনেক সময় দেখিতে পাই। কিন্তু সেই পরমপুরুষ, একান্তরসস্বরূপ যিনি, তাঁহাকে পাইতে হইলে এমনই ভাবে ভালবাসিতে হয়, নচেৎ একান্তভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জগতের আপামর সকলেই সেই তাঁহাকেই খুঁজিয়া মরিতেছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের কলকোলাহলে তাহাদের অন্তরের নিভৃত সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কার মিলাইয়া যাইতেছে। ভালবাসার প্রবৃত্তি প্রত্যেক জীবের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। পৃথিবীতে আমরা যে-কোন ভালবাসাই দেখি না কেন, সকল আকর্ষণের মধ্যে সেই

রাগমার্গীয় উপাসনা

অনন্তকেই আমরা ভালবাসিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারে এই আকর্ষণশক্তি ক্রিয়া করে বলিয়া আমরা ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি না। সংসারে পরস্পরের প্রতি এই প্রীতিই মঙ্গলকে ডাকিয়া আনে। প্রীতি মঙ্গল এবং কল্যাণের অগ্রদূত। প্রীতির অভাব ঘটিলেই স্বার্থ এবং ঈর্ষ্যার কলুষ সকল অমঙ্গল এবং অকল্যাণকে আহ্বান করিয়া আনে। পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক প্রীতির গাঢ় বন্ধন যেরূপ সংসারে এক অখণ্ড শান্তির স্নিগ্ধধারা বর্ষণ করে, তেমনই সেই পরমপুরুষের সহিত প্রীতির বন্ধন স্থাপন করিলে, সমগ্র জগৎ সেই প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ের অমৃত বর্ষণে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ কল্যাণশ্রী ধারণ করে। এই সমগ্র জগৎ সেই পরমব্রহ্মেরই অংশবিশেষ। সেই কারণে বৈষ্ণবগণ রাগমার্গীয় উপাসনাকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন।

সাংসারিক প্রেমের মধ্যে আমরা যেখানে যেখানে তীব্রতা অনুভব করি, বৈষ্ণবগণ পরমব্রহ্মের প্রতি প্রীতিকেও সেইভাবে বিভাগ করিয়াছেন। ভগবদ্ প্রেম পাঁচপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য। ইহার মধ্যে মাধুর্য্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কেননা পার্থিব জগতে এই ভালবাসার মধ্যেই আমরা চূড়ান্ত উন্মাদনা দেখিতে পাই। ভগবানের প্রতি জীবের গাঢ় অনুরাগ জন্মিলে, তিনি তখন আর পতি হয়েন না, জার হন।

মধুর রস

সংসারে অবৈধ প্রেমের তীব্রতা অধিক, তাই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহা সমাজ এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। যিনি পরমপুরুষ তিনি সাংসারিক সকল কিছু মানদণ্ডের বাহিরে। আমরা আমাদের সামাজিক সঙ্কীর্ণ মানদণ্ড দিয়া বৈষ্ণব দর্শনবাদকে বিচার করিতে যাইয়া পদে পদে ভুল করি। সংসারে আমরা যে সকল রীতি নীতি মানিয়া চলি, সেগুলির অধিকাংশই সংসারের প্রয়োজনেই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যিনি পরমপুরুষ, তিনি ত' এই সকল আচার, নীতি সব কিছুরই ঊর্দ্ধে। সুতরাং তাঁহার লীলাকে এই মানদণ্ডে সমর্থন বা সমালোচনা সকল কিছুই অর্থহীন। ঈশ্বরকে একান্তভাবে পাইতে হইলে বাহ্যজগৎ সম্পূর্ণভাবে ভুলিতে হইবে, অন্তরের সমস্ত কামনা বাসনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এমনকি তাঁহার ঈশ্বরত্ব ভুলিতে হইবে, তবেই জীব তাঁহাকে পাইবে। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিভাবে ভজনা করিলেন। পতিভাবে ভজনায় শাস্ত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু উপপতিভাবে হৃদয়ের বিশুদ্ধ অহৈতুকী প্রেমই সর্ব্বস্ব। গোপিকার হৃদয়সর্ব্বস্ব ব্রজনাথ, তিনি ব্যতীত

গোপিকার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। একমাত্র অন্তরের ভালবাসাই সেখানে মুখ্য, কৃষ্ণের তৃপ্তিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য।

রাধিকা কৃষ্ণের শক্তি, তাঁহার প্রণয়শক্তি। শক্তিমাত্রেই জড়। কিন্তু শ্রীরাধিকা ভগবানে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। বৈষ্ণবগণ বলেন,

রাধাতত্ত্ব

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৪)

শ্রীরাধিকা হ্লাদিনী শক্তি, পরমব্রহ্ম আপনি আহ্লাদস্বরূপ হইয়া এই শক্তি দ্বারা আপনাকে হ্লাদিত করেন।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৪)

"হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৫)

চৈতন্যচরিতকারের উক্ত এই কযটি ছত্রে রাধা প্রেমের মূল তত্ত্বটি সুপরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, রসমূর্ত্তি। পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা তাঁহাকেই আনন্দদান করেন। তাঁহাদের পারস্পরিক যে প্রেম তাহা জাগতিক প্রেমাপেক্ষাও গভীর এবং তীব্র। শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপা। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণপ্রেমে তিনি এমনই বিভোর আত্মহারা যে তাঁহার অন্তর বাহির স্বরূপত্ব ত্যাগ করিয়াছে, এবং সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। রাধাত্ব প্রাপ্তি জীবের কামনার বস্তু, তাই জীব যখন তুচ্ছ সাংসারিক প্রেমকে ঠেলিযা বৃহত্তর প্রেমের আস্বাদ পায় তখন সে রাধাত্ব লাভ করে। তাঁহার অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই সেই প্রেমময় বিরাজ করেন।

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৬)

শ্রীরাধিকা কে ? ভক্তই রাধিকা, কেননা তিনিই সেই পরমপুরুষকে আরাধনা করেন।

"কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে ব্যাখ্যানে॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ৪।৩৬)

গোপীপ্রেমে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক বিকারই বর্ত্তমান, কামনার এতটুকু গন্ধও তাহার মধ্যে নাই। কৃষ্ণের তৃপ্তি কিসে ঘটিবে গোপীর জীবনে ইহাই একমাত্র কামনা। গোপিকার কাছে জগৎ, সংসার, পতি, পুত্র, গুরুজন, ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই তুচ্ছ, একমাত্র ধ্রুব কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। গোপীর নিকট কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বস্বধন। জাগতিক লজ্জা, সামাজিক ভয, গুরুজনের রক্তচক্ষু কিছুই গোপীকে তাহার পথ হইতে ফিরাইতে পারে না। একমাত্র কৃষ্ণসেবাতেই এই প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। যিনি কৃষ্ণকে এই গোপীভাবে ভজনা কবিবেন, তাঁহার নিকট মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভও তুচ্ছ। যে মু'ক্ত কামনায যুগে যুগে যোগী ঋষি সাধনা করিযাছেন প্রেমিক তাহাও তুচ্ছ বলিযা পবিত্যাগ করিযাছেন, কৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিকট একমাত্র প্রার্থনীয। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভকেও তুচ্ছ করিযা সেই পরম প্রেমমযের সেবার উদ্দেশ্যে বারংবার এই দুঃখক্লেশযন্ত্রণামায সংসারে আসিতে তিনি দ্বিধা করেন না। এই প্রেমিক ভক্তই প্রকৃত আনন্দকে আস্বাদন করিযাছেন। তাই কিবা সংসারের সহস্র বন্ধনপাকে অথবা মুক্তিব উদার গগনতলে সর্ব্বাবস্থাই তাঁহার নিকট সমান। পার্থিব এই জীবনকে বৈষ্ণবভক্ত মাযামোহের আকর বলিযা দূরে সরাইযা রাখেন নাই, সংসারে এই সহজ আনন্দেরই লীলাক্ষেত্রে ক্ষুদ্রবৃহৎ সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনাব মধ্যে তাঁহারই স্পর্শ পাওযা যায় বলিযা বৈষ্ণবসাধক বিশ্বাস করেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব

(বৈষ্ণব ভক্তের পরমারাধ্য প্রাণের দেবতা এই শ্রীকৃষ্ণ কে ? তিনি স্বযং পরমব্রহ্ম ভগবান্। সকল অবতার তাঁহারই অংশীভূত এবং তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল। সম্বিৎ, চিৎ এবং হ্লাদিনী এই ত্রিবিধ শক্তি ইঁহাকেই আশ্রয করিয়া আছে। সকল রস, সকল শক্তি, সকল ঐশ্বর্য্যের আধারীভূত এই পরমপুরুষই বৃন্দাবনে লীলা করিয়া থাকেন। রসো বৈ সঃ। ইনি পরম রসস্বরূপ। জগতের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দের পরিপূর্ণ বিগ্রহ জীবের অন্তরে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন।)

মহাভাবস্বরূপিনী পরমাশক্তি শ্রীরাধা কে ? কৃষ্ণ অনন্ত শক্তিময়, কিন্তু এই অসংখ্য শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি। কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ সচ্চিৎ এবং আনন্দময়—তাই তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই ত্রিশক্তির মধ্যে হ্লাদিনী কৃষ্ণকে আনন্দিত করেন এবং ইনিই পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধা।

ভক্তি এবং প্রেমই বৈষ্ণব সাধনার মূল অঙ্গ। যে-ভক্তি শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত না হইয়া কেবলমাত্র তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা দ্বারাই পরিচালিত হয় সেই ভক্তিই ভাগবতকারের মতে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রেমভক্তির কথা পাওয়া যায়। এই প্রেমকে ভাগবতকার রস বলিয়াছেন। ভক্ত এই প্রেমরসে মগ্ন হইয়া সেই রসস্বরূপের সান্নিধ্য লাভ করে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" তিনি জীবকে আকর্ষণ করেন। জীবাত্মা সেই বিরাট পুরুষের অংশবিশেষ। তাই প্রত্যেক জীবের অন্তরে সেই বৃহত্তর সত্তার প্রতি অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ থাকে। সাংসারিক এবং পারিপার্শ্বিক নানা সংস্পর্শে আসিয়া জীব আপনার প্রকৃত স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়া দুঃখ পায়। কিন্তু যখনই সে তাঁহার কৃপায় আপনার নিত্য স্বরূপ বুঝিতে পারে তখনই সে ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করে। কৃষ্ণপ্রেম জীবের সাধনার বস্তু নয়, এ প্রেম সাধনাবলে লাভ করা যায় না, কেবল ব্যাকুল ভাবে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিলে ও তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে তিনি কৃপা করিয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। প্রেমের মধ্য দিয়া জীব তাঁহার নিকট পৌঁছায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য—কৃষ্ণপ্রেম এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রেমের সকল অবস্থাতেই ভক্ত সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারেন, তথাপি বৈষ্ণবগণ সূক্ষ্ম বিচারে মাধুর্য্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাধনার প্রেম

"কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তার তম॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৮।২০২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় রায় রামানন্দ - মহাপ্রভু প্রসঙ্গে মাধুর্য্য রসের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ৮।২০২)

শান্তরসে কেবল কৃষ্ণনিষ্ঠা বর্ত্তমান, কিন্তু দাস্যরসে সাধক কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা এই দুইটি গুণ গ্রহণ করেন। পুনশ্চ কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবার সহিত সখ্যরসে কৃষ্ণে অসঙ্কোচ গুণ যুক্ত হয়। বাৎসল্যরসে এই তিনটি গুণের সহিত উপরন্তু মমতাধিক্য যুক্ত হয়। মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ, মমতাধিক্য এবং নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান। সুতরাং রসের ক্রমানুসারে গুণের আধিক্য হয় এবং মধুর রসে সর্ব্বপ্রকার গুণ থাকায় তাহাই শ্রেষ্ঠ রস। এই মধুর রস সম্পূর্ণ নিষ্কাম এবং তাহা ব্যহ্যতঃ কামমূলক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম প্রেমমূলক। ব্রজগোপী ব্যতীত এই রসের কোথাও স্থিতি নাই এবং এই প্রেমে একমাত্র প্রেমই কাম্য।

ব্রজগোপীগণের সহিত কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমের সম্বন্ধ। গোপী কৃষ্ণের নিত্যলীলার সহচরী। তাঁহারাই ব্রজভূমিতে গোপারূপে অবতীর্ণা হইয়া কৃষ্ণের ক্রীড়াসঙ্গিনী হইয়াছিলেন। রাধিকা গোপীশ্রেষ্ঠা, তিনি মূর্ত্তিমতী প্রেম এবং ভক্তি। এই প্রেম কামনার রাজ্যের বাহিরে, কেননা পরমেশ্বরে যাহা নিবেদন করা যায় তাহা বাহ্যতঃ কামনা হইলেও নিবৃত্তি এবং নিষ্কলুষ শুদ্ধ প্রেমে রূপান্তরিত হয়। পরশমণির আলৌকিক স্পর্শে কর্কশ কুৎসিত লৌহও যেমন দিব্যজ্যোতির্মণ্ডিত সুবর্ণে পরিণত হয়, তেমনই ঈশ্বরের সংস্পর্শে অন্তরের দৈহিক কামনাও শুদ্ধ পবিত্র প্রেমে পরিণত হয। এই গোপীভাবের আরাধনায ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোনরূপ সম্ভ্রম বা স্বতন্ত্রভাব থাকে না। ভক্ত আপনাকে তুচ্ছ বা নগণ্য মনে করে না। ভগবদ্ প্রেমে সে এমনই বিভোর হয যে এই প্রেমের ফল বিষয়ে তাহার কোন অনুরাগ থাকে না। জাগতিক প্রেমে যেমন মিলনই চরম পরিণতি—এই দিব্য প্রেমেও ভক্ত সমাজবন্ধন ত্যাগ করিয়া আত্মহারা হইয়া ছুটে এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রেমের চরম উৎকর্ষ লাভ করে। জাগতিক প্রেমে অন্তরে যেরূপ ভাবের উদয় হয়—পূর্ব্বরাগ, মান, আত্মসমর্পণ, বিরহ এই বিচিত্র ভাবলহরী হৃদয়সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ সৃজন করে, ভগবদ্ প্রেমেও অনুরূপ বিচিত্র সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখা যায়। ভগবানে পরিপূর্ণ সত্ত্বাকে নিবেদন করিয়াই ভক্ত পরম চরিতার্থতা লাভ করে, সে এক অপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পরম ও চরম অনুভূতির রস আস্বাদন

করিতে থাকে। এই যে কৃষ্ণপ্রেম, যাহা ভক্তকে উন্মাদ করিয়া তোলে, যে প্রেম যুগে যুগে সাধক এবং ভক্তবৃন্দের জীবনে আবির্ভূত হইয়া অলৌকিক দিব্য মহিমার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই একটি অপূর্ব্ব বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রেমমূর্ত্তি মহাপ্রভুর মুখে দিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনাকালে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের তীব্রতা বিষয়ে বলিতেছেন,—

"সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২১।৩৭৭)

কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তিই তাঁহার বংশীধ্বনি। কৃষ্ণ যাহাকে আকর্ষণ করেন সে সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হয়।

"সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অন্তর্ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈলে জগতের কানে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥"

(শ্রীঃ চৈঃ মধ্যলীলা ২১।৩৭৮)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার এই ব্যাকুলতা বর্ণিত হইয়াছে।

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
* * *
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হ'আঁ তার পাযে নিছিব আপনা॥"

(শ্রীঃ কৃঃ বংশীখণ্ড ১১৬ পৃঃ)

শ্যামরূপী পরমাত্মা অহরহ আমাদের রাধারূপী জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার আহ্বানে সংসারের অসংখ্য বন্ধন আপনি খুলিয়া যাইতেছে, তাঁহার দর্শন লালসায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সাংসারিক আসক্তি, কাঞ্চন, নামযশ প্রভৃতির প্রতি যতক্ষণ আসক্তি থাকিবে এই গোপীপ্রেম লাভ করা যাইবে না। একমাত্র সর্ব্বত্যাগী সাধকই ইহাকে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। "এই গোপী প্রেমে ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর

প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান। যখন সমস্ত জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে।"

(স্বামী বিবেকানন্দ)

এই যে প্রেমরূপা ভক্তি তাহা জন্মান্তরীণ সুকৃতি বশেই জীব লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং অবশেষে অন্তরে গভীর প্রেমাসক্তি অনুভব করেন। এই প্রেম ব্রজগোপীগণের জীবনে স্ফুরিত হইয়াছিল। এই প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং অবশেষে মহাভাবে পরিণত হয়। এই মহাভাবই প্রেম-জগতের শেষ কথা। এই অবস্থায় প্রেমিক ও প্রেমিকা পৃথক সত্ত্বা হারাইয়া দুই আত্মা এক হইয়া যায়। বৈষ্ণবগণ বলেন এই দুই আত্মাই এক দেহে মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। "মীলল দুঁহু তনু অতি অপরূপ।"

রাধা ও কৃষ্ণ বাহ্যতঃ পৃথক হইলেও বস্তুতঃ উভয়ে ভেদ নাই। দ্বাপরে রাধা কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদনের জন্যই ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এই দুই সম্মিলিত তনু একীভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব রূপ ধারণ করিলেন। রাধার প্রেমভক্তির স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এবং জগতে রাধার প্রেমভক্তির আদর্শ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া রাধাভাবে আবির্ভূত হইলেন।

মহাপ্রভুর স্বরূপ

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো

যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি

লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ আদিলীলা ১।২)

শ্রীরাধা যে প্রণয় দ্বারা আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদ করেন তাহা কিরূপ, আমার মাধুর্য্যই বা কিরূপ, আমাকে অনুভব করিয়া তাঁহার যে সুখ তাহাই বা কিরূপ, এইরূপ লোভযুক্ত হইয়া রাধাভাবযুক্ত হরি শচীর গর্ভ-সমুদ্রে জন্ম লইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীপ্রেমের যে আভাস পাওয়া যায় তাহারই বিকাশ মহাপ্রভু স্বজীবনে পরিপূর্ণভাবে দেখাইলেন। শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণের জন্য

উন্মাদিনী, এক তীব্র ব্যাকুলতা তাঁহার দেহমনকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, তেমনি মহাপ্রভুর জীবনেও তীব্র আকুলতা দেখা দিল। দিবারাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণনামপ্রচার যেমন তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তেমনই গম্ভীরার কক্ষে প্রতি রাত্রে এই ব্যাকুল প্রেমের বেদনা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিত। তাঁহারই জীবনব্যাপী সাধনা এবং প্রচার বলে বৈষ্ণব দর্শন সমগ্র ভারতে স্থায়ী আসন লাভ করিল। তিনি কোন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু এই শীর্ণ, কৃশ, তপঃক্লিষ্ট গৈরিকধারী তাপসের দেহে প্রেমবিকার এমনই ব্যাকুলভাবে প্রকাশিত হইত যে এই অপূর্ব্ব প্রেম-নির্ঝরিণীর অমৃতাস্বাদ গ্রহণের জন্য জনসাধারণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রেমপুলকিত দেহ বৈষ্ণব ভক্ত এবং কবির অন্তরে যে অপূর্ব্ব ভাবের জন্ম দিল, সেই ভাব-মন্দাকিনীর স্বগায় স্নিগ্ধ ধারায় বাংলার সাহিত্যকানন পুষ্পিত হইয়া উঠিল। এই স্নিগ্ধ ধারা সিঞ্চনে বাঙ্গালার নির্জীব সাহিত্যতরু নবজীবন লাভ করিয়া মঞ্জরিত হইল এবং তাহা যে কুসুমের জন্ম দিল তাহা আজিও সকলের নয়ন অগোচরে হৃদয়কে আমোদিত করিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই। মহাপ্রভুর পুণ্যস্পর্শে বৈষ্ণবধর্ম্ম আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে ছাড়াইয়া আপামর জনসাধারণের বরেণ্য হইয়াছে, সে আর আপনার সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে অনাদৃত অবহেলিত হইয়া নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মই একদিনে জনসাধারণের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। যদিও মহাপ্রভুর

ভূমিকা

অলৌকিক দৈবী চরিত্র এই ধর্ম্মের সর্ব্বোন্নতির জন্য মুখ্যতঃ দায়ী, তথাপি ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এবং সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইবার জন্য জনচিত্তের ক্ষেত্র এতদিন ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। জগতের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম যে কোন বিষয়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্রের পশ্চাতে একটি যোগ্য অবস্থার সৃষ্টি হইবে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা

পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একের অবনতি বা উন্নতির উপর সমাজের তৎকালীন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় এবং জনসাধারণের চিত্ত পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত হয়।

আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের জীবনযাত্রা এবং ধর্ম্মকর্ম্ম সকল কিছুই সরল এবং অনাড়ম্বর ছিল। পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে ধর্ম্মকর্ম্মের সরলতা ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান করিতেছিল এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান স্থানগ্রহণ করিতেছিল। ফল এবং দুগ্ধের পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুবলি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতির যজ্ঞধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ নানা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, যজ্ঞবেদির নির্ম্মাণ এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া ব্যাপৃত হইযা রহিলেন। নানা বাহ্যিক অনুষ্ঠান সঙ্ঘটিত হইলেও উপনিষদের ঋষি এই যুগেই এক অভিনব বাণী প্রচার করিলেন। বিশ্বের ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল কিছুই সেই এক পরমাত্মা ব্রহ্মের অংশ এবং তাঁহার মধ্যেই সকল কিছুর বিলোপসাধন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি ঘোষণা করিলেন আপনার সত্ত্বাকে জ্ঞাত হইলে মৃত্যুর পর আত্মার মোক্ষ ঘটে। যতদিন পর্য্যন্ত জীব স্বকীয় সত্ত্বাকে অবগত না হয়, এই জগতে বারংবার আসা-যাওয়ার বিরাম লাভ হয় না। পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ আত্মা ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ ভোগ করে, কিন্তু কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই মতবাদ ধীরে ধীরে জনসমাজে বিস্তার লাভ করিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহারই উপর ভিত্তি করিযা আপনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই যুগে প্রজাপতি প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই রুদ্র এবং বিষ্ণু জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

বৈদিক যুগের ধর্ম্ম

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন থানেশ্বররাজ হর্ষাদিত্য ভারতের সিংহাসনে সমাসীন। তিনি বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন এবং সমগ্র দেশে বৌদ্ধভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে প্রাণহীন যাগযজ্ঞ এবং পশুবধ প্রভৃতিই প্রধানতঃ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত রসধারা জনচিত্তকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না এবং শুষ্ককণ্ঠ সমগ্র ভারত আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া পন্থানুসন্ধান করিতেছিল। এমনই উপযুক্ত কালে তথাগত নবধর্ম্মের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া জনচিত্তকে প্রকৃত ধর্ম্মের আস্বাদ দিলেন এবং শান্তি ও তৃপ্তি দান করিলেন। এখন হইতে বুদ্ধের উপদেশে

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব

মানুষ অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ এবং আড়ম্বরের নিরর্থকতা বুঝিতে পারিল এবং ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের যে বীজ, ঈশ্বরের সহিত অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন করা, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মে না পাইলেও বাহ্য আচারের মূল্যহীনতা মনে হয় এখন হইতেই জনচিত্তে স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং আমরা একথা বলিতে পারি যে সম্ভবতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহার বীজ বপনেব ক্ষেত্র জনচিত্তে কর্ষণ করিতেছিল।

মৌর্য্যযুগে জাতিভেদ ক্রমেই সুদৃঢ় হইতেছে দেখা যায়। মৌর্য্যযুগের ধর্ম্মগত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় বৈদিক ইন্দ্র এবং বরুণ দেবতা তখন পূজা পাইতেছেন কিন্তু তাহার সঙ্গে বাসুদেবের মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। এই বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব আবির্ভাব। নানা দেবদেবী, গঙ্গা, শিব, স্কন্দ প্রভৃতিব পূজা এযুগে হইত তাহা পাতঞ্জলিব মহাভাষ্য হইতে জানা যায়। বলিদান এযুগে অব্যাহতভাবে চলিতেছিল। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হইত এবং এই উপলক্ষ্যে মদ্যপান চলিত। দেশের মধ্যে ধর্ম্মভাব ক্রমেই শিথিল হইতেছিল এবং ধর্ম্মের নামে নানা অনাচারের সূত্রপাত দেখা দিযাছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়দর্শী অশোকেব হৃদযেব শুভ্র ধর্ম্মজ্যোতির দীপ্তিতে সমগ্র দেশ হইতে এই অনাচাবের কালিমা দূবীভূত হইল। আপন হৃদযের করুণা এবং মৈত্রীবলে জীবের প্রকৃত কল্যাণকে উপলব্ধি করিযা প্রিয়দর্শী মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হইলেন। বৈষ্ণব সংস্কারকগণও বলিদানকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দিবার চেষ্টা করিযা তাহা রুদ্ধ করিতে চাহিলেন। সেই যুগেই বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত অতি ক্ষীণ ধারায লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইযাছিল। কিন্তু এ জাতীয পরিবর্ত্তন সম্রাট অশোকের সমযে সামযিকমাত্র হইযাছিল। জনচিত্ত তখনও মহত্তর ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয নাই। সেই কারণে সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য্যবংশ ধ্বংস হইলে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, শাতবাহন রাজগণ, পল্লব নরপতিগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটাইলেন। মহাসমারোহে অশ্বমেধ, রাজসূয প্রভৃতি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান

বুদ্ধের সমসামযিক কালে দেবোদ্দেশ্যে পশুহত্যা প্রভৃতি চলিতে থাকিলেও জীবে দযাধর্ম্ম ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। কৃষ্ণের পূজা এবং কৃষ্ণে ভক্তি সে যুগেই বাসুদেব ভক্তগণ কর্তৃক প্রচার হইতে আরম্ভ হইযাছিল।

মৌর্য্যযুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যবাদের যে পুনরভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে দেখা দিল তাহারই চরম বিকাশ গুপ্তযুগে হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু এই দুই যুগে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এবং যাগযজ্ঞেই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান দুইটি শাখা শৈব এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে।

ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমেই জনসাধারণের মধ্যে এই যুগে স্বীকৃত হইতে দেখা যায়। জীবে প্রেম, পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা এবং পরহিতৈষণা বৃত্তিতে রূপ পাইতে লাগিল। বৈষ্ণব এবং শাক্ত দুই ধর্ম্মেই ভক্তিকে ভগবদ্‌কৃপা লাভের সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান সোপান বলিয়া বিবেচনা করা হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এবং শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে এই বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

ভক্তিবাদের বিকাশ

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্যং এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যযা শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

(গীতা, একাদশ অধ্যায় ৫৩-৫৪)

একমাত্র ভগবানের প্রতি নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। এই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় এবং এই অনন্যা ভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিন্নস্বরূপ হইয়া যায়, অর্থাৎ সাধক তাহাতে লীন হইয়া যান। শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে জ্ঞানলাভ হয় না, এ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। * * * সকল বিষয় হইতে চিত্ত আস্থাশূন্য হইয়া যদি ভগবানের চরণে শরণ লয় ও তাঁহাতেই একান্ত ভক্তি করিতে থাকে, তবে সেই ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মাত্মভাব আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কর্ম্মাদির পৃথক্ পৃথক্ সাধনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ফল হয় বটে, কিন্তু ভক্তিসাধনার দ্বারাই জীবের সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

এই অমৃতময়ী ভক্তিবাদের স্নিগ্ধ ধারা জনচিত্তে বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে সর্ব্বপ্রকার লৌকিক আচারহীন সংস্কারমুক্ত যে এক বিরাট ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছিল তাহা জনচিত্তক্ষেত্রকে কর্ষিত করিয়া এই অপূর্ব্ব

ধর্ম্মের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সেইজন্য অতি সহজেই ভক্তিধর্ম্মের বৃক্ষ ধীরে ধীরে পত্রে পুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠিল। অনন্ত বিরাট সান্ত হইয়া মাটির মানুষের নিকট ধরা দিল। ধরার ধূলার মানুষ সেই বিরাটের পদে আপনাকে সঁপিয়া দিতে উদ্যত হইল। গীতার মূল বাণীটি গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইনি অসংখ্য নহেন, বহু নহেন, সেই এক। সেই এককে আশ্রয় করিলে, পরিপূর্ণভাবে তাঁহারই শরণ লইলে কোন দুঃখ খেদ থাকে না।

গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলা হয়। ঐশ্বর্য্য, জ্ঞানচর্চ্চা, ধর্ম্মোন্নতি—সকল দিক দিয়াই এক অপূর্ব্ব নবজাগরণের যুগ। জাতির জীবনে সেদিন সাচ্ছল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। ঐহিক শান্তির আশ্রয়ে জাতি সেদিন ব্যাকুল চিত্তে পরমা শান্তির সন্ধান করিতেছিল। সেই ব্যাকুলতাই সেদিন সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, জ্ঞানচর্চ্চা, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছিল। স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি এবং উচ্চতর ধর্ম্মভাবের ফলে সমগ্র জাতির জীবনে পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা লক্ষিত হয়। জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গভীর প্রেমমৈত্রী ভাবের সুদৃঢ় বন্ধন গ্রথিত হইযাছিল। অস্পৃশ্য জাতি ব্যতীত সকল সম্প্রদাযই অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিযা স্বীকার করিযা লইয়াছিল। এই গুপ্তযুগেই বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহারই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল।

গুপ্তযুগের বিভিন্ন শিলালিপিতে বৈষ্ণবাচার্য্যের পরিচয় পাওযা যায। গুপ্তসম্রাটগণ স্বযং বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে ভাগবত এবং পঞ্চতন্ত্র নামে দুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদাযের উল্লেখ পাওয়া যায। রাজসহাযে বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিযা মনে হয়। বাতাপির চালুক্য রাজগণও কেহ কেহ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষিণ ভারত, বিশেষতঃ তামিল দেশে বিষ্ণু আরাধনার বহুল প্রচার ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে তামিল দেশে বৈষ্ণব আলবারগণ আবির্ভূত হন। এই আলবার বৈষ্ণবগণ প্রেমধর্ম্মের সাধনা করিতেন। নাথমুনি, যামুনাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একে একে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের জন্য আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার

এবং প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের কঠোরতা হ্রাস হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাবের বিরোধিতা করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। কিন্তু কালক্রমে সকল ধর্ম্মই নিজস্ব প্রাণসম্পদ হারাইয়া ফেলে। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম বৌদ্ধধর্ম্মেও ঘটিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শুষ্ক প্রাণহীন ধর্ম্মাচরণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রাণবন্যার প্রবাহ বহন করিয়া আনিয়া উচ্চনীচ সকল অসমতল ভূমিকে সমতল করিয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা খুব বেশী দিন চলিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে মানবের সকল কামনা বাসনা নির্ব্বাপনে নির্ব্বাণ শান্তি লাভ হয়, কিন্তু পরমানন্দ লাভের কথা সেখানে নাই। সচ্চিদানন্দ, যিনি পরম রসস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, তাঁহার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করার যে গভীর অনুভূতি তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম জানাইতে পারিল না। সুতরাং কালক্রমে শৈবধর্ম্ম আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া লইল। সংসারের নানা সম্বন্ধের মধ্যেই যে সেই পরম পুরুষের স্পর্শ পাওয়া যায় তাহা শৈবধর্ম্মই জানাইল। সন্ন্যাসকেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধান স্থান দিয়াছে, অনাসক্ত গৃহীকে সন্ন্যাসীর চেয়ে বড় বলিয়া স্বীকার করে নাই। কিন্তু শৈবধর্ম্মে সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথ সন্ন্যাসী, কিন্তু পরম গৃহী। এই অনাসক্তি এবং আসক্তির মিলন, ত্যাগী উদাসীন গৃহীর চিত্র, শুষ্ক আনন্দহীন নীরস বৌদ্ধধর্ম্মকে লোকচিত্ত হইতে দূরে সরাইয়া দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পতন

বৌদ্ধধর্ম্ম নিবৃত্তিমূলক। প্রকৃতি সদাই চঞ্চলা, পরিবর্ত্তনশীলা। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতির ভিন্ন রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম তাই জাগতিক সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া শূন্যবাদের জন্ম দিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির চঞ্চল প্রক্ষেপকে শৈবপন্থীরা লীলা বলিয়াছেন। সকল কিছুর অন্তরে সেই প্রকৃতি আনন্দময়ী রূপে লীলা করিতেছেন। আনন্দই সত্য, উহাই নিত্য।

শৈবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের অগ্রদূত হইয়া দাঁড়াইল। শৈবধর্ম্মে প্রেমের যে সূত্রপাত দেখা দিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই প্রেমবন্যায় সারা ভারত প্লাবিত করিল। সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বভারাক্রান্ত চিত্তকে জটিল তর্কজাল হইতে মুক্তি দিয়া সহজ সরল বিশ্বাস ও প্রেমের পথে জাতি ধাবিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে পূতচরিত্রা ভিক্ষুণীগণ সমাজজীবনকে অলঙ্কৃত করেন

এবং সমাজকেও উন্নততর করিয়া তোলেন। কিন্তু কালক্রমে সঙ্ঘ মধ্যে নানা ব্যভিচার দোষ প্রবেশ করিল। ভিক্ষুণীগণের মধ্যে বিলাসিতা, অর্থলালসা, নানাপ্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিল। খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একাভিপ্রায়ী বলিযা পরিচিত একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল গড়িযা উঠিল। ইহারা গোপনে সাধনভজন এবং নানা আলোচনা করিত। বৌদ্ধসঙ্ঘের কঠোব সংযম নীতির বিরুদ্ধে ইহারা ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বর ধ্বনিত করিযা তুলিত। তান্ত্রিক ভৈরবীচক্র প্রভৃতি এই সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণেরই দান। সঙ্ঘারামগুলি ক্রমে তান্ত্রিক বীভৎসতার কেন্দ্র হইযা দাঁড়াইল। বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই লোকচক্ষে হেয হইযা পড়িল এবং এই দেশ হইতে তাড়িত হইল। ব্যভিচারদুষ্ট এই সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং হেয হইযা পড়িল। হিন্দুসমাজ ইহাদের ছায়াসংস্পর্শও অপবিত্র মনে করিত। তাহার ফলে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অন্য ধর্ম্মে আশ্রয লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি হিন্দু দেবদেবীর নাম দিযা পরিচিত হইলেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সহজিযা এবং বাউল নামে পরিচিত হইযাছিলেন। ইহারা বঙ্গীয সমাজে 'নেড়ানেড়ী' নামে পরিচিত। আপনাদের রক্ষা কবিবার জন্য অবশেষে ইহারা নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। বৈষ্ণবধর্ম্মের গণ্ডীভুক্ত হইযা ইহারা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইল এবং ব্যভিচারের স্রোত কিছু পরিমাণে বন্ধ হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম 'নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম' বলিযা অনেকে বিদ্রূপ করেন এবং ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নানা কুৎসিত রীতির উল্লেখ করিযা নিন্দা করেন। কিন্তু ইহারা মোটেই বৈষ্ণব সম্প্রদায হইতে উদ্ভূত নহে। পতনোন্মুখ বৌদ্ধ সমাজের ইহারা শেষ ভগ্নস্তূপ এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে স্থানলাভ করিযা ইহাদের জীবনযাত্রা উন্নততর হইযাছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুও এই মত পোষণ করেন।

বৈদিকধর্ম্মের আড়ম্বরতার বিরোধিতা করিযাই ভক্তি আন্দোলনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। 'একান্তিক-ধর্ম্ম' নামে ইহা পরিচিত ছিল এবং ভগবদ্‌গীতার তত্ত্বের উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বাসুদেব কৃষ্ণ এই ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। কালক্রমে নানা সম্প্রদাযের সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে পরিচিত হয। ৪০০-৪৬০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তরাজগণ তাঁহাদের মুদ্রায় নিজেদের পরম ভাগবত বলিযা মুদ্রিত করিযাছেন। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষের মৃত্যুর পর মগধের জনৈক গুপ্তনরপতি, আদিত্যগুপ্ত গয়ায একটি

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে নীতির প্রাধান্যই প্রধান ছিল, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে বুদ্ধদেব নীরব। মানবচিত্ত চিরদিনই কোন একটি নির্ভরের আশ্রয়কে সন্ধান করে, তাই এই ধর্ম্ম কিছু চিরকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহা ব্যতীত নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বের পবিত্র আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়া নানা দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে সমগ্র দেশে নবশক্তিতে বলীয়ান্ ইসলাম্ তাহার অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা ভারতের বক্ষে প্রোথিত করিল। মহম্মদ ঘোরী এবং তাঁহার সেনাপতিবৃন্দ সমগ্র ভারতের দিকে দিকে অভিযান সুরু করিলেন, তাঁহাদের আক্রমণের ফলে সমগ্র দেশে এক বিরাট আলোড়ন সুরু হইল। স্বভাবতঃই নববিজেতা শাসকবৃন্দ বিজিত হিন্দুগণকে স্বীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া অত্যাচারের তুমুল স্রোত বহিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ইতি-পূর্ব্বেই দেশ হইতে বিদায় লইয়াছিল, কেবল স্থানে স্থানে বিশাল বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ২।১টি ক্ষীণ ধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। এইবার এক বিশাল ঝঞ্ঝাঘাতের সম্মুখীন হইয়া আপনার অস্তিত্বকে রক্ষা করিতে পারিল না। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং শাক্তধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত সত্যধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বামাচারকে অবলম্বন করিল এবং সমগ্র দেশে অনাচার, ব্যভিচার এবং মদ্যপান অবাধে চলিতে লাগিল। মনে হয়, বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুগণ জনসাধারণকে শক্তির আশ্রয় লইয়া ইসলামের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি কিছুকাল ধরিয়া চলা সম্ভব নয়। মানুষের অন্তরের চিরন্তন রসপিপাসা, কল্যাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সাময়িক ঘূর্ণিবাত্যায় রুদ্ধ হইলেও তাহা নষ্ট হইবার নয়। সুতরাং মানুষের হৃদয় অপর একদিকে ব্যাকুলভাবে উপায় সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল। ইতিমধ্যেই নানা দার্শনিক আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং ভক্তিবাদের স্নিগ্ধ রসধারা সিঞ্চন করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভক্তিহীন বিদ্যা এবং শুষ্ক ন্যায়ের তর্কে অদ্বৈতবাদী শঙ্করমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ভারতভূমিকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছেন। এই শুষ্ক তর্কের পীঠস্থান ছিল তৎকালীন নবদ্বীপ, যেস্থানেই পরবর্ত্তীকালে মানব হৃদয়ের চিরন্তন ব্যাকুল বেদনাকে শান্ত করিতে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীমদ্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী

ঐসলামিক বিজয়

শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া শুষ্ক জ্ঞান কচ্‌কচি লইয়া কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। ধর্ম্ম যে পুস্তকগত বস্তু নহে, তাহা মানুষের অন্তরের বস্তু, প্রেম এবং ভক্তির উপরই ইহার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শাস্ত্রের কঠোর বন্ধনে মানুষের প্রকৃত মূল্য তাঁহারা অস্বীকার করিতেন। অপরদিকে সমগ্র দেশের বিশাল জনসমষ্টি একদিকে বৃহত্তর ঐসলামিক শক্তির কঠোর অত্যাচার এবং প্রলুব্ধ আহ্বানে, অপরদিকে শুষ্ক জ্ঞান কঠোর পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক অপাংক্তেয় হইয়া শাশ্বত অনন্ত আনন্দ এবং শান্তির পথ খুঁজিতেছিল।

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে সমগ্র ভারতে এক প্রবল অশান্তির অভ্যুদয় ঘটিল। সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের ঐক্য বিনষ্ট হইল। রাজপুত নামক এক বীরজাতি ভারতের ইতিহাসে এই যুগেই আবির্ভূত হইল, কিন্তু তথাপি সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থকে ছাড়াইয়া বৃহত্তর ভারতের স্বার্থে তাহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারে নাই। স্ব স্ব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য লইয়া আত্মকলহে তাহারা এতই অধিক মগ্ন ছিল যে চারিত্রিক সাহস, দৃঢ়তা, শৌর্য্য এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও আসন্ন ঐসলামিক বিজয় হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার মত দৃঢ় প্রতিরোধের প্রাচীর তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে তুলিতে পারিল না। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা সমুদ্রগুপ্তের মত পরাক্রান্ত একচ্ছত্র সম্রাট আর কেহ হইলেন না এবং ভারতবর্ষ বিদেশীর পদানত হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সমগ্র দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুশাসনের অভাব ঘটায় প্রাকৃত জনগণ এক অশান্ত পরিবেশের মধ্যে দিনাতিপাত করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঐতিহ্যময় অতীত ইতিহাসকে বিস্মৃত হইলেন। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ জাতি এবং সমাজের পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধনকে প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অতীত আদর্শকে ভুলিয়া গেলেন এবং ইহার ফলস্বরূপ সমগ্র হিন্দুসমাজের পতন শুরু হইল।

খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কারণে রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিল। হর্ষ ধর্ম্মজগতে যে পরমতসহিষ্ণুতা দেখাইয়া ছিলেন তাহাতে পারিপার্শ্বিকের শান্তি বর্ত্তমান ছিল। জনসাধারণ শিব, সূর্য্য বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতার পূজা করিত। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায়

থাকায় ধীরে ধীরে অদ্বৈতবাদ গড়িয়া উঠিতেছিল এবং শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটিলে ধর্ম্মবিবাদের ক্ষেত্রে এই অদ্বৈতবাদই তর্কের প্রধান বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমগ্র দেশে ধর্ম্মগ্লানি দেখা দিয়াছিল। লোকে ইচ্ছামত অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করিত এবং মদ্য প্রভৃতি নানা কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়ে। অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিচিত্র অনুষ্ঠানসকল প্রকৃত ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় বেদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিত এবং নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিরত কলহ এবং তর্কযুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শিব, অগ্নি, গণেশ, সূর্য্য, ভৈরব, কার্ত্তিক, যম, বরুণ, আকাশ, জল, সাপ এমনকি ভূত প্রেত পর্য্যন্ত পূজনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বীর পদক্ষেপে বেদান্তদর্শনের উড্ডীয়মান ধ্বজা লইয়া ভারতের এই বিশৃঙ্খল ধর্ম্মরাজ্যে শৃঙ্খলা আনিলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তর্কযুদ্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে পরাস্ত করিয়া তিনি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এই প্রচণ্ড সংঘাতের সম্মুখে টিকিতে পারিল না, তাহা আপনার পরিধিকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়া মগধের নির্জ্জন বিহারগুলির মধ্যে আত্মগোপন করিল। দেশের শিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলী অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ জনগণ ইহার মধ্যে আপন অন্তরের তৃপ্তি খুঁজিয়া না পাইয়া তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর আরাধনাতেই ব্যাপৃত হইল। শঙ্করের মতবাদ সমগ্র দেশের জনচিত্তের পরিপূর্ণ খাদ্য দিতে পারে নাই। তাই তাঁহার মতবাদ পরবর্ত্তীকালে এক বিরাট মত-বিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল এবং অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মজগতে এক বিরাট সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতির মত তাঁহাকে বাস্তবপন্থী সংস্কারক সম্ভবতঃ বলা চলে না। যুগযুগান্ত ধরিয়া যে অর্থহীন বিচিত্র সংস্কার এবং ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, শতাব্দীব্যাপী সেই সংস্কারকে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জনচিত্ত হইতে দূরীভূত করা সম্ভবপর ছিল না। সেই কারণে নবম শতাব্দীকে এক কথায় মতবিরোধ তথা ধর্ম্মকলহের যুগ বলা চলে।

ধর্ম্ম কলহ

বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্ম্মের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা লুপ্ত হইল। কেননা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমেই অবনতির পথে আগাইয়া যাইতেছিল। বুদ্ধদেবের সরল

উচ্চ আনন্দময় শিক্ষা ধীরে ধীরে জটিল এবং আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিয়া প্রকৃত ধর্ম্মকে বিদায় দিল। বৌদ্ধমঠগুলি কুসংস্কার এবং নানাবিধ ব্যভিচারের আকর হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রা জনসাধারণের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদন করিল না এবং লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়িল। অপরদিকে, হিন্দুধর্ম্ম কখনও সম্পূর্ণভাবে আপনার প্রাণশক্তিকে হারায় নাই। নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও যখনই কোন শক্তিশালী সংস্কারক বা মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তখনই হিন্দুধর্ম্ম নব প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুতগণের সমর্থন এবং শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের জনচিত্তে প্রাধান্য এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অবহেলা ইহাকে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহারই ফলে নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য যখন বৈদান্তিক দর্শনবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় দাঁড়াইতে পারিল না। সমগ্র দেশে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। দেশের এই অশান্তিময় পরিবেশে জনসাধারণ বীরধর্ম্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইল, শান্ত বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে আপনার পুরাতন অবস্থাকে ফিরিয়া প.ইল এবং যখন মুসলমানগণ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিহার আক্রমণ করিল, তখন সহজেই বৌদ্ধ মঠ এবং বিহারগুলি ভূমিসাৎ হইল।

শঙ্করাচার্য্যের আগমনের কিছুদিন পরে সমগ্র হিন্দুসমাজ ভক্তিবাদের প্রচারক রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবে আন্দোলিত হইল। মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে নবযুগের অরুণোদয় প্রত্যক্ষ হই‍ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে যে আরবজাতি ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল তাহারা পরবর্ত্তী যুগের তুর্কী শাসকবৃন্দ অপেক্ষা সভ্যতায় অধিক অগ্রসর ছিল। আরব আক্রমণের সমসাময়িক যুগে হিন্দুসমাজ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। হর্ষের মৃত্যুর পর সমগ্র দেশব্যাপী রাজনৈতিক বিপর্য্যয় নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটাইয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও ভারত তাহার দার্শনিক এবং অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে তখনও উন্নত ছিল এবং যখন আরবগণ হিন্দুগণের সংস্পর্শে আসিলেন তাঁহারা হিন্দু দর্শনের প্রগাঢ় গভীরতা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দর্শন এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় প্রসক্তি হিন্দুগণকে রাজনীতিক্ষেত্রে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহ তাঁহারা হারাইয়া ফেলিলেন এবং তাহার ফলে প্রবল তুর্কী আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

যুগে যুগে ভারতে নানা জাতি অভিযান করিয়াছে এবং কালের গতিতে "এক দেহে হল লীন"। কিন্তু মুসলিম অভিযানের অনুরূপ রূপান্তর ঘটিল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তি বিধ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার পিতৃপিতামহ-গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সে হারাইল না। তুর্কীগণ দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানসিক সম্পদ বলিতে তাহাদের বিশেষ কিছু ছিল না। মুসলিমগণের একেশ্বরবাদ উপনিষদে বহু পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন ভক্তিবাদের মধ্যে ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে বৈদান্তিক দার্শনিকগণ ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মুসলিম আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সমগ্র দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা এবং পুরোহিতের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এক যুগে বিভিন্ন প্রদেশে উন্নতির চরমাবস্থায় নীত হইল। হর্ষ প্রভৃতি নরপতিগণ উভয় ধর্ম্মের রীতি অনুসারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন এবং বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে দান করিতেন। কিন্তু কালক্রমে শঙ্করাচার্য্য সমগ্র জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে পুনরায় লুপ্ত গৌরব এবং প্রাধান্যকে উদ্ধার করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে কল্পনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ভক্তিবাদ স্থান পায় নাই। ভক্তিবাদ ব্রহ্মকে পরম রসস্বরূপ, সকল সৌন্দর্য্যের এবং আনন্দের মূলীভূত পরমাত্মারূপে কল্পনা করিয়াছেন। মায়াবাদ সংসারের প্রেম প্রীতিকে কোন স্থান দিতে চায় নাই। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করিয়া একাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান ঘটিল। রামানুজ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে শঙ্করের ভাষ্যেরই বিরোধিতা করিয়াছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে রামানুজ তামিলদেশীয় মহাপুরুষগণের নিকট হইতেই উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন।

এইভাবে ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান ঘটিল এবং রামানুজের পরবর্ত্তী আচার্য্য-গণের প্রচেষ্টায় ইহা জনচিত্তে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিল। হিন্দুধর্ম্মও ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতার ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ইহার উন্মুক্ত উদার ক্রোড়ে আহূত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের মিলন সাধিত হইল এবং বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতাররূপে গৃহীত হইলেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে দর্শনবাদে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুসলিম চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নামদেব, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণের উপদেশাবলীতে হিন্দু এবং মুসলিমের মিলিত চিন্তাধারার একাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলিমধর্ম্মের জটিলতাহীনতা এবং একেশ্বরবাদ ধর্ম্মসংস্কারকগণকে প্রভাবিত করে। তাঁহারা পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করেন এবং ভক্তিকেই একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

উভয় সভ্যতার মিলন

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গ্রহণশক্তি এতই অধিক ছিল যে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদেশিক আক্রমণকারীগণ গ্রীক, শক, হুণ সকলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কবির কথায় বলিতে গেলে "শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন"। কিন্তু তুর্ক আফগান আক্রমণকালে ঠিক তদনুরূপ ঘটিল না। মুসলিম শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্মাদর্শ সকল কিছুই ভারতের প্রাচীন সমাজ এবং ধর্ম্মাদর্শ হইতে পৃথক, সেই কারণেই আগন্তুক অভিযানকারীদের সহিত অধিবাসীদের মিলন ঘটিতে পারিল না। উভয়ের পারস্পরিক বিজিত ও বিজেতা সম্পর্ক কখনও কখনও তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয় সভ্যতায় শতাব্দীব্যাপী সংযোগ ঘটায় পরস্পরের প্রভাব পড়িয়াছিল। সুদীর্ঘকালব্যাপী সংযোগের ফলে ভারতে ইসলাম ধর্ম্মান্তরিতদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। এই যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদারমতাবলম্বী আচার্য্যগণ ধর্ম্মান্দোলনের প্রভাবে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের চিন্তাধারা এবং রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক সংঘাত এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের অন্তরালেও পারস্পরিক ধর্ম্মসমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল। বস্তুতঃ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পরস্পরের নিকট গ্রহণযোগ্য অনেক কিছুই ছিল। মুসলিম সাধু এবং পণ্ডিতগণ মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় ভারতবর্ষে ইসলাম দর্শন এবং রহস্যবাদের প্রভাব হিন্দুধর্ম্মের উপর পড়ে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধকগণের উপর শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়ায় পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার ভাবটি ক্রমেই জাগিয়া উঠিতে থাকে। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে মুসলমানগণের কৌতূহল জাগ্রত হইতেছিল এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালাদেশে হুসেন শাহ এবং কাশ্মীরে জৈন-উল-আবিদীন হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের যোগ, বেদান্ত, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এবং

জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির'চর্চ্চা মুসলিমধর্ম্মপ্রচারক সাধুগণকে আকৃষ্ট করিল। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণও মুসলমানগণের নিকট হইতে অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমারেখার হিসাব, পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবার বিশেষ কয়েকটি প্রণালী, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ের ভাষার সংমিশ্রণের ফলে উর্দ্দুর জন্ম হইল। শিল্পবিদ্যা, সাহিত্যচর্চ্চা প্রভৃতি জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলিতেছিল দেখা যায়। ধর্ম্মজগতেও এই ভাবটি প্রবল হইয়া উঠিল।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইসলামের সংঘাত এবং সম্মিলনের দুইটি ফল দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে ইসলামের প্রবল ধর্ম্মান্তরিতকরণের প্রচণ্ড উদ্দীপনা গোঁড়া হিন্দুগণকে অধিকতর সংস্কারাবদ্ধ করিয়া তুলিল। ইসলাম ধর্ম্মকে বাধা দিবার জন্য এবং হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষার্থে জাতিভেদের কঠোরতা বর্দ্ধিত হইল ও স্মৃতিশাস্ত্রের নানা বিধি-নিষেধাদি গঠিত হইল। বিজয়নগর রাজ্যের মধ্বাচার্য্য "পরাশর স্মৃতি"র উপর ভাষ্য রচনা করিলেন। কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকা রচনা করিলেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রের নব্য বিধান দিলেন। অপরদিকে ইসলামের গণতান্ত্রিক প্রভাব হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মব্যবস্থার উপর পড়িল। উদার ভক্তিমতের কয়েকজন বিখ্যাত সাধক এবং মহাপুরুষ এই যুগেই আবির্ভূত হইলেন। সামান্য কয়েক বিষয়ে মতদ্বৈধতা থাকিলেও, তাঁহারা যে বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা কোটি কোটি নিরক্ষর প্রাকৃত নরনারীর জন্য। সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল যে একই এবং সেই এক ঈশ্বরই যে সেই অনাদি অনন্ত মূল তাহাই তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্তিপথের সাধকেরা মানুষকে তাহার জাতির জন্য মূল্য দিতেন না, অন্তরের ভক্তির প্রেরণা ও কর্ম্মের সাধনাই মানুষকে প্রকৃত মূল্য দেয় ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের এবং পুরোহিতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা দৃপ্ত প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর একদিনও এমনই বিদ্রোহ ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের পুরোধা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। যখনই প্রকৃত ধর্ম্ম আচারের শুষ্ক মরুবালিরাশি তলে আপনার নির্ম্মল ধারাটিকে হারাইয়া ফেলে তখনই বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছে। সরল ভক্তি এবং বিশ্বাস প্রতিটি প্রাণীকে পরম এবং চরম মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে।

ইসলামের প্রভাবের দুইটি ফল

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে উহা কতকগুলি বীভৎস তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্ম সঙ্ঘের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষু ও

ভিক্ষুণীর অবাধ মিলনের ফলে বিহারগুলি হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধদেব কে ছিলেন তাহাও অনেকে বিস্মৃত হইযাছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য এবং বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বৌদ্ধপন্থীদের উপর সমাজ ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। জনসমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতেছিল এবং অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িযাছিল। কিন্তু পাঠান যুগে সর্ব্ব প্রথম হিন্দুসমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল। মুসলমান সম্রাট ও বাদশাহেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করাইতে লাগিলেন। এক দিকে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব, অপব দিকে বাঙ্গালা ভাষায ধর্ম্মপ্রচার, তাহার ফলে জনসাধাবণের মনে নবভাব জাগ্রত হইল। চিন্তা-জগতে সর্ব্বত্র জডত্ব পরিহার করিযা স্বাধীনতার স্ফুবণ হইল। এই সমযে শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মজগতে কযেকজন সাধক এবং মহাপুরুষ আবির্ভূত হইযা প্রেম ভক্তিব বন্যা প্রবাহিত করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী, বামানুজাচার্য্য, নিম্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, মহাপ্রভু প্রায এক কালেই আবির্ভূত হইলেন।

রামানুজ ১০১৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমে ধর্ম্মপ্রচারেব প্রধান কেন্দ্র করেন।

কান্যকুব্জেব এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারতের পবিত্র তীর্থগুলিতে পরিভ্রমণ কবিযা তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁহার ·· গুধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার প্রধান প্রধান দ্বাদশ শিষ্যেব মধ্যে একজন ছিলেন নাপিত, একজন মুচি ও অপর একজন মুসলমান জোলা।

বিভিন্ন সাধকের আবির্ভাব

১৪৭৯ খৃঃ বারাণসীতে এক তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে বৈষ্ণবাচার্য্য বল্লভাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিযা তিনি বিজযনগররাজ কৃষ্ণদেব রাযের সভায গমন করেন এবং প্রকাশ্য দরবারে কযেকজন শৈব পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। বল্লভাচার্য্যের মতবাদ শুদ্ধ অদ্বৈত নামে খ্যাত ছিল।

নামদেব, কবীর এবং নানকের উপদেশাবলীতে ঐস্লামিক প্রভাব লক্ষিত হয। তাঁহারা জাতিভেদপ্রথা, পৌত্তলিকতা, অন্ধ সংস্কার প্রভৃতির বিরোধিতা করিয়াছেন এবং বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও পবিত্রতাকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিযা প্রচার করিয়াছেন। ঈশ্বর এক এবং মানুষ ভাই ভাই—তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

মহারাষ্ট্রে নামদেব ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার কয়েকজন মুসলমান শিষ্য ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এক দর্জ্জীর ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরের একত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিমা পূজা এবং ধর্ম্মের নানা বাহ্য আড়ম্বরকে তিনি বিশেষ স্থান দিতেন না। একমাত্র ঐকান্তিক ঈশ্বরপ্রেমই ভগবদ্ লাভের সহায়ক হইতে পারে—ইহাই তাঁহার মত ছিল।

হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় আনয়নের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন কবীর। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কবীরের চিন্তাধারায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব পড়িলেও সুফী সাধক এবং কবিদের প্রভাবও প্রভূতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কবীর যে প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে একটি সূত্রে বাঁধিয়াছিল। কবীর হিন্দু-মুসলিম কোন ধর্ম্মেরই বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করিতেন না।

শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক সমসাময়িক কালেই আবির্ভূত হন। তিনি তালবন্দীতে ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে এক ক্ষত্রি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্মমতসহিষ্ণুতা প্রচার করিয়াছিলেন। অনর্থক ধর্ম্মকলহ নিবারণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্ম্মেরই বহিরঙ্গমূলক অনুষ্ঠানকে তিনি দোষারোপ করিয়াছিলেন এবং একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কৃচ্ছ্র সাধন এবং ভোগবিলাসের মধ্য পথকে নানক বাছিয়া লইয়াছিলেন।

প্রাচীন শাস্ত্রে রাগানুগা ভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ইহার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কর্ত্তা, অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতি এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মেও তিনি সেই ভাবেই পরিচিত ছিলেন। মহাপ্রভু ভগবানের আনন্দময় রূপকেই আরাধ্য করিলেন। বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে সমস্ত জীবজগতের একমাত্র করুণার সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। জীবের সমস্ত পারিবারিক বন্ধনকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত কামনার উর্দ্ধে তাঁহার মতবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু পরিবারের সকল সম্বন্ধের মধ্যেই ভগবদারাধনার উপাদান দেখাইয়াছেন। শৈবধর্ম্ম পরিবারগত সম্বন্ধকে আনন্দময়ের আনন্দের সম্বন্ধ বলিয়া প্রথম ঘোষণা করেন। মহাপ্রভু এই সম্বন্ধগুলিকেই অধিকতর গরীয়ান করিয়া তোলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিলেন, আনন্দময় একদিন নররূপে

আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনই ব্রজবাসীগণের উপাসনা ছিল।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। ২৪ বৎসর বয়ঃকালে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি সমগ্র ভারতে প্রেম ভক্তির বাণী প্রচার করিয়া বেড়ান। তাঁহাব শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতাররূপে শ্রদ্ধা করিতেন। চৈতন্যবাদেব মূলবস্তুটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঐকান্তিক বিশ্বাসের সহিত প্রচার করিতেন যে প্রেমভক্তির মধ্য দিয়াই ভগবদ্‌স্বরূপকে অবগত হওয়া যায়। হিন্দু মুসলিম, উচ্চনীচ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিনি তাঁহার অমৃতময়ী বাণীকে প্রচার করিযাছেন এবং কৃপা করিযাছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক গতি

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায সাহিত্য শব্দের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিযাছেন।

"শব্দার্থযো র্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা।"

শব্দ ও অর্থের যথাযথ সহভাবে যে বিদ্যা তাহাই সাহিত্যবিদ্যা।

সাহিত্য কাহাকে বলি? কবিচিত্ত বিচিত্র বিশ্বের নানা ভাব সত্তাকে গ্রহণ করিযা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ধ্বনি ও সুরে তাহাকে প্রকাশ করেন এবং তাহাই সাহিত্য রূপে আমাদেব সম্মুখে তাহার রসমূর্ত্তি লইযা প্রকাশিত হয। কবির হৃদযনিঃসৃত সেই ভাবরাশি পাঠক চিত্তে শব্দোত্তর ও বাক্যোত্তর এক ব্যঞ্জনা রচনা করে এবং পাঠক ও কবি চিত্তে এক নিবিড় সংযোগ ঘটাইযা থাকে। বিশ্ববীণাব তন্ত্রীতে যে সুর ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইযা উঠে, তাহাকেই অন্তরের দৈবীশক্তি বলিযা কবি শুনিয়া থাকেন এবং নানা রাগরাগিণী সহযোগে তাহাকেই আমাদের অন্তরবেদীতে পৌঁছাইযা দেন।

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও শব্দ ব্যাখ্যা

সাহিত্যের লক্ষ্য উপলব্ধির আনন্দ। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজন এবং অভাব আমাদের চারিদিকে জমিযা উঠে, কিন্তু সেই জমার প্রাচীরে একটি

ছুটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে। দৈনন্দিন জীবনের সব কিছু প্রয়োজন এবং অভাবকে মোচন করিয়াও আমাদের অন্তরের তৃপ্তিহীন কামনা রসতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ঘুরিয়া বেড়ায়, অপ্রয়োজনের আনন্দকে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য পাইতে চায়। তাই দৈনন্দিন সপ্তাহব্যাপী কর্ম্মের মধ্যে আমরা একদিন ছুটি চাই। এই ছুটি চাওয়া মানুষের ধর্ম্ম। এই ছুটি কিন্তু কর্ম্মহীন অলস মুহূর্ত্তে যাপিত হয় না— অকাজের বোঝা লইয়া মানুষ তাহার অবসর দিনটিকে পূর্ণ করে। এই অপ্রয়োজনীয় অকাজই মানুষের জীবনে ছুটির আনন্দের স্পর্শ দেয়। মানুষের ক্ষুদ্র দেহসত্ত্বার অন্তরালে যে আত্মাপুরুষ থাকেন তিনি সেই বিরাট অনন্ত সত্ত্বারই অংশবিশেষ। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার চাপে সেই আত্মাপুরুষ পীড়িত হন। তাই মানুষ চায় ছুটি, চায় প্রয়োজনের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ছাড়াইয়া অপ্রয়োজনের আনন্দকে ভোগ করিতে। তাহারই মধ্যে মানুষ অনন্তের স্পর্শ পাইয়া থাকে। আদিম মানুষ যেদিন সভ্যতার প্রথম ধাপে পদার্পণ করিল —সেইদিন সে মাথায় রঙীন ফুল গুঁজিত, জ্যোৎস্নার অমল শুভ্র কিরণে আপনার সঙ্গিনীকে লইয়া নৃত্যগীতে মত্ত হইয়া উঠিত, আপনার গুহাদ্বার বিচিত্র চিত্রে ভূষিত করিত—এ সবই অপ্রয়োজনের আনন্দ। আপনাকে নানা রূপে প্রকাশ না করিতে পারিলে মানুষ বাঁচে না, তাহার স্বভাবধর্ম্ম তাহাকে পীড়া দেয়।

"রূপে সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশ সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব, এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত—আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করে; তার বর্ত্তমানকে অধিকার করে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত, সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না। তাই এ আপন সত্ত্বার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত যে রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। এই সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে। যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্য, সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয়তায়।" (রবীন্দ্রনাথ)

মানবচিত্তের বহিঃপ্রকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরতম রূপ—সাহিত্য। যুগের

ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যাইবে ধর্ম্মগত, রাষ্ট্রগত যে-কোন বিরাট আন্দোলন আলোড়ন পরিপূর্ণ তরঙ্গক্ষেপের চিহ্ন সাহিত্যেই প্রথম স্থানলাভ করিয়াছে। সমাজমানসের পরিপূর্ণ চিত্র এই সাহিত্য হইতেই লাভ করা যায়। বিভিন্ন যুগে তৎকালীন জনচিত্তের মানসিক গতি প্রকৃতি এবং চিত্তের প্রবণতা সমসাময়িক যুগসাহিত্যেই পদচিহ্ন রাখিয়া যায়।

সাহিত্যে ক্ষণিকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই অনন্তের আস্বাদ পাওয়া যায়, শুধু তাহাই নহে—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন সামগ্রীতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কবি ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন—তাঁহার হৃদয়গত ভাবোচ্ছ্বাস বহির্বিশ্বে মূর্ত্তি গ্রহণ করে এবং তাহার মধ্য দিয়া কবির অন্তরের বেদনা মুক্তি পায়।

সাহিত্যের রস বা আনন্দ লৌকিক জীবনের উপলব্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুখ দুঃখ সকল লৌকিক অনুভূতিই সাহিত্যে অলৌকিক রস সঞ্চার করে। দুঃখের অনুভূতিও সাহিত্যে রসের সৃষ্টি করে, সেইজন্য ট্র্যাজেডি আমাদের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দুঃখের অনুভূতি আমাদের চিত্তে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। দুঃখের কাহিনীর মধ্যে আমরা মানবহৃদয়েরই প্রকাশ দেখি।

"যেখানে ট্র্যাজেডি সবচেয়ে বেদনাদায়ক, সেইখানেই সে তীব্রতম আনন্দের বাহন। ইহার কারণ এই যে, বেদনাময় মুহূর্ত্তেও আমরা অনুভব করি যে এই অভিজ্ঞতার অংশীদার হইলেও ইহা আমাদের স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ না করিলেও ইহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। * * * মনে করি অথচ ইহাও মনে করি যে, যে-আমি এই তন্ময়তা লাভ করিতেছে, সেই-আমি আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ সত্তা নহে, তাহা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।" (শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

কবির সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ মৌলিকতা। একমাত্র বাস্তবানুগামিতা সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড নহে। কেননা সাহিত্যের কারবার বিচিত্র মানবচরিত্র লইয়া। মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রাণশক্তিতে, চঞ্চলতায়, পরিবর্ত্তনশীলতায়। আধুনিক সমালোচক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডে মানুষ এবং শিল্প সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিল। কিন্তু অর্থনীতি মানুষের জীবনকে চালিত করিলেও সে-ই মানুষের সকল ইচ্ছাশক্তির সর্ব্বময় প্রভু নহে। মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচয় তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিতে। সাহিত্যের নানা চরিত্রে

এই প্রাণশক্তিই আমরা দেখিতে চাই। কোন কিছু মত বা প্রচারকে লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য রচিত হইলে সেখানে সাহিত্যের ধর্ম্ম কলুষিত হয়—তাহা নিছক প্রচারমূলক পত্রিকা হইয়া দাঁড়ায়। সাহিত্যে হইবে রসের উৎস—যে রস মানুষকে আনন্দ দান করে, তৃপ্ত করে—সত্য ও সুন্দরের সাধনায় মানুষকে প্রবৃত্ত করে। সাহিত্যের "আবেদন নিছক বুদ্ধির কাছে নহে, নিছক অনুভবের কাছেও নহে, বুদ্ধি ও অনুভবের দ্বারা উদ্ভাসিত উপলব্ধি ও অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-ক্ষমা কল্পনার কাছে।" (শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

সাহিত্য আমাদের চিত্তকে সম্প্রসারিত করে এবং অনুভূতির গভীরতা আনয়ন করে। সাহিত্যে জীবনের প্রতিচ্ছবি পড়ে, কিন্তু সেই প্রতিচ্ছবিই সার নহে—জীবনের রহস্য ও জটিলতার পরিচয় সাহিত্যই দেয়। সাহিত্যের নিবিড়তম আবেদন হৃদয়ে কেননা সাহিত্যে মতের প্রচার আছে কিন্তু সেখানে মনের প্রকাশই প্রধান।

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সমগ্র ভারতে একদিন আলোড়ন তুলিয়াছিল এবং আসমুদ্র হিমাচলবাসী কোটি কোটি জনচিত্তকে এক অপূর্ব্ব নবভাবের উন্মাদনায় মথিত করিয়াছিল, আজিকার দিনে সেই পরিচয় আমরা তৎকালীন সাহিত্য হইতেই পাই। এই আলোড়ন একদিনে আসে নাই। নিভৃত গিরিকন্দরে চিরতুষার রাজ্যে নদী ঘুমাইয়া থাকে। একদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। পাষাণবেষ্টনী ভেদ করিয়া অমৃত-প্রবাহিনী কল্যাণরূপিণী স্রোতস্বিনী নগর, জনপদ, গ্রাম রচনা করিয়া অনন্তের আহ্বানে ছুটিয়া চলে। সেইরূপ কোন এক অজ্ঞাত শুভ মুহূর্ত্তে ভাগবতের সংস্কৃত কারায় আবদ্ধ অপূর্ব্ব প্রেমভক্তিরস কোন এক অলৌকিক প্রেরণায় স্বর্গীয় মন্দাকিনী-ধারা লৌকিক ধারায় বহন করিয়া লইয়া আসিল। অসংখ্য কবির কল-কাকলীতে বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জ মুখরিত হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব কবিতার জন্ম

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক উমাপতিধরের গীতিকাব্য, জয়দেবের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রসাত্মক পদগুলি রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এইগুলিতে প্রাকৃত প্রেমই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সম্ভোগ ও মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতার চিত্রই অধিক পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে তাঁহার জীবনে সাত্ত্বিকবিকারপূর্ণ শ্রীরাধার প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং এই কাব্যগুলিও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করে। তিনি

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

নিজে সর্ব্বদা শ্রীগীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমের বিরহানলে দগ্ধ তাঁহার তাপখিন্ন হৃদয় যে এইগুলি পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত এবং শান্ত হইত তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়।

"কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
দুঁহে শ্লোকগীতে প্রচুর করায় আনন্দ॥"

(শ্রীঃ চৈঃ অন্ত্যখণ্ড ১৫।৫৫৪)

"স্বরূপ গোঁসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাহাতে আমার চিত্ত হয়েত সম্বিত॥
শুনি স্বরূপ গোঁসাঞি মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া॥

*   *   *

স্বরূপ গোঁসাঞি পদ কৈল সমাপন।
বোল বোল বলে প্রভু বলে বার বার॥'

(শ্রীঃ চৈঃ অন্ত্যখণ্ড ১৫।৫৫৮)

মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে, তাঁহার জীবনাদর্শ ও প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে অসংখ্য কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাবৈচিত্র্য অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন।

মহাকবি জয়দেব যে কোমল-কান্ত-পদাবলী সৃজন করিলেন তাহাতে সে যুগের কাব্যকলার প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় কবি উমাপতিধর, আচার্য্য গোবর্দ্ধন, কবিরাজ ধোয়ী এবং শরণ প্রভৃতি সে যুগের বিচিত্র কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেন। কাব্যের আড়ম্বর এবং ঝঙ্কার শ্রোতার কর্ণকে বিস্মিত করিত। কিন্তু প্রকৃত রসাত্মক কাব্যই একমাত্র যথার্থ সাহিত্য হইতে পারে তাহা স্বকীয় দৈবী প্রতিভা বলে মহাকবি জয়দেব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। রচনায় ভাব এবং রসই যে মুখ্য বস্তু এবং তাঁহার রচিত কাব্য যে রসপিপাসু এবং ভক্ত সাধককে প্রকৃত আনন্দ দান করিবে তাহা যেন কবি দিব্যদৃষ্টিবলে বুঝিয়াছিলেন। তাই শতাব্দীর ব্যবধানে আজ সেনরাজসভার কবিতার খণ্ডাংশ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়, কিন্তু অমর কাব্য গীতগোবিন্দ আজিও সাহিত্য-রসপিপাসু এবং ভক্তের অন্তরের বস্তু। ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু এ কাব্যের প্রকৃত

বোদ্ধা ছিলেন, তাই এ কাব্যের রসকে তিনি সাগ্রহে আস্বাদন করিতেন।

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ—
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥"

মহাকবি জয়দেবের স্বরচিত কাব্যবিষয়ে ইহা গর্ব্বোক্তি মাত্র নহে, ইহা প্রকৃতই রসিকচিত্তের পরিচয়। গীতগোবিন্দের প্রতিটি শ্লোকে যে অপূর্ব্ব রসমাধুরী, শব্দঝঙ্কার, ভাবমূর্চ্ছনার প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বিশ্বসাহিত্যের আসরেও এক অভিনব সৃষ্টি।

গীতগোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে বিচিত্র বিবরণ আছে তাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিতান্ত প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরম ভক্ত এবং সাধক জয়দেব অন্তরের সবটুকু প্রেম ঢালিযাই এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে গীতগোবিন্দের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ ধরা পড়ে না, কিন্তু মহাপ্রেমিক মহাপ্রভু ইহার গভীরতা অনুভব করিয়াছিলেন বলিযাই উহার মূল্য দিয়াছিলেন। এই প্রেমলীলা যে অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে অনাদি পুরুষের নিত্যলীলা তাহা গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি নির্দ্দেশ করে।

"মেঘৈর্ম্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং
ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপকে এক কাহিনীতে উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। বর্ষার এক নিবিড় রাত্রে সন্ত্রস্ত শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ শ্রীমতী রাধার হস্তে অর্পণ করেন। নন্দ শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই-জন্য তাঁহাকেই গৃহে লইয়া যাইবার ভার দিলেন। কবি জয়দেবও তাঁহার অমর কাব্যে সুগভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাটি দিবার জন্যই এই কাহিনীটির উপর ভিত্তি করিয়াই কাব্যের আদি শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ যে পরমপুরুষ, পরব্রহ্ম তাহা সাধক জয়দেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেবতারা যে তাঁহারই অংশ সে ইঙ্গিত তিনি কাব্যে দিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধনার এই পরম এবং চরম কথাটি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" জয়দেব গোস্বামীর কাব্যে স্থান পাইয়াছে। দশাবতার স্তোত্রে প্রত্যেকটি রূপের বন্দনা করিয়া

অবশেষে দশরূপধারী কৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন।

জগৎসংসার যাঁহাকে নিরন্তর অনুসন্ধান করিতেছে, যাঁহার মুহূর্ত্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ত্রিভুবন ব্যগ্র ব্যাকুল, যোগী ঋষি মুনির যিনি পরম সাধনার বস্তু, তিনিও রাধার প্রেমে বিবশ। রাধা বিরহে তিনি উন্মাদ হইয়া উঠেন। এই যে নূতন পথের সন্ধান দিলেন জয়দেব গোস্বামী, তাহাই পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণব কাব্যের প্রধান বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। ভগবান প্রেমের বশ, ভক্তির আকর্ষণে সেই অচঞ্চলও স্থির থাকিতে পারেন না—তিনি প্রেমময় তাই প্রেমাকর্ষণে তিনি আসিয়া ধরা দেন। তপস্যা এবং ধ্যান দ্বারা তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং ব্যাকুল ব্যগ্র আলিঙ্গনে আসিয়া ধরা দেন। শ্রীমতী রাধিকা পরমা প্রেমময়ী, তাঁহার সেই প্রেমকে কবি জয়দেব আপনার অন্তরের সাধনলব্ধ অনুভূতিতে অনুভব করিয়াছিলেন। প্রেমের যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি, যাহা সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকেও আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা জয়দেব গোস্বামীর পূর্ব্বে বাঙ্গলা কাব্যে স্থান পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। প্রেমের এই দিব্য রূপ, লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকত্ব, পার্থিবের মধ্যে অপার্থিবত্বকে জয়দেব গোস্বামী প্রথম আনয়ন করিলেন। বহুবল্লভ কেশব শত শত গোপিকা বেষ্টিত হইয়াও শ্রীমতী বিহনে রাসকুঞ্জে অবস্থান করিতে পারেন না। শ্রীমতী আপনার হৃদয়ের প্রেমানুভূতি দিয়া অনুভব করেন :—

> "সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত—
> ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্।
> গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
> ন্নন্তর্মুগ্ধ মনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ॥"

শ্রীরাধার প্রেমের ব্যাকুলতা, তাঁহার বিরহবেদনা কবি যে ভাবে বর্ণনা করিলেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের কয়েকটি পরিচ্ছেদ আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুর যে বিবরণ আমরা পাই, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক কবি শ্রীরাধার সেই অবস্থাই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার অবস্থা মেঘদূতের যক্ষবধূকে স্মরণ করায় না, অলৌকিক ঐশ্বরিক প্রেমিক ভক্ত সাধককে মনে করাইয়া দেয়। কৃষ্ণবিরহে রাধা পরম ভক্তের মতই ইষ্টদেবের নাম জপ করিতেছেন, কখনও প্রলাপ, কখনও মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে।

"হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥

*   *   *

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।"

প্রেম-ব্যাকুলা রাধার এই অবস্থা পড়িতে পড়িতে চৈতন্যচরিতামৃতের বিরহখিন্ন মহাপ্রভুকে মনে পড়িয়া যায়।

"উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।"

(অন্ত্যলীলা ১৫।৫৫৮)

এতেক প্রলাপ করি,   প্রেমাবেগে গৌরহরি
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রাম রায়।
কভু নাচে কভু গায়,   ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রিদিন যায়॥"

(অন্ত্যলীলা ১৬।৫৬৬)

"কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে কভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায়॥"

(অন্ত্যলীলা ৫৭৩)

জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটি বিষয় লক্ষ্যীভূত হয়—এই মধুর প্রেমকাহিনী যে সর্ব্বসাধারণের আস্বাদনযোগ্য নহে তাহা তিনি জানিতেন। তাই এই রসের যাহারা রসিক, যাঁহারা ভক্ত এবং সাধক, কেবলমাত্র তাঁহারাই এই কাব্য পাঠ করিবার যোগ্য—কবি তাঁহার কাব্যের বহু স্থানেই এই ইঙ্গিত দিয়াছেন। আলৌকিক রসের মাধুরী আপামর জনসাধারণ সকলেই আস্বাদন করিতে পারে না।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং॥"

"ভণতি কবি জয়দেবে হরিবিরহবিলসিতেন
মনসি রসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥"

প্রেমের মধ্যে অপার্থিবতা, হৃদয়ের বিচিত্র ভাববৈচিত্র্য কাব্যসাহিত্যে কবি জয়দেব প্রথম আনয়ন করিলেন এবং এক নবীন পথের প্রদর্শক হইয়া দাঁড়াইলেন।

সেন-আমলে বাংলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এক গভীর তিমিররাত্রি নামিয়া আসিযাছিল। তন্ত্রসাধনার নামে এক গোপন কামলীলা জাতির মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিতেছিল, সাহিত্যেও তৎকালীন সামাজিক অধঃপতনের ছবিই পরিস্ফুট হইতেছিল। বীর্য্যহীন ভ্রষ্টচরিত্র জাতির পতনের দিনেই আবির্ভাব হইযাছিল মহাকবি জযদেবের। এই ভাঙ্গনধরা সমাজে নূতন ধর্ম্মোন্মাদনার স্রোতপ্রবাহ বহন করিয়া আনিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। কবি জয়দেব তাঁহার অপরূপ প্রেমসাধনায় সেই মহাপুরুষেরই আবির্ভাব পথকে প্রস্তুত করিয়া গেলেন। এক দেহাতীত দিব্য প্রেমালোকের দীপ্তিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতীয় জীবন এবং সাহিত্যকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিলেন।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহার পদাবলী বাঙ্গালাদেশে খুবই সমাদৃত হইযাছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব সাহিত্যে যে সুরের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করিলেন, বৈষ্ণব কবির ভাবটি ঠিক তাহাতে পাওয়া যায় না। কবি জযদেব এবং বিদ্যাপতি উভযেই রাধাকৃষ্ণের প্রণযলীলাকেই কাব্যে প্রতিফলিত করিযাছেন, উভযের কাব্যেই মুগ্ধ প্রেমিকের বিহ্বল আবেগ লক্ষিত হয। কবি বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রেমিক কৃষ্ণ মুগ্ধনেত্রে রাধাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু সে দৃষ্টি অনেকখানি রূপমুগ্ধের দৃষ্টিপাত, ব্যাকুল প্রেমের আকূতি সেখানে নাই। প্রেমিকের দৃষ্টি দেহের রূপকে ছাড়াইযা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিদ্যাপতি রাজকবি, কিশোরী রাধিকা সেখানে ছলাকলাময়ী প্রেমপ্রৌঢ়া, তাঁহার রূপের বর্ণনায় যেমন অলঙ্কারের ছটা, তাঁহার প্রেমের বর্ণনায়ও তেমনই শব্দের চাতুরী। এ রাধিকা আমাদের মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে, হৃদয়ের উত্তাপ যেন অনুভব করিতে পারি, কিন্তু আপন হৃদয়ের মর্ম্মবাণীকে তাহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে দেখি না। সে যুগের সাহিত্যের ধারাই এই ছিল বলিয়া

বিদ্যাপতি

মনে হয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস তিন কবির কাব্যেই দেহ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই তখন মুখ্য ছিল। প্রেমের বর্ণনায় দেহের মিলনেই প্রেমের চরমাবস্থা ঘোষিত হইয়াছে, বিরহের বর্ণনায়ও দেহের মিলনাকাঙ্ক্ষার আর্ত্তি অধিক ফুটিয়াছে। অবশ্য হৃদয়কে সেখানে বাদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তথাপি প্রেমের যে গভীরতা, সর্ব্বাঙ্গীনতা পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে লক্ষিত হয় তাহা এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মিলনের মধ্যেও বিরহের ব্যথা, মিলনেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি নাই, সেই চির-অতৃপ্তি, চিরপুরাতন চিরনূতন প্রেমের কথা জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস শুনাইতে পারেন নাই। প্রেমিক শিরোমণি মহাপ্রভু যথার্থই বলিয়াছিলেন, "প্রেমের কথা সকলেই বলে, প্রকৃত প্রেমের স্বরূপজ্ঞ কয়জন আছে?" এই পৃথিবীতে যথার্থ প্রেমই দুর্লভ। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমের মহিমা দেখিয়াই প্রকৃত প্রেমকে মানুষ বুঝিতে পারিল। এই প্রেমেরই আগমনী গীত গাহিয়াছিলেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস। দিব্যপুরুষের আগমনের আবির্ভাবচ্ছায়া তাঁহাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাই রূপবর্ণনার অন্তরালে মধ্যে মধ্যে এক অলৌকিক গভীর প্রেমের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনা করিলে সে যুগের সাহিত্যের ভাবধারাকে বুঝিতে পারা যায় এবং অনাগত কাল তাঁহার পদাবলীতে কি প্রকার রূপ পাইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির রাধা এক অপূর্ব্ব অনুপম সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। উপমা প্রয়োগে, রস মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে এক একখানি সুন্দর চিত্রপটের মতই শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, পুনর্মিলন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়াছে। নবীনা প্রেমিকার প্রেমলীলার একটি পূর্ণ পরিচয়, প্রেমের নানা বিলাস, ভাবভঙ্গী সেখানে স্থান পাইয়াছে কিন্তু হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত, আপনাকে পরিপূর্ণ নিবেদন, সেই আকুল প্রেমকে পাওয়া যায় না। কথা এখানে অধিক, হৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করা যায় না।

বিদ্যাপতি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকালীন রূপবর্ণন করিয়াছেন। শ্রীরাধার শৈশব অতিক্রান্তপ্রায়, কৈশোর উপস্থিত। দেহ যৌবনশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সলজ্জা কিশোরীর ব্রীড়ানম্রতা পরিপূর্ণভাবে আসে নাই, বালিকার চপলতাও সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই। এমনই একটা অপূর্ব্ব কালের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। চিরকালের কিশোরী মূর্ত্তিটি অনুপম রসে রূপে বর্ণে শতদলের মতই প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

"খনে খন নয়ন-কোণ অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই॥
খনে খন দশনক ছটাছট হাস।
খনে খন অধর-আগে করু বাস॥"

বয়ঃসন্ধির পর পূর্ব্বরাগের বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে রাধার অপরূপ রূপরাশি পড়িয়াছে, মুগ্ধ কেশব রাধার সেই স্থির দামিনী দেহবল্লরীকে স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। প্রেমের লক্ষণই এই যে প্রেমিক তাহার প্রেয়সীকে দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে না, দর্শনে অতৃপ্তি রহিযা যায়। কিন্তু এই দেখার মধ্যে একটা গভীরতর বস্তু নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। এ যেন শাশ্বতকালের চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ নহে, এ যেন কোন নবীন তরুণের যৌবনের আবেশমুগ্ধ দিবসে সুন্দরী কিশোরীর রূপ নিরীক্ষণ। তাই বর্ণনা এবং উপমা রূপবর্ণনায যতখানি প্রকাশ পাইযাছে, হৃদয়ের আর্ত্তি ঠিক সেইরূপ ফুটিয়া উঠে নাই।

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদযে শেল দেই গেল॥"

রাধার তনুশ্রী কেশবকে মুগ্ধ করিয়াছে। মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়াছে, তথাপি তাহা দেহের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রাহিয়াছে।

"গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি' পালটি' নেহারি'।
* * *
জোড়ি' ভুজ যুগ মোড়ি' বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ-চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥

পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনা করিতে গিয়া যথার্থই বলিয়াছেন—"বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া আপনি পলায়নপর হইতেছে। * * * আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায়, ভয়ে, আনন্দে, সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। * * * বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। * * * কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

বিদ্যাপতির মিলন এবং রসোদ্গারের পদগুলি পড়িলে রবীন্দ্রনাথের উক্তির যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়। রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় দুই ব্যাকুল আত্মার মিলন, অস্থির ব্যাকুল প্রতীক্ষান্তে মিলনের কথা পাই না। বাগবৈদগ্ধ এবং প্রেমের চাতুরীই সেখানে প্রধান হইয়াছে, আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রেমাস্পদের নিকট নিবেদন বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায় না। সখীরা রাধাকে বিলাসকলা শিক্ষা দিতেছে, কি ভাবে প্রেমিককে মিলনের মুহূর্তে নানা ছলাকলা প্রদর্শন করিবে সে সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি ছত্রেই এই বাগভঙ্গি, লীলাবিলাসের পরিচয় আছে। ইহার জন্য বিদ্যাপতি দায়ী নহেন। সে যুগের রুচি এবং প্রকৃতিই এই সাহিত্য সৃজন করিয়াছিল। যুগের পরিচয় সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার সবটুকু বৈশিষ্ট্য লইয়াই দেখা দেয়।

"হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ।
পহিরণ অম্বরে ঝাঁপবি কেশ ॥
* * *
পিয়া পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
নহি নহি বোলবি নয়ন-বিভঙ্গ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি কি কহব হাম।
আপে গুরু হোই শিখায়ব কাম॥"

উপমার ঘটা কাব্যকে কতখানি অধিকার করিয়াছিল, বিদ্যাপতির পদগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। শ্রীরাধা আপনার হৃদয়ে প্রেমাকৃতি অনুভব করিতেছেন, কিন্তু সেই প্রেমের বর্ণনায় হৃদয়ের উত্তাপ অপেক্ষা অলঙ্কার শিঞ্জন অধিক শুনা গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় মুগ্ধ নায়িকার বিহ্বল দৃষ্টির পরিচয় অপেক্ষা রূপবর্ণনার নানা বিবরণই শুনা গিযাছে।

"এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি সপন সরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদক মান।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেড়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর পর সুধাকর পাঁতি।
তঁহি নব পল্লব অরুণক ভাঁতি॥"

"কানু অনুরাগ বাঘ যব পৈঠল
মন-ঘন-কানন-মাঝ।
মান-গজেন্দ্র দরশন দূরে রহু
গন্ধে ভাগল করি-রাজ॥
ধরম-কুরঙ্গ রঙ্গ করি ভুখল
কুল হয় পলাযল ত্রাসে।
ধৈরয-মেষ দেশ তঁহি ছোড়ল॥
স্বামী বরত অজা নাশে॥"

বিদ্যাপতির পদ চিত্রধর্ম্মী, তাঁহার পদাবলীতে বৈষ্ণব সাধকের আত্মবিস্মৃত, একনিষ্ঠ ভক্তি-বিহ্বলতার সুর লাগে নাই। বিদ্যাপতির প্রণয়গীতিকা রাই-কানুর অমর প্রেম কাব্য নহে, বাস্তব জগতেরই কোন এক নায়ক নায়িকার প্রেমের বিচিত্র কৌতুকই যেন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বিদ্যাপতির পদকে নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃত প্রেমের বর্ণনা মাত্র বলা চলে না। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে অমূল্য জীবনাধিক প্রেম সুগুপ্ত থাকে, তাহাও বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে, নচেৎ প্রেমিক শিরোমণি মহাপ্রভু কখনও

তাঁহার পদবলীকে এতখানি সমাদর জানাইতেন না। উপমা অলঙ্কারের রাজ্যকে ছাড়াইয়া বিদ্যাপতির পদ আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রাকৃত প্রেমানুভূতির গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া মানুষের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির উপর বিদ্যাপতির পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির অন্তরে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রতি একটি গভীর অনুরাগ ছিল। ৺দীনেশচন্দ্র সেন বিদ্যাপতির পদ আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুকূল ছিল, এ কথা বোধ হয় দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে।" চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে যে নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং ভাবতন্ময়তা দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাপতির পদেও তাহা লক্ষিত হয়।

"ধনি ধনি রমণি-জনম ধনি তোর।
সব জন কাহ্নু কাহ্নু করি' ফুরয়ে,
সে তুয় ভাবে বিভোর॥"

কৃষ্ণ যে কেবল রাধার প্রেমিক মাত্র নহেন, তিনি যে জগদবল্লভ তাহা কবি অনুভব করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব এই সুদুর্লভকে পাইবার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেছে। কিন্তু রাধার প্রেম এই সুদুর্লভ আপনিই পাইতে ব্যাকুল। রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কবি স্বকীয় অনুভূতি বলে মহাপ্রভুর পূর্ব্বযুগেও অনুভব করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণের প্রেমে রাধা তাঁহার সম্পূর্ণ সত্ত্বা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। প্রেমের গভীরতায় রাধাকৃষ্ণ একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, উপমা রূপকের ছটা প্রেমের গভীরতা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিরস্ত হইয়াছে।

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন, হাম তুঁহু জানি॥"

কানুই রাধার সর্ব্বস্ব, কথার পর কথা বলিয়াও কৃষ্ণ তাঁহার কতখানি তাহা বলা হইতেছে না। অবশেষে সেই অনির্ব্বচনীয়ের পরিপূর্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে তিনি পারিলেন না। সেই আনন্দময় পরমপুরুষ আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তথাপি তাঁহার পূর্ণ পরিচয় আমরা জানি না।

তাই শ্রীরাধা সব কিছু বলিয়া পরিশেষে বলেন,

"তুঁহু কৈসে মাধব কহ তুঁহু মোয়।"

তুমি আছ, বিশ্বভুবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তুমি বর্ত্তমান, তথাপি তোমার স্বরূপ আমার নিকট অজ্ঞাত। রাধাকৃষ্ণ যে একাত্ম, একদেহ, দুই রূপ ধরিয়া লীলাবিলাস করেন, এই তত্ত্ব বিদ্যাপতির অজ্ঞাত নহে।

"বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহা হোয়॥"

বিদ্যাপতির মাথুর পদগুলিকে ভাবের গভীরতায় এবং অনুভূতির নিবিড়তায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা চলে। উপমা, রূপক, যমকের অলঙ্কার-শিঞ্জন সেখানে মৃদু হইয়াছে। হৃদয়ের আর্ত্তি গভীরতর হইয়া ফুটিয়াছে। প্রেমের গভীরতায় স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকে না, বিদ্যাপতির ব্যাখ্যা সেই গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়াছে।

"আন জনমে হব কান॥
কানু হোযব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥"

এই জাতীয় উক্তি এবং ভাব চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের পার্থক্য ক্রমেই ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রেমের গভীরতায় রাধা কেবল পার্থিব নায়িকামাত্র নহেন, তাঁহার বিরহের ব্যাকুলতা, প্রেমিকের নাম জপ ইষ্টের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্ত সেবককেই মনে করাইয়া দে"। এ ব্যাকুলতা কেবল প্রেমিকের দর্শনের আকাঙ্ক্ষামাত্র নহে, এ আরও গভীরতর অনুভূতি, যে অনুভূতিবলে সাধক আপন ইষ্টকে আহ্বান করেন, ইহাও তাহাই। প্রেম যে সুখের বস্তু নহে, প্রকৃত প্রেমের নাম প্রাণবিসর্জ্জন, তাহা বিদ্যাপতি অনুভব করিয়াছেন। জীবনের সকল বন্ধন এই প্রেমের জন্য ছিন্ন করিতে পারিলে তবেই সেই সুদুর্লভ বস্তু লাভ করা যায়।

"শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারি।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥

পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় যে চপলা কিশোরীকে আমরা দেখিয়াছিলাম, সে আমাদের অজ্ঞাতসারে চিরন্তনী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছে। অধীর হৃদয়ে প্রেমিকের প্রতীক্ষায় ব্যর্থ প্রহর গণিতেছে, প্রেমের ছলাকলা অন্তর্দ্ধান করিয়াছে,

এখন দুই নয়নে কেবল ব্যর্থ প্রতীক্ষা।

"এখন তখন করি দিবস গমাওল,
দিবস দিবস করি' মাসা।
মাস মাস করি' বরষ গমাওল,
ছোড়লুঁ জীবন আশা।
বরষ বরষ করি' সময় গমাওল,
খোয়লুঁ তনুক আশে।"

সুদীর্ঘ বিরহ প্রতীক্ষান্তে রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। প্রথম মিলনের চপলতা, বিলাসকলা আজ আর নাই, আত্মনিবেদনের কোমল সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। আপনার দেহজ্ঞানও রাধা বিস্মৃত হইয়াছেন। এ প্রেম যে সহজে হয় না, বহু জন্মজন্মান্তরের সাধনায় এ প্রেমকে অর্জ্জন করিতে হয়, বিদ্যাপতি তাহা বুঝিয়াছেন। চপল, চঞ্চল লীলাবিলাসের বহু ঊর্দ্ধে যে এই প্রেমের রাজ্য, সে তত্ত্ব বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল না।

"অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ-ভাগি নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥"

বিদ্যাপতির পদে দেখা যায় কবি গভীর ভাবপূর্ণ আবেগের মুহূর্ত্তে বর্ত্তমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদের ভক্তি-বিহ্বলতা অনুভব করিয়াছেন।

জয়দেব এবং বিদ্যাপতি এই দুই কবির কাব্য আলোচনা করিয়া দেখা গেল সে যুগের রুচি এবং প্রকৃতি অনেকখানি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যেও স্থান পাইয়াছে। প্রেমে তখন হৃদয় অপেক্ষা দেহের ভাগ অধিক ছিল। জাতির জীবনে রাজনৈতিক সামাজিক সর্ব্বপ্রকার ভাঙাগড়া আরম্ভ হইয়াছে। সেই নিদারুণ অমানিশার দুর্য্যোগ রাত্রে গভীরতর ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিবার রুচি এবং ইচ্ছা সে যুগে কাহারও ছিল না। দুই রাজসভার দুই রাজকবি রাজকীয় রুচিকে পরিতৃপ্ত করিতেই অধিক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি অনাগত ভবিষ্যতে যে মহান পরিবর্ত্তন আগতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ও তাঁহাদের কাব্যে আমরা পাই। মানুষের মূল্য তাঁহাদের নিকট স্বীকৃত হইয়াছিল। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মর্ত্ত্য মানবের লৌকিক প্রেম এবং স্বর্গের

অলৌকিকত্ব একত্রিত হইয়াছে। প্রেমই যে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বস্তু এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান তাহা এই কবিদ্বয়ের পূর্ব্বে সাহিত্যে এমন করিয়া কেহ বোঝান নাই। এই প্রেমের বলেই অসাধ্যসাধন ঘটে। যুগযুগান্তরের সাধনবলে যাঁহাকে লাভ করা যায়না, তিনিও এই প্রেমের বশ। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রেমসাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জীবনব্যাপী প্রেমেরই সাধনা করিয়াছেন। মানবপ্রেমিক মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমকে জীবনের সাধনার বস্তু করিয়াছিলেন, এই প্রেম সর্ব্ব মানবের উপর অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। তাই ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব্ব নবীন যুগের সূচনা দেখা দিল।

পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস এক অথবা দুই ইহা লইযা পণ্ডিতসমাজে বিতর্কের অন্ত আজিও হয নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পদাবলী উভয়কে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, দুই কাব্যের ভাবধারা এবং বিষযবর্ণনায প্রচুর প্রভেদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দৈহিক কামনাই সর্ব্বস্ব, কাব্যের শেষাংশে উচ্চতর প্রেমের স্পর্শ থাকিলেও ইহা কোন এক অলৌকিক দৈবী প্রেমের ইঙ্গিত দেয না। দ্বিজ অথবা দীন চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ একজনই ছিলেন।

চণ্ডীদাস

এই দ্বিতীয চণ্ডীদাস কেহ ছিলেন বলিযাই মনে হয, কেননা, তাঁহার রচিত সকল পদগুলির মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য লক্ষিত হয। পদাবলীর চণ্ডীদাস যিনি, তাঁহার রচনার বহু ছত্র মহাপ্রভুর প্রেম-বিহ্বলতাকে স্মরণ করাইযা দেয। মনে হয, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব্বোত্তর যুগের কবি নহেন, তাঁহার পদাবলী পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব কবি এবং সাধকগণের ভাবের সহিত ঐক্য স্থাপন করিযাছে। পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের প্রেম নিতান্তই মানুষী, কিন্তু পদাবলীর প্রেম ক্ষণে ক্ষণে এক অমানুষী অপার্থিব প্রেমরাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাবসম্মিলনের পদে চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন,—

> "এখন কোকিল আসিযা করুক গান।
> ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
> মলয পবন বহুক মন্দ।
> গগনে উদয় হউক চন্দ॥"

এই পদটির সহিত বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদের সর্ব্বাংশে মিল দেখা যায়।

"সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

চণ্ডীদাসের রাধা আজন্ম কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী, প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের কথায়,—"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষা, সহজ ভাবের লোক— এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই—তাহারই জন্য কবি। তিনি একছত্র লিখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লিখিয়া লন।*** চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। *** চণ্ডীদাস সহ্ন করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন।

"তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয়। দুঃখের প্রতিও অনুরাগ।*** তাঁহার প্রেম 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণ আধা।' তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহা বিষামৃতে একত্র করিয়া।*** চণ্ডীদাসের কথা এই যে প্রেমের দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে—প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।

"যেন মলাজ ধাবিত শীতল
অধিক সৌরভময়
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন
দীন চণ্ডীদাস কয়।"

"দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া সুখের সৌরভ বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল—

"পরাণ সমান পিরীতি রতন
যুখিনু হৃদয় তুলে
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল ঝুলে।"

এতবড় প্রেমের কথা চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না।***

"চণ্ডীদাসের প্রেম বিশুদ্ধ প্রেম ছিল। তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। কঠোর ব্রতসাধনা স্বরূপে প্রেমসাধনা

করা চণ্ডীদাসের ভাব—সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের ভাব নহে—সে ভাবের কাল এখনও নয—সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে তখন কবিরা গাহিবেন—

"পিরীতি নগরে বসত করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলই পর।"

চণ্ডীদাসের পদাবলী মহাপ্রভুর ভাবধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা একটি পদে বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব ভক্তগণ বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেম আস্বাদন করিতে রাধার অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিয়া চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন। এই ভাবটি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্যে পাওয়া সম্ভব নহে।

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এতো কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥"

পদটির শেষ দুইটি ছত্রই প্রমাণ করে যে কবি মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের বর্ণনাই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কবিদের সহিত চণ্ডীদাসের পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। শ্রীরাধার দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই, প্রেমের মলয় সমীরে তিনি ফুটিয়া উঠিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধা যেন বর্ষাবারিধারাস্নাত স্নিগ্ধ প্রস্ফুটিত শতদল, তেমনই কোমল, মধুর, এতটুকু নাড়া পাইলেই ঝরঝর করিয়া বারিধারা ঝরিয়া পড়ে। রাধা প্রেমে উন্মাদিনী, এই উন্মাদ প্রেম দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুর প্রেমের আর্ত্তিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধিকার প্রথম হইতে যোগিনী মূর্ত্তি, বিলাসসজ্জার চিহ্নমাত্র সেখানে নাই, এ প্রেম তো চপলা চঞ্চলা কিশোরীর লীলাবিলাস নহে, ইহা তপস্যার হোমবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া জন্ম লইয়াছে।

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা ॥"

এ প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীমদ্ মহাপ্রভু।

"মাধবেন্দ্রপুরী কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন ॥" (শ্রীঃ চৈঃ)

"হসিত বদনে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি।
এক দিঠি করি ময়ূরা ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিখনে ॥

এই উন্মাদ প্রেম একমাত্র মহাপ্রভুর জীবনে লক্ষিত হইয়াছে, তাঁহার পূর্ব্বে ইহা অজ্ঞাতই ছিল। ব্রজগোপীর প্রেমে যে কি বস্তু, তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম জানাইলেন।

"যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাত কে ॥"

কানুর নাম রাধার কানে গিয়াছে, নাম শুনিয়াই রাধা বিহ্বল। কেবল নাম শুনিয়া এমন ভালবাসা মর্ত্ত্যজগতে দেখা যায় না। কৃষ্ণনাম-জপরতা রাধা একনিষ্ঠ ভক্তকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥"

এই অমানুষী ভালবাসা কেবল রাধা একা দেখান নাই। কৃষ্ণও রাধার নামে পাগল।

"মরি কোন বিধি আনি সুধা নিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মুরছি পড়ল হামে ॥"

ঈশ্বরপ্রেম মানুষকে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত করিয়া দেয়। প্রেমের ধর্ম্মই এই। কি

মানুষী, কি দিব্য, সর্ব্ববন্ধনকে ছিন্ন না করিলে, একনিষ্ঠতা না জন্মিলে, প্রকৃত প্রেমকে লাভ করা যায় না। প্রেমের নিকট সংসার সমাজ সকলই তুচ্ছ। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে এমন করিয়া কেহ প্রেমের জয়গান করেন নাই। শাস্ত্রবন্ধন, লোকচার অপেক্ষা মানুষের হৃদযের মূল্য যে অধিক, এই স্বাধীন মত চণ্ডীদাসই উচ্চ রবে ঘোষণা করিলেন।

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥"

দেহভেদ যখন ঘুচিযা যায প্রেম তখনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। চণ্ডীদাসের বহু পদেই এই ভাবটি লক্ষিত হয। অবশ্য চণ্ডীদাসের পূর্ব্বতন পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির পদেও এই ভাবটি দেখা যায।

"অনুখন মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
সো নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ অনুধাই॥"

বিদ্যাপতির ভাব চণ্ডীদাসের বহু পদেই অনুসৃত হইযাছে, তবে চণ্ডীদাসের ভাব আরও গভীরতর।

"সই মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ঐ ত রসের কূপ।
এক কীট হযে আর দেহ পায
ভাবিয়ে তাহার রূপ॥"

এই ভাবটি চণ্ডীদাসের অন্যান্য বহু পদেই প্রকাশিত হইযাছে। প্রেমের গভীরতায় দুইটি আত্মা এক হইয়া যায়, দেহকে অতিক্রম করিযা দুইটি আত্মা যখন প্রেম-পারাবারের দিকে যাত্রা করে, তখন তাহাদের নিজ নিজ সত্ত্বা একে অন্যের মধ্যে বিসর্জ্জন দেয়। নদী যেমন আপনার জলধারাকে সাগরের সহিত একীভূত করিয়া ফেলে, প্রেমও তেমনই ক্ষুদ্রত্ব হইতে যখন অনন্তের প্রতি ধাবিত

হয়, তখন কি মানুষী, কি দৈবী, সকল ক্ষেত্রে আপনার পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দেয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর ইহাই বৈশিষ্ট্য। তাহা একদিকে যেমন অপূর্ব্ব রোমান্টিক প্রেমকাব্য, পার্থিব প্রেমের এক বিচিত্র রেখাচিত্র, তেমনই অলৌকিক স্বর্গীয় প্রেমেরও কাহিনী। মর্ত্ত্যজগতে এই প্রেমের এক সীমানা, অসীম অনন্ত লোকে তাহার বিহার। মর্ত্ত্যের প্রেম কতখানি স্বর্গের বস্তু হইতে পারে চণ্ডীদাস তাহাই জানাইলেন।

"চণ্ডীদাসে কয় দুযে এক হয়
হয় বা না হয় ভিন্ন।
রহে সে রসিয়া দুহু মিশাইয়া
রাই কানু একই তনু॥"

রাধাকৃষ্ণ যে একই দেহ, একাত্ম, কৃষ্ণ সেই পরমপুরুষ এবং রাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি, এ তত্ত্ব চণ্ডীদাসের সুপরিজ্ঞাত ছিল। চণ্ডীদাসের প্রেমগীতি নিছক নায়ক নায়িকার প্রেমবৈচিত্র্য মাত্র ছিল না।

রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনাকলে কেবল উপমা এবং রূপকের মালা গাঁথিয়া কবি আপনার বক্তব্য শেষ করেন নাই। নয়নের মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি পরস্পরের রূপের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু সেখানেই তাহার সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। রূপ দেখিতে দেখিতে তনুশ্রীর কথা আর মনে থাকে না, অলঙ্কারের ঝঙ্কার মৃদু হইয়া আসে, হৃদয়ের স্পর্শই রূপকে মোহন করিয়া তুলে। রূপের সীমা বড় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু তাহার সহিত আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া পরস্পর পরস্পরকে পলক-হীন নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

"বরণ দেখিলুঁ শ্যাম জিনিয়া কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ধনুভঙ্গি ধাম নয়ান কোণে পুরে বাণ
হাসিয়ে খসয়ে সুধারাশি॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি সতী ছাড়ে নিজপতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥"

"দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।

পশিয়া মরমে, ঘুচাঞা ধরমে,
পরাণ সহিতে টানে ॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল,
কি তার কুলবিচার ॥"
"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমনি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা ॥"

কৃষ্ণ রাধার রূপ দেখিয়া বিহ্বল হইযাছেন। রূপের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, না পাওযার ব্যাকুলতাই তাঁহার সর্ব্ব দেহমনকে ব্যাপ্ত করিয়াছে, রূপের বিবরণ তাঁহার মুখে নাই, অন্তরের প্রজ্বলিত প্রেমাগ্নিকেই তিনি ব্যাকুলভাবে সখার নিকট প্রকাশ করিযাছেন। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে সাহিত্যে সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে রূপমুগ্ধ নাযকের আবেশমুগ্ধ কণ্ঠে নাযিকার রূপস্তুতি শুনা গিয়াছে, নাযিকার দৈহিক রূপের নানা বিচিত্র বর্ণনা এবং হৃদযের অভিলাষ—লালসার বিবরণই শ্রোতা ও পাঠকগণের নিকট পরিচিত ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাসের কানু রাধার রূপ দেখিযা সব ভুলিয়া গিযাছে, কেবল অন্তরে এক সুগভীর বেদনা অনুভব করিযাছে। রাধাবিহনে তাহার জীবনের সব কিছু মূল্যহীন, স্বাদহীন হইযা গিয়াছে। রাধাকে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণও অবশ্য বলিযাছে—

"তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়িল ॥
দারুণ কুসুম শর সুদৃঢ় সন্ধানে।
অতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়াযিল ॥"
"এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।
মরোঁ হেন রাধার বিরহে ॥
বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে।
তবেঁ রহে আম্মার জীবনে ॥"

কিন্তু পদাবলীর কৃষ্ণের প্রেম আরও তীব্র, আরও গভীরতর।

"দেখিয়া মুরতি রূপের আকুতি
মরমে লাগল তাই।
যেই সে দেখিল তৈখন হইতে
কিছু না সম্বিত পাই॥

* * *

কালি হতে মন করিছে কেমন
হৃদয়ে ভিতরে জাগে॥
শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি মোর সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥
কি হইল অন্তরে হিয়া জরজর
বিহ্বল সন্ধান শরে।"
"চলে নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হইতে মোর হিযা নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর॥"

পদাবলীর চণ্ডীদাস রাধাপ্রেমের যে বর্ণনা দিযাছেন, তাহা অনেকখানি মহাপ্রভুর ভাবদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই জাতায দিব্য প্রেম সাহিত্যে কখনও ছিল না। রাধা কৃষ্ণবিরহে আকুল হইযা সুতীব্র মর্ম্মজ্বালা অনুভব করিতেছেন।

"অকথন বিয়াধি কহনে নাহি যায়।
যে কহে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পাযে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমিতে লুটায়॥
পুছযে কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি॥"

প্রেমিক শিরোমণি মহাপ্রভুই একমাত্র কৃষ্ণ নামে উন্মাদের মত ভূলুণ্ঠিত হইতেন। 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। দুই চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত, যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই

শ্যামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। লজ্জা, সম্ভ্রম সকল কিছু বিসর্জ্জন দিয়া এই অভিনব প্রেমের সত্যমূর্ত্তি না দেখিলে চণ্ডীদাস এমন করিয়া লিখিতে পারিতেন না।

"না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রৈয়াছে চাই॥
তুলাখানি দিলুঁ নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ শোযাস আছে॥"

রাধাবিরহে কৃষ্ণের যে দশা কবি বর্ণনা করিযাছেন, তাহা নিছক প্রেমের বিকার নহে, তাহা মহাভাব। এই মহাভাব শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর জীবনে দেখা দিয়াছিল। মুহুর্মুহু তাঁহার সমাধি হইত, তাঁহার পরিকরগণ নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া তাঁহার জীবন আছে কি না স্থির করিত।

এইরূপ অলৌকিক প্রেম যে ইহার পূর্ব্বে কখনও কেহ দেখে নাই এবং সাহিত্যেও ইহার পরিচয় নাই, তাহা চণ্ডীদাস স্বীকার করিয়াছেন। প্রেম হৃদযের একটি বৃত্তিমাত্র নহে, তাহা জীবনকে অতিক্রম করিযা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। চণ্ডীদাসের প্রেমে মিলনেও সুখে নাই, মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদাশঙ্কা রহিযা গিযাছে। এই প্রেম "কিছু কিছু সুধা, বিষগুণ আধা"—

"এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিযা॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥"

"সই কে বলে পিরিতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল॥"

লোকাচার শাস্ত্রাচারের নির্দ্দেশে যে বৈধী ভক্তি এবং উপাসনা, সেখানে ইষ্টের সহিত ভক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কেবলমাত্র রাগানুগা ভক্তিই ভগবানকে ভক্তের নিকটে আনিয়া দেয়। লাজ-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য সকল কিছুই বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণ লইতে হইবে। এই শরণাগতির প্রথম মন্ত্র প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন। আমার নিজের

দিক হইতে কোন ভারই থাকিবে না, সকল চিন্তা ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া সেই প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমে আপনাকে ঢালিয়া দিতে হইবে। চণ্ডীদাসের রাধাও এই প্রেমকে বড় বলিয়া জানিয়া ছিলেন, এই প্রেমই ছিল চণ্ডীদাসের ধর্ম্ম।

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জানহ তুমি।"

* * *

"সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।"

"প্রাকৃত জনসাধারণ ও কাব্যরসিকের মনে প্রেমানুভূতির যে আবেশ যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত হইয়াছে, বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, হাসি-কান্নার যে নিবিড় আবেশ অপরূপ ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়াছে, চণ্ডীদাস সেই সনাতন হৃদয়লীলার সহিত বৃন্দাবনলীলার সংযোগের পথপ্রদর্শক। 'দেবতারে প্রিয়' ও 'প্রিয়ের দেবতা' করিয়া ধর্ম্মসাধনার মধ্যে কেমন করিয়া সহজ রস-মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যবোধের স্ফুরণ করিতে হয়, ইঁহার রচনায় তাহাই পরিস্ফুট। তাই ইঁহার বৈষ্ণব কবিতার আবেদন বিশেষ গণ্ডী ছাড়াইয়া মানবের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।" (শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ কৃষ্ণ এবং রাধাকেই তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকা করিয়া কাব্য রচনা করিতেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকে কাব্যের বহিরঙ্গের কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। নরহরিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসাদি চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তাদের রচিত পদাবলীর মধ্যে রাধাভাবের সহিত একটি তদাত্মতা যোগ পাওয়া যায় না যাহা পূর্ব্বতন কবিদের পদাবলীতে লক্ষিত হইত। ইঁহাদের পদাবলীতে স্ফূর্ত্ত রাধাভাবের মাধ্যম যেন শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্ত্তাগণ মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। "অন্তর্কৃষ্ণ, বহির্গৌর" মহাপ্রভুর প্রভাবে পদাবলী সাহিত্য যেমন নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, তেমনই উহার বিষয়বস্তুরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

কাব্যের ভাব পরিবর্ত্তন

মহাপ্রভুকে কৃষ্ণভাবে ভক্ত ও সাধকগণ আরাধনা করিলেন এবং তাঁহাদের পদাবলীতে গৌরাঙ্গদেব মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিলেন। নরহরিদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে গৌরাঙ্গভাবে ভাবিত করিয়া দেখিলেন। প্রেমের আশ্চর্য্য

স্ফূর্ত্তিতে মহাপ্রভুর দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্রঢেউ যমুনালহরী হইয়াছে, চটকপর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণবগণের সম্মুখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। বিশুদ্ধ অনুরাগময়ী শ্রীরাধার প্রেম, বিরহ-উৎকণ্ঠা মহাপ্রভুর জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌরাঙ্গকে লইয়াও অসংখ্য পদ রচিত হইল। নরহরিদাস, নরোত্তমদাস প্রভৃতি নদীয়া নাগরী ভাবের পদ রচনা করিতে লাগিলেন এবং গৌরাঙ্গকে তাঁহারা প্রণয়ী এবং নিজেদেরকে প্রণয়িনীরূপে উপস্থাপিত করিলেন। রাধামোহন ঠাকুর এবং অন্যান্য অনেকে গৌরাঙ্গকে রাধাকৃষ্ণ ভাবে ভাবিত করিয়া পদরচনা করিলেন। চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীকে বিচার করিলে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীখণ্ডনিবাসী পদকর্ত্তা নরহরিদাস শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে প্রথম পদরচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণব সাহিত্যে দুইজন নরহরি নামক পদকর্ত্তা পাওয়া গিয়াছে। প্রথম শ্রীখণ্ডনিবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর এবং দ্বিতীয় নরহরি চক্রবর্ত্তী। উভয়ের পদগুলি একত্রে মিশিয়া গিয়াছে। নরহরির

নরহরি দাস

পদাবলীর ভাব এবং ভাষা অত্যন্ত সরল। ইঁহার পদগুলির রচনাচাতুর্য্য বিশেষ নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবিত বলিয়া ইহাদের সমাদর আছে। পদগুলি খুবই স্বাভাবিক তবে উচ্চ অঙ্গের কবিকল্পনা কিছু নাই। প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই যুগের পদকর্ত্তাদের একটা বিশেষ ধারণা হইয়া গিয়াছিল, নরহরির পদেও এই প্রেমকে সার বলা হইয়াছে।

"কহে নরহরি শুনগো সুন্দরী,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার।"

এই যুগের প্রেমের গোপনতা, লুকোচুরি নাই। প্রেমের কথা কবিগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। সমাজ সংসারকে তাঁহারা ভয় করেন নাই। প্রেমকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছেন। তাই অভিসারিকার নিঃশব্দ পদক্ষেপে সঙ্কেতগৃহ উদ্দেশ্যে যাত্রার পরিবর্ত্তে সদলবলে রাজপথে সমারোহ যাত্রাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন। এই অভিসারের বিবরণ পড়িলে নবীনা প্রেমবিহ্বলা রাধাকে মনে পড়ে না, মহাপ্রভুর নগর-সঙ্কীর্ত্তনকেই স্মরণে আনিয়া দেয়।

"আনন্দে মগন চলে সখীগণ
দিয়ে জয় জয় ধ্বনি ॥
কেহ যন্ত্র বায় নানা রস গায়
পুলকে পূরিত গোরি।
প্রেম রস ভরে, গমন মন্থরে
সঙ্গে চলু নরহরি ॥"

রচনার মধ্যে এক নবভাবের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু মনে হয় অভিসারিকার সশঙ্ক পদক্ষেপে যে মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে সাহিত্য অনেকটা বঞ্চিত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গলীলা লইয়া নরহরিদাস অধিক পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদে গৌরাঙ্গকে অনেক স্থলেই প্রেমিক কল্পনা করিয়াছেন।

"ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে প্রবেশে,
চকিত চৌদিকে চাঞা ॥
হাসিয়া হাসিয়া রসিয়া রসিয়া
আসিয়া সিথান পাশে।
নিজ করে মোর অধর পরশি
সুখের সায়রে ভাসে ॥"

বলরামদাস

বলরামদাসের ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালা দুই প্রকার পদই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্রজবুলি পদ বাঙ্গালা পদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বলরামদাসের পদে ভাবের আবেগ এবং বেদনার তীব্রতা যেরূপ ফুটিয়াছে, সমসামযিক বৈষ্ণব পদগুলিতে এতখানি দেখা যায় না। অলঙ্কার, ছন্দ এবং ভাব এই তিনেরই অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার পদে দেখা যায়। তাঁহার পদাবলীর ইহাই বিশেষত্ব যে কবি নিজ হৃদযের অনুভূতি সবটুকু ঢালিয়া দিয়া পদরচনা করেন। সেই কারণে বলরামদাসের পদে মানবিকতা উপাদানের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় এবং তাঁহার পদ এতখানি হৃদযগ্রাহী হইয়াছে।

বলরামদাসের অনেক পদেই গৌরলীলার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওযা যায়। বৃন্দাবনলীলার সহিত নবদ্বীপলীলাকে এই যুগের অনেক কবিই এক করিয়াছেন, বলরামদাসও ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

"কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইযা ওর॥
ভাবিযা দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে,
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুযা ভাব কান্তি ধরি, তুযা প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরামদাসে কয, প্রভু মোর দযামষ
না ভজিনু মুঞি নরাধম॥"

চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের পদাবলী এবং পরবর্ত্তী যুগের পদাবলীর ভাবে একটা পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয। পূর্ব্বকালের সাহিত্যে একটা রোমান্টিক ধর্ম্মই মুখ্য ছিল, সেখানে ভগবান নিতান্তই মর্ত্ত্যের নাযক। কৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমকে বর্ণনা করিতে যাইযা কবি সঙ্কুচিত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন নাই, প্রেমের সকল অবস্থাই নিঃশঙ্ক চিত্তে বর্ণনা করিযাছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে বৈষ্ণবোচিত বিনয এবং দীনতা অনেক ক্ষেত্রেই ফুটিযা উঠিয়াছে। ইহাতে মনে হয পূর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগের পদাবলীতে মানবধর্ম্ম যেন তে... করিযা ফুটিতে পারে নাই। উহা অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিক ও নিষ্প্রাণ হইযা পড়িযাছে। অবশ্য শক্তিমান কবিদের কথা স্বতন্ত্র।

বলরামদাস রাধা এবং কৃষ্ণের বিরহজনিত বেদনার যে বর্ণনা দিযাছেন, তাহাতে রাধাকৃষ্ণকে মনে পড়ে না, প্রেমখিন্ন বিরহব্যাকুল মহাপ্রভুরই চিত্র মনে পড়িযা যায।

"শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ গদ উতর না নিকসই
কহিতে সজল নযান॥"
"বিরহ বিযাধি বেযাকুল সোপলুঁ
বরজন ধৈরয লাজ।

বাসর যামিনী বিলপে গোঙায়ই
বসি বসি বিপিনক মাঝ ॥"

বলরামদাসের রূপবর্ণনায় উপমা অলঙ্কারের রাজ্য ছাড়াইয়া হৃদয়ের বার্ত্তার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। রূপ সেখানে দৃষ্টির সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে, তাহা হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

"প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিযাছে মনে ॥"

বলরামদাসের পদে এই যুগের বিশেষত্ব লক্ষিত হয। গৌরাঙ্গকে প্রেমিকভাবে ভাবিত করিযা বলরামদাস কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয তিনি নদীযার নাগরী ভাবের সাধক ছিলেন। অনেকটা সেই কারণেই তাঁহার বিরহ বর্ণনায মহাপ্রভুকেই মনে পড়িযা যায়।

"মনু মনু সই দেখিযা গৌরঠাম।
বধিতে যুবতী গড়লো কো বিধি
কামের উপরি কাম ॥"

বলরামদাসের পদ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশূন্য নহে। এযুগের পদকর্ত্তাগণ অনেকেই কৃষ্ণ যে জগৎপতি সেইদিকে লক্ষ্য রাখিযা পদ রচনা করিযাছেন। ভগবানের সহিত হৃদয়ের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি একটা সম্ভ্রমের ভাব আসিয়াছে। অবশ্য ভগবানই যে মানুষের একমাত্র গতি এবং জীব একমাত্র তাঁহাকেই আপনার করিতে পারে, সে তত্ত্ব কবির অজ্ঞাত ছিল না।

"তুমি ত জগত তোমাতেই জগত
তুমিই হে জগতপতি।
তুমি বিনা কেহ অন্য নহে কভু,
কেবা কোথা পরপতি ॥"

কবি জ্ঞানদাস চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি দুই জাতীয় রচনাই পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা পদগুলি ভাবের সৌকুমার্য্যে এবং রচনার প্রসাদগুণে ব্রজবুলি পদ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানদাসকে অনেকে বলেন, তিনি চণ্ডীদাসের পন্থানুসরণ করিয়া

চলিযাছেন। কিন্তু তাহা সঠিক বলিযা মনে হয় না। তাঁহার ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির অনুকরণ স্থানে স্থানে বরং লক্ষিত হয। তাঁহার বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সুরের গভীরতা লক্ষিত হয। কিন্তু তাহার জন্য চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য অধিক বলা চলে না। ভাবের গভীরতায বহু কবির পদও চণ্ডীদাসের ভাবসাদৃশ্য লাভ করিযাছে। জ্ঞানদাসের অধিক কোন বিশিষ্টতা আছে বলিযা মনে হয় না। চণ্ডীদাসের পদ মাধুর্য্যে এবং সৌন্দর্য্যে জ্ঞানদাসকে হারাইযা দেয়। বহু পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অন্যান্য কবির ভণিতায পাওযা যায :—

জ্ঞানদাস

একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী (জ্ঞানদাস), কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে (যদুনন্দন), কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন (জ্ঞানদাস), কাহারে কহিব মনের কথা (রামচন্দ্র ও জ্ঞানদাস), কি না হৈল সই মোর কানুর পিরীতি(নরহরি), চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে (রামগোপাল দাস), ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক (নরহরি), থির বিজুরী বরণ গোরী (রামগোপাল দাস) না বল না বল সখি (জ্ঞানদাস), পিরীতি বলিযা একটি কমল (নরহরি), বঁধু কি আর বলিব তোরে (দীনবন্ধু দাস), ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে (রামগোপাল), বাই আজু কেন হেন দেখি (কৃষ্ণকিশোর), সই কত না রাখিব হিযা (জ্ঞান ও নরহরি), সই জানি কুদিন সুদিন ভেল (গোপালদাস ও জ্ঞানদাস), সজনি ও ধনি কে কহ (জগন্নাথ ও লোচনদাস), হেদে হে নিলজ বঁধু লাজ নাহি বাস (নরোত্তম দাস)।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয কবির পদের পার্থক্য পদ দ্বারাই বুঝান সম্ভব। দুজনেই রাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা দিযাছেন। উভযই প্রেমিকার দৃষ্টিতে প্রেমিকের রূপবর্ণনা, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গীতে অনেক পার্থক্য। জ্ঞানদাসের রাধা যমুনার তীরে কদম্ববৃক্ষের তলায শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিযাছে। রূপবর্ণনার ভিতর মুগ্ধতা আছে, কিন্তু ভাষার বিচিত্র কলাকৌশল মুগ্ধ দৃষ্টিতে যতখানি প্রকাশ করিযাছে, একটি মুগ্ধ প্রণযার্থী হৃদয়কে ঠিক ততখানি প্রকাশ করিতে পারিযাছে কি না সন্দেহ হয।

"কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্বমূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায।
মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয ॥

নাচিছে ময়ূর জলদ পরি।
অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি ॥
আরও অপরূপ কহিতে নারি।
যথা মেঘ তথা না হয বারি ॥
হৃদয আকাশে উদয করি।
নযন যুগলে বহযে বারি ॥"

চণ্ডীদাসের রাধার রূপবর্ণনা মুগ্ধা প্রেমিকার ভাষা। ভাবের কথা নাই, অলঙ্কারের দীপ্তি নাই, রূপ দেখিযা রাধার দৃষ্টিই কেবল মুগ্ধ হয় নাই, অন্তরও আকুল হইযাছে।

"দুইটি নযান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিযা মরমে ঘুচাঞা ধরমে
পবাণ সহিত টানে ॥"

জ্ঞানদাসের বাংলা পদগুলি ব্রজবুলি পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিযাই মনে হয। বিদ্যাপতির অনুকরণ জ্ঞানদাসের পদে বহু স্থানে লক্ষিত হয। ব্রজবুলি পদগুলিতে জ্ঞানদাসের স্বকীয কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয না।

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেবত সহচরী মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মচুকাই ॥"

এই পদটির সহিত বিদ্যাপতির বযঃ সন্ধির একটি পদের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই ॥"

জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ বৈচিত্র্যহীন এবং গতানুগতিক। জ্ঞানদাসের মত প্রতিভাশালী কবির পদাবলীতেও একঘেয়েমি ও গতানুগতিকতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যুগের সঙ্গে ক্রমেই বৈষ্ণব সাহিত্য তাহার নবীন, বিচিত্র রূপকে বিসর্জ্জন দিয়া গতানুগতিক সাহিত্যে পরিণত হইতেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী

তাহার প্রেমের সকল কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, নূতন আর কিছু দিবার নাই, কিছু বলিবার নাই, পুরাতন লইয়াই পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। তাই সেই পুরাতন অলঙ্কার মার্জিত করিয়া নূতন দীপ্তি দিবার একটা চেষ্টা চলিতেছে দেখা যায়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের শ্রীহস্তে যে অলঙ্কার রচনার গুণে স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে কাব্যকে আশ্রয় করিয়াছিল তাহাই এযুগের কবিগণের চেষ্টাকৃত হইয়া দাঁড়াইল। প্রেমের কথা তখন আর মর্ম্মের অব্যক্ত বাণী লইয়া কানাকানি নহে, তাহা দুটি প্রাণকে এক করিয়া এক স্বর্গীয় লোকের দিকে নিভৃত যাত্রা হইয়া রহিল না, তাহা বিশ্বজনের মাঝে নানা কথার রঙীন ফুলঝুরি হইয়া দেখা দিল। ইহার গতি এইখানেই সীমাবদ্ধ রহিল না, ধীরে ধীরে স্বর্গচ্যুত হইয়া রসাতলের কর্দ্দম মাখিয়া কবিওয়ালাদের হাতে উহার নিস্তার হইল। জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় বহু স্থলেই রূপকে প্রকাশ করিতে গিয়া বাক্যকেই অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, রূপের বর্ণনা সেখানে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

"চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নবমেঘে করিয়াছে শোভা॥"
"ভবজ-অম্বুজ রথ তলে বিনত.সুত
করে কুমুদবন্ধু সাজে।
হরি অরি সন্নিধানে, অবিরত পুরে বাণ
রমণীগণের মনে বাজে॥
কুন্তির নন্দন মূলে কশ্যপ নন্দন দোলে
মন্মথের মন মথে তায়।
খগেন্দ্র নিকটে বসি রমেন্দ্র বাজায় বাঁশী
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়॥"
"অচলা চপলা মেঘেরি গায়।
মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয়॥
নাচিছে ময়ূর জলদ পরি।
অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি॥

আরও অপরূপ কহিতে নারি।
যথা মেঘ তথা না হয় বারি ॥"

দ্বিতীয় পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাকে ধাঁধাঁয় পরিণত করিয়া কবি অভিনবত্ব সৃজন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কবির চেষ্টা সফল হইযাছে, অভিনবত্ব পাঠককে বিস্মিত করিয়াছে, কিন্তু রসজ্ঞ চিত্তকে উহা তৃপ্তি দিতে পারে না। যুগের বৈশিষ্ট্য ক্রমেই বিভিন্ন কবির পদে স্ফুটিয়া উঠিতে দেখা যাইবে। কবিতা পড়িয়া পাঠকের চিত্ত রসগ্রহণে নিবিষ্ট হইতে পারিবে না, ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনার আবেশে মুগ্ধ না হইয়া শব্দের অর্থবোধ করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িবে।

প্রতিভাশালী কবি সর্ব্ব অবস্থাতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন। ভাবের দুর্ব্বলতা জ্ঞানদাসের কবিতায় লক্ষিত হইলেও মধ্যে মধ্যে এক একটি অপূর্ব্ব পদ সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানদাসের কয়েকটি পদ ভাবের উচ্চতায় রবীন্দ্র-নাথকেও যেন স্পর্শ করিযাছে মনে হয।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥"
"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইযা গেল ॥"

রূপবর্ণনায ভাষার কারিকুরি নাই, মাত্র দুটি ছত্রে অতি সহজ গুটিকযেক কথা, কিন্তু তাহারই ভিতর এক অতুলনীয় রূপের আভাস এবং দ্রষ্টার বিমুগ্ধতা এবং আকুলতা বুঝাইযা দিল।

জ্ঞানদাস কেবল কবিমাত্র নহেন, প্রেমের কথা নানা ইঙ্গিতে বলিযাই তিনি ছাড়িয়া দেন নাই। ভক্তের হৃদয়ের গভীর আত্ম-নিবেদনের সুরটিও তিনি জানিতেন। প্রেমের একনিষ্ঠায়, গভীরতায মান-অপমান, নিন্দা-যশ সকল কিছুই তুচ্ছ, প্রেমাস্পদের নিকট গভীর আত্ম-নিবেদনের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা।

"অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যামের রাঙা পায় এ তনু সঁপিল
তিল তুলসীদল দিয়া ॥"

পার্থিব মান-অপমান প্রেমের নিকট তুচ্ছ, সেই পরম প্রিয়তমকে পাইবার

জন্য হাসিমুখে সকল কিছু মানিয়া লওয়া যায়। এ প্রেম ত নিছক নরনারীর মনোবিলাস নহে, ইহা ইষ্টের চরণে ভক্তের পরিপূর্ণ নিবেদন। তিল তুলসী দিয়া দানের অর্থ পরিপূর্ণভাবে নিঃস্বত্ব হইয়া দান। তাই বিদ্যাপতির মত কবিও তিল তুলসী দিয়া আপনাকেই উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে নদীয়া-নাগরী ভাবের পরিচয় আছে। তিনি গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া পদরচনা করিয়াছেন।

"ভাঙ গঞ্জে মদন ধাহুকি।
কুলবতী উনমত কৈলে দুটি আঁখি॥
মদন বিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে বাঁচে কামিনী অবলা॥
নিশি দিশি শশা ষোলকলা।
জ্ঞানদাসেতে কহে মজিল অবলা॥"

জ্ঞানদাসের পদে রাধাতত্ত্ব যে পরম তত্ত্ব তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর কাল হইতে শ্রীরাধিকাও সম্মানার্হা ও পূজনীয়া হইয়াছেন। পূর্ব্ব যুগের সহিত এইখানে পরবর্ত্তী যুগের পার্থক্য। শ্রীরাধা কৃষ্ণের চেযেও বড় হইয়াছেন। কৃষ্ণকে দিয়া রাধার পদসেবা করাইতেও এ যুগের কবির বাধে নাই।

"তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরি নাম॥

* * *

জানে সব ব্রজ জন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
করে ধরি রাই লয়ে বসাইল বামে।
পীতবাসে মুছই রাই মুখ ঘামে॥
নিজ কর-কমলে চরণ ধূলি ঝাড়ে।"

* * *

"ভাঙ্গিয়া চূড়ার ফুল হাতে করি নিল।
নমঃ প্রেমময়ী বলে চরণেতে দিল॥"

তন্ত্রসাধনার প্রভাব জ্ঞানদাসের পদে আছে বলিয়া মনে হয়। এই ভাবে রাধাপূজা তন্ত্রের নারীপূজা তথা শক্তিপূজার কথা মনে করাইয়া দেয়।

প্রেমের কথায় কিন্তু সকল কবিই সমান হইয়া গেছেন। প্রেমের আকৃতির

কথা প্রকাশ করিতে জ্ঞানদাসও কম যান না। তাঁহার কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পাগল হইয়াছে। এতটুকু ছোঁয়া, প্রিয়ের দেহের এতটুকু সৌরভ হৃদয় মনকে স্পর্শ করিয়া যায়। রাধার স্বর্ণোজ্জ্বল দেহবর্ণের ছায়াটুকু পাইবার জন্য প্রেমিক পীতবসন পরেন, দেহের স্নিগ্ধ সৌরভটুকু লইতে উন্মাদ হইয়াছেন।

"আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥"

রাধার গাত্রসৌরভের স্পর্শ পাইবার জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা মহাকবি কালিদাসের বিরহকাতর যক্ষকে মনে করাইযা দেয।

"আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিযা বাউল হইযা
তখন সে দিগে যায়॥"

"ভিত্বা সদ্যঃ কিশলযপুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভযে দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতী মযা তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গ মেভিস্তবেতি।"

কৃষ্ণ নিছক প্রেমিকমাত্র নহেন, তিনি পরমপুরুষ বহুবল্লভ। যোগী ঋষি কোটি বৎসর তপস্যা করিযা সেই অধরাকে ধরিতে পারেন না। কিন্তু তিনি রাধার প্রেমিক, সামান্য গোয়ালার মেযে হইয়া কৃষ্ণকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিযাছে। প্রেমকে জ্ঞানদাস বড করিয়াছেন, তাই প্রেমের মহিমা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র গভীর প্রেমের বলেই সচ্চিদানন্দ গোবিন্দকে লাভ করা যায়।

"লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কয় আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায়॥"

জ্ঞানদাসের রসোদ্গারের পদগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাধিকার মাধ্যমে প্রেমের অতি উচ্চ স্তরের এবং ভাবের কথা কবি বলিয়াছেন।

"হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁয়ায ॥
নিদের আলিসে যদি পাশমোড়া দিযে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠযে ॥"
"কোরে থাকি কত দূরে হেন মানে,
তেঞি সদা লয নাম।"

কবি নিজেই স্বীকার করিযাছেন এমন প্রেম পৃথিবীতে সম্ভব নয। ইহা অপার্থিব স্বর্গীয বস্তু। রাধাকৃষ্ণ একই, জগতে প্রেমের মহিমা প্রচারের জন্যই ভিন্ন দেহ।

"জ্ঞানদাস কয এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে।"
"শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈযাছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেলধান্ধা ॥"

প্রেমের ধর্ম্মই তাহা। প্রকৃত প্রেম যখন জন্মে, তখন দেহের পার্থক্য না থাকে কিন্তু দুই দেহে একটি মাত্র প্রাণ বর্ত্তমান থাকে। সকল কবিই সেই একই সুর গাহিযাছেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ ব্রজবুলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। সুমধুর গীতিঝঙ্কার এবং নর্ত্তনশীলতা তাঁহার পদাবলীকে মাধুর্য্যময এবং চিত্তহারী করিযাছে। কবি অনুপ্রাস অত্যন্ত সুকৌশলে কাব্যে প্রযোগ করিযা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য কবির মত তাঁহার কাব্যে অযথা অনুপ্রাস চিন্তাশক্তির গভীরতা হ্রাস করে নাই। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তাঁহার পদাবলীতে প্রধানরূপে প্রতীযমান হইলেও প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি এবং তাঁহার বিচিত্র কল্পনা খুবই উচ্চ স্তরের।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস বহু স্থলেই ভাষা এবং ভাবে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিযাছেন। অনেক স্থলে বিদ্যাপতির পদের তিনি পাদপূরণ করিযাছেন।

"বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময়া ফন্দা।

গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল
যে হেরি লাগযে ধন্দা ॥"

গোবিন্দদাসের পদগুলি অলঙ্কারসমৃদ্ধ, বিশেষ করিযা শ্লেষের প্রযোগ তাঁহার পদে অতি পরিপাটি। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিতে গিযা কবি বলিলেন—

"সজনি কো কহ কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে সো রতিনাযক
পেখলু নটবর ভঙ্গ ॥
* * *
গোবিন্দদাস অতযে অনুমানল
মদনমোহন অবতার।"

শ্রীকৃষ্ণ যে সুন্দর, তাঁহার রূপ যে কন্দর্পের মতই ইহাই কবির বক্তব্য। কিন্তু কবি সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিলেন না, বলিলেন মদন তনুদেহ পরিগ্রহ করিযাছে, তাহার অনঙ্গত্ব সত্য নহে। মদনের যেমন পুষ্পশর, বৃক্ষমূলে দণ্ডাযমান মদনেরও তেমনি নযনবাণ, মদনের যেমন মকরাঙ্কিত বিজযপতাকা ইহারও কানে মকরকুণ্ডল দুলিতেছে। পরিশেষে কৌশলে বুঝাইলেন সকলই ঠিক বটে, ইনি মদনমোহন, অনিন্দ্যকান্তি মদন তুল্যই ইঁহার রূপ।

কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী শ্রীরাধা কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুলা, প্রেমে সমগ্র জগৎ তাঁহাব কৃষ্ণময হইযা িযাছে। সেই প্রেমাকুতি গোবিন্দদাস বড সুন্দর ছন্দে প্রকাশ করিলেন। শ্যাম-উন্মাদিনী রাধিকা শ্যামকে সর্ব্বত্রই খুঁজিতেছেন, তাঁহার নযনে শ্যামরূপ, মুখে শ্যামনাম, অঙ্গে নীলবাস, কণ্ঠে নীলমণির হার। এমনকি শ্যামের স্পর্শ পাইবার জন্য শ্যামবর্ণা সখীকে রাধা কোলে করিতেছেন।

"লোচনে শ্যামর বচন হি শ্যামর
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদযে মণি শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর ॥"

গোবিন্দদাসের পদের ভাব ভাষা ও ছন্দের সহিত বিদ্যাপতির বহু স্থলেই মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

"যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই ॥" (বিদ্যাপতি)

"যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমলদল খলই॥" (গোবিন্দদাস)
"যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥" (বিদ্যাপতি)
"যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥" (গোবিন্দদাস)

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস একই পথের পথিক, তবে বিদ্যাপতির রাধা প্রেমিকা, গোবিন্দদাসের রাধা ভক্ত। উভয়ের দৃষ্টির পার্থক্য এইখানেই।

চৈতন্যপ্রভাবান্বিত গোবিন্দদাস কবিরাজ রাধা-প্রেমকে নিছক প্রেম-বিলাস মনে করেন নাই, ইহা যে অপার্থিব বস্তু, রাধা যে পরম পূজনীয়া তাহা জানাইয়াছেন। রাধার বিলাস, তাহার প্রেম, তাহার রূপ ও সজ্জা প্রভৃতিই এতদিন পদকর্ত্তাদের বর্ণনার বস্তু ছিল। রাধার সকল কিছুই প্রেমিককে দিয়াই পূর্ণ। কিন্তু গোবিন্দদাস রাধারও মূল্য দিলেন। রাধা কেবল কৃষ্ণে সমর্পিতা হইয়াই সার্থক নহেন, তিনিও পরমপূজ্যা শ্যামকে মুগ্ধ করেন। শ্যামও রাধা না হইলে পূর্ণ হন না।

"জয় জয় বৃষ- ভানু নন্দিনী
শ্যামমোহিনী রাধিকে।
* * *
গোবিন্দদাস তথি মাগয়ে ভকতি
নমো নমো দেবী রাধিকে॥"

এই জাতীয় পদ গোবিন্দদাস আরও গাহিয়াছেন।

"রাধা নামে নয়নে ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পারি॥
ধনি ধনি তুহু ধনি রমণী শিরোমণি
কানু সে যাহে একান্ত।
তুয়া পদ পঙ্কজ ভালে না ছোড়ই
গোবিন্দদাস মতিমন্দ॥"

এতদিন মহাজন পদকর্ত্তাগণ কানুপদপঙ্কজই ধ্যান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দদাসে রাধার করুণাই ভিক্ষা করিলেন। রাধাই এতকাল বিরহে কাঁদিয়াছেন, আজ কানুও রাধাপ্রেমে কাতর।

মহাপ্রভুর ভাবরসে অভিষিক্ত গোবিন্দদাসের পদে অনেক স্থানেই মহাপ্রভু মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছেন। রাধাবিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহা ধূলিধূসর কনককষিত দণ্ডপাণি মূর্ত্তিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এ মূর্ত্তি যেন কল্লোলিনী যমুনার তীরে আমরা আশা করিতে পারি না। এ মূর্ত্তি উচ্ছল মহাসমুদ্রের বালুবেলায় দেখিতে পাই।

" 'রা' কহি 'ধা' পঁহু কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণী পুন
কো কহ আরতি ওর॥"

রাধা বলিতে গিয়া 'ধা' উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না, 'রা' বলিয়া দুই চক্ষে জলধারা ঝরিতেছে, এ দৃশ্য জগতে মহাপ্রভুই দেখাইয়াছেন।

মহাপ্রভুই প্রথম জানাইলেন ইষ্ট আমাদের একান্ত আপনার জন, তিনি ভয়ভক্তির পাত্র নহেন। গোবিন্দদাসের পদে রাধাকৃষ্ণ সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ রাধাকে প্রণাম করিযাছেন, গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ পথক্লিষ্টা রাধিকার চরণতলে সজল দৃষ্টির প্রলেপ দিয়াছেন।

"কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥"

প্রেমের নৈকট্যে এ যুগের কবিগণের সঙ্কোচ দূর হইয়াছে। গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণ প্রেমে সঙ্কোচশূন্য কতখানি হইয়াছেন তাহার প্রমাণ নানা পদে রহিয়াছে। কৃষ্ণকে দিয়া রাধার চরণের ধূলি মুছাইতেও তাঁহাদের বাধে নাই। কেননা রাধা কৃষ্ণের সমান।

"নিজ করকমলে চরণ যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥
পিরীতি-মূরতি-অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব সুখ মিটই
সোই আপনে করু সেবা॥"

যিনি সকল প্রেমের আধার, রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তিনিও প্রেমের দাবী মিটান।

ভাষার কারিকুরি ক্রমেই সাহিত্যে স্থান গ্রহণ করিতেছিল। সরল, সহজ ভাষা ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছিল, জটিলতা এবং নানা বক্রোক্তি ভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গোবিন্দদাসের পদে এই ধরণের নানা বক্রোক্তির নমুনা পাওয়া যায়।

"ভোগি-ভোগপর কনয়া সরোরুহ
তহি পর খঞ্জন খেলা।
বিধুন্তুক ভানুক কবলে মদন ধনু
দরশনে মনমথ গেলা॥"

সর্পের ফণার উপর কনকপদ্ম, তাহাতে খঞ্জন নৃত্য করিতেছে। রাহু ও সূর্য্যের কবলে মদন ধনু। অর্থাৎ রাধিকার সুন্দর মুখশ্রী সুদীর্ঘ বেণীবদ্ধ মস্তকে শোভা পাইতেছে এবং চঞ্চল নয়ন দুটি নাচিতেছে। দুই ভ্রূযুগলের মধ্যে সিন্দুর ও মৃগমদ তিলক।

প্রেমের এক নবীন সুরতরঙ্গ গোবিন্দদাস শুনাইলেন। দশেন্দ্রিয় প্রেমাস্পদের রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, দেহের সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যায়, অবাধ্য মন বাধা মানে না, অধরাকে ধরিতে যায়।

"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

* * *

নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণ গণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ধাম॥"

প্রেমের সাধনা বড় কঠিন সাধনা। অভিসার সেই সাধনারই ইঙ্গিত দেয়। ফুলশয্যায় শুইয়া বৈষ্ণব সাধকগণের মিলন ঘটে নাই। মলয় পবন, জ্যোৎস্না, কুহুতান বলিয়া বৈষ্ণব কাব্যকে বিদ্রূপ করা হয়, কিন্তু অভিসারের পদগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কি সুকঠিন এ সাধনা। কুলমান, লোকলজ্জা ত' তুচ্ছ বস্তু, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলে তবে সেই প্রেমময় ধরা দেন। এই কঠিন অভিসারের পথ অতিক্রম করিলে তবে না মিলনের

আনন্দ। এই অভিসারের কঠোরতা, দুঃখ, বেদনা বর্ণনা করিতে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়।

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
* * *
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসাব।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥"

সখী শ্রীরাধাকে দুর্য্যোগময়ী রাত্রে অভিসাব যাইতে নিষেধ করিতেছে, নানা বাধা ও বিপদের কথা বলিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণা রাধার নিকট কোন বাধাই বাধা নহে। সখির সকল যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া তিনি অভিসাবেব পথে যাত্রা কবিলেন।

"কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলু
তাহে কি কাঠ কি বাধা।"

সামাজিক ভয়, লোকলজ্জা প্রভৃতির বাধাই সবচেয়ে বড বাধা, ইহাকে অতিক্রম করিবার দৃঢতা সকলের থাকে না। সেই বাধাকে শ্রীরাধা অতিক্রম করিযাছেন। সমাজকে অস্বীকাব করিয়া মানবধর্ম্মকে, জীবনধর্ম্মকে মূল্য দিবার একটা চেষ্টা সুরু হইযাছে দেখিতে পাই।

বৈষ্ণব কবিতা এক বিচিত্র বস্তু। সমাজ, লোকলজ্জা সকল কিছুকে অস্বীকার করিয়া হৃদযকে মূল্য দিতে কোন সাহিত্যই পারে নাই। এই সমাজের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে এই বন্ধনহীন জীবনের কাহিনী কি ভাবে ঠাঁই পাইল তাহা বিস্ময়ের কথা। যে প্রেমের জন্য রাধার প্রাণবিসর্জ্জন, প্রেমকে এতখানি মূল্য ইতিপূর্ব্বে দিতে দেখা যায় নাই। এক চণ্ডীদাস এই সুরে গাহিযাছিলেন।

"পরাণ সমান পিরীতি রতন
যুখিনু হৃদয তুলে
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল ঝুলে।" (চণ্ডীদাস)

"পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতে মিলয়ে তথা ॥" (চণ্ডীদাস)

গোবিন্দদাসও সেই সুরেই গাহিলেন,—

"প্রেম দহন-দহ থাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি।
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ ॥"

রাজনন্দিনী শ্রীমতী প্রেমের জন্য সকল সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কঠিন পথ বাছিয়া লইলেন।

"বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জলধারক এহ ॥"

শ্রীমতী পিছল পথে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যাইতেছেন। কিছু ধরিয়া যে উঠিবেন এমন অবলম্বন নাই। বিদ্যুৎ চমকাইলে নিজের ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখিতে পাইতেছেন। তখন জলধারা ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীমতীর কঠিন সাধনার পদগুলি পড়িতে পড়িতে মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দকে মনে পড়িয়া যায়। গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের দবীর খাস রূপ, সাকর মল্লিক সনাতন, সপ্তগ্রামের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজপুত্র রঘুনাথ রাজভোগ ঐশ্বর্য্য পথের ধূলিসম হীনজ্ঞান করিয়া বৈরাগীর কন্থাকে সমাদরে মস্তকে তুলিয়া লইয়াছেন। রায় রামানন্দ তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিলাস পশ্চাতে ফেলিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

রাধিকাও রাজনন্দিনী, সুখেই লালিত হইয়াছেন, কিন্তু আজ যখন বৃহত্তর আহ্বান তাঁহার নিকট অসিয়া পৌছাইল, তখন সেই পথের সাধনা আরম্ভ হইল। প্রাঙ্গণে কণ্টক পুঁতিয়া এবং জল ঢালিয়া পিছল পথে রাধিকা চক্ষু বুজিয়া গমনাগমন অভ্যাস করিতেছেন। হয়ত 'শ্যামবঁধুয়া'র আহ্বানে কণ্টকময় পিছল পথে গভীর রাত্রে যাত্রা করিতে হইবে।

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলী চাপি ॥

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥"

প্রাণের ভয়ও রাধার নাই, প্রেমবিহ্বলতায় কুলকামিনী সকল বিপদকেই তুচ্ছ করিয়াছেন। পিচ্ছল পথে পদস্খলন ঘটিতেছে, সর্পকে অবলম্বন করিয়া উঠিতে যান।

"উঠইতে ফণি-মণি উজোর হেরি।
কনক দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছন সোপিলুঁ তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥"

কেবলমাত্র দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতেই নহে, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে নবনী-কোমলা শ্রীরাধা তপ্ত বালুর মধ্য দিয়া অভিসার যাত্রা করিয়াছেন। বিচিত্র এই প্রেম, সকল ইন্দ্রিয়বোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
নোনিক পুতলি তনু চরণ কোমল জনু
দিনহি করল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ-রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥"

কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কানুকে পঞ্চভূতের ভিতর দিয়া স্পর্শ পাইতে চান। প্রেমে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দিতে চান। এ বড় সামান্য অনুভূতি নহে।

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥

* * *

যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাঁহি হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ধাম॥

বাঙ্গালাদেশে আফগান-শাসন উচ্ছেদ হইবার পর বহুদিন নৈরাজ্যকাল চলিযাছিল। মোগলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু দীর্ঘকাল লাগিযাছিল। এই সময়ে জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের প্রভাবে ইহাকে লোকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া স্বীকার করিল। সাহিত্যেও তাই বৈষ্ণব ভক্তির সুর উচ্ছ্বসিত হইযাছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের জের সপ্তদশ শতাব্দীতে সমানভাবে চলিযাছে। কিন্তু ক্রমেই তাহা গতানুগতিক হইযা উঠিযাছে। যোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙ্গালাদেশের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বাঙ্গালার সহিত যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন। মোগলশাসনের অধীন হইযা বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যের অবনতি সূচিত হইল। রাজশক্তি দুর্ব্বল হওযায স্বাধীন এবং প্রাণবান সাহিত্য ক্ষীণ হইযা আসিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্রমাবনতি

সপ্তদশ শতকে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদের গ্রন্থ এবং সংস্কৃতে লেখা বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ প্রবলভাবে চলিযাছিল। এই শতকে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে প্রধানতঃ রূপ গোস্বামীর অনুসরণে ভাগবতে উক্ত কাহিনীই অনুবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু গতানুগতিক হইয়া পড়ায় বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ব্বতন নবীনতা ও রস ছিল না। লেখকদের ভক্তিরসেও প্রাণ ছিল না। কিন্তু সাধারণ পাঠক শ্রোতার নিকট এই লঘু রচনার মূল্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুযায়ী আদিরসের প্রাধান্য কোন কোন জনপদের লোকপ্রচলিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীতে সমানভাবে চলিযা আসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের পাশ দিয়া ক্ষীণভাবে মৌলিক আদিরসাত্মক যে ধারা বহিতেছিল তাহা বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। ভবানন্দের ‘হরিবংশ’ তাহার নমুনা।

দিব্যসিংহের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ এই শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার

ব্রজবুলি পদ সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিয়াছে। অবশ্য তাঁহারা পদে পূর্ব্বানুসরণ খুব বেশী দৃষ্টিগোচর হয়। পদাবলীর মৌলিকত্ব ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, গতানুগতিক ছন্দোবদ্ধ রচনাই ক্রমে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়া লইল।

ঘনশ্যামদাস

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিতে গিয়া ঘনশ্যামদাস চণ্ডীদাসেরই ভাবকে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করিযাছেন, কিন্তু ভাবের অভাবকে ভাষার অলঙ্কার দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নূতনত্ব সৃজন করিবার প্রয়াস হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন ক্রমেই বন্ধ হইবার উপক্রম হইযাছে।

"ক্ষণে ঘর বাহির করসি নিরন্তর
খেনে খেনে দশ দিশ হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি॥
কেলি কদম্ব পুনহি পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি
ভন ঘনশ্যামর দাস॥"

পদাবলী সাহিত্যের এই বদ্ধতা ক্রমেই সাহিত্যে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যেমন নূতন করিয়া কোন প্রাণস্পন্দনের সাড়া পাওয়া গেল না, সাহিত্যেও জীবনীশক্তির সঞ্চারের অভাব ঘটায নানা কুসাহিত্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহারই ফলস্বরূপ কবিওয়ালা এবং বিদ্যাসুন্দরের আবির্ভাব। ছন্দের পারিপাট্য, বাগবিন্যাসের চটক ইদানীন্তন কালের বৈশিষ্ট্য। রক্তমাংসের মানুষেরা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া টাইপ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যে গ্রাম্যতা ও কুরুচির পরিচয় বেশ ভালই পাওয়া যায়। সমাজ-জীবনে বিত্তশালীগণ ক্রমেই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চাকচিক্য, আড়ম্বরপ্রিয়তা ক্রমেই সমাজে প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। সাহিত্য ইঁহাদেরই আশ্রয়ে লালিত হইয়া ইঁহাদের রুচিকেই গ্রহণ করিল।

সমাজে ও সাহিত্যে কুরুচি

কিন্তু এই অবস্থা খুব বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। ইংরাজশাসন দেশে কায়েমী হইল। বিদেশী সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাব সমাজ-জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনিল, যাহার ফলে সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের নানা বিকৃতি ঘটিলেও ইহার সূত্র ধরিয়াই প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগ স্থাপিত হইল এবং তাহা আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নূতন যুগের আবির্ভাব

গীতি ও গাথা কবিতার যুগ শেষ হইয়া আসিল। মানুষ ক্রমেই বাস্তববাদী হইয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম দিকে কবিতারই সমাদর। গদ্য সাহিত্যে স্থান পায় নাই, অত্যন্ত অবজ্ঞাতভাবে দৈনন্দিন প্রযোজন মিটাইযা যাইতেছে মাত্র। মানুষ যে যুগে কিছুটা কল্পনালোকের বাসিন্দা ছিল, সাহিত্যে তাঁহারা নিজের পারিপার্শ্বিককে ভুলিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু জীবন ক্রমেই সমস্যা-জড়িত হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক, সামাজিক নানাবিধ জটিল সমস্যা পীড়িত মানুষ কেবলমাত্র কল্পলোকের কাহিনী লইয়া দিনযাপন করিতে পারিল না। তাহার জীবনের সমস্যা সাহিত্যেও ছাযাপাত করিল।

পুরাতন ধারার পরিবর্ত্তন

একান্ত ধর্ম্মঘটিত ও দেব-সচেতন সাহিত্যকে প্রথম নাড়া দিলেন মহাপ্রভু। তাঁহার প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য কিভাবে আত্মসচেতন সাহিত্য হইয়া উঠিযাছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইযাছে। ইসলাম ধর্ম্মের প্রচণ্ড আবর্ত্তনে যে এক বিপুল পরিবর্ত্তন সমাজ-জীবনে দেখা দিযাছিল এবং যাহার প্রভাব সাহিত্যে প্রতিফলিত হইযাছিল, ঠিক সেই অবস্থার পুনরাবির্ভাব ঘটিল। এক নূতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খণ্ড বিখণ্ড ভারতসাম্রাজ্যকে জয করিযা শাসক হইযা বসিল। তাহাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি সকল কিছুই প্রবলবেগে জাতির জীবনকে আন্দোলিত করিল। সেই প্রচণ্ড আন্দোলন এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সজ্ঘর্ষে সাহিত্যে এক নূতন ধারা আবিষ্কৃত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন হওয়ার সময় হইতে

গদ্যে সাহিত্যরচনা সুরু হইল। সাময়িক পত্রের মাধ্যমে রাজা রামমোহন রায় এক নূতন সাহিত্যরসের সৃষ্টি করিলেন। বিদেশী সংস্কৃতি ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে জাতির মানসিক পরিবর্ত্তন সুরু হইল, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবাহেও এক নবীন ধারার প্রবর্ত্তন হইল। বিজাতীয় আচার ব্যবহার একদিকে অবজ্ঞাত ও ধিকৃত হইল, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপকভাবে সংস্কারপ্রচেষ্টা শুরু হইল। এই যুগের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়। এক বিপুল শক্তির বলে সমস্ত প্রাচীন কুপ্রথা ও সংস্কারকে দলিত করিয়া তিনি নূতন করিয়া সমাজ-জীবনকে সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কার করিতে যাইয়া যে সংগ্রাম তিনি আরম্ভ করিলেন, তাহাই আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইযাছিল। যে সকল কুপ্রথা ইসলামশাসন অবসানকালে জন্মগ্রহণ করিযাছিল এবং ক্রমেই জাতীয জীবনকে নীরক্ত করিয়া ফেলিতেছিল, বেগবান হস্তে তিনি মার্জ্জনী দ্বারা তাহাকে অপসারণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সবল হস্ততাড়নায সমাজ এবং সাহিত্য বহু পঙ্কিলতা এবং জটিলতা হইতে মুক্ত হইবার পথ পাইল। এ যুগের মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়।

গদ্য রচনা ও রামমোহন রায়

সাময়িক পত্রিকার প্রবর্ত্তন বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমেই সাহিত্যে যুগস্রষ্টারা আবির্ভূত হইযাছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভারতীয অধ্যাত্ম ঐতিহ্যকে একত্রে মিলাইযা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত সাহিত্যকে সংস্কার করিলেন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এক বৈপ্লবিক যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। সামযিক পত্রিকায় অনুবাদ সাহিত্যে এক নূতন দিকের পথ খুলিযা দিল। ইংরাজী গদ্য পদ্য আখ্যায়িকার অনুবাদ আরম্ভ হইল। কয়েক শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব গোস্বামীরা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায রূপান্তরিত করিতে ছিলেন। এই সকল অনুবাদও আলোচ্য সময়ে বন্ধ হইয়া যায নাই। বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতা প্রবর্ত্তনের প্রধান সূত্র হইল ইংরাজী স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক রোমান্টিক কাহিনীকাব্যের আদর্শ। ইংরাজী শিক্ষালব্ধ নব রসদৃষ্টি আধুনিক উপন্যাসের জন্ম দিল।

সমসাময়িক পত্রিকা

মানুষ তাহার ব্যক্তিগত গুণাবলী লইয়া কেবলমাত্র দেবদেবীর মহিমা

প্রকাশের জন্য সাহিত্যজগতে পূর্ব্বে স্থান পাইত। বঙ্গসাহিত্যের এই আদর্শ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে পরিবর্জ্জিত হইল। প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূলে আঘাত পড়িতেই বিরোধ জাগিয়া উঠিল। এই বিরোধের ফলে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও ধর্ম্মীয় রীতি ভঙ্গ হইল।

মানুষের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ

পারিপার্শ্বিকতার ঊর্দ্ধে মানুষ নিজেকে তুলিয়া ধরিল। তাহার স্বাধীন মতামত ইচ্ছা সামাজিক অধিকারের সীমা বহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কও বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় নারীকে অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করা হইয়াছে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বেথুন, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে রোমান্টিকতার মধ্যে প্রেমের অনুভূতিকে স্থাপিত করিয়া নারীকে তাহার গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা হইতে মুক্তি দিলেন।

নারীপ্রগতি

পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব হইল। বঙ্গবিভাগ এবং অসহযোগ এ যুগে আরম্ভ হইলেও সাহিত্যে দেশপ্রেমিকতার সুর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই জাতীয়তাবাদের ধারা ক্রমে আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হইল। মানুষ তাঁহার আত্মাকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তবেই দেশকে সেবা করিতে পারে। আধ্যাত্মিকতার এই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

জাতীয়তাবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালাদেশের সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ের যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতার নব নব তরঙ্গরাশি এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি সকল কিছুর উপরই আঘাত হানিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এযুগে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশব সেন প্রভৃতি যুগপুরুষগণ এবং বহু মনীষি আবির্ভূত হন এবং তাঁহারা দুই সভ্যতার সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। একদিকে ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া উপন্যাসের আবির্ভাব হইল, তেমনি অপরদিকে কাব্যেরও রূপ-পরিবর্তন ঘটিল।

উভয় সভ্যতার মিলন

পয়ার-লাচাড়ির এক ঘেয়ে গতানুগতিক ছন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন

মধুসূদন। কাব্যের ছন্দকে তিনি বদলাইলেন, কাব্যের ধারাও বদলাইল। কাব্যের নায়ক রাম নহেন—রাবণ। রাবণের দুঃখে তিনি নিজে কাঁদিয়াছেন, শ্রোতাকেও কাঁদাইয়াছেন, কেননা তিনি "hate Ram and his rabbles"। তাঁহার কাব্যে দেবমহিমা অপেক্ষা মানবমহিমাই অধিক প্রচারিত হইয়াছে। পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া তিনি অভিনব মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেন। তাঁহার কাব্যে রাম দেবতা নহেন—তিনি মানুষ। তাঁহার মহিমা কাব্যে স্থান পায় নাই। রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের দীপ্ত শৌর্য্য এবং মহিমা, দেবের সহিত সংগ্রাম আমাদের চিত্তকে দেবগণের চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর স্পর্শ করে।

মধুসূদন

রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া কাহিনী-কাব্য রচনা করিলেন। এই কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়া চিরন্তন মানবের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে।

রঙ্গলাল

হেমচন্দ্রের কাব্যেও মানবিকতার মর্য্যাদা—স্বাধীনতাস্বপ্ন ফুটিযা উঠিযাছে।

হেমচন্দ্র

নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা গাহিযাছেন। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসের ভিতর তিনি আদর্শ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের জযগান করিযাছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণাবতার নহেন, তিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ—তাঁহার আত্মোপলব্ধির ভিতর দিযাই তিনি ব্রহ্মকে অনুভব করেন।

নবীন সেন

"বাঙ্গালা লিরিক কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব একান্তভাবে আকস্মিক নয়; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।" বৈষ্ণব পদাবলী অপূর্ব্ব গীতিকাব্য হইলেও আধুনিক কালের গীতিকবিতার জন্মদাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের নিভৃত আপন-মনের গান। কবিমনের সহজ এবং সুন্দরতম প্রকাশ এই চতুর্দ্দশপদী কবিতা-বলীর ভিতর হইয়াছে।

গীতি কবিতা

মধুসূদনের পরে নবীনচন্দ্র লিরিক কবি হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহার মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য সমগ্র রচনার মধ্যেই একটা লিরিক সুর প্রবাহিত। কিন্তু তবুও ইঁহারা মুখ্যতঃ এপিক কবি, বিহারীলালই বঙ্গ-

সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম খাঁটি লিরিক কবি। বিহারীলালের সকল কাব্যই সুবিশুদ্ধ গীতিকবিতা। গীতিকবিতার ভিতরে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য। কাব্যধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ বিহারীল'লের শিষ্য। বিহারীলাল যে নবযুগের আভাস দিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে যুগান্তর ঘটাইলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের কবি যে 'আত্মসচেতনার স্পর্শ দিয়াছেন, তাহাই আধুনিক সাহিত্যে ব্যক্তিসচেতনতা হইয়া দেখা দিল। উপন্যাসের জন্ম প্রাচীন সাহিত্যে সম্ভব হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক কালের। মধ্যযুগের মানুষ স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে সমাজের মধ্যে পুরাপুরি লুপ্ত করিয়া সমাজের একজন হইয়া থাকিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্য লুপ্ত ব্যক্তিচেতনাকে জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাই ক্রমবর্দ্ধমানভাবে মানুষকে কেবলমাত্র সামাজিক জীবরূপে বদ্ধ থাকিতে দিল না। নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষায় উপন্যাসের সৃষ্টি হইল। ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রত্যেক মানুষের আত্মমর্য্যাদাবোধকে জাগাইয়া তোলে এবং নিম্নতম মানুষটিও তাহার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। প্রাচীন সাহিত্যে মানুষ দেবতার হস্তে ক্রীড়নক, তাহার স্বকীয়ত্ব কোথাও নাই। দুই চারিটি বিশিষ্ট মানুষের কাহিনী লইয়াই সাহিত্যজগৎ সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে নিম্নতম মানুষের ক্ষুদ্রতম জীবনটি অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার প্রযাস পাইয়াছে।

উপন্যাসের সূত্রপাত

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যজগতে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। সেকালের লেখকেরা কেহই বঙ্কিমের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের লেখনী ধারণের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু পরিপূর্ণ উপন্যাস সাহিত্যে তখনও আবির্ভূত হয় নাই। বঙ্কিম-চন্দ্র আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক। টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" এ বিষয়ে প্রথম পথ দেখাইল কিন্তু উপন্যাসের জমাট ঘন রসটুকু ভাষার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের পুর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু তাহার আড়ষ্ট গতি এবং সুবৃহৎ সন্ধি সমাস কণ্টকিত ভাষা নব নব ভাবকে বহন করিবার উপযোগী ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যের জনকরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষাকে মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করিলেন। বঙ্কিম আসিয়া মরা গাঙে জোয়ার আনিলেন। বাঙ্গালা গদ্যকে তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান

করিলেন এবং তাহাকে সরসতা দান করিলেন। বাঙ্গালাভাষার কাঠিন্য দূরীভূত হইয়া নব সুষমা এবং লালিত্যে তাহা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল। যে অনাদৃত ভাষা তাহার অবজ্ঞেয় সাহিত্যকে বুকে করিয়া বাঙ্গালীর গৃহপ্রান্তে অবহেলিত হইয়া পড়িয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নব ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিলেন। যে সাহিত্য একদিন মাত্র একতারা বাজাইয়া বাউলের গান গাহিবার যোগ্য ছিল, তিনি স্বহস্তে একটি একটি করিয়া তার চড়াইয়া বিশ্বের দরবারে খেয়াল ধ্রুপদ রাগিণী গাহিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণের উদ্বোধন করিয়া পাঠকচিত্তে রোমান্স্ রসের তৃষ্ণা তিনি জাগাইয়া তুলিলেন। বাঙ্গালা গদ্যে রসসঞ্চার এবং রোমান্টিক উপন্যাস সৃষ্টি বঙ্কিমের প্রধান কৃতিত্ব। রোমান্সের প্রবর্ত্তনা করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রসচেতনা আনিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রবর্ত্তন করিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আকস্মিকতার স্থান নাই, রোমান্সের ছায়াঘন রহস্য নাই, তাহা নিতান্তই দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও সংঘাতের চিত্র এবং তাহারই ভিতর দিয়া তিনি রস সঞ্চার করিয়াছেন। "রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্বাভাবিক ধীর প্রবাহটির অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদের জীবনে স্বাভাবিক কারণে যে সমস্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় সেইগুলিতে আপন দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। এই বাস্তবতার প্রবর্ত্তনেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার প্রথম পরিচয়। এই বাস্তবতার সুরই আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। ইহাই ক্রমশঃ উগ্রতর ও তীব্রতর হইয়া বিদ্রোহের সুরটি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠাইয়া, অবিমিশ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শে প্রচলিত নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুলিয়া, সমগ্র উপন্যাস ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পথপ্রদর্শক, কিন্তু তবুও উপন্যাসগুলি যেন অসাধারণ নায়ক নায়িকা লইয়া আমাদের প্রাত্যহিক গণ্ডী ছাড়াইয়া নীলাকাশে ধাবমান হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচন, চরিত্র-পরিকল্পনা, অন্তর্নিহিত সমস্যা—সর্ব্বত্রই অসাধারণত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চরিত্রগুলির সচরাচর প্রাত্যহিক জীবনে সাক্ষাৎ ঘটে না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলী বঙ্গোপন্যাসের

অগ্রগতির প্রধান ধারার সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য লইয়া কিছু স্বতন্ত্র।

শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতা আরও তীব্রতর। তাঁহার উপন্যাসে নূতন ভাবের উত্তেজনায় এক নবীন দিক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রগুলি নিরবচ্ছিন্ন ভালো বা মন্দ নহে, তাহারা দোষে গুণে জড়িত মানুষ। এমন মানুষ চারিপার্শ্বে চাহিলেই আমরা দেখিতে পাই। নারীচরিত্র গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া নূতন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিযাছে। বঙ্গসাহিত্যে এতদিন পর্য্যন্ত নারীচরিত্র সংসার ও সমাজের সহস্র বাধাবদ্ধ হইযা অতিক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে চলাফেরা করিযাছে। শরৎচন্দ্রের অভযা, কিরণমযী, সবিতা, অচলা, কমলা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীযা। সামাজিক নীতি তাহাদের পাযে শৃঙ্খল পরাইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা প্রভৃতি চরিত্র অবশ্য এ বিষযে পথ দেখাইযাছে। শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই উপন্যাস সাহিত্য অগ্রসর হইযাছে এবং অস্ফুট বিদ্রোহের সুর ক্রমেই বিপ্লবের কণ্ঠ উদ্যত করিযাছে। অর্থহীন এবং হৃদযহীন সামাজিক আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তর্ক তুলিযা মানুষের স্বকীয মূল্য দিতে আজিকার সাহিত্য অগ্রসর হইযাছে।

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের পর বঙ্গসাহিত্যে যে যুগের সূত্রপাত হইযাছে তাহা অতি-আধুনিক যুগ। ইউরোপীয সাহিত্যের অবাধ যৌনবাদ এই সাহিত্যে প্রধান স্থান লাভ করিযাছে। সমাজ ও সংসারের সকল বাধা নিষেধকে অগ্রাহ্য করিযা চরিত্রগুলি আপনার বৈশিষ্ট্য লইযা দেখা দিযাছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাঙ্গালার সামাজিক জীবন নানা সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত। সেই প্রভাব সাহিত্যেও পডিযাছে। এই জাতীয় সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায সুস্থ সাহিত্যের আশা করা যায না। অতি-আধুনিক সাহিত্য একদিকে অতৃপ্ত মানসিক অবস্থার পরিচয় দেয, অপরদিকে নানা সমস্যাবিজডিত বর্ত্তমান জীবনের প্রতিফল সাহিত্যে প্রতিভাত হইযা তাহাকে সাঙ্কেতিক ও সমস্যা-কণ্টকিত করিয়াছে। চরিত্রগুলিও বর্ত্তমান যুগের মানুষের মতই অসহিষ্ণু ও অস্থির মতি।

অতি আধুনিক সাহিত্য

এক্ষণে মোটামুটি দেখা যায, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে সমাজ-জীবন ক্রমেই শান্ত, নিস্তরঙ্গ এবং নানা জটিল বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে বদ্ধ ও ভারাক্রান্ত হইযা পড়িয়াছিল। এই নিরেট নিশ্ছিদ্র জীবনে এতটুকু বহির্জগতের আলোর

রেখা দেখা যায় না, সাহিত্যও ক্রমে গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয়ধর্ম্ম বেশীদিন বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং শতাব্দীর বদ্ধতাকে ভেদ করিয়া জীবনের জয়গান সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর পর আবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং তাহার ধারা আজিও রুদ্ধ হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমসাময়িক ইতিহাস

কবি সামাজিকে জীব। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকিলেই তবে তাহা প্রকৃত সাহিত্য হইতে পারে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের পরিবর্ত্তনের পিছনে আছে তাহার সামাজিক ইতিহাস। সাহিত্য ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত কবির মনে কাব্যের জন্ম দেয়। কাব্যের কাজ রসসৃষ্টি কিন্তু যুগে যুগে রসোপলব্ধির পন্থা মানুষের চিন্তার সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। সাহিত্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইতিহাসকে ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন।

ভূমিকা

ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনার পর বাঙ্গালা সাহিত্যেও নানা পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্যময় বিকাশ দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়ো বড়ো যুগবিভাগ-গুলির সঙ্গে সামাজিক বিবর্ত্তনের ছাপ স্পষ্ট। ইসলাম শাসন এদেশকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্রই একটা পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে ধাক্কা লাগিলেও ইসলামবিজয় দেশের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ঐসলামিক ও হিন্দু সভ্যতার সংঘর্ষ অধিক পরিমাণে বাহ্য, তাহা প্রথার সংঘর্ষ।

ইতিহাসে যখন একটা নূতন বিবর্ত্তন দেখা দেয়, সেই বিবর্ত্তনের ছাপ সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম সকল কিছুর উপরই দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় অগ্রসর হয়। ভাগীরথীর কূলে কলিকাতা মহানগরী ইংরাজ শক্তির কেন্দ্র হইল। প্রাচীন

ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগ

শাসনব্যবস্থা সিরাজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িল। এমনি এক অরাজক অন্ধ যুগে ইংরাজশাসনের সূত্রপাত। সারা দেশে কোন স্থায়ী শাসন নাই। যুদ্ধ, অশান্তি এবং অরাজক অবস্থায় কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ নয়। অন্ধ কুসংস্কারে দেশ আচ্ছন্ন। বহু কুপ্রথা এবং কদাচার জীবনের গতিপথকে রুদ্ধ করিয়াছে। কোথাও আলোক নাই, উচ্চ চিন্তা বা মহৎ চিন্তার ভাব নাই। কেবল একদল হঠাৎ-ধনী শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সাহিত্যও কেবল কবিওয়ালাদের গানেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। অতি অশ্লীল এবং নিম্নস্তরের রচনা প্রভৃতি এই দূষিত রোগগ্রস্ত সমাজের অঙ্গে দুষ্ট ব্রণের মতই শোভা পাইতে লাগিল। কদাচারী কুরুচিসম্পন্ন ধনীশ্রেণী এই জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইল।

ইংরাজশাসন দেশে ধীরে ধীরে স্থায়ী হইল। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিক্ষা এই বদ্ধ প্রাণহীন জীবনে একটা নূতন সাড়া জাগাইয়া দিল। যে পশ্চিমী সভ্যতা ইংরাজ এদেশে লইয়া আসিল, তাহা এদেশে একেবারেই নূতন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়া এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন যুগ সৃষ্টির মূলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান অসামান্য। এই যুগেই রাজা রামমোহন রায়, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির আবির্ভাব। নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজে প্রতি দিকেই নূতন যুগ ও নূতন প্রতিভার ছাপ পড়িল। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর পশ্চিমী সভ্যতার আলোক আসিয়া পড়িল। এই যুগের রচনায় জাতির অন্তর্নিহিত মর্ম্মবাণী মূর্ত্ত হইয়াছে এবং জীবনের রুদ্ধ স্রোত প্রাণের পরশে খরবেগে অনন্তের পথে ধাবিত হইয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবর্ত্তে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি নবজীবনের গান শোনাইল। পাশ্চমী সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতাকে মিলাইয়া লইয়া ঊনবিংশ শতকের মনীষিবৃন্দ এক সমন্বয়মূলক সভ্যতার বার্ত্তা শোনাইলেন এবং জাতির নিরাশ প্রাণে এক নবীন আশার সঞ্চার করিলেন। গ্রহণ এবং সংস্কার চেষ্টা এ যুগের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

১৮৫৮ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিল। দেশের শাসনভার পুরাপুরিভাবে ব্রিটিশ গ্রহণ করিল। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের শাসনকালে দেশের

শাসন ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এতদিন দেশের প্রজাসাধারণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নানা সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতিতে জরাজীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার জমিদারের স্বার্থ সংরক্ষণে এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে শাসকদের টনক নড়িল। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন রচিত হইল। ১৮৮২ সালের আইনে ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন স্থাপিত হইয়াছে। রাস্তা ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির প্রবর্ত্তন হইল।

ইংরাজী শাসনব্যবস্থা

দ্বৈত শাসনের অবসানের ফলে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিমের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইল। পশ্চিমের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ভারতে উন্নততর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় আধুনিক ভাবধারার সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইল। তদানীন্তন পশ্চিমের উদারনৈতিক মনোভাব ভারতবর্ষকেও প্রভাবিত করিল। ভারতের মধ্যযুগীয় শাসন এবং সমাজ আধুনিক ইউরোপের প্রগতিপন্থী ধারা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিল।

১৮৫৯-৬০ বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে এক যুগসন্ধিক্ষণ। সমাজ-বিবর্ত্তনের কালে নূতন সমাজ উজ্জ্বল পশ্চিমালোকে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, প্রাচীন সমাজও আপনার পথ নির্ণয়ে অসমর্থ। এমনই সঙ্কটপূর্ণকালে বঙ্কিম, ভূদেব, হেম, নবীন প্রভৃতির আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সমাজে ও রাষ্ট্রে একটি নূতন ধারা দেখা দিয়াছে। ধ্বংসমুখীন সামন্ততন্ত্র ও অত্যাচারিত নিম্নশ্রেণী ছাড়া ইংরাজীশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও প্রাধান্য এই যুগে।

সাহিত্যও সমাজে দ্বি-সভ্যার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়

উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরাজ যে উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল, শতকের মধ্যভাগে ক্রমেই তাহাতে ভাটা পড়িতে থাকে। এদেশেও আশাভঙ্গের সঙ্গে সামাজিক চিন্তাধারার মোড় ফিরিল। সমাজ বিবর্ত্তনের প্রেরণার সঙ্গে এদেশীয় সমাজের মূল নীতির সঙ্ঘর্ষ বাধিল। মধুসূদন ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল সমাজের প্রতিভূ। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সভ্যতার বিষামৃত একাধারে তিনি নীলকণ্ঠ মহাদেবের ন্যায় পান করিয়াছিলেন। স্বীয় জীবনের ব্যর্থতা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, অবিমিশ্র ইংরাজী সভ্যতা এদেশের ধাতে

সহ্য হইবে না। তাই নিজের কাব্যে তিনি একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পরের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন যুগের সমাজে এই সমাধানের পথ খুঁজিয়াছেন। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত অনুকরণকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, অপরদিকে সেকালের প্রচলিত সাংস্কৃতিক আদর্শকে পরিহাস করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত এদেশীয় সভ্যতার সমন্বয়ের ভিত্তিমূল তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহ অবসান হইলে ঘোষণাপত্রে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন, "We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects." মহারাণীর ঘোষণাপত্র শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। ব্রিটেনের উদারনৈতিক রাজনীতিকগণের ন্যায়বিচারের উপর শিক্ষিত ভারতবাসী গভীর আশা পোষণ করিল।

Indian Civil Service Act স্থাপিত হইল। মহারাণীর ঘোষণানুযায়ী ভারতীয়গণ শ্বেতকায়দের সহিত ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা। কিন্তু আইন সত্ত্বেও তাহাকে কার্য্যকরী করিবার উদ্যোগ সরকার পক্ষ হইতে দেখা গেল না। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীর আশাভঙ্গের যুগ সুরু হইল।

ইহার পরই তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড লিটন Arms Act এবং Vernacular Press Act পাশ করিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতের জন্য লর্ড লিটন বহুলাংশে দায়ী। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সচেতন হইয়া উঠিলেন। জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা ক্রমেই জাগ্রত হইয়া উঠিল। পরিপূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য জাতি সচেষ্ট হইল।

জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত

ইলবার্ট বিল লইয়া সমগ্র দেশে উত্তেজনার সঞ্চার হইল। ইহার পরবর্ত্তী ফল ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের জন্ম। ইতিপূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের জন্ম হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সমাজে ও সাহিত্যে একটা পরিবর্ত্তনের পালা সুরু হইয়াছিল। ২৫শে জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হইল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অ্যাসোসিয়েসন

জাতির মর্ম্মকথা রূপদানের চেষ্টা করিলেন।

অপমানক্ষুব্ধ বেদনাদীর্ণ জাতির উপর একটির পর একটি সংঘাত আসিয়া পড়িল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ জাগরণকে উপস্থিত করিল। সমন্বয়ের নীতি অচল হইয়া পড়িল, দিকে দিকে নব জাগরণ দেখা দিল। আবেদন নিবেদনের পালা শেষ হইয়া গেল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ অনবদ্যভাবে লিখিয়াছেন।

"ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি।......আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীর বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে।......কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারও চলৎশক্তি আছে।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উচ্ছ্বসিতভাবে আকস্মিকভাবে সুরু হইলেও, কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিই ইহার লক্ষ্য ছিল না। সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টাই এই আন্দোলনের মধ্যে চলিতেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল। রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, আর্ট প্রত্যেকটির ভিতর দিয়া এই একটি ধারাই প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বাহিরের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সংহতির বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ধনীদরিদ্র হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশবাসী রাখীবন্ধন করিল। জাতির চিন্তাধারার গতিও অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইল। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যেমন পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিল, সাহিত্যেও ইহার প্রভাব দেখা দিল। বিদেশী সাহিত্যের আলো এতদিন দেশী সাহিত্যের উপর আসিয়া পড়িতেছিল, এবার প্রাচীন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বৈষ্ণবকবিদের পরিত্যক্ত বীণায় নূতন সুর লাগাইলেন। ভাষা, ছন্দ, গান, কবিতা, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতে গেলে সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিলেন। সে যুগের সামাজিক অবস্থা, সে

যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস এমন এক তীব্রতা ও প্রেরণার উদ্দীপনা জাগাইল, যাহাতে এক বিরাট প্রতিভার আমরা মুখোমুখী হইলাম।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইল। সমাজে ও রাষ্ট্রে একটা নূতন পরিবর্ত্তনের হাওয়া দেখা দিল। সমগ্র পৃথিবীতে একটা ভাঙ্গাগড়ার কারবার শুরু হইল। মানুষের চিন্তাধারাতেও এরই প্রভাব পড়িয়াছিল। মহাযুদ্ধকালীন দুঃখ দুর্দ্দশা বেদনা সত্ত্বেও একটা নতুন যুগের নবারুণালোকের আশা প্রত্যেক মানুষের মনে উদয় হইয়াছিল। এমনি অবস্থায় 'ঘরে-বাইরে' 'বলাকা' প্রভৃতি গ্রন্থের আবির্ভাব।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব

মহাযুদ্ধ কোন নূতন আশার বাণী শোনাইল না, জগতে নূতন যুগের উদয় হইল না। মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙ্গন দেখা দিল। অসহযোগ অন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল। নিরাশার তীব্রতা যেমন সমাজে, সাহিত্যেও সেইরূপ অসংলগ্নতা। রবীন্দ্রনাথ গদ্য ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন, অতি আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের একটা নূতন যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগেই সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী। শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের শিল্পী। তাঁর চরিত্ররা অমিত বা মধুসূদনের মত অভিজাত সম্প্রদায়ের নহে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি সমাজের অতি সাধারণ পাত্রপাত্রীর মধ্য হইতে আসিয়াছে। সাহিত্যে আভিজাত্যের দিন শেষ হইয়া আসিল। অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে ভাঙন দেখা দিয়াছে।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে, সমাজের ভিত্তিমূলও নানা পেষণে পড়িয়া গিয়াছে। চাকুরীর বাজারে শিক্ষিত ভদ্রলোকের স্থান নাই। বাঙ্গালা দেশে মাড়োয়ারী, গুজরাটি, সিন্ধি, ভাটিয়া প্রভৃতি বণিক ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের সুযোগে দেশকে শোষণ করিয়া ধনিক শিল্পপতি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকল ক্ষেত্রে পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং আর্থিক জীবন ক্রমেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ ক্রমেই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমজীবির স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। দেশের এই সমস্যাকীর্ণ অবস্থায় জাতির সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল। যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী প্রভৃতি একের পর এক বিপর্য্যয় বাঙ্গালীর জীবনে ঘটিতে থাকে। বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালী জীবন ক্রমেই বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবনের এই বিরাট বিপর্য্যয় এবং বিপ্লবের পরিচয় তার সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক অবনতি

মানুষের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় তাহার সাহিত্যে। এই সৃষ্টির সাহায্যেই মানুষ পশুশক্তি হইতে পৃথক, প্রকৃতিবিজয়ী। নূতন প্রকাশই হইল সংস্কৃতির মূল। তাই সংস্কৃতি সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে। সাহিত্য সংস্কৃতির সেই একটি বিশেষ রূপ।

১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই সংস্কৃতির এক নূতন ও গভীর সংকটের দিকে দেশকে আগাইয়া লইয়া গেল। এই যুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট সংঘর্ষ আনিয়াছে যাহার ফলে সভ্যতার ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ১৯০৫ সালের সামাজিক সংস্থান ও চিত্তবৃত্তি ১৯৪২-৪৩ সালে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৯১৪ সালের ঝড়ো হাওয়ায় পশ্চিমী সভ্যতার উপর-আবরণ অনেকখানি সরিয়া গিয়া ভিতরের কুৎসিত অত্যাচারী শাসকদের রূপকে অনাবৃত করিল। লোভ এবং ঈর্ষ্যার একটা হিংস্র নগ্নরূপ আত্মপ্রকাশ করিল। সুতরাং এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জাতি আগুন জ্বালাইল। স্বদেশী যুগে জাতির এক সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণ দেখা দিয়াছিল, আর এ যুগে দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু এই অসহিষ্ণু আন্দোলনের জন্য জাতি প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য নানা অনৈক্য ও শ্রেণীবিভাগ দেখা দিল। দ্রুত সাফল্য লাভের চেষ্টায় অনেকখানি গলদ থাকিয়া গেল। কেননা এতদিন আন্দোলন ছিল পশ্চিমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দেশের প্রাণনাড়ীর সঙ্গে ইহার সংযোগ অধিক ছিল না। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য অহিংসাবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ঘরে বাইরে যে একটা আন্দোলনের হাওয়া বহিতেছিল তাহা বুঝিয়া গান্ধীজী হরিজন আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রেমকে বড় করিতে চাহিলেন। কিন্তু সারা বিশ্বে হিংসার উন্মত্ত প্রলয় যেখানে, সেখানে "শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"। সবল শাসক প্রতিপক্ষ প্রেমের শিকরকণায় শান্ত হইতে পারিল না।

সন্ত্রাসবাদ

রবীন্দ্ররচনায়ও একটা নূতন যুগ দেখা দিল। গীতাঞ্জলির মধ্যে একটি গভীর বিষাদের সুর ছিল কিন্তু বলাকা কাব্যগ্রন্থে একটা নূতন গতি ও উত্তাপের সঞ্চার হইয়াছে। নূতন জীবন, নূতন যুগের জয়গান কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। যে সমন্বয় এতদিন সাহিত্যে চলিতেছিল, তাহা আর রহিল না। একটা অশান্তির ঝড়

সাহিত্যে নূতন যুগ

দেখা দিল। বলাকা কাব্যের মধ্যে একটা বৃহৎ প্রেরণা, নূতন সৃষ্টির আয়োজন দেখা যায়।

কিন্তু এর পর আবার ভাঙ্গনের পালা। ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সারা বিশ্বে ভাঙ্গনের মহোৎসব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রান্তিক, পত্রপুট প্রভৃতি গ্রন্থে এই ভাঙ্গনের ছবি দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল

১৩৫০-৫১ সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল সমাজের সকল স্তরে ছড়াইয়া দিল। ১৩৫০এর মন্বন্তর এবং ৫১-র মহামারী বাঙ্গালার সামাজিক ও নৈতিক জীবনের কাঠামোকে জীর্ণ করিয়া ফেলিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে একদল ব্যবসাদার টাকা রোজগারের জন্য বাঙ্গালায় ব্যবসার শিকড় গাড়ে। যুদ্ধকালে এরাই নিষ্ঠুর নৃশংসভাবে দেশকে শোষণ করিয়া চোরাকারবারের রাজত্ব শুরু করে। ফলে সারা দেশে এল কঠিন দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিল। অসংখ্য পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল। নারীর মর্য্যাদা পদদলিত হইল। মানুষের মনে সেদিন এক সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ও লালসার ইন্ধন জ্বলিতেছিল, মনের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। পথে পথে শিয়াল কুকুরের মত মানুষ মরিল, কিন্তু লোভী মানুষ মোটা মুনাফায় চাল বিক্রয় করিতে লাগিল, নারীমেধের ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। ঘোর দুর্দ্দিনের অন্ধকারে সকল দিক ঢাকিয়া গেল। মানুষের মনুষ্যত্ব, মায়ামমতা, মর্য্যাদার কোন মূল্য রহিল না। এই লোভী চোরাকারবারী সমাজের মুকুটমণি হইল। বাঙ্গালার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয় সঙ্ঘটিত হইল। পঞ্চাশের পর এই ভাঙ্গন কমিল না। নিম্ন বর্ণের জাতি লুপ্তপ্রায়, মধ্যবিত্ত সমাজ নিঃস্ব। এই ভাঙ্গনের দাগ রাষ্ট্র-আন্দোলনে, সমাজে, সাহিত্যেও লাগিল। হিন্দু মুসলিম বিরোধের সূত্রপাত, জাতির মধ্যে সম্প্রদায়ভেদ দেখা দিল। বাঙ্গালী সাহিত্যিক এই ভাঙ্গনের কঠিন চেহারাকে সাহিত্যে রূপ দিলেন।

"আমাদের মধ্যবিত্ত মানসে যে সঙ্কট ক্রমবর্দ্ধমান এবং বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তন এই ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কটকে যেভাবে গভীরতর করে তুলছে তাতে কাব্যে নতুন ভঙ্গী আসা একান্ত স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত যে শ্রেণী আমাদের সমাজ-বিবর্ত্তনের পুরোভাগে চলেছে তার মধ্যে ফাটল ধরলো, সম্প্রসারণের পরিবর্ত্তে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই সঙ্গে প্রতিদিন যে নিরাশা ও হতাশ্বাস জনমানসে ঘনীভূত হচ্ছে তার মধ্যে" কবিদের আশার বাণী না শোনাইলে আশ্চর্য্য হইবার

নাই। একদিকে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার, অপরদিকে শোষিত জনসাধারণ তথা শ্রমিকশ্রেণীর বাঁচিবার সংগ্রাম দেশের সমাজকে ভাঙ্গনের দিকে ক্রমেই ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু কোন কোন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সম্পন্ন কবি এই অন্ধকারের ভিতর নবীন ঊষার জয়গান গাহিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ রচনায় একটা রক্তহীন জীবনের কাহিনী, নানা সমস্যাকণ্টকিত, কোন প্রকারে দিনগুজরাণের কথা। চতুর্দ্দিকে তার মৃত্যুর ঘনছায়া পরিব্যাপ্ত। আশা নাই, আলো নাই, প্রাণ নাই, কেবল ধ্বংসেরই কথিকা। দৈনন্দিন হীনতা ক্ষুদ্রতাই সাহিত্যে বড় হইয়া দাঁড়াইল, শালীনতাবোধ অস্বীকৃত হইল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জীবনানন্দ দাস, সুকান্ত প্রভৃতির কাব্য এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, নবেন্দু ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাস কোন স্থায়ী ঐতিহ্য রচনা করিতে পারে নাই। জীবনে যে অবসাদ দেখা দিয়াছে, সাহিত্যেও তাহাই বড় হইযাছে।

"মনুষ্যজীবনে মানবাত্মার যাহা শ্রেষ্ঠ প্রয়াস—ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দুর্ব্বলতার জন্য পীড়া, জগৎ ব্যাপারের অসীম রহস্যভেদের চেষ্টা, এই সকলের মধ্য দিয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যের উদ্ভব ও তদ্দ্বারা আত্ম-পরিচয় সাধন—ইহাই সকল সাহিত্যচেষ্টার অন্তর্গত নীতি। মানুষকে পশুর রূপে চিত্রিত করিলে, সে চিত্র মিথ্যা বলিয়াই কুৎসিত দেখায়। আবার মানুষকে দেবতা বানাইলে দুর্ব্বল হৃদয় নীতিবিদ্ খুঁসী হন বটে, কিন্তু যাঁহার মনুষ্যত্ব সুস্থ ও সজীব তাঁহার রসপিপাসা তৃপ্ত হয় না। মানুষের আদর্শ—মানুষ নিজে, সে আদর্শ কোনও সূত্রধৃত সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিবার নয়। মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তার জীবজীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে।" এ যুগে কাব্যে নানা অসহ্য জিনিসের প্রবেশ, আদর্শের অবনতি প্রবেশ করা খুবই স্বাভাবিক। তার জন্য দায়ী বর্ত্তমান সমাজ। সুস্থ সমাজ ব্যতীত সুস্থ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। রুগ্ন, বিষণ্ণ, নানা সমস্যা জর্জ্জর সমাজের প্রতিকৃতি সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। গভীর ক্ষোভ ও বেদনাবোধ সাহিত্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত বিভাগ সকল কিছুই সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্যের উপর এক সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের ছাপ দিয়াছে কিন্তু আবার নূতন প্রাণের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সাহিত্যেও ধীরে ধীরে নূতন আশার বাণী, নূতন প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত হইতেছে। আগামী অধ্যায়গুলিতে

বর্ত্তমান কালের সাহিত্য আলোচনা করিলে তাহার ক্ষীণ উত্তাপের স্পর্শ পাইব।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

(ক)

সাহিত্যে আধুনিকতা বলিতে আমরা বর্ত্তমান কালের চলিত সাহিত্যকেই বুঝিযা থাকি। কিন্তু এই আধুনিক কথাটির পুরা অর্থ সব সময় ঠিক থাকে না। আজ যাহা আধুনিক কাল তাহা পুরাতন সুতরাং কালের মাপকাঠিতে আধুনিক পর্য্যাযে কাহাকে ফেলা যাইতে পারে, তাহা লইযা বেশ সমস্যা আছে। মধু, বঙ্কিম, হেম, নবীন, যাঁহারা এক কালে আধুনিকতার অগ্রদূত বলিযা সাহিত্যসমাজে পথিকৃৎ হইবার সম্মান পাইযাছিলেন, আজ তাঁহারা পুরাতনের দলে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও ক্রমে পা পা করিযা পিছু হাঁটিতেছেন। এমন অবস্থায আধুনিক বলিযা কাহাকেও নির্দ্দেশ করিবার মত সাহস সঞ্চয করা বড় কম কথা নহে। তবুও আধুনিক সাহিত্যের গতি নির্দ্দেশ করিতে যাইযা আমরা এঁদেরও আধুনিক গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত বলিব। নূতন চিন্তাধারা, নূতন ভাবাদর্শ যখনই সাহিত্যে ও সমাজে দেখা দিযাছে, তখন তাহাকে আধুনিক ভাব বলা হইযাছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাযগুলিতে সাহিত্যের ভাবধারার যে পরিবর্ত্তন আলোচনা করা হইযাছে, তাহা হইতে প্রাচীনকালের সহিত একালের পার্থক্য বহু বিষযে লক্ষিত হইবে।

আধুনিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা

কিন্তু সাহিত্য মানবের চিরন্তন সুখদুঃখের সহিত জড়িত। তাই বহুবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও নানা সাদৃশ্য প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হইবে। মহাকাল তাঁহার সম্মার্জ্জনী হস্তে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, অবান্তর কথাসাহিত্যকে দূরীভূত করিতেছেন, আবার অমূল্য রত্নগুলিকে সংগ্রহ করিযা রত্নমালা গ্রথিত করিতেছেন।

সাহিত্যের লক্ষণ

সাহিত্য যুগে যুগে একই ভাব বহন করে, কেবল সময়ের ব্যবধানে তাহার বহিরঙ্গটি পরিবর্ত্তিত হয়। প্রেম সাহিত্যের এক প্রধান উপজীব্য বস্তু। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় সাহিত্যেই এই প্রেমই প্রধান বস্তু, কেননা মানবজীবনে এই প্রেমই প্রধান বৃত্তি। অতিরিক্ত বন্ধন—তাহা নীতিগত, শাস্ত্রগত, আচারগত যাহাই হউক না কেন, জীবনকে পঙ্গু করিয়া দেয়। সেই বিদ্রোহের ধ্বনি প্রতি যুগেই সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, তাহার মূল্য সবার উর্দ্ধে। মানবতার জয়গান উভয় সাহিত্যেই গীত হইয়াছে। সাহিত্যে যাহা কিছু বিকৃত অসুন্দর, অসুস্থ তাহার কারণ জীর্ণ রুগ্ন সমাজ।

সাহিত্য মাত্রেই রোমান্টিক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে রোমান্স থাকিবেই। রোমান্স সাহিত্যকে অপূর্ণ হইতে পূর্ণ করে, খণ্ড জীবনাদর্শ হইতে তাহাকে অখণ্ডতায় সমাপ্ত করে। প্রাচীন সাহিত্যকে যাঁহারা রোমান্টিক সাহিত্য বলিয়া ধিক্কার দেন, তাঁহাদের নিজেদের রচনাও সেই রোমান্টিক দৃষ্টির পরিচয় দেয়। রোমান্টিক দৃষ্টিই রচনাকে সাহিত্য করে, বাস্তবের ইতিবৃত্ত সাহিত্য নহে, তাহা ইতিহাস। এই ইতিহাস রস-সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হইলে তবেই তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য।

"উৎকৃষ্ট কবিকল্পনা সকল 'হওয়া'কেই একটি সম্পূর্ণ হওয়ার রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে—'হওয়া'র এই সম্পূর্ণতাই রোমান্স, ইহাতে বাস্তবই পূর্ণ আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল রচনায় বাস্তবই নাই, অসংলগ্ন স্বপ্নখণ্ডকে—রূপে নয়, ভাবে অপরূপ করিয়া তোলা হয়—তাহাকে আমি রোমান্স বলিতেছি না, তাহাকে সাহিত্যিক সৃষ্টি বলিব না, তাহাও আর্টের অন্তর্গত। আবার যেখানে 'হওয়া উচিত'কেই জবরদস্তি করিয়া 'হয়'এর উপরে চাপানো হয়, অর্থাৎ 'হওয়া'কে তাহার আপন নিয়মেই সম্পূর্ণ হইতে দেখার দৃষ্টি নাই—ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আদর্শে জীবনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটা ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হয়, সেখানেও রোমান্সের চিত্ত-চমৎকার নাই, একটা সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধন বা সংস্কারবদ্ধ চিত্তের উল্লাসই আছে।" (মোহিতলাল মজুমদার)

প্রাচীন এবং আধুনিক দুই সাহিত্যের ভাবসূত্রটি একই, তবুও বহিরঙ্গে কিছু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটুকু দেশকালের পার্থক্য। আধুনিক সাহিত্য

উভয় সাহিত্যের পার্থক্য

বলিতে এখন সাধারণতঃ পাশ্চাত্যভাবধারাপুষ্ট সাহিত্যকেই বুঝায়। এই সাহিত্যের সূচনা একদিকে রঙ্গলাল, মধুসূদন অপরদিকে ভূদেব, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম থেকে বলা যায়। এই

আধুনিক সাহিত্যকে মোটামুটি আলোচনা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যাযগুলিতে আমাদের আলোচ্যবিষয—প্রাচীন সাহিত্য তথা বৈষ্ণব সাহিত্য এবং আধুনিক যুগসাহিত্যের—এক কথায সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হইবে।

কবি রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি। দাশরথা, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ভাবপ্রেরণা তাঁহার ভিতর দিযা কাজ করিযা আসিযাছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের রসে যতখানি বাঙ্গালীত্ব আছে, ততখানি কবিদৃষ্টি নাই। এই দৃষ্টির অভাব তখন সাহিত্যে বেশ কিছুদিন ধরিযা চলিযাছিল।

রঙ্গলাল

কবি রঙ্গলাল সেই অভাবটুকু পূরণ করিলেন। তাঁহার "পদ্মিনী উপাখ্যান" "কর্ম্মদেবী", "কাঞ্চী-কাবেরী" প্রভৃতি কাহিনী কাব্যে একটা নূতন বস্তুব স্বাদ পাওযা গেল। ইতিহাসকে রসে পরিণত করিযা তাহারই অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন তিনি বাঙ্গালীর পাতে পরিবেশন করিলেন। জাতীযতাবাদের যে সুর পরের যুগের সাহিত্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইযাছে, তাহারই প্রভাতী শিঙাবেণু বাদ্য রঙ্গলাল করিলেন। কর্ম্মদেবী ও পদ্মিনীব তেজস্বিতা, প্রেমের গভীরতা, রাজন্যদ্বযের বীরত্ব এবং ব্যথা-মধুর প্রেমের কাহিনী আমাদের মনের তন্ত্রীকে গভীবভাবে স্পর্শ করে। বিস্মৃত অতীতের ইতিহাসের সহিত রোমান্স মিশাইযা এই কাব্য রচিত হইযাছে। মানুষের সুখদুঃখই এই কাহিনীর উপজীব্য। এই কাহিনী কাব্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে অতিক্রম করিযা চিরন্তন মানবের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইযাছে। "কাঞ্চী-কাবেরী" অতীতের কাহিনী এবং ইহার উপজীব্য ব্যক্তি জগন্নাথদেব। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তন হইযাছে। তাই জগন্নাথদেব কাহিনীর সাক্ষীরূপে দণ্ডাযমান। তাঁহারই সম্মুখে জীবন্ত মানুষের রাগ, দ্বেষ, অভিমান, প্রেম, বীরত্বের অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত হইযাছে।

রঙ্গলালের সমসামযিক কবি মধুসূদন, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার আবির্ভাব একটা বিচিত্র বিস্মষ। মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবনেব তীব্র দুঃসাহসিকতা, সমাজকে অস্বীকার করার দুর্নিবার ইচ্ছা—তাঁহাকে মহাকাব্য রচনায প্রবৃত্ত করে। মধুসূদনের কাব্য সকল কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁহার মহাকাব্য

মধুসূদন

রামায়ণ নহে, তাহা মেঘনাদবধ কাব্য। বহু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মধুসূদন যেমন জীবনে ব্যর্থ হইযাছেন, সেই বিরাট জীবনের ব্যর্থতার ক্রন্দনই মহাকাব্যের নাযক রাবণের জীবনে

দেখাইয়াছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী রাবণ জীবনে কয়েকটি ভুল করিয়াছেন। নির্ম্মম অদৃষ্ট নিদারুণ কঠোর হস্তে সেই ভুলের মাশুল আদায় করিয়াছে। মধুসূদনের জীবনেও সেই একই ভুল। নীতির বিধান, শাস্ত্রের চুলচেরা আইনকে অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা, মানুষের চেষ্টাকে অধিকতর মূল্য দেবার প্রয়াস মধুসূদন করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে কবির অন্তরতম মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-জীবন যেমন বিক্ষোভহীন, নিস্তরঙ্গ, বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সাহিত্যও গতানুগতিক একঘেয়ে ছন্দে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছিল। বিপ্লবী মধুসূদন সাহিত্যে যেমন নূতন ভাবের আগমন ঘটাইলেন, সেই ভাবকে বহন করিবার উপযুক্ত ভাষাও তৈয়ারী করিলেন। বাঙ্গালার কাব্যজগতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা উলটপালট ঘটাইয়া দিল এবং নব নব ভাবধারাকে বহন করিয়া সহস্রধারা হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মহাকাব্যকার হইয়াও মধুসূদন ছিলেন জাতকবি। তাঁহার কবি-প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রজাঙ্গনা ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে। বাঙ্গালা-দেশের জলহাওয়ায় বৈষ্ণব রসসাধনা পরিপুষ্ট হইযাছে এবং এই দেশের মাটিতেই বর্দ্ধিত কবি তাহার প্রভাব এড়াইতেও পারেন নাই। গীতি কবিতার অমৃত মধুর রস তাঁহাকে মুগ্ধ করিযাছে। প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুরী, পার্থিব এবং অপার্থিব প্রেমসুধা মধুসূদনও বাঙ্গালীকে পান করাইযাছেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রেমকাব্য নহে, কিন্তু তাহাও গীতিকবিতা, কবির নিভৃত আপন মনের গান।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সাহিত্যিকদের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তাঁহারা পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, লৌকিক সংস্কার প্রভৃতিকে মানবতার আদর্শে রূপান্তরিত করিয়া ইহাদের মধ্যে মৌলিক তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিযাছেন।

মানুষের প্রতিষ্ঠা

মানুষের প্রয়োজনে সমাজ যেমন মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল, সাহিত্যেও সেই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে লইয়া সমাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইত, বহুর সুখদুঃখ ভালমন্দের মূল্য কিছু ছিল না। সাহিত্যেও দেবদেবীর মহিমা প্রকাশের জন্য মানুষের স্থান হইত। জীবনের ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হইলেই এমতাবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে, রাষ্ট্রে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। এই আলোড়নের পিছনে ছিল যুগসঞ্চিত অসন্তোষ ও

ক্ষুব্ধতা। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, ধর্ম্মীয় রীতি ভঙ্গ হইল। বৈষ্ণব কবির পুরাতন বাণী আবার সার্থক হইল—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই!"

মাইকেলের কাব্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিল, তাহাই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনাতেও স্থান পাইল। মধুসূদনের কাব্যে দেবমহিমা অপেক্ষা মানবের মহিমাই ঘোষিত হইয়াছে। মেঘনাদ বধ মহাকাব্যে রামের জয়লাভ অপেক্ষা রাবণেব পরাজয়, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু এবং নিয়তির নির্ম্মম বিধানের নিকট পৌরুষের পরাজয় আমাদের হৃদয়কে অধিকতর আন্দোলিত করে এবং নয়নকে অশ্রুসিক্ত করিয়া ফেলে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে যে কয়েকটি পত্র সেইগুলি হইতেছে "নীলধ্বজের প্রতি জনা", "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী", "সোমদেবের প্রতি তারা"। এই তিনটি পত্র বীররস, রৌদ্ররস, এবং আদি-রসের জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনটি পত্রেই সুখদুঃখাভিভূত মানব হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিতধারার স্পর্শ এবং স্পন্দন যেন গভীরভাবে অনুভব করা যায়। নীতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আইন ইহারা মানে নাই। পুত্র শোকাতুরা জনা নর-নারায়ণকে স্বীকার করে নাই, দর্পিতা কৈকেয়ী ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, বৃহস্পতি পত্নী যুগযুগব্যাপী সংস্কারকে পদদলিত করিয়াছে। প্রত্যেকটি পত্র মানবোচিত ভাবের স্পর্শে জীবন্ত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র

কবি হেমচন্দ্রের কাব্যে এই মানবিকতার মর্য্যাদা পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি তাঁহার খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য উভয়ত্রই মানুষের চিরন্তন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাবোধকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে শৌর্য্যবীর্য্যের এক প্রবল আলোড়ন তুলিল।

"বাঙলা সাহিত্যের এই নবযুগের মূলমন্ত্র একটা মনুষ্যত্ববোধ—একটা আত্ম-মর্য্যাদাবোধ, একটা জাতীয়তাবোধ—একটা স্বাধীনতার শৌর্য্যবীর্য্যের উন্মাদ বাসনা। বাস্তবতার তীব্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল বিশ্বজীবনের পাশে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বন্ধনে আবদ্ধ বাঙ্গালী জীবনক্ষেত্রের পরিধি। ফলে নবীন বাঙ্গালার ভিতরে জাগিয়া উঠিল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। একটা সংস্কারের প্রয়োজন—একটা স্বাধীনতার স্বপ্ন নব্য বাঙালাকে আকুল করিয়া তুলিল। এই নবীন সুরের প্রকাশেই গড়িয়া উঠিল বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের বীর যুগ।

এই বীরযুগের কবি হেমচন্দ্রের সাহিত্যের ভিতরে আমরা পাই সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন—সেই জাতীয়তাবোধ—ব্যক্তিত্বের স্পন্দন—বীর্য্যের গরিমা।"

(শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত)

দশমহাবিদ্যা কাব্যে কবি তান্ত্রিক ও পৌরাণিক দশমহাবিদ্যার পরিবর্ত্তনকে আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মঙ্গলের পথে ধাবিত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনে দশটি স্তরে ব্রহ্মাণ্ডের দশটি রূপ ভাসিয়া উঠিযাছে। এই দশটি স্তবের অধিষ্ঠাত্রী দশটি দেবীই দশমহাবিদ্যা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবি দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সকল কিছুকে মিলাইয়া কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। দশমহাবিদ্যার পশ্চাতে বিশেষ কোন তত্ত্ব নাই।

হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি বৃত্রসংহার। দেবগণের রাজ্যচ্যুতি এবং স্বরাজ্য উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম, স্বাধীনতার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পরহিতায় দধিচী মুনির দেহত্যাগ প্রভৃতি বৃত্রসংহাবকে মহিমা দান করিয়াছে।

সার্ব্বভৌম আবেদন না থাকিলে মহাকাব্য অচল। হোমার ও বাল্মীকির আবেদন বিশেষ যুগকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে। সার্থক মহাকাব্য তৎকালীন যুগ ও সর্ব্বকালীন যুগকে এক সঙ্গে তৃপ্ত করে। মহাকাব্যের বাণী চিরদিনের, তাহা চিরন্তন জীবনেব কথাই বলে। যেকালে মহাকাব্য রচিত হয সেইকালের আশা আকাঙ্ক্ষা মহাকাব্যের মধ্যে যেমন রূপলাভ করা প্রযোজন সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎকালের ব্যথা বেদনাও সেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিবে।

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। সেখানে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ হইয়াছে। হেমচন্দ্রের কাব্যের বিষযবস্তু তপস্যা ও প্রাযশ্চিত্ত দ্বারা হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার ও অপরাধের প্রাযশ্চিত্ত। মাইকেলের রামরাবণেব সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে স্মরণে আনিয়া দেয। আরও মনে হয, অনন্তকাল মানুষ অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, কিন্তু এই দুর্ব্বার অদৃষ্ট অখণ্ডনীয। মেঘনাদবধে তৎকালীন এবং সার্ব্বকালীন, দুই আবেদনই বড হইযা উঠিযাছে।

কিন্তু হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে দেবাসুরের যুদ্ধই প্রধান হইযাছে, এখানে গভীর সার্ব্বভৌম মানবিক আবেদন নাই। রাবণ মানবাত্মার প্রতীক, কিন্তু বৃত্রসংহারের দেবচরিত্রগণ আমাদের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করেন নাই। দধিচীর আত্মবিসর্জ্জন মহৎ ঘটনা হইলেও তাহা বৃহৎ স্থান অধিকার করে নাই।

সার্ব্বকালীক মানবিক আবেদন ব্যতীত সাহিত্য চিরস্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। এই উপাদানের অভাব 'বৃত্রসংহারে' ঘটিয়াছে। অপরদিকে মানবিক আবেদনে 'মেঘনাদবধ' কাব্য চিরকালের সাহিত্য হইয়াছে।

নবীন সেন

নবীন সেনের কাব্যে কল্পনার প্রসার এবং বর্ণনার বিস্তার আছে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই ভাবের অসংযম স্থান পাইযাছে। মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমার জয়গান নবীন সেন তাঁহার কাব্যে করিযাছেন।

"রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসের ভিতরে তিনি গাহিয়াছেন আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জয়গান। দয়া, প্রেম, শৌর্য -বীর্য্য, জ্ঞান-ভক্তি, কর্ম্ম-সবলতা-দুর্ব্বলতা, রুদ্রত্ব ও কমনীয়তা—একটি সুসমঞ্জস পরিণতি তাঁহার চরিত্রে লাভ করিযাছে বলিযা তিনি আদর্শ মানুষ। এই মানবতার মাহাত্ম্যেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিরাট হইযা উঠিয়াছে। তিনি ভগবানের পূর্ণাবতার নহেন, তিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ, —তাঁহার আত্মোপলব্ধির ভিতর দিযাই তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেন তিনিও ব্রহ্ম। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণমূর্ত্তি পাণ্ডিত্য-লব্ধ নহে—উহা তাঁহার অন্তরের গভীর প্রেরণায় প্রকাশিত।" (শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত)

আর্য্য-অনার্য্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিযাই হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের যুগে নানা আর্য্যগোষ্ঠী ও অনার্য্যগোষ্ঠীর পরস্পর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জাতি, রাষ্ট্র, ধর্ম্মের বি[illegible] দূর করিয়া একটা দৃঢ় ঐক্যের সহিত এক জা[illegible], এক রাষ্ট্র, ও এক ধর্ম্মে সমগ্র দেশকে বাঁধিবার জন্য একটা মিলনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র অন্তরে অন্তরে প্রকৃত গীতিকবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যে গীতি-কবিতার ভাবোচ্ছ্বাসই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সংযমের অভাবে অপরিমিত দৈর্ঘ্য তাঁহার গীতিকবিতার মাধুর্য্য নষ্ট করিযাছে। তাঁহার মধ্যে গীতিকাব্যপ্রবণতা থাকিলেও তাহা লিরিক্যাল হয নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যজগতে পাশ্চত্য প্রভাবে লিরিক বা গীতিকবিতার জন্ম হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিক গীতিকবিতার জন্মদাতা।

গীতি কবিতা

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণ গীতিকবিতায। ইতিপূর্ব্বে শাক্ত, বৈষ্ণব কবিগণ গীতিকবিতার সুরে দেশ প্লাবিত করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবনে কিছুদিন রোমান্টিক গীতিকবিতার স্রোত রুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকে নানা আবর্জ্জনা সাহিত্য-

প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত হইয়া গীতিকবিতার নির্ম্মল স্রোতকে কলুষিত করিয়া ক্রমেই তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যের কোদণ্ড টঙ্কার চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইতে লাগিল। ইহারই মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি নূতন সুর ধরিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যের আদি কবি তিনিই। "বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালার বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রামবসু প্রভৃতির প্রণয়সঙ্গীতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা বিহারীলাল নূতন খাতে বহাইয়া দিলেন সঙ্গীত শতকে।" (শ্রীসুকুমার সেন)

বিহারীলাল

বিহারীলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে যে নবযুগের আভাস দিলেন, সে যুগান্তর ঘটাইলেন রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন মুখ্যতঃ এপিক কবি ছিলেন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের ভিতরে ছিল এপিক ও লিরিকের সংমিশ্রণ, বিহারীলালই অকৃত্রিম ও আদি লিরিক কবি।

গীতিকবিতার প্রধান ধর্ম্ম মানুষের নিবিড় রসানুভূতিকে অতি ছোট আয়তনের ভিতর প্রকাশ করা। গীতিকবিতা কবির অন্তরতম ব্যক্তিপুরুষটিকে প্রকাশ করে। বৈষ্ণব কবিতা অপূর্ব্ব গীতিকবিতা, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের অন্তরালে কবি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। আধুনিক গীতিকবিতা কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্ত একই সঙ্গে যুক্ত করে। ঊনবিংশ শতকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইদানীন্তনকালে বৈষ্ণব কবিতা প্রাণের স্পর্শ হারাইয়া নিতান্ত মামুলি, নবীনতাহীন ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। বিহারীলাল বাঙ্গালা গীতিকবিতার ধারায় আনিলেন কবির অন্তর্লোকের স্পর্শ যাহা সকল সাহিত্যেরই প্রাণকেন্দ্র। গীতিকবিতার ভিতরে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য। কবির মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত বাসনার কমলদলে চরণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে সৌন্দর্য্যময়ী সারদা, তিনি সৃষ্টির আদি কবি ব্রহ্মার মানসী। এই সারদার পরিকল্পনাটি অনেকাংশে বিহারীলালের নিজস্ব। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার পূর্ব্বে এ জাতীয় কল্পনা আর কাহারও ভিতর দেখা যায় না।

কাব্যধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের শিষ্য। "বিহারীলাল সমগ্র জীবন ধরিয়া যে রহস্যময়ীর পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও সৃষ্টির অন্তর্নিহিতা সেই রহস্যময়ীর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তবে পার্থক্য এই যে

বিহারীলালের মিষ্টিক দৃষ্টি সারদাকে অবলম্বন করিয়াই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্যকারের মিষ্টিক দৃষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল সৃষ্টির অন্তর্নিহিতা এই রহস্যময়ী দেবীর খোঁজ করিতে করিতে আরও অগ্রসর হইয়া জীবনদেবতার সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। বিহারীলালের ভাবধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার গভীর সাদৃশ্যের কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের কবি-মানসের নিগূঢ় সাধর্ম্ম্য।" (শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত)

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'। মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক এখানে সহজ হয় নাই। একটা সঙ্কোচ ও সন্দেহ তাঁহাকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। পরবর্ত্তী কাব্য 'প্রভাত সঙ্গীত'। এখানে কবির হতাশা কাটিয়াছে, সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্য্য কবির অন্তরকে রসসিক্ত করিয়াছে। 'ছবি ও গান' কাব্যে কবি প্রকৃতি ও জীবনের সর্ব্বত্র রসসৌন্দর্য্যের ছবি দেখিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে এই রস উচ্ছলিত হইয়াছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও প্রকৃতি প্রেম উভয়ই স্থান পাইয়াছে। 'মানসী' কাব্যে কবিচিত্তের অতৃপ্তি ও গ্লানি দূর হইয়াছে, তবুও অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হয় নাই। 'মানসী'র কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম বাস্তবের ভূমিকে ছাড়াইয়া অধ্যাত্মলোকের আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে। 'সোনার তরী' কাব্যে কবি মানবজীবনস্রোতে অবগাহন করিয়াছেন। এই কাব্যে কবি সমগ্রদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে আপনার অখণ্ডতা উপলব্ধি করিয়াছেন। জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটিয়াছে। সাধারণ মানুষের সামান্য হাসিকান্না কবির চিত্তে প্রকাশমুখরতা জাগাইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রসসাধনার যে ইঙ্গিত আছে তাহাতে মানবজীবনলীলার তত্ত্বটিই রূপায়িত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। চিত্ত-প্রশান্তি ও নৈর্ব্যক্তিক রসদৃষ্টি কবির রসানুভূতিতে চরাচরের হৃদয়াবেগ প্রতি-ফলিত করিয়াছে; কবির হৃদয়াবেগ নিখিলের হৃদয়াবেগে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'চিত্রা'য় কবি আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ও সার্থকতার দিকে আগাইয়া গেছেন। এখানেই কবি কল্পনাবিলাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন! 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি কঠোর বাস্তব জীবনে, কর্ম্মচঞ্চল মনুষ্যসমাজে নামিয়া আসিয়াছেন। 'কল্পনা'তেও সেই কর্ম্মচঞ্চল সুরটি অব্যাহত। এখানে অনুভূতির

প্রকাশ আরও গভীর হইয়াছে। রোমান্টিকতা ও রসভাবালুতা ত্যাগ করিয়া কবি জীবনের সত্যকে বরণ করিয়াছেন। 'চৈতালী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন-রসের নিগূঢ় অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। জীবনের সহজ আনন্দ ও প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্য তাঁহার রচনায় পরিপূর্ণতা আনিয়া দিয়াছে। জগৎকে ও জীবনকে কবি ভালবাসিয়াছেন, আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

'ক্ষণিকা' কাব্যে কবিচিত্ত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। 'ক্ষণিকা'র লঘুছন্দের কবিতাগুলির মধ্যে কবি সহজ ভাষায় নিরাসক্ত আনন্দকে প্রকাশ করিয়াছেন। "ক্ষণিকায় কবিসত্ত্বা এক নবতর মুক্তি আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছে। মানবপ্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতির অখণ্ডতা এবং তাহার সহিত কবিসত্ত্বার একাত্মতা উপলব্ধি এই জীবন্মুক্তির প্রেরণা যোগাইয়াছে। শুধু চোখে নয় সমস্ত অনুভূতি দিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে অন্তঃ-প্রকৃতির সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়া কবিসত্ত্বা শুদ্ধ অস্তিত্বমাত্রবোধের নির্বন্ধন আনন্দ অনুভব করিয়াছে। মানসবন্ধন ছিঁড়িয়া কবিসত্ত্বা আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে দিক্‌বিদিকের সীমাহীন অবকাশে।" (শ্রীসুকুমার সেন)

'নৈবেদ্য' কাব্যের কবি প্রাচীন ভারতের ধ্যানমগ্নতা লাভ করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্রতা কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। বাস্তবের এই কঠোর মূর্ত্তি কবিকে জীবনের মুক্তি সাধনায় আগাইয়া দিয়াছে। বৈষ্ণব রসিক-ভক্তের মতই তিনি এই বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং বিশ্বনাথকে একাত্ম করিতে চাহিয়াছেন। নিরাসক্ত ভাবজীবন ত্যাগ করিয়া কবি জীবনসাধনাকে কর্ম্মে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে'র কবি মানুষের কবি—বৈষ্ণব কবির সঙ্গে তাঁহার সেখানেও মিল আছে। বৈষ্ণব-কবি মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে'র কবিও বিশ্বাস করেন মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে ঈশ্বরের পূজা করা হয়। মানবদেবতার অপমান করা হইয়াছে বলিয়াই আজ জাতির এই দুর্দ্দশা। প্রাচীন সমাজের প্রাণহীন আচার-পরায়ণতা শিক্ষিত সমাজকে পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজও পূর্ণাঙ্গ নহে। তাহার মধ্যে উদগ্র লোভ, হিংসা শ্বদন্ত বিকাশ করিয়া বসিয়া আছে। সেখানেও মানুষের মূল্য নাই, আছে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার। প্রাচীন ভারতের সাধনার মধ্যে কবি মানুষের বৃহত্তম ও মহত্তম মূল্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

'খেয়া'য় রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের অবসান ঘটিল। জীবনের

বিচিত্র বেদনার মধ্য দিয়া চরম সত্য উপলব্ধির আকৃতি, দুঃখের মধ্য দিয়া প্রেয়োলাভের ব্যাকুলতা খেয়ার মর্ম্মকথা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা অজ্ঞাতসারে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়া বৈষ্ণবসাধনার অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছিযাছে। 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' চপলপ্রণয়ী ; 'কণিকা'য তিনি হইয়াছেন 'অন্তরতম' ; খেয়ায় কবিচিত্ত মিলনোৎসুকা অচির বিরহিণীর মত প্রণযোদ্বেল ব্যাকুলতা লইয়া হৃদয়স্বামীর সহিত মিলনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে।" (শ্রীসুকুমার সেন)

'বলাকা' কাব্যে এক নূতন দিকের সূচনা হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম তাণ্ডব তখন সুরু হইযাছে। বিশ্বযুদ্ধের হিংস্রতা কবিচিত্তে পীড়া দিয়াছে। এর মানস-ইতিহাস কবি নিজেই লিখিয়াছেন : "তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।...আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয আসন্ন।" প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার ভিত্তির উপর তাঁহার বিশ্বমানবতা-বাদকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মার সঙ্গে সমগ্র মানব-সংসারের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলন, শ্রমিক সম্প্রদাযের উত্থান, মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙন—রাষ্ট্রে ও সমাজে নানা আলোড়ন তুলিল। সমাজে পুরানো দিনের বদল হইল, সাহিত্যেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল। কবি 'পুনশ্চ' কাব্যে সহজ মানুষের আড়ম্বরহীন জীবনের সুখদুঃখের একটা স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু এই আলোডনের সুরটি রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থকে লইয়া তিনি কাব্যরচনা করিয়াছেন. কিন্তু মনের সঙ্গে কোথায যেন রচনার মিল নাই। "পত্রপুটের ঘোষণা ঘেঁষা সুর এবং চড়া অলংকার প্রমাণ করে যে কবিকে উজান ঠেলতে হচ্ছে। এগুলিতে নতুনত্ব আছে, কিন্তু সেটি বাহ্য, ভেতরে প্রবেশ করে নাই।...এর মধ্যে কবির মনের সুষ্ঠু স্ফুরণ ঘটে নাই।" (শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ)

'প্রান্তিক' 'আকাশ', 'নবজাতক' প্রভৃতি কাব্যে কবি নূতন নূতন দিকের প্রকাশ দেখাইয়াছেন। জীবনের নানা বিচিত্র দিক তাঁহার কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে, জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃকে তিনি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন।

সামাজিক বিরোধে ও মানুষের অপমানে তিনি একদিকে পীড়িত হইয়াছেন, অন্যদিকে শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি নূতন জগৎ ও নূতন দিনের আগমনী গাহিয়াছেন। বর্ত্তমানের ঘোর দুর্য্যোগের অবসান ঘটিবে, মানবের অবনতির দিন শেষ হইয়া তাহার মহিমময় উত্থান ঘটিবে।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন যুগে নানা কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সুরের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে ভাবের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কিন্তু তাঁহার শেষ যুগের কাব্য—'রোগশয্যায', 'আরোগ্য', 'জন্ম-দিনে', 'শেষলেখা'—এখানে সুরভঙ্গী বিষযবস্তু একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

একেবারে অলংকার বাদ দিবার চেষ্টায় সাহিত্যে প্রাণের কথা স্থান পাইয়াছে। এই কাব্যগুলিতে কবি কোন অলংকারই দেন নাই, অত্যন্ত সহজভাবে সহজ কথাগুলি বলিয়াছেন। ফ্যাশানের দোহাই দিযা কাব্যকে আধুনিক করিতে গিয়া কবি প্রাণহীন করেন নাই। কাব্যমাত্রেই বর্ত্তমান মানুষের মনের অভিব্যক্তি। আধুনিক যুগের চারিপার্শ্বের পরিবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকেও প্রভাবিত করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া বেদনার সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। পীড়িত মানবের দুঃখই কবির কাব্যে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। সভ্যতা ক্রমেই হিংস্র রক্তলোলুপ অত্যাচারীর হস্তে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। মানবতার জয়গানই কবির কণ্ঠে এতদিন গীত হইয়াছে। কিন্তু আজিকার দিনে মানব ক্রমেই অসার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহারই মধ্যে কবি নবযুগের আগমনের গীত গাহিয়াছেন। কবি "অনুভব করেছেন যে বিশ্বরাষ্ট্রচক্রে যে নয়নস্তম্ভন পরিবর্ত্তন চলেছে তার আড়ম্বর যতই থাক সে সবই অন্তঃসারশূন্য, তার পিছনে আছে প্রকৃত মানুষের দল যারা এই মনুষ্যত্বের অপমান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।" (শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ)

ছন্দের যাদুকর, স্বচ্ছন্দ ছন্দরাজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র আবহাওয়ায কাব্য রচনা করিলেও তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকুও সহজেই চোখে পড়ে।

সত্যেন্দ্রনাথ

আধুনিক যুগের কোন কোন কবির কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার প্রভাব তাঁহার বহু কাব্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই অন্যান্য পূর্ব্বসূরী ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন ও নবীন সেন প্রভৃতির প্রভাবও তাঁহার কাব্যে লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রপ্রভাবের উদ্ধৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া যায়—

"আমার কণ্ঠে গাহিছে আজিকে জগতের যত কবি।
আমার তুলিতে আঁকিছে তাদের সুখদুঃখের ছবি।
শত বিচিত্র সুর,
আজি একত্রে বিহরে হরষে অখণ্ড সুমধুর।"

নবীন সেনের প্রভাবও স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়—

"জ্বলিতেছ চিরদিন তুহি হে যেমন
জ্বলে সদা ধরণী তেমনি,
মানব সে সিন্ধুনীরে বুদ্ধুদের মালা
তারাও জ্বলিছে দিনমণি।
বাহিরে স্নিগ্ধতা—ঢাকা—
শান্তির মাধুরী মাখা
অন্তরে জ্বলিছে মহানল,
অভিলাষ—আশা—তৃষ্ণা—আকাঙ্ক্ষা কেবল।"

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁহার বৈদগ্ধ্যজ্ঞান পাঠককে বিস্মিত করে। নানা ভাষা হইতে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর প্রসাধনের তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দেশকালের বিপুল এবং বিচিত্র পটভূমিও তাঁহার রচনার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'হোমশিখা', 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই সকল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতায় বহির্মুখীনতাই প্রধান। রবীন্দ্রপ্রভাবের ছায়াতলে বসিয়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানমহিমায় প্রভাবিত হন নাই। কিন্তু প্রকৃত কবিত্বের লক্ষণ, অন্তর্মুখী, আত্মনিষ্ঠ, গীতাত্মক রচনা সত্যেন দত্তের 'বেণু ও বীণা' 'কুহু ও কেকা' 'অভ্র আবীর' 'ফুলের ফসল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাই।

'বেণু ও বীণা'র আরম্ভে প্রকৃতির মূর্ত্তরূপ, সংসারের রূপরসকে প্রেমের দৃষ্টি দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিতে সত্যেন দত্তের ন্যায় বস্তুমুখী কবিও চাহিয়াছেন।

"মানসের জলে বেজেছে বিভোল বীণা,
তারি মূর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু—
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা।
পরাণ আমার শুনেছে সে মধুবাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে।"

'ফুলের ফসলে' কবি রূপতৃষ্ণার ব্যাকুলতায় কাব্যে বস্তুজগতের সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই খণ্ড সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া কবি এক অখণ্ড পূর্ণানুভূতির স্বাদ পাইয়াছেন। 'ফুলের ফসল' কাব্যে বস্তুতান্ত্রিক সত্যেন্দ্রনাথ রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছেন।

"ভরা দিনের বাজল বাঁশী,
ভরা মুখের ফুটল হাসি ;
ভোলা স্বপন সফল হ'ল
সোনার শরৎ-শেষে গো !
যে আলোকে কাঁদন হরে
শিউলি মরে হেসে গো !" (আবির্ভাব)

"আমার পরাণ যেন হাসে
ফুলেরি মতন অনাযাসে,
চাঁদের কিরণতলে,
বরষার ধারা জলে,
শিশিরে কিবা সে মধুমাসে
ফুলেরি মতন—অনাযাসে।" (প্রাণপুষ্প)

'কুহু ও কেকা'র কবি বিশ্বপ্রকৃতির উৎসবের মধ্য দিযাই ইন্দ্রিযাতীত রূপের সন্ধান পাইযাছেন।

"হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে।
ধেয়ানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎস্না
স্মিরিতি সাথে পীরিতি, আজি মন্দ্র-মধু মন্তরে।"

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি দোষ ধ্বন্যতিরেক। একদিকে এই ধ্বনি স্পন্দনের অতিরেক তাঁহাকে ছন্দের যাদুকর করিয়াছে, আবার উহাই ক্ষেত্র-বিশেষে দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পীর আত্মভোলা দৃষ্টি লুপ্ত হইয়া তাঁহার কাব্যে অনেক স্থলেই বাগ্মিতা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কবি হৃদয়সংবেদনমূলক অপেক্ষা মননাতিরেক কবিতার সৃষ্টিতে অধিক উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

"আড়বাড় আর ঘাঁটি মুহড়ায়
হাঁকার বাজায় দামামা কাড়া,
হের দেখ কার বিপুল বাহিনী
হামার হয়েছে ছাড়া।"
(ইন্দ্রজাল : অভ্রআবীর)

"গোগর ঝাউয়ের গোকর্ণ ছাঁদ শাখায় তুষার সরতেছে,
শালের পশম ঝলমলিয়ে ছাগলগুলি চরতেছে,
শিস্ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে ওজয় এবং গঙ্করে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাসতে থাকে উছট খেয়ে টক্করে,"
(জাফরাণি স্থান : বিদায় আরতি)

ধ্বনির অসংযম কাব্যকে তাহার মহতী পরিণতি লাভ করিতে দেয় নাই। যেমন 'জর্দ্দাপরী' কবিতাটিও লক্ষণীয়—

"রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে দুই পাখনা মেলে যাও কোথায়?
যাই কোথায়?—
হায় হায়
দরদ দিয়ে বুঝতে জরদ্ গরদ্ গুটির দরদ্ দায়।"

"ছন্দের কাণ, শব্দের সমৃদ্ধি, বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান,—সত্যেন্দ্রনাথের সবই ছিল, কিন্তু জীবনকে নতুন চোখে দেখবার, নতুন মনন-কল্পনা চৈতন্যের মধ্যে ধারণ করবার প্রবল কোনো সামর্থ্য ছিল না। ফলে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ছন্দকে কাব্যের বাহন হিসাবে ততটা দেখা যায় না—যতটা দেখা যায় তাঁর শ্রুতিনৈপুণ্যের দ্যোতক রূপে।" (শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র)

কালিদাস রায়

কালিদাস রায় আধুনিক যুগের বৈষ্ণব কবি। বৈষ্ণব ভাব কল্পনার উত্তরাধিকার তিনি জন্মসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবভাববিমণ্ডিত কবিতা 'বৃন্দাবন অন্ধকার' 'কুসুমশয়নে' অনুপ্রাসের সঙ্গে স্পন্দন, লালিত্য, বেগ ও নিবিড়তা যেন একটি সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

"শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।

রুচে না কারো নবনী সর, হেলায় লুটে অবনী 'পর
করে না দধি মন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার। (বৃন্দাবন অন্ধকার)

কালিদাস রায় স্বভাবকবি। তাঁহার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে একটি কবি-প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য একটি কাব্যে কালিদাস রায়ের কবিতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন—"তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কালিদাস রায়ের কাব্যধারায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অতি পুরাতন ভাবটি নবীনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ছন্দ, অলঙ্কার ও অনুভূতি—কবিতার এই তিনটি মুখ্য বস্তুই তাঁহার রচনায় একত্রিত হইয়া একটি অখণ্ড রসানুভূতি সৃজন করিয়াছে।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অন্তরে একটি বৈষ্ণব ভক্ত বাস করেন। জগতের সকল সৌন্দর্য্যরস হইতে যে আনন্দ উদ্ভূত হইতেছে, সে আনন্দই সচ্চিদানন্দের আনন্দময় রূপ। সেই রূপকেই বৈষ্ণব ভক্ত হৃদ্‌গম্য করিবার সাধনা করেন। এই যে সৌন্দর্য্যধ্যান, ইহা বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির সাধনার বৈশিষ্ট্য। ইহাই এদেশের প্রধান বিশিষ্টতা, সাহিত্যেও ইহাই স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালা কাব্য বাঙ্গালীর রসজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কবি কুমুদরঞ্জন খাঁটি বাঙ্গালী সংস্কৃতির রসকে পুনরায় কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কবির কাব্য এতখানি হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে, রসসমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর একটি কারণ মানবিকতাবোধের স্পর্শ। সমাজে যাঁহারা অস্পৃশ্য, হীন, অবজ্ঞেয়, তাহাদেরই মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমা দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। কুমুদরঞ্জন তাহার কাব্যে সেই মানুষের পূজা করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাই বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক জীবনকে এতখানি অনন্যসাধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই মানবতার সুর এতখানি তীব্র তাহা এই বাঙ্গালীত্বের জন্য। কবি কুমুদরঞ্জন অতি ক্ষুদ্র মানুষগুলির মধ্যে মহামানুষের রূপ দেখিয়াছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

"মানুষকে, মানুষের জীবনকে, সংসারের তুচ্ছতম বস্তুকে এমন প্রেমের পূজা আর কোন জাতি করে নাই। কুমুদরঞ্জনের কাব্যে সেই কালচার, শুক্ল সন্ধ্যার গোধূলি-জ্যোৎস্নার মত, বিনীত মাধুর্য্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে,—তাহাই কাব্যে একটি রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।...রবীন্দ্রযুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই

নব ভাব-প্লাবনের শেষে, সেই নব ভাবকে উৎকৃষ্ট কলাশিল্পে মণ্ডিত করিয়া যে গীতিকাব্যের পত্তন হইল, তাহার আওতায় পড়িয়াও বাংলার সেই জাতিগত কালচার যে খাঁটি কাব্যরূপ ধারণ করিতে পারে কুমুদরঞ্জনের কাব্যও তাহাই। কুমুদরঞ্জন এ যুগের একমাত্র কবি, যিনি বাংলার সেই রসজীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আধুনিক মানবপূজাকে সেই বৈষ্ণব ভাবসাধনার মন্ত্রে শোধন করিয়া, অসংখ্য কবিতায় গুঞ্জরিত করিয়াছেন।" (মোহিতলাল মজুমদার)

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রশিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম। জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ফুল হইয়া ফুটিয়াছে। তাঁহার কবিতার মাধুরী আমাদের অতি জাগ্রত বাস্তববুদ্ধিকীর্ণ চিত্তে স্বপ্নের পরশ লইয়া আসে। প্রকৃতিব রূপলাবণ্যে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—তাঁহার রচনায় প্রকৃতির নানা বিচিত্র রূপের খেলাই আমরা দেখিতে পাই। প্রকৃতির নির্জ্জন স্নিগ্ধ রূপটির কথাই কবি নানা স্বরে বলিয়াছেন। প্রকৃতির সকল রূপের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্না কিশোরী, কখনও বা তরুণীব মূর্ত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন।

করুণানিধান

"এইখানে এই অনেক দূরে পথ ভুলিনু তার নূপুরে,
সুনয়নীর মনোমণির চিরগোপন ইশারাতে।" (বনের কোণে)
"চিরযুগের কান্তা আমার, প্রাণ-প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সিঁথির মণি, শিথিল বেণীর নীল ফিতা।" (দুমকাবাণী)

প্রকৃতির রূপের মধ্যে এক অনন্যা, অরূপার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। ছন্দের সহজ সৌন্দর্য্যে ও শব্দের বিচিত্র সম্ভারে তাঁহার কবিতার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু জীবনের নানা তিক্ত আস্বাদ তাঁহার সে মাধুরী লুণ্ঠন করিয়া লইল। যে স্বপ্নলোক তিনি যৌবনের আবেশে রচনা করিয়াছিলেন—জীবনব্যাপী সংগ্রাম তাহা অবশেষে তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত করিল।

"সোনার মালা গিনির মালা ভালবাসার ভাণ
অভিনয়ের উৎপাতে হায় বিষিয়ে গেছে প্রাণ।" (ক্ষ্যাপার গান)

তাঁহার কবিতায় ছন্দের সহজতা ছিল, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ও মাইকেলের অনুকরণ তাঁহার কবিতাকে বৃথা শব্দসর্ব্বস্ব করিয়াছে।

"ভো মহার্ণব, নীল ভৈরব গর্জদ-জলভঙ্গে,
দূর সমুদ্র-মন্ত্র সমান তুলিতেছে কার বন্দনা গান ?
নক্তন্দিব উদ্বোধনের দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।" (শ্রীক্ষেত্র)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় বাস্তববুদ্ধি ও দুঃখবাদের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা অত্যাধুনিক যুগের প্রথম স্পর্শ আনিয়াছে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পেষণে মানবাত্মা আর্ত্ত ক্রন্দন করিতেছে। সেই আর্ত্ত ক্রন্দনই কবির কাব্যে স্থান পাইয়াছে। যে কোন মিথ্যা ভাববিলাসিতাকেও কবি ধিক্কার করিয়াছেন। দুঃখকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে অতি আধুনিক কবিদের মত এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা তাহাকেই সার করেন নাই। এই দুঃখবেদনাকে স্বীকার করিয়া তাহার উর্দ্ধে উঠিবার প্রয়াসই মানবাত্মার কঠিন সাধনা।

যতীন্দ্রনাথ

মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদার ফলে আধুনিক সমাজে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, সাহিত্যেও সেই পরিবেশ দেখিতে পাই। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক হইতে গিয়া সাহিত্য হইতে পারে নাই, শুধু কথার কচকচি হইয়াছে। কাব্যের মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র কয়েকটি বাঁধা গৎএর আশ্রয় কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন। এ কবিতা আধুনিকও নহে, কাব্যও নহে, উহা অকাব্য। আধুনিক কবি জনসাহিত্য রচনার নামে জঘন্য কুৎসিত বৃত্তিকে কোথাও আশ্রয় করিয়াছেন, কোথায়ও বা প্রাণহীন কথার কপচানি সৃষ্টি করিয়াছেন। জাতি ও সমাজের যখন ধ্বংস উপস্থিত হয়, এই জাতীয় আগাছার সাহিত্যে আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। একটা বিরাট ভাঙনের পালা সারা দেশ জুড়িয়া চলিতেছে। অন্নহীনতা, অর্থহীনতা, গৃহহীনতা, শিক্ষাহীনতা, সকল হীনতার পালা চলিতেছে, তাহার সহিত চলিয়াছে হীনমন্যতা। নবীন ভাব নাই, নবীন আশা নাই, কেবল ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া।

আধুনিক কবিতা

"এই সব ম্লান মূঢ় মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে আশা।"

কবির সেই জাগ্রত বাণী ব্যর্থ হইয়াছে। আধুনিক কবি সমাজের সেই নীচুস্তর পর্যন্ত দেখাইয়াছেন, ভাঙনের কাহিনী শুনাইয়াছেন, কিন্তু পরিত্রাণের কোন পথ দেখান নাই। বাঙ্গালার সরস ভূমি অন্তর্দ্দাহের অগ্নিতাপে মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সোনার ফসল আর ফলিল না।

আধুনিক কবিতার রুক্ষ উত্তপ্ত রূপ বিশেষভাবে ফুটিয়াছে সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, সুকান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব প্রভৃতি আরও অনেকের রচনায়। আধুনিক যুগের যে ছাপ আধুনিক কবিতায় পড়িয়াছে

তাহা সমাজ-মানসেরই রূপ। ইহা একান্ত স্বাভাবিক যে সাহিত্যে তৎকালীন রূপটি ফুটিবেই। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু বাগ্‌সর্ব্বস্ব, গ্লানিময় সমাজ-জীবনে যে একটা উপপ্লবের মহড়া চলিতেছে তাহার প্রতিচ্ছবি কবির রচনাতে না আসিলে সাহিত্য সমাজের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। কিন্তু সেই ক্ষয় ও ধ্বংসই কোন কোন কবির রচনায় সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। তাহা কখনই চিরকালীন সাহিত্যের মানদণ্ড হইতে পারে না। সুস্থ মানুষ মাত্রেই চাহিবে মঙ্গল ও কল্যাণ। সাহিত্যকার অমঙ্গলের চিত্র আঁকিবেন, বর্ত্তমানের দুর্দ্দশার কথা শুনাইবেন— কিন্তু তাহাই পরম ও চরম ঘোষণা করিবেন না। শক্তিশালী কবি যাঁহারা, আধুনিক কবিতা তাঁহাদের সেই মানদণ্ডেই সৃষ্ট। অবক্ষয়ের চিত্র আছে, গ্লানি, ব্যর্থতা ও হতাশার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আছে কিন্তু তারই সঙ্গে আশা আছে মহাবিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে—এই জরতপ্ত বিকৃতরুচি সমাজব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িবে। নূতন সমাজ বলিষ্ঠ আত্মচেতনা লইয়া আগাইয়া আসিবে। সেই অগ্রসরণ হইবে প্রেমে।

দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে একটা প্রচণ্ড ভাঙনের যুগ চলিতেছে। একদিকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেশকে নানা আঘাতে বিপর্য্যস্ত ও দেশবাসীকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, অপরদিকে শ্রমিক সম্প্রদায়ের দ্রুত উত্থান—নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া সমাজ কোন্ পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কবিরা বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে আশার বাণী বড় ক্ষীণ, একটা হতাশ্বাস, রক্তহীন সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান আধুনিক বাংলা কাব্য অনেক ক্ষেত্রেই নবযুগের বাণী বহন করে নাই। কবির অন্তরে কোন আশা নাই, কোন আশার গীত তিনি শুনাইতে পারেন না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় একদিকে নৈরাশ্য, মনোভঙ্গ, দুঃখের পরিচয় যেমন পাই, তেমনই জীবনানুরাগের কথাও পাই। জীবন দুঃখময়, মানুষের লোভ, প্রেমহীনতা—মানুষের বুকের ভগবানকে কাঁদায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একদিকে 'প্রেয়সী শ্রেয়সী'র জন্য তাঁহার 'সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে, বঞ্চনায়, আঘাতে ও হতাশায় কাঁদা নানা ছলে' চলিতেছে আবার তিনিই বলিয়াছেন—

> "যত কান্না ধরণীতে
> তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
> আর ধন্য আপনারে মানি!"

জীবন নশ্বর কিন্তু তার জন্য পৃথিবীর রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে তিনি পূর্ণরূপে ভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন।

"মৃত্যু শাসায় শুনতে কি পাস?
বিশ্ব জুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই।
* * *
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ
লুট করে নে যেথায় যা পাস;
আকাশ বাতাস
প্রেমের প্রকাশ
নারীর দেহে রূপের বিকাশ
যেথায় যা পাস।" (প্রথমা)

লেখক আধুনিক যুগের কবি। কিন্তু চিরকালের চির আদিম সত্য তাঁহার লেখনীতে ধরা পড়িয়াছে। তিনি বুঝিযাছেন ভালবাসার সহজ অঙ্গীকার লইযা মানুষ জীবনের পথে পা বাড়ায। কিন্তু তাহার পরেই আধুনিক সন্দিগ্ধ মন ভালবাসার শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে। তিনি বলেন—"জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।" অবশ্য মানুষের লোভই যে ইহার কারণ তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। "প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমন স্বভাবতঃই আধ্যাত্মিক,—জড়বিজ্ঞানের শেষ দেযালের ওপারে আরো কিছু আছে,—রবীন্দ্রনাথের যুগে, রবীন্দ্রভক্ত প্রেমেন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান প্রীতি সত্ত্বেও সেই অনতিস্পষ্ট অমৃতবাদে বিশ্বাসী।" (শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র)

চতুষ্পার্শ্বের ব্যর্থতা এবং লক্ষ্যভ্রষ্টতার মধ্যে প্রেমেন্দ্রের কবিতায একটা আশাভঙ্গের সুর শোনা যায়।

"তারি সন্ততি, আমাদেরও ভাই ব্যর্থ সন্ধান
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি;
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি
লেগেছে মলিন ধুলি।
* * *

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন ;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু
আদি পঙ্কের ঋণ।"

এই লক্ষ্যহীনতা ও ব্যর্থতার মধ্যে আধুনিক কবি মগ্ন থাকিতে চান নাই। কবির অন্তরাত্মা এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে উর্দ্ধে উঠিতে চাহিয়াছে। স্বপ্নবিলাসের কুহকে তন্দ্রাচ্ছন্ন না থাকিয়া কর্মযজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান জীবনে মানুষের একমুহূর্ত্ত অবসর নাই।

"কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় ;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।"

কিন্তু কর্ম্মযজ্ঞেও কবির মন তৃপ্ত হয় নাই। যতই বাস্তবতার ভাণ করুন, কবিচিত্ত কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম্ম লইয়াই তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। জীবনের রস, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করিবার একটা আকুলতা ও তাহা না পাওয়ার বেদনা কাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।

"নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়!
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়
হায় সময় যে নাই।"

মানুষের অমর্য্যাদা, অপমানের ভিতর দিয়া আধুনিক কবিও ভগবানের অপমানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের মহিমার ভিতরেই দেবত্বের উদ্দীপন তাহা তিনিও বিশ্বাস করেন। প্রেমকে তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেমহীনতাই আজ সমাজে, দেশে মহা দুর্য্যোগ

আসন্ন করিয়া আনিয়াছে।

"আজ বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর ;
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙ্গাল।"

"পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না পায়,
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি,
আমাদের বেদনা।
তারা যেন সবে ভালবাসে।"

বুদ্ধদেব বসু (১)

বুদ্ধদেব বসুও এই প্রেমের কথা বলিয়াছেন। দেহগত প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক যুগের কবি হইয়াও দেহাতীত প্রেমকে অস্বীকার করেন নাই।

"শোনো, দেহ কি প্রেমের বাসা ?
বলো, দেহ কি প্রেমের ভাষা ?
দেহ ঝরে যায় কপট হাওয়ায়
তবু থাকে ভালোবাসা ?"

বুদ্ধদেব বসুও বিদ্রোহী কবি, মোহমাধুর্য্যকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন, সকল প্রকার মোহ, মাধুর্য্য, প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে আত্মাকে তুলিবার একটা প্রাণপণ প্রয়াস তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। একালে মনুষ্যত্ব অবমানিত, তাই প্রেমও সার্থক নহে। দৈনন্দিন হীনতা ক্ষুদ্রতা আজ জীবনে যেমন বড় হইয়া উঠিয়াছে, কবির সাহিত্যেও তাই।

"হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে ক্ষণে করিয়া শোষণ
কায়াহীন বুভুক্ষু অন্তরে।
অতৃপ্ত আত্মার মতো অজানিত অন্ধকার হতে
শত শত অমঙ্গল বীজ বহি আনি'
সঞ্চারিয়া দিব তব বসন্ত ভুবনে।"

কিন্তু সকল অতৃপ্ত সত্ত্বেও আধুনিক কবির কাব্যে চিরন্তন প্রেম, চির সত্য

প্রকাশ হইয়াছে। কবিতা চির সত্যের বাহন—কবিকে ঋষি বলা হয়—তাই সর্ব্বকালের কবির কথায় এক সত্যের পুনরাবৃত্তি হয়। সত্য অপরিবর্ত্তনশীল।

"মানুষের বন্দী করা পরম পাপের ক্ষমা
ভালোবাসার ভাণ্ডারেতেও নেই তো জমা।"
"যে মুহূর্ত্তে বাঁধতে তাকে চাই
আমার মলিন অভিমানের খুঁটে
সে মুহূর্ত্তে অমৃতের বস্তু হয়ে ওঠে।" (নববর্ষের জল্পনা)

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে বিদ্রোহের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। সমাজে একটা ভাঙ্গনের খেলা চলিয়াছে। এতদিন মানুষ বুকের রক্ত দিয়া যাহা কিছু গড়িয়াছে সকলই ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। মানুষে মানুষে প্রেম লুপ্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের এই ধ্বংসের মধ্যে কবি বিশ্বাসের বাণী খুঁজিয়াও পান নাই। তাঁহার চিত্তের মলিনতা ও অস্থিরতাই কাব্যরূপ লইয়াছে। দুর্বিনীত ক্ষমতাশালী আজ সমাজপতি। তাহারা মানুষকে ভুলিয়াছে, স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছে।

"এবার আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পারে
সামনে নর অস্থি সমাকুল:
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিলো আতঙ্কে মোরে
অস্তমিত বিদিশ আমি ভুল।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার খুব বেশী চোখে পড়ে। তাঁহার কাব্যে এই সকল অপ্রচলিত শব্দ সুরের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছে। এই সুরের মূলে আছে তাঁহার অনুভূতি। 'স্মরণ' কবিতায় সর্ব্বকালীন কবির চিরকালীন বেদনার অনুভূতি—প্রাপ্তির মধ্যে বিচ্ছেদের দুঃখ ব্যক্ত হইয়াছে—

"আজিকার মাধবী পূর্ণিমা
নিঃশেষে মিলায়ে যাবে বিস্মৃতির অমা-অন্ধকারে।
তোমার জগৎ হতে অনাদৃত স্মৃতি মোর পড়ে যাবে খসি'
নিশান্তের গন্ধহারা ছিন্নমালা সম!"

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মননশীলতা ও সামঞ্জস্যের অভিপ্রায় চোখে পড়ে। কিন্তু গভীর অনুভূতি এই সামঞ্জস্যবোধকে একটি সংগীতে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার কবিতায় কবি ও দার্শনিকের মিলন ঘটিয়াছে। জীবনের পরম ও চরম

সত্য তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। এই চরম সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া কবি তান্ত্রিক সাধক হইয়া উঠিয়াছেন। পৃথিবী অবিনশ্বর ইহাই ধ্রুব।

"জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া
নির্ব্বিকারে নির্ব্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী;"

সুধীন দত্তের কবিতায় সমসাময়িক যুগের প্রভাব অতি স্পষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্ব্বরতা,—সাম্প্রতিক জীবনের ব্যথা বেদনা লাঞ্ছনা কবির ভবিষ্যদ্‌ দৃষ্টিকে খুলিয়া দিয়াছে। কবি অনাগত প্রলয়কে অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি একটি পূর্ণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সে রাষ্ট্রের ভিত্তি মনুষ্যত্ববোধে, প্রেমে, কর্ত্তব্যে—কিন্তু বাস্তবের সংঘাত বারংবার তাঁহার স্বপ্ন চূর্ণ করিয়াছে।

"আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,
* * *
বুঝি উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের;
যত তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা মেতেছে গাজনে চড়কের;
* * *
ওই রসাতল যায় ত্রিভুবন;" (অর্কেষ্ট্রা)

"নৈরাশ্যের নির্ব্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
* * *
কাল পেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে তিমিরে: (উজ্জীবন)

বর্ত্তমান জীবনে যে অবসাদ দেখা দিয়াছে, তাহাকেই কাব্যরূপ দিয়াছেন

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে। তাঁহার কাব্যে এক সুনিপুণ ব্যঙ্গরূপ দেখা দিয়াছে। প্রাচীন শান্ত রোমান্টিক জীবনকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, আবার যৌবনের আত্মপীড়নকেও ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

"কৈশোরে ছিল ধর্ম্মঘটের সখ,
যৌবনে নয মাষ্টার, কেরাণীও।
বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংসসার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য সে উমেদার।
এদিকে শরীর মন হল বরণীয,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে কেউ হোক।"

মহৎকে কবি ব্যঙ্গ করিযাছেন কেননা আজিকার এই বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত জীবনে সজীবতার কোন মূল্য নাই। বিষ্ণু দের কবিতার বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গোক্তি এবং স্থানে স্থানে দুরূহতা।

"বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধস্থাবির।
জড়কবন্ধ অন্ধকর্ম্মে ফুৎকার মোর নর্ম্মাচার।
প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগিনা। মন তুষার।"

বিষ্ণু দের কবিতায বহু অপ্রচলিত ও নতুন শব্দের প্রযোগ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয। কিন্তু শক্তিশালী কবির হাতে কথা এবং সুর উভযে মিলিয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীত রচনা করিযাছে।

"সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে।
আকাশ গঙ্গা পীতপিঙ্গল বালুকারেখা।
শনির কণিকা মারক-আখরে জীবনে হানে
করোটির কালি, করকোষ্ঠিতে ছিন্নলেখা।

কবিতাটি প্রথম দৃষ্টিতে দুর্ব্বোধ্য—কিন্তু সন্ধ্যার উদাস মধুর রূপের একটি ছবি তুলির দু-একটি টানে চিত্রিত হইযাছে। তার পরেই কবি ইঙ্গিত করিযাছেন বাস্তবের রূঢ় সমস্যা রসপিপাসু মানুষকে আজ কেমন করিযা সৌন্দর্য্যের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করে।

বিষ্ণু দের কবিতায সহজ সুর অবশ্য কোথাও কোথাও পাণ্ডিত্যের কঠিন প্রস্তরে হুঁচট খাইযাছে। সেখানে তাঁহার কবিতা সত্যেন দত্তের উক্তিকে মনে পড়াইযা দেয।

"কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি মোচড় লাগাযো ভাল মতে।'

সমাজ আজ অসুস্থ—আধুনিক কবির কাব্যও তাই অনেক ক্ষেত্রে সুস্থ নহে। "বর্ত্তমান সামাজিক পটভূমিকায কাব্যাদর্শের পরিবর্ত্তন এবং অবনতি ঘটেছে বলা

চলে কিন্তু একথাও দৃঢ়ভাবে বলা প্রয়োজন কবিরা মিছে মহত্ত্বের জয়গানে ব্যস্ত থাকলেও তাঁদের ধর্ম্মচ্যুতি হতো, কেননা এযুগের মন বা একালের জীবন সম্পূর্ণভাবে তা নয়, আর বাস্তবতার অজুহাত যে শুধুই অক্ষমতার সাফাই নয় বিষ্ণু দের কাব্য তার নিঃসংশয় প্রমাণ। কেবল নতুন ভঙ্গী হিসেবে নয়, নতুন কাব্য হিসেবেই এর সার্থকতা অনস্বীকার্য্য।" (শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ)

বিষ্ণু দের কাব্যের যে দুরূহতা, যাহা তিনি কাব্যকে আধুনিকত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কাব্যকে অনেক সময়ে অকাব্য করিয়াছে। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। কাব্যের এই আদি লক্ষণটি তুচ্ছ করিলে তাহা আর কাব্য থাকে না, কতকগুলি অর্থহীন কথার ফুলঝুরি মাত্র হয়। যে কাব্য পাঠে পাঠকচিত্ত রসাশ্রিত হইয়া গলিয়া না যায়, তাহা কোন মতেই যথার্থ কাব্য হইতে পারে না। সেখানে কবির পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারই ফোটে, কাব্য সার্থক হয় না। মানবসমাজের দৈনন্দিন সুখদুঃখের বাণীমূর্ত্তি কাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই, এই পাণ্ডিত্যবিলাস কবিধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অবশ্য এই কবিধর্ম্মক্ষুণ্ণতার কারণ মানসিক অস্থিরতা। সমাজের সুস্থ দৃঢ় ভিত্তি পদতল হইতে লুপ্ত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের হীনতা, দৈন্য, শূন্যতা দেখিয়া কবির মন অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কবির রচনায় ক্ষীণকণ্ঠে নবযুগের সূর্য্যালোকের গীত শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার আলোক কবির অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য ধরা দিয়াছে।

> "তোমার জীবনে নূতন কালের সূর্য্য
> হাসি কান্নার সুস্থ আলোয় হাসছে।
> সে আলোয় প্রাণ-মুক্তি-প্রবল-তূর্য্য
> তোমার কণ্ঠ হাসিকান্নায় ভাসছে।"

সমর সেনের রচনায় আধুনিক সমাজের জীবনের সঞ্চিত ক্ষোভ ও বেদনা রূপ পাইয়াছে। মনের সূক্ষ্ম ও উচ্চ বৃত্তিগুলিকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

সমর সেন

আজিকার জীবনে প্রেম অর্থহীন, দেহই সর্ব্বস্ব। রুগ্ন অসুস্থ মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। সমর সেনের কাব্যে একটা বিষণ্ণ অসুস্থ আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

"ঘুম নেই
শুধু ক্লান্ত কান্নার উচ্ছ্বাসে কোথায় কাদের চোখে
যেন ঘুম নাই।
মৃত মানুষের ভারে ক্লান্ত।"

"মহান্ মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় নেই
বিদ্যুতের আলোয়,
তিলে তিলে মৃত্যু রুদ্ধশ্বাস, মৃত্যু আমাদের প্রাণ ;
দিকে দিকে আজ হানা দেয় বর্ব্বর নগর
আজ সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
কতো শতাব্দীর শূন্য মরুভূমি।"

জীবনানন্দ দাশ (১)

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক যুগের অতি বাস্তব কবি। তাঁহার কাব্যে কল্পনার খেলা নাই, একটা নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি সকল কিছু দেখিয়াছেন। কোন ছন্দ বা বর্ণনার বৈচিত্র্য তাঁহার রচনাকে রঙ্গীন করে নাই। তিনি ভাঙ্গনের কবি। আজিকার দিনে যে প্রচণ্ড লোভ, স্বার্থপরতা সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহার নগ্ন রূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন আজিকার মানুষ সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং শিল্পবোধকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমহীন স্বার্থের পায়ে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে। মানুষের ভবিষ্যৎ—তাহার কল্যাণবুদ্ধি, প্রেম, সকল কিছু এক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

"যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

* * *

এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাহাদের হৃদয়।"

আজিকার জীবন অতি বাস্তব—সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিগুলি লুপ্ত হইয়া মানুষ আজ অমানুষে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কবি তাহার জন্য বেদনা অনুভব করিয়াছেন কিন্তু অতি সংযত ভাষায় তাহার কথা বলিয়াছেন।

"পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহাকে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁজে বেদনা
জাগাতে ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।"

জীবনানন্দ দাশ মোটামুটি শান্তরসের কবি। আধুনিক যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃতির শান্ত সমাহিত রূপেই তাঁহার চিত্ত মগ্ন থাকিত। বর্ত্তমানের সমস্যা, নানা বিক্ষোভ ও আলোড়ন তাঁহার মনের সমতা কখনও কখনও নষ্ট করিলেও মোটামুটি তাঁহার রচনায় প্রকৃতির রূপ রসের একটি স্নিগ্ধ সহজ ছবির কথাই পাই। প্রকৃতির রূপের সঙ্গে জীবনের শাশ্বত সত্যকে তিনি মিলাইয়া লইয়াছিলেন।

"নির্জ্জন ঢেউযের কাণে মানুষের মনের পিপাসা,
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা···।"

জীবনানন্দ দাশের কবিতা দুর্জ্ঞেয় রহস্যবিমণ্ডিত। সত্যের অন্বেষণের তীব্রতার আবেগ কবিতার বহু স্থলেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

জীবনানন্দের কবিতায় একটি গভীর তৃষ্ণা ও অতৃপ্তির সুর আমরা পাই। সৌন্দর্য্যের আদর্শকে মানুষের স্থূলতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা আজ ধ্বংস করিতে উদ্যত। কবি তাই তীব্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত
—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত— (আদিম দেবতারা)

আধুনিক যুগের লালসা, কামনা, নিষ্ঠুরতা কবিচিত্তকে ব্যথিত করে, পলায়নমুখী করে। সভ্যতার সংকট আসন্ন কবি ঘোষণা করেন।

"মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।" (এই সব দিনরাত্রি)

কিন্তু কবির সত্যদৃষ্টি উপলব্ধি করিয়াছে এই তিমির নিশার অবসানে নবীন

সূর্য্যোদয় ঘটিবে। বর্ত্তমান যুগের পর মানুষের মহত্তর ও বৃহত্তর চৈতন্য জাগ্রত হইবে। সেই চৈতন্যের জাগরণ ঘটিবে প্রেমে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতায় বর্ত্তমান যুগের দৈন্য ও ক্ষুধা রূপ পাইয়াছে। এই প্রচণ্ড দৈন্যের ও অভাবের মধ্যে কবিতা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। দেহের ক্ষুধাকে মিটাইতে না পারিলে অন্তরের ক্ষুধার আহার দেওয়া সম্ভব নহে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

"পদ্যলালিত ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িতে আজ হানো।
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

সমাজে ও মনোজগতে একটা নূতন পরিবর্ত্তনের পালা চলিয়াছে, সাহিত্যেও সেই সঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আধুনিক কবির মন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, কিন্তু সমাজে ও জীবনে যেমন প্রাণধর্ম্মের অভাব, সাহিত্যেও তেমনই সার্থক ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। আধুনিক কাব্যে আঙ্গিকটাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগ ও সামাজিক পরিবেশ কোন প্রাণবান সাহিত্য রচনার অনুকূল নহে।

(খ)

সাহিত্যে কাব্য যত পূর্ব্বে আসিয়াছে, উপন্যাসের জন্ম তাহার বহু পরে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও উপন্যাসের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তাহার পূর্ব্বে উপন্যাসের একটা ধারা বা পূর্ব্বাভাস গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ উপন্যাস ইহার পূর্ব্বে কখনও আবির্ভূত হয় নাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে উপন্যাসের ক্ষীণ ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের জীবনের বাঁধাধরা পথ যখন থাকে না, নানা সমস্যা ও জটিলতা দেখা যায়, মনের গতি তখন কয়েকটিমাত্র সীমাবদ্ধ পথে গতাগতি করিতে চাহে না, তখনই কেবলমাত্র কাব্য মানুষের রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য দেশের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটিল এবং উভয় সভ্যতার সঙ্ঘর্ষ বাধিল। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন

উপন্যাসের জন্ম

এবং আলোড়ন দেখা দিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসের জমাট ঘন রসটুকু তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছিল বলা চলে, কিন্তু ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপটি তখন গঠিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। মঙ্গলের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে তাহা প্রকৃত সাহিত্য হয় না। তাঁহার উপন্যাস অনেকখানি প্রচারধর্ম্মী এবং নীতিধর্ম্মমূলক। তাঁহার উপন্যাসের ঘটনাস্রোত এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে যে সহজেই একটি নৈতিক সত্য প্রতিভাত হয। কিন্তু এই নৈতিক দৃষ্টির সহিত একটি প্রকৃত কবিমনের সংযোগ ছিল। জীবনের সকল বঞ্চনা ও বেদনাকে তিনি মূর্ত্তি দিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষে' কুন্দের মৃত্যু হইয়াছে নীতির মুখ চাহিয়া, কিন্তু সেই মৃত্যুতে কুন্দ গরীয়সী হইয়াছে। মহিমময়ী সূর্য্যমুখী তাহার মত মৃত্যু কামনা করিযাছে। কুন্দের মৃত্যু নীতির জন্য প্রয়োজন হইলেও তাহা উপন্যাসে অকস্মাৎ আসে নাই। দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হীরাই কুন্দের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। শক্তিশালী লেখক প্রতিটি ঘটনা উপন্যাসের প্রযোজনেই উপস্থিত করিযাছেন।

'সীতারামে' বঙ্কিম এই নীতিকেই বড় করিয়াছেন। সীতারামের মধ্যে রূপমোহের বীজ সুপ্ত ছিল। শ্রীর প্রতি রূপতৃষ্ণা প্রবল হইয়া সীতারামকে ক্রমেই অধঃপতনের দিকে লইযা গেছে। তথাপি এত বড় চরিত্রকে বঙ্কিম একেবারে ধ্বংস করেন নাই, গ্রন্থের শেষে পুনরায় সীতারামের মহত্ত্ব ধর্ম্মের প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রিত। বিলাতী উপন্যাসের বা ট্রাজেডির প্রভাব সেখানে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন ও নগেন্দ্র-কুন্দের সাক্ষাৎ এই দৈবকে নির্দ্দেশ করে। 'সীতারামে'ও শ্রী সীতারামের নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছিল দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে ভ্রাতার প্রাণহন্ত্রী হইয়াছে। সীতারামের সহিত শ্রীর বিচ্ছেদও উপন্যাসের ঘটনা এবং সীতারামের অধঃপতনের জন্য দায়ী।

বঙ্কিমের উপন্যাসে স্বার্থগন্ধহান প্রেমই প্রধান হইয়াছে। এ প্রেম কবির ভাষায় "যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে" তাহা নহে। নগেন্দ্র

সূর্য্যমুখীর গভীর প্রেমকে ত্যাগ করিয়া কুন্দের রূপে মত্ত হইলেন। আবার সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কুন্দ বিষ হইল। শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্যমুখীই জয়ী হইয়াছে।

'কপালকুণ্ডলা'য় পদ্মাবতীর নবকুমারের প্রতি উদ্বেলিত প্রেমতরঙ্গ আপনার হৃদয়রাজ্যের তটদেশে রুদ্ধ আক্ষেপে মাথা কুটিয়া মরিয়াছে। কেননা এ প্রেম কামনার মৈনাক-পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে জন্মিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে দূরে সরাইবার জন্য সে যে ষড়যন্ত্র করিল, তাহার ফলে নবকুমারও হারাইয়া গেল।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া উন্মত্ত হইলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল অধঃপতনের চরম সীমায়, নরকের দ্বারে পৌঁছাইয়া আত্মস্থ হইলেন। ভ্রমর তখন প্রাণের অধিক হইল। সেই ভ্রমর মৃত্যুর মধ্য দিয়া প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেল।

'সীতারামে'ও সেই কাম ও প্রেমের কথা। শ্রীর প্রতি কামনা তাঁহাকে ধ্বংস করিল। 'চন্দ্রশেখরে' ত কথাই নাই। কামোন্মত্তা শৈবলিনী ও প্রেমিক প্রতাপ, প্রেমমুগ্ধা দলনী, প্রত্যেকের জীবনই এই ধ্রুব নীতিকে স্বীকার করিয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাস অনেকখানি রোমান্টিকধর্ম্মী। বাঙ্গালা গদ্যে রসসঞ্চার এবং রোমান্টিক উপন্যাস সৃষ্টি বঙ্কিমের প্রধান কৃতিত্ব। রোমান্সের প্রবর্ত্তনা করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রসচেতনা আনিয়াছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি ও রোমান্টিকতার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে একটা অসাধারণত্ব আছে। আবাল্য সে কাপালিকের নিকট মানুষ। কাপালিকের ধর্ম্মসাধনা, বিজন সমুদ্রতীর ও অরণ্য তাহার চরিত্রে গভীর প্রভাব আঁকিয়া রাখিয়াছে। সাংসারিক জীবনে সে স্থিতিলাভ করিতে পারে নাই এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য।

'চন্দ্রশেখর'ও রোমান্স, মুখ্যতঃ মনস্তত্ত্বমূলক। শৈবলিনীর পাপ অভিসন্ধি এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই রোমান্সের প্রধান অঙ্গ। 'মৃণালিনী'তে মনোরমার চরিত্রটি যেমন জটিল তেমনি রহস্যময়। 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনখানি দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস। 'আনন্দমঠে' সন্তানদল গঠন এবং তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ, 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের সামান্য গৃহস্থবধূ হইতে রাণী এবং পুনরায় গৃহস্থবধূ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ, সকলই রোমান্টিক ধর্ম্মের ফল। 'সীতারামে' শ্রীর চরিত্র রোমান্টিক হইতে গিয়া অনেকখানি অবাস্তব

হইয়া পড়িয়াছে। পতিগতপ্রাণা শ্রী অকস্মাৎ নিষ্কামধর্ম্মের সাধিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা উপন্যাস সাহিত্যে যুগান্তর আনিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্গালা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্সের ঘোর কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার প্রবর্ত্তন করিলেন। তথাপি তাঁহার 'নৌকাডুবি' উপন্যাস এই রোমান্সের স্পর্শ পাইয়াছে। রমেশ ও কমলার সংযোগ ও নলিনাক্ষ-কমলার মিলন উপন্যাসে রোমান্সের হাওয়া বহাইয়াছে। এখানেও হেমনলিনীর প্রেমই জয়ী হইয়াছে। আধুনিক লেখকদের মত রমেশ ও কমলার সম্পর্ককে কুৎসিত ও জটিল করিয়া তিনি উপন্যাসের মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই। কমলার যুগান্তরের সংস্কারাবদ্ধ নারীচিত্ত মুহূর্ত্তমধ্যে রমেশের দিক হইতে ফিরিয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। হেমনলিনীর প্রেমও নানা দুর্ব্বিপাকে এবং সন্দেহের দোলার মধ্যেও অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রেমের স্থির দীপশিখাটি কম্পিত হয় নাই। এই একনিষ্ঠ, সংযত প্রেম অবশেষে জয়ী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

'চোখের বালি' উপন্যাসেও এই প্রেমের কথা। আশা-মহেন্দ্রের অসংযত কামনার ভিত্তির উপর প্রেমের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাই তাহা দাম্পত্য প্রেম হইলেও অসংযত। বিনোদিনীর উদগ্র কামনার নিঃশ্বাসে প্রেমের দীপটি নিবু নিবু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিহারীর স্থির সংযত চরিত্র; তাহার সংস্পর্শে আসিয়া পরিবর্ত্তিতা বিনোদিনীই মহেন্দ্রকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রেমের মঙ্গল দীপটি জ্বলিয়াছে। বিনোদিনী প্রেমকে চিনিতে শিখিয়াছে, তাই সতত ত্যাগের পুটপাকে নিজেকে দহন করিয়া শুদ্ধ হইতে চাহিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর পুত্রবাৎসল্য স্বার্থপরায়ণ ছিল, তাই মহেন্দ্রকে তাহা ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। বিনোদিনীর চরিত্রও অনেকটা রোমান্টিক ভাবানুগ। বিনোদিনীর চরিত্রের পরিবর্ত্তন, উদ্বেলিত কামনার শিখা গৃহের মঙ্গল দীপে পরিণত হওয়া, অনেকটা রোমান্টিক উপন্যাসের ধর্ম্ম পাইয়াছে।

'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে খাঁটি বাস্তবতার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছে বলিতে পারা যায়। অতি আধুনিক উপন্যাসের এইখানেই সূত্রপাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা মানুষের মনোজগৎ অনেকখানি প্রাধান্য পাইয়াছে। বিনোদিনী বিধবা, কিন্তু তাহার প্রেমকে ঘৃণিত বর্ণনা না করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার মূল্য স্বীকার করিয়াছেন।

'গোরা' উপন্যাস অনেকখানি তর্কমূলক এবং বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস। ফলে অধিকাংশ চরিত্রই জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। আচার নিয়ম অনেকখানি বাহিরের বস্তু, দেশানুরাগ ও ধর্ম্মের খুঁটিনাটি নিয়ম পালনের সঙ্গে তাহার কোন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। অবিরাম এই সকল শুষ্ক আচার বিচার পালন করিতে করিতে গোরার সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলি বহু পরিমাণে শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, সে একটা জীবন্ত তর্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার জন্মকাহিনী প্রমাণ করিয়া দিল তাহার পক্ষে এ সকলই মিথ্যা, সে ভারতবাসী নহে। সে মুক্তি পাইয়াছে এবং সুচরিতার প্রেমকে গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হইয়াছে।

সুচরিতার শান্ত নম্র চরিত্র, তাহার সংযত প্রেম এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা উপন্যাসে একটি শান্ত রস সৃষ্টি করিয়াছে। ললিতার বিদ্রোহী তীব্র প্রেম সকল বাধাকে অপসারিত করিয়াছে এবং বিনয়কেও সার্থক করিয়াছে।

'গোরা'র পর হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটি বড় রকম পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। 'গোরা'র পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে বুদ্ধির ঝলকানি, সাঙ্কেতিকতা এবং রহস্যময়তা স্থান পাইয়াছে। শচীশ-দামিনী, অমিত-লাবণ্য, বিমলা-সন্দীপ প্রভৃতি যেন রোমান্টিক জগতের অধিবাসী। অবশ্য এ রোমান্স বাহিরের জগতের ঘটনাবলী হইতে আরোপিত হয় নাই, ইহা মস্তিষ্কের বুদ্ধিকোষ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। তথ্যবিচার ও স্থূল ঘটনা সন্নিবেশের পরিবর্তে যেন কাব্যের বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায়।

'চতুরঙ্গ' বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস। শচীশ ও দামিনীর চরিত্রে একটা রোমান্টিক পরিবেশ আছে। দামিনীর রূপের নেশা শচীশকে অরূপের সাধনায় প্রবৃত্ত করাইল। রূপমোহকে জয় করিয়া সে সেই অরূপ সাধনায় ডুব দিয়াছে। দামিনী বরাবরই বিদ্রোহিনী; ভক্তির ধার সে ধারিত না। কিন্তু শচীশের প্রতি আকর্ষণ তাহার প্রবল হইয়াছে। শচীশের প্রত্যাখ্যান তাহাকে আঘাত করিল এবং সে শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিল। কিন্তু শচীশকে গভীরতর সত্তার মধ্যে সে লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীবিলাসকে দামিনী কোনদিনই শচীশের চেয়ে বড় মনে করে নাই। তাই অগত্যা আশ্রয়ের প্রয়োজনে শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিলেও শচীশ তখনও তাহার ধ্যানের বস্তু হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পর সে শ্রীবিলাসের পরিচয় পাইল। তাহার প্রেমভিক্ষু হৃদয় এতখানি সম্মান আর কোথাও পায় নাই—না স্বামী, না শচীশ। তাই মরার আগে শ্রীবিলাসের পদধূলি লইয়া শেষকথাটি বলিল, "যেন জন্মান্তরে আবার

তোমাকেই পাই।" এই বিদ্রোহিনী নারীর অন্তরে একটি ভক্তিমতী স্নেহময়ী কল্যাণী রমণী ছিল।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। স্বদেশী আন্দোলনের যে ঢেউ বাঙ্গালা দেশের ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছিল তাহারই অভিঘাত এই উপন্যাসে আসিয়া পড়িয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালাদেশে তখন স্বদেশপ্রীতির এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে এমনই সময়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দেশোত্তর মানবধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এক উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের মধ্যে এক বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এমন কয়েকটি লোক সমাজে দেখা দিয়াছিল, যাহারা নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত নিতান্ত স্বার্থলোলুপ ব্যক্তি। সন্দীপ তাহাদেরই একজন। ইহারা ভোগকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া জানে, অন্যের কামনায় ইন্ধন যোগায়, নৈতিক সংস্কারকে তুচ্ছ ঘোষণা করে এবং কাপুরুষতা বলে। এই জাতীয় চরিত্র অবশ্য আধুনিক সাহিত্যে চোখে পড়ে।

আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেকখানি গতানুগতিক এবং নিয়মবদ্ধ। অনেক সময় এই সম্পর্ক প্রথাগত হইয়া থাকে। স্ত্রী স্বামীর বশ্য, এই নিয়মই চলিয়া থাকে। পারস্পরিক সহজ সম্পর্কটি লুপ্ত হইয়া যায়, প্রেমবস্তুটি চতুর্দ্দিকের বিধিনিষেধ এবং বশ্যতাস্বীকারেই সমাপ্ত হইয়া যায়। নিখিলেশ এই নিয়মে তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার রোমান্টিক মন বহির্জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এই প্রেমকে যাচাই করিতে চাহিয়াছে। এমনই সময়ে দুর্নিবার ঝড়ের মত বাহির হইতে সন্দীপ তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাণ্ডব বাধাইয়াছে। বিমলার চিত্তকে সে কথার আগুনে জ্বালাইয়াছে এবং তাহার মনে একটা রঙীন আলোর ফুলঝুরি সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রন্থের মাঝামাঝি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিমলা যেন আপনার স্বপ্নাবেশে মশগুল, কোন্ নীল আকাশে নীলাঞ্জন চোখে মাখিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেশের কাজের নামে সে একটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়াছে। তাহার এই রোমান্টিকতার ফানুসকে সাংসারিক পরিবেশ ধাক্কা দিয়াছে। সন্দীপের কামনা-লোলুপ মূর্ত্তিও তাহাকে রোমান্টিক আকাশ হইতে কঠিন মৃত্তিকায় নামাইয়াছে। শেষকালে অমূল্যর প্রতি স্নেহ তাহাকে পুনরায় স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছে। দেওয়া-নেওয়ার উপরই প্রেমের সার্থকতা। অপর্য্যাপ্ত প্রাপ্তি বিমলার প্রণয়-জীবনের ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তাই ঝড়ের

ধাক্কায় সহজেই তাহা টলিয়া পড়িয়াছিল।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর চরিত্র অনেকটা যেন কল্পনাজগতের বাসিন্দা হইয়াছে। রোমান্সের ঘোর অনেকখানি তাহার চক্ষে লাগিয়া আছে। সংসার সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞা। কুমুদিনীর নিকট প্রেম ছিল এক দুর্লভ বস্তু। প্রেমিক তাহার কাছে ভগবানের স্বরূপ, পরিপূর্ণভাবে সে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে। সেইজন্য বিপ্রদাসের সতর্কতা সত্ত্বেও সে নির্ব্বিচারে কেবলমাত্র হৃদয়ের অন্ধ আবেগে মধুসূদনকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার এই বরণ, প্রেমিকের উদ্দেশ্যে যাত্রার মূলে শ্রীরাধার প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল। কুমু কল্পনাজগতের অধিবাসিনী। পদাবলীর রসে মগ্ন হইয়া নিজেকেও সেই জাতীয়া কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের সহিত বিবাহের পর তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি মধুসূদনের প্রচণ্ড দাবীর নিকট নিষ্পেষিত হইয়াছে। প্রেম ঝরিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র দাবীর মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। সূক্ষ্মহৃদয়-বৃত্তিসম্পন্না কুমু এই দাবীকে পাশবিক অত্যাচার বলিয়া মনে করিয়াছে এবং অসহযোগ করিয়াছে। মধুসূদনের অন্তর্জগতেও একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। সে কুমুর নিকটে অবশেষে নতি স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু কুমু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিলেও সে ইহাকে স্বীকার করিতে পারে নাই। কুমুদিনীর বিতৃষ্ণা মধুসূদনের চরিত্রের সুপ্ত আত্মসম্মান ও প্রভুত্বগৌরবকে জাগাইয়া দিল। সে শ্যামার প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কুমুকেও শেষ প[illegible] সন্তানের দায়ে মধুসূদনের নিকট ফিরিতে হইয়াছে। কুমুদিনীর "সৌন্দর্য্য বাহির অপেক্ষা অন্তরেই বেশী; তাহার সৌকুমার্য্য, তাহার গভীর ভক্তি ও বিশ্বাসপ্রবণতা, তাহার বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত, আত্মজিজ্ঞাসাশীল ধ্যানময়তা তাহার চারিদিকে একটা অধ্যাত্ম জ্যোতির্ম্মণ্ডল রচনা করিয়াছে। সে যেন কাব্যের নায়িকার মত শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি; তাহার মধ্যে উপন্যাসোচিত ব্যক্তিত্বদ্যোতক গুণের তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না। উপন্যাসের বাস্তব, বিরোধ-কণ্টকিত জগৎ তাহার পরীক্ষাক্ষেত্র, কিন্তু কাব্যের অপরূপ সুষমামণ্ডিত কল্পলোকই তাহার স্থান।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

'শেষের কবিতা' কবিত্বমণ্ডিত উপন্যাস। আমাদের বাস্তবজীবনে প্রেমকে অতি ব্যবহারে আমরা তাহার বৈচিত্র্য ও নবীনত্ব নষ্ট করিয়া ফেলি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমেই গতানুগতিক হইয়া পড়ে। বিবাহে অনেক প্রেমেরই সমাধি ঘটে। তাহা তখন কেবল কর্ত্তব্যপালন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই

প্রেম কবির ভাষায় "হাত যেমন হাতকড়াকে পায়"। অমিত ও লাবণ্যের প্রেমকাহিনী এক বিচিত্র জগৎ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। অমিতের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ ও প্রবল প্রাণশক্তি লাবণ্যকে শুষ্ক পাঠজীবন হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাহার বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরকে প্রেমের রঙীন আভায় রাঙা করিয়াছে।

শোভনলালের প্রেমকে সে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু অমিতের প্রেমের মুখরতা এবং কেটির হৃদয়রহস্য উন্মোচন তাহার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিযাছে। অমিত রোমান্সের পরমহংস। সেই কারণে লাবণ্যের সন্দেহ হইয়াছে বিবাহের পর অমিত তাহার প্রেম লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার প্রেম চল্‌তি, তাহা অন্তঃপুরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। অমিতের প্রেমের আলোয় সে শোভনলালের প্রেমের মূল্য বুঝিযাছে এবং এই সুদীর্ঘ-প্রত্যাশী প্রেমিককে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। তারপর কেতকীর কথা—অমিত মুহূর্ত্তের ভাল লাগায় কেতকীকে আংটি পরাইযাছিল। অমিতের নিকট তাহার কোন মূল্য ছিল না, কিন্তু কেতকী সেই মুহূর্ত্তটিকে তাহার জীবনে অনন্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। অমিতের অবহেলায তাহার দেহে মনে বিকৃতি আসিয়াছে। কিন্তু তাহার ফ্যাশনদুরস্ত মূর্ত্তির অন্তরালে একটি প্রেমমুগ্ধা রমণী বাস করিত। লাবণ্যের সহিত প্রেমের প্রতিযোগিতায পরাজয় ঘটিলে চোখের জলের ভিতব সেই প্রেমময়ীর আবির্ভাব হইল। লাবণ্যও তাহার অন্তরের পরিচয় পাইল। অমিতও যে সে পরিচয় পায় নাই তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নহে, বরং সাহিত্যের গতিপথে তাঁহার আগমন অত্যন্ত সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নিষিদ্ধ প্রেমের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' ও 'চতুরঙ্গে' উহাই সম্প্রসারণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিষিদ্ধ প্রেমের জয়গান করেন নাই, রবীন্দ্রনাথও ইহাকে বড় বলেন নাই। সংসার ও সমাজে যাহা মঙ্গল আনে, তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে "কুমারসম্ভব" সমালোচনাকালে তিনি বিবাহের প্রয়োজনিয়তা ও আদর্শ উল্লেখ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাস জগতে নিষিদ্ধ প্রেমের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন বলিয়া যে চীৎকার চতুর্দ্দিকে শোনা যায় তাহা কিন্তু সত্য বলিয়া মনে হয় না। সংসারে নিষিদ্ধ প্রেম ঘটে এবং তাহা ঘটিলেই

ঘৃণার বস্তু নহে। কিন্তু সে প্রেমকে বাহবা তিনি কোথাও দেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই, এমনকি স্বয়ং শরৎচন্দ্র, তাঁহাকে নীতিবাগীশ বলিয়াছেন। কিন্তু শৈবলিনী ও কুন্দের কারুণ্য বঙ্কিমের হৃদযকে স্পর্শ করিয়াছিল। শৈবলিনীর চিত্ত হইতে প্রতাপ অপসারিত হইযাছে, ইহা লেখক বুঝাইলেও আমরা শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারি নাই। প্রতাপের জীবনের শেষে আজীবনের সুপ্ত প্রেম মর্ম্ম ভেদিয়া বাহির হইযাছে। কুন্দ পতিপরায়ণা নারীর মতই সসম্মান মৃত্যু লাভ করিযাছে। একমাত্র রোহিণীর ও হীরার ভযাবহ পরিণামের জন্য দায়ী তাহাদের অন্তরস্থ পাপাগ্নি। লেখক সেই জন্যই তাহাদের দগ্ধ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও মানুষের হৃদযের দুর্ব্বল দিকের প্রতি সমবেদনা আছে, কিন্তু সমর্থন নাই। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্নদাদিদির চরিত্র যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঞ্চার করিযাছে, তাহা বৈধ প্রেমেরই জয়-জযকার। রাজলক্ষ্মী পরিপূর্ণ ভালবাসা লইয়াও শ্রীকান্তের নিকট অগ্রসর হইতে পারে নাই। নিষিদ্ধ প্রেম সেখানে সমাজের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয নাই। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী উচ্চতর প্রেমের সাধিকা, তাই সে সহজেই সরিযা আসিয়াছে। সতীশের সহিত সরোজিনীর জীবনকে এক সূত্রে বাঁধিযা সতীশের জীবনকে নিরর্থক হইতে দেয নাই। কিন্তু কিরণমযীর ব্যর্থ প্রেমের জ্বালাকর ইতিহাস তাহাকে শীতল স্নিগ্ধ পানীয়ের সন্ধান দেয় নাই, শেষ পর্য্যন্ত আপনার অন্তরস্থ কামনার দায়ে জ্বলিযা পুড়িযা সে নিঃশেষ হইয়াছে। 'গৃহদাহে'র অচলা প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইযাছে, তাহার জীবন মরুময হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিযা সমাজ মৃণালের মত যে সকল গৃহলক্ষ্মীর জন্ম দিযাছে, তাহারই হাত ধরিয়া লেখক তাহাকে পুনরায় স্বামীগৃহে ফিরাইযা আনিয়াছেন। 'শেষের পরিচয়' গ্রন্থে সবিতা মুহূর্ত্তের উত্তেজনায স্বামীগৃহ ত্যাগ করিযাছে, তারপর সারাজীবন ধরিযা সেই ভুলের প্রাযশ্চিত্ত মর্ম্মে মর্ম্মে করিয়াছে। একমাত্র কন্যা মাকে কোনদিন আপনার বলিযা স্বীকার করিতে পারে নাই। অবশেষে রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দরিদ্র স্বামীর দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র

'শেষপ্রশ্নে'র কথা অনেকে তুলিবেন, কেননা কমলের মুখে বর্ত্তমান জীবনের বহু সমস্যা ও প্রশ্ন তিনি দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দী এক বিরাট জিজ্ঞাসার যুগ। নির্ব্বিচারে মানুষ কোন কিছুই বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে'

পুরাপুরি উপন্যাসধর্ম্ম বজায় নাই। এখানে তত্ত্বপ্রিয়তার দিক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়া কলাকৌশলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়াছে। 'শেষপ্রশ্ন'কে তর্কমূলক উপন্যাস বলা চলে। কেবল ঘটনাবিন্যাস বা পাত্রপাত্রীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কোন উপন্যাসের প্রাণ হইতে পারে না। কমলের মতবাদ উপন্যাসের সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং তাহা কাহিনীর উপন্যাস-ধর্ম্মকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কমলের মতবাদ বুদ্ধিবৃত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ; তাহার মতবাদ জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে। 'শেষপ্রশ্নে' জীবনীরসের অভাব ঘটায় তাহা উপন্যাস হইবার পথে বাধা ঘটাইয়াছে। 'শেষপ্রশ্নে' জীবনকে ছাড়াইয়া তাহার উপর মতবাদ স্থান পাইয়াছে। নানা প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কমলের মতবাদ পূর্ণতা লাভ করে নাই। চরিত্রের যে পরিপূর্ণতা তাহা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে পাওয়া যায় না। এখানে কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন চিত্তবিক্ষেপ নাই। 'শেষপ্রশ্নে'র সমালোচনা করিতে গিয়া মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন—"কমল চরিত্র সেই জীবন রহস্যের বিরুদ্ধে বিধাতার চির-চমৎকার কবি-কল্পনার বিরুদ্ধে একজন চিন্তা-ভিমানী মানুষের বিকট দন্তবিকাশ বলিয়া মনে হয়।···কমল সমস্ত নীতিবিধান ও সমাজবিধানকে অস্বীকার করিয়া যে নীতিহীনতার আস্ফালন করে তাহা সামাজিক সত্য নয় বলিয়াই এবং সমাজও মূলে প্রকৃতির তাড়নার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া, তার সেই চমকপ্রদ মিথ্যা উক্তিগুলি শরৎচন্দ্রের চিন্তাবিলাস মাত্র ; সেই উক্তিগুলিকে যে চরিত্রের দ্বারা তিনি বাঁধিয়া দিয়াছেন সে চরিত্রটি কতকগুলি বাক্য-স্ফুলিঙ্গের আতসবাজী। কোনও সংস্কার মানে না, সত্যেরও সংস্কার নয় ; কোনও কিছুকে ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া থাকিতে সে রাজী নয়। কিন্তু এ ত মানুষের সম্মতি অসম্মতির কথা নয়—প্রকৃতি চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে যে একটা কিছু মানাইবে ; তাহার রক্তমাংসের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের নিয়ম কাজ করিতেছে—তর্ক করিয়া সে হারাইবে কাহাকে ? শরৎচন্দ্রের কল্পনায় কমল যে কৃত্রিম জীবনযাত্রা করিতেছে—সংসারে সেরূপ জীবনযাত্রা অচল।"

সমাজ উৎপীড়ন এবং হৃদয়হীন আচারের নামে অত্যাচারকে শরৎচন্দ্র উদঘাটিত করিয়াছেন। মানুষের হৃদয়কে তিনি মূল্য দিয়াছেন। তাঁহার রচনায় মানুষের দুঃখবেদনার ইতিহাস আছে। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাস্তব দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ নহে, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার চরিত্রগুলিকে আদর্শবাদী করিয়াছে।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসও অনেকখানি রোমান্টিক দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাস বুদ্ধিপ্রধান না হইয়া অনেকখানি ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ হইয়াছে।

মস্তিষ্কে তাহার আবেদন না হইয়া হৃদয়ে তাহারা কম্পন জাগায়। তাঁহার উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের জোয়ারভাঁটা উপন্যাসের ঘটনাবলীকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট প্রধান প্রধান নারীচরিত্রগুলি সমজাতীয়া বলিয়াই মনে হয়। 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণী, 'মা'তে ব্রজরাণী, 'চক্রে' কৃষ্ণা এবং উর্ম্মিলা, 'পথহারা'য় উৎপলা, 'মহানিশা'য় অপর্ণা, 'গরীবের মেয়ে'তে নীলিমা, 'উত্তরায়ণে' স্বর্ণলতা ও আরতি, 'পথের সাথী'তে কবি, 'পূর্ব্বাপরে' বিদ্যুৎ ও সর্ব্বাণী, 'জোয়ার ভাঁটা'য় পঙ্কজিনী প্রভৃতি সকলেই সমান জেদী, অভিমানিনী, কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাশীলা। এদের জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহাদের অন্তঃস্থ প্রকৃতি। দুর্ব্বার হৃদয়াবেগের স্রোতে ইহারা নিজেরা ভাসমান হইয়াছে। প্রচণ্ডবেগশালিনী তীব্র-স্রোতা পার্ব্বত্য নদীর মতই যেদিকে যখন চল পাইয়াছে তখনই উদ্দাম বেগে ছুটিয়াছে। শচীকান্ত, অজয়, বিনয়, বিমলেন্দু, শুভেন্দু পুরুষ হইয়াও ইহাদের স্বগোত্র। তবে সাধারণতঃ পুরুষচরিত্রগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে সংযত ও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। তাহারা সহস্র ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে অটল, অচল। অম্বরনাথ, অরবিন্দ, মণীন্দ্র, রামদুলাল, সুরঞ্জন, নির্ম্মল, সলিল প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। এ যেন শিবশক্তির সমন্বয় ঘটিয়াছে। পুরুষ অচঞ্চল শিব, প্রকৃতি চঞ্চলা মহাশক্তি। আবার ধৈর্য্যস্বরূপিণী ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার মাতৃমূর্ত্তি নারীচরিত্র কয়েকটি পাওয়া যায়। যেমন—বাণীর মা, মনোরমা, ধারা, স্বর্ণলতা, ইন্দ্রাণী। প্রেম অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য বস্তু। প্রেমের দ্বন্দ্ব সংঘাত, ক্ষুদ্রবৃহৎ বীচিবিক্ষোভ অতি সুনিপুণ তুলিতে চিত্রিত হইয়াছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন ধরণের দৃষ্টি ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনায় বাঙ্গালা দেশের গোপন রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রোমান্টিক দৃষ্টি লইয়া দুই লেখকই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ রোমান্স বর্ণোজ্জ্বল আকাশ-কুসুম মাত্র নহে, ইহা অন্তরের রসাভিব্যক্তিরই পরিচয়। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মাটির মিষ্ট গন্ধটুকু ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।

তারাশঙ্করের প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল ছোটঘরের ছেলে, তাহার রক্তে অনার্য্য ডোমের আদিম প্রবৃত্তি, হিংস্রতা, পাশবিকতা সকলই তীব্রভাবে প্রকাশিত

হইয়াছে। প্রাণের স্বাভাবিক নিয়মে সে চালিত হয়। কিন্তু সকল বীভৎসতা সত্ত্বেও তাহার উপর আর এক জগতের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সকল অশুচিতা সত্ত্বেও এক উচ্চ ভাবলোকের আলো তাহার চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়াছে—সে বস্তুটি প্রেম। দেহের ক্ষুধা লুপ্ত হইয়াছে—দেহের পিপাসা প্রাণের পিপাসায় পরিণত হইয়াছে এই প্রেমের আলোকে। সে কবি, সত্য সুন্দরের পূজারী—তাহার অন্তরস্থিত দেবতাই তাহাকে প্রেমের স্পর্শ দিয়া অতলান্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই প্রেমের স্পর্শে বসনের কয়লা-হৃদয় পুড়িয়া হীরা হইয়াছে। আপনার জীবন দিয়া সে সেই প্রেমের আগুনে আহুতি হইয়াছে। "ঠাকুরঝি ও নিতাইয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি একটি মধুর অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগের রহস্যমণ্ডিত; প্রেমিকের কল্পনায় তাহার চলমান মূর্ত্তিটি যে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের রূপক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাই এই সম্বন্ধের কাব্যমাধুর্য্যের দ্যোতক।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের উপন্যাসে আধুনিক জীবনের সমস্যা অপেক্ষা প্রাচীন সমাজের ধ্বংসমুখী পরিবেশই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' সমাজবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, দুর্নীতি ও স্বার্থলোলুপতা সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভাঙ্গনের ইতিহাস তারাশঙ্করের উপন্যাসে সুস্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন সমাজ মানুষের হৃদয়ের দিকে তাকায় নাই, কেবলমাত্র লৌকিক সংস্কারকেই প্রধান করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাণধর্ম্মের অভাবে তাহার গ্রহণশক্তি নিঃশেষ হইয়াছে এবং সে অন্তর্জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ন্যায়রত্ন দেশ ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার পৌত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। চাষী গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়া মজুরে পরিণত হইয়াছে, চাষ ছাড়িয়া কারখানায় যোগ দিয়াছে। উৎসাহ উদ্দীপনা নাই—মুমূর্ষু জাতি আদর্শভ্রষ্ট হইয়া দিগ্বিদিক ছুটিতেছে। বিমূঢ়, আশাহীন, পথহীন, সমাজ নূতন আশার বাণী চাহিতেছে, নূতন পথের হদিশ খুঁজিতেছে।

'মন্বন্তর' উপন্যাসও সমাজের ভয়াবহ ভাঙ্গনের চিত্র। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, ব্যাধি, রাজনৈতিক আন্দোলন জনচিত্তকে বিপুলভাবে আলোড়িত করিয়াছে। মৃত্যুভয়, দানবীয় ধ্বংস এবং নীতিহীন চরম উচ্ছৃঙ্খলতা—মনুষ্য সমাজের ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সুখময় চক্রবর্ত্তীর ব্যাধিজীর্ণ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, মানসিক রোগগ্রস্ত পরিবারের বর্ণনায় প্রাচীন অভিজাত সমাজ-

ব্যবস্থার ধ্বংসমুখানতাই বর্ণিত হইযাছে। কিন্তু সকল কিছু ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা বীভৎসতা ও গ্লানির উর্দ্ধে দীপ্যমান হইযাছে কানাই ও নীলার চরিত্র। জীবনের সকল তুচ্ছতাকে ঠেলিযা ফেলিযা উন্নত মহান জীবনের একটা আদর্শ উভযের চিত্তে ভাসিযা উঠিযাছে। এই আদর্শ সাম্যের উপরই উহাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত।

'কালিন্দী' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বাবু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস এবং নূতন বাণিজ্যিক সমাজের সংগঠনের চিত্র আঁকিযাছেন। মানুষে মানুষে হিংসা হানাহানি সকল কিছুর মূলেই থাকে প্রচণ্ড লোভ। চরের একটুকরা নূতন জমি লইযা দুই জমিদার বংশ ধ্বংস হইযা গেল। ইন্দ্র রায চরকে ফাঁকি দিযা নিবার মতলব করিলেন। ননী পালকে নিযুক্ত করিলেন চক্রবর্ত্তীদের অপমান করিবার জন্য। কিন্তু সে অপমান তাঁহার গাযেই ফিরিযা আসিযা বাজিল। রায বলিলেন, "লজ্জার বোঝা—শুধু লজ্জার বোঝা নয হেম, এ আমার অপরাধের বোঝা—মাথায নিযে মাথা আমি তুলতে পারছি না। * * * আমিই নিযুক্ত করেছিলাম ননী পালকে। * * * ননীকে আমি বলেছিলাম চক্রবর্ত্তীদের যদি প্রকাশ্যভাবে অপমান করতে পারিস তবে তোকে আমি বকশিশ দেব। ননী অপমান করলে রাধারাণীর—আমার সহোদরার।" মানুষকে আঘাত করিলে সে আঘাত নিজের বুকেই লাগে।

সুনীতির বুকে সারা বিশ্বের জন্য মমতা ভরা। তাঁহারই পুত্র মহীন হত্যা করিযাছে ননী পালকে, অথচ ননী পালের জন্য তিনি ব্যাকুল হইযা অশ্রুপাত করিযাছেন। নবীন চাষী দাঙ্গায ধরা পড়িযাছে, নিহত ও আহত যাহারা হইযাছে সবার জন্য তাঁহার অশ্রু ঝরিযা পড়িযাছে। নিজের উন্মত্ত স্বামীকে পরম শ্রদ্ধা ও স্নেহের সহিত সেবা করিযাছেন। অহীনের মানসিক চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করিযাছিলেন, কিন্তু সে মানুষের দুঃখ দূর করার ব্রত লইযাছে জানিযাও তাহাকে নিষেধ করেন নাই। কালিন্দীর চর বারংবার তাঁহার মনে সর্ব্বনাশের ছাযা ফেলিযাছে। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আশঙ্কা সত্য হইযাছে।

রামেশ্বরের পাপের প্রাযশ্চিত্ত পূর্ণ হইযাছে। স্বযং চরিত্রহীন হইযা রাধারাণীর অন্তরপীড়ার কারণ হইযাছিলেন। সন্দেহের বিষ অবশেষে পুত্রহত্যা ও স্ত্রীহত্যায তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইল। কিন্তু এই ভীষণ পাপে এবং রাধারাণীর অভিশাপে তাঁহার চিত্তজগতে একটা ওলট পালট ঘটিযা গেল। উন্মত্ততা তাঁহাকে অধিকার করিল, সারা জীবন তিনি জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

পুত্রদের পরিণামে তাঁহার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

মানুষের লোভ ও হিংসা চরের বুকে অসংখ্য হত্যা ও পাপের সৃষ্টি করিয়াছে। সাঁওতালরা ভূমিহীন হইয়াছে। বিমলবাবু কল বসাইয়াছেন। সারীর নিশ্চিন্ত গৃহজীবন ধ্বংস হইয়াছে। অবশেষে রায়হাটের জমিদার বংশ ধ্বংস হইয়াছে। এই দুর্ব্বার লোভ, প্রেমহীনতা অহীন্দ্রের চিত্তকে নাড়া দিয়াছে। সে মানুষের দুঃখ দূর করার ব্রত গ্রহণ করিয়া কঠিন রুক্ষ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

'আরোগ্য নিকেতন' তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা চলে। বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক যুগধারার সহিত এই কাহিনী যেমন তাল রাখিয়া চলিয়াছে—তেমনই অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের ধ্যানগভীরতার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক কালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে, করাল ব্যাধির প্রতিকার বাহির হইযাছে, কিন্তু তাহার সহিত আসিয়াছে প্রদ্যোত ডাক্তারের মত আধুনিক শিক্ষাভিমানী তরুণের দল। ইহারা প্রাচীন ভারতকে জানিতে চায় না, দেশের চিত্তশতদল বিকশিত করিবার গুপ্ত রহস্যটুকু জানে না—কিশোরের ভাষায—"এরা মানুষকে ভালবাসে না, তাই মানুষও এদের বিশ্বাস করিতে পারে না।"

জীবন মশায় পিতৃপিতামহের জ্ঞান বিশ্বাস, রক্ত ও সংস্কার বলে কেবল নয়, ধ্যানযোগে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চিকিৎসাবিদ্যা বা নাড়ীবিদ্যার সঙ্গে যোগ ছিল শুদ্ধ ধ্যানজ্ঞান—সেই পরম আনন্দময়ের স্পর্শ লাভ করিলে তবেই সেই সূক্ষ্মজ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে প্রবেশ করিত, সুতরাং তাহা নির্ভুল হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যাকে তিনি বারে বারে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন মহাশয়ের বংশ—মহান আশ্রয় যাঁহারা। দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট গ্রামবাসীর তিনি ছিলেন পরম বন্ধুস্বরূপ—এঁদের চিকিৎসার মধ্যে দিয়াই তিনি ক্ষণে ক্ষণে সেই পরমানন্দ মাধবকে স্মরণ করিয়াছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান কেবলমাত্র তাঁহাকে শুষ্ক শিক্ষা দেয় নাই—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের শিক্ষা তাঁহাকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে—আনন্দ দুঃখের ফাঁকে ফাঁকে সেই পরমপুরুষের শিক্ষা দিয়া গেছে। এই শিক্ষা বলেই প্রথম কৈশোরের চাপল্য তাঁহাকে মঞ্জরীর প্রেমদ্বন্দ্বে নিযুক্ত করিলেও তাহা ক্রমেই স্থির হইয়া আসিয়াছে। মঞ্জরীর প্রেম আতর বৌয়ের প্রেমকে পূর্ণ করিতে দেয় নাই। সেবা-যত্নের অন্তরালে আতর বৌয়ের অগ্নিদাহ তিনি ধীরতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সাংসারিক কোন ঘটনাই—মঞ্জরীর পলায়ন,

আতর বউয়ের ভর্ৎসনা, সাংসারিক দারিদ্র্য কিছুই তাঁহার স্থির বিশ্বাসকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। মতির মার ব্যাপারে তাঁহার চিকিৎসাজ্ঞান আহত হইয়াছে কিন্তু স্থির অচঞ্চল ভাবে কালের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। নিজ পুত্রের মৃত্যুও তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির মতই সহ্য করিয়াছেন। অথচ বিপিন, শশাঙ্ক, মতির ছেলে প্রভৃতির মৃত্যুতে এবং সীতার আগমনে তাঁহার কোমল দরদী চিত্তের পরিচয় বারে বারে আমরা পাইয়াছি। মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিতেন। তাই কোন আঘাতেই তিনি বিচলিত হন নাই। আবার মঞ্জুর অসুখে প্রদ্যোতের আত্মসমর্পণ তাঁহাকে আনন্দে অধীর করিয়া দেয় নাই। জীবন মশায়ই এই উপন্যাসের কেন্দ্রগত চরিত্র—তাঁহাকে আবর্ত্তন করিয়াই কাহিনী ও চরিত্রগুলি ঘুরিয়াছে।

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা-কণ্টকিত পথে বিভূতিভূষণের পদার্পণ এক বিস্ময়কর আবির্ভাব। আধুনিক জীবনের সমস্যা যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, দাঙ্গা, শ্রমিক-আন্দোলনকে বাদ দিয়াও যে সত্যকার সাহিত্য রচিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান বিভূতিবাবু পাঠককে দিয়াছেন। এই অতিবাস্তব কর্ম্মমুখর জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে অধ্যাত্ম-ধ্যানদৃষ্টির, বিচিত্র কল্পজগতের পরিচয়ের কাহিনী লেখক আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। পল্লী প্রকৃতির অতি তুচ্ছ তৃণটি পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অপু জীবনে বহু দুঃখ পাইয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তরে যে একটি ধ্যানী, যোগীপুরুষ থাকিত সে কোন কিছুই কামনা করে না, জাগতিক কোন বস্তুই তাহার কাম্য নহে, প্রকৃতির সাহচর্য্যে অনাবিল আনন্দ মধু পানে তাহার মনভৃঙ্গ মত্ত। এমন বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে আর দুটি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

বিভূতিভূষণ
১১

'দৃষ্টি প্রদীপ' গ্রন্থের নায়ক জিতু আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, ভবিষ্যতের চিত্র সে দেখিতে পায়। কিন্তু জিতুর অন্তরে যে একটি প্রকৃতি-প্রেমিক ধ্যানী পুরুষ বাস করিত তাহা সকল কিছু গ্লানি ও বেদনার ধূলায় মলিন হইয়াছে, তাহার সত্তা এ সকলকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। জিতু গৃহ পায় নাই, কিন্তু সে অন্তরে গৃহী। নারীপ্রেম জিতুর জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। সে অনেকখানি স্বপ্নবিলাসী।

'আরণ্যক' গ্রন্থে প্রকৃতিই প্রধান, তাহার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সুখ দুঃখের

কাহিনী চলিযাছে। প্রকৃতির নানা বিচিত্র বর্ণসম্ভার বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিযা কবি পূর্ণ করিযাছেন। এর মধ্যে মানুষ তাহার সামান্য সুখ দুঃখ লইযা অতি ক্ষুদ্র হইযা গিযাছে। বিভূতিবাবুর সকল উপন্যাসেই একটি রোমান্টিক দৃষ্টির স্পর্শ পাওয়া যায।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের অন্যতম। তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিযাছে। তিনি দুর্নীতি প্রচারক এবং অশ্লীল লেখক বলিযা কুখ্যাতি লাভ করিযাছেন। শরৎচন্দ্রের পর তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে বহু আন্দোলিত হইযাছে এবং নীতিবাগীশদের নাসিকা কুঞ্চিত করিযাছে। কিন্তু সত্যই কি তাহাই ? নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইযা তাঁহার উপন্যাসগুলি বিচার করিবার সময উপস্থিত হইযাছে। তাঁহার 'আঁকাবাঁকা' উপন্যাসখানি অত্যন্ত তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইযাছে। এই অপূর্ব্ব কাব্যোপন্যাসটিকে নীতির দোহাই দিযা অতি হেয করিযা রাখা হইযাছে।

প্রবোধ সান্যাল

'আঁকাবাঁকা' গ্রন্থখানি স্থানে স্থানে অশ্লীলতার সীমায আসিযা পৌঁছিযাছে সত্য, কিন্তু গ্রন্থখানি দুর্নীতি প্রচারে সাহায্য করিযাছে বলিতে পারি না। এই গ্রন্থ দুই বিচিত্র প্রেমপাগলের কাহিনী, সংসারে ইহাদের দেখা পাওযা ভার। প্রেমই তাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই প্রেমের পথে তাহারা কোন আসক্তি, কোন কামনাকে আসিতে দিবে না। সংযমের বড়াই তাহাদের নাই, স্বভাবের উপর জযী হওযাই তাহাদের সাধনা। আসক্তিহীন নিষ্কাম প্রেম সাধনা, দেহকে জয করার সাধনা কখনও কখনও প্রবৃত্তির আকর্ষণে আন্দোলিত হইয়াছে। প্রেমের যে অমরাপুরীতে তাহাদের যাত্রা, কেবলমাত্র পরস্পরকে লইযা তাহাদের প্রেমের স্বর্গ রচনা, এ যেন বৃন্দাবনের সেই চিরন্তন কিশোর কিশোরীর প্রেমকাহিনী মনে করাইযা দেয। বিবাহের বন্ধন তাহারা স্বীকার করে নাই, কেননা দেহরতির এতটুকুও তাহাদের প্রেমে তাহারা থাকিতে দিবে না। গ্রন্থের শেষে লেখক তাহাদের মিলন ঘটাইযাছেন, কিন্তু মনে হয সে মিলন নিছক প্রবৃত্তির জযগান নহে, তাহা যদি হইত তবে এ উপন্যাসের পরিকল্পনাটুকু ব্যর্থ হইযা যাইত।

বিকৃত প্রেমের পরিচয সুধীর ও কমলার একত্রবাস, মিসেস রাযের শিকার সংগ্রহ বৃত্তি, ইন্দুমতীর লোলুপ ঈর্ষ্যার মধ্যে পাই। কিন্তু তাহাদের প্রেমের অম্লান জ্যোতিটুকু অক্ষুণ্ণ রহিযা গিযাছে সকল বাধা ও আকর্ষণের ভিতর দিযা।

অবশেষে প্রেমের স্বর্গ রচনার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা, সে যেন প্রেমতীর্থের প্রতি অভিসার যাত্রা। মানুষ অনন্তের অংশ। তাই লক্ষ কোটি মানবসন্তানের মধ্যে এমনি এক-আধজন উন্মাদ জন্মগ্রহণ করে। ক্ষুদ্র খণ্ড জীবনের ধারায় যাহারা মিলিতে পারে না, বৃহত্তর জীবনের স্বাদ গ্রহণের জন্য তাহাদের সত্ত্বা উন্মুখ হয়। এই জাতীয় চরিত্রের আজিকার অতি বাস্তব জীবনেও অভাব ঘটে না।

প্রেমের চরম ও পরম কথাটি মীনাক্ষী অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছে, "আমার এই নীলাম্বরীর আবরণ খুলে দাও, দেখে নাও সেই অতি প্রাচীন শ্রীরাধাকে। স্বার্থের কথাই ভাবলে, আনন্দের কথাটা মনে এলো না ?···রতিরঙ্গের উন্মাদনাকেই আধুনিক কাল বড করে দেখবে আর মেয়েমানুষের মনে যে দুর্গম অন্ধকারের দিকে অভিসারের তৃষ্ণা রয়েছে তার দিকে কি চোখ ফেরাবে না ?" তাদের আদর্শের কথা কঙ্করের মুখেই ফুটেছে, "মীনাক্ষী, একে কোনদিন অন্যায় মনে ক'রো না, একে বলতে পার স্বভাবের খেলা। সস্তা মন্ত্রপাঠের ছাড়পত্র পেয়ে যারা গার্হস্থ্যজীবনের অন্ধকূপের ভিতর বসে অশ্লীল অসংযমে দিন কাটায় তারা হবে বড, আর আমরা যারা বড পটভূমির উপর জীবনকে বিচার করলুম, ···তারা হবে কলঙ্কিত।" "দুঃখে দুর্গমে দুরন্তপনায় বৃহত্তর মানবসংসারকে কেন্দ্র করে যারা জীবনকে বিস্তৃতভাবে আস্বাদ করেনি তাদের আমি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা দিতে পারবো না।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব আমাদের জীবনের উপর বহুদূর ব্যস্ত বিস্তৃত। প্রবোধ সান্ন্যাল সাম্প্রতিক উপন্যাস-জগতে একজন অতি আধুনিক দুর্দ্ধর্ষ লেখক রূপেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে এই বৈষ্ণব সাধনার দিকে একটা সহজ প্রবণতা লক্ষিত হয়। অতিবাস্তব উপন্যাস, যেখানে বুদ্ধির খেলাই প্রধান, সেখানেও রোমান্সের স্বপ্নালুতা পরিদৃষ্ট হয়। এ রোমান্স বহির্জগৎ হইতে আসে নাই, অন্তর্জগতে তাঁহার কারবার। তাঁহার 'শ্যামলীর স্বপ্ন' উপন্যাস সংসারের অতি ঘৃণ্য হেয় স্তরকে লইয়া রচিত। শ্যামলী দেহ-বিলাসিনী কিন্তু পঙ্কের মধ্যে বাস করিয়াও সে পঙ্কজা। প্রেমপাগলিনী হইয়া সে বিনয়ের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, অতি কুৎসিত জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার সকল অত্যাচারকে আবরণ ও আভরণ করিয়াছে। কিন্তু জীবনের কুৎসিত পরিণাম, সকল কিছু হারানোকে প্রকৃত প্রেম বলিতে লেখক চান নাই। উচ্চতর প্রেমের আলোকে তাহার জীবনকে যাচাই করাইয়াছেন।

সুধাংশু ও শ্যামলীর সম্বন্ধ—তাহা এক অতি-উচ্চ মহত্তর জগতের বিষয়—ইহাদের পারস্পরিক ভালবাসা শুদ্ধ কল্যাণময় মঙ্গলপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে। এ প্রেম কোন প্রেমজগতের সংবাদ দিয়াছে! এই প্রেমের বলে গণিকা শ্যামলী মহত্তর বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, আপনার জীবনের কলঙ্ককালিমা মুছিয়া পরহিতায় আপনাকে বিলাইয়াছে। তাহার সেই প্রেমের আলোকে পতিতা লীলাও সংশোধিত হইয়াছে, সুধাংশুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নরেন ও লীলা শান্ত সংযত জীবন লাভ করিয়াছে। প্রেমের জন্য শ্যামলী তাহার প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করিয়াছে, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ প্রেমে সে সুধাংশুকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই, মহৎ প্রেমের প্রেরণায় জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মদান করিযাছে।

বনফুলের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তাহার কাব্যধর্ম্ম, সামান্য কথায় অসামান্য রসসৃষ্টি। তাঁহার 'দ্বৈরথ' উপন্যাস অতিবাস্তব পটভূমিকায় রচিত। দুই ক্ষমতাগর্ব্বী জমিদারের ক্ষমতার কাহিনী—ক্ষমতার গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সাধারণ মানুষকে তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক করিয়াছে। দুধনাথ পাঁড়ে তাহার একটি হাত হারাইয়াছে, অসংখ্য সিপাহী জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে, গোলকসার ভয়াবহ পরিণতি ঘটিয়াছে—গঙ্গাগোবিন্দ গৃহত্যাগ করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত দুইজনেরই একান্ত প্রিয়জন বহ্নিকুমারী বা বাণীর জীবন বিসর্জ্জনে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

বনফুল

ধনের অভিমান, ক্ষমতার অভিমান মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয—তাহার পারিপার্শ্বের দিকে তাকাইবার অবসর মিলে না। সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিগুলি অবহেলিত হয়। বিদ্যার অহঙ্কারও মানুষকে প্রাণহীন করিয়া তোলে—গঙ্গাগোবিন্দ সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বাণীর কিশোর প্রাণকে সম্মান করে নাই। কিন্তু তাহার ভ্রম ভাঙ্গিল যখন, বাণী তখন বহ্নিকুমারী। বাণী তাহার হৃদয়ের সব ঐশ্বর্য্য উগ্রমোহনকে নিবেদন করিল—বহিরঙ্গে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রহিল, কিন্তু দুই বিপরীত চরিত্রের সমন্বয় ঘটিল না। জীবনবীণার সরু মোটা তার বাজিয়া একটা অখণ্ড সুরের রচনা হইল না—বাণী তাহার নিজ হৃদয়রাজ্যে একাকিনী হইয়া রহিল। বাণীর এই একাকীত্ব, একটা কারুণ্য গ্রন্থের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়াছে। অনাদিকালের নারীচিত্ত তাহার পরম অভিসারের পথ খুঁজিতেছিল। মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সে উগ্রমোহনের হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও গভীর বৃত্তিগুলি জাগাইয়া দিল। চন্দ্রকান্তও অনুভব করিলেন কেবল বুদ্ধির খেলায় ও ক্ষমতার দর্পে এ সংসারে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারা যায় না।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যধর্ম্মী উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার 'তিথিডোর' উপন্যাস অতি বাস্তব ঘটনাপুঞ্জকে অবলম্বন করিয়া রোমান্টিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। স্বাতীর মানসিক বিকাশ ও চরিত্র বিশ্লেষণই এই উপন্যাসে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন এই তিন অবস্থার নানা বিচিত্র মনোভাব বিশ্লেষিত হইয়াছে। নানা বিচিত্র পুরুষের সংসর্গে সে আসিয়াছে—কিন্তু প্রত্যেকেই তাহার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। শুভ্র ও মজুমদারের অতি ব্যাকুল লোলুপ আকাঙ্ক্ষা তাহার অনুভূতিশীল চিত্ত সহজেই অনুভব করিয়াছিল—কিন্তু তাহার কল্পনাবিলাসী, কাব্যধর্ম্মী মন উহাদের গ্রহণ করিতে পারে নাই। সত্যেন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ তাহার চিত্তে একটা অন্য জগতের স্পর্শ আনিয়া দিল। এই অতিবাস্তব জগতের কর্ম্মকোলাহল হইতে তাহাকে যেন হাত ধরিয়া কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গেল। সত্যেন এবং স্বাতীর মিলন যেন হংসমিথুনের অনন্ত নীলাকাশে ভাসিয়া কোন্ অনন্ত অসীম রহস্যের সন্ধানে যাত্রা। স্বাতী এবং সত্যেনের মানসিক পরিবর্ত্তন এবং ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ লেখক বর্ণনা করিয়াছেন সমগ্র উপন্যাস ব্যাপিয়া—কিন্তু এই বর্ণনা যেন গদ্যকে ছাড়াইয়া কবিতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব বসু

উপন্যাসের অন্যান্য ছোট বড় চরিত্রগুলিও প্রাণ-সমুজ্জ্বল। রাজেনবাবুর অতি স্নেহপ্রবণ শান্ত চরিত্রটি মনে রেখাপাত করে। শ্বেতার চরিত্রটি অপূর্ব্ব। তাহার চরিত্র বিস্মৃত একান্নবর্ত্তী সংসারের স্নেহময়ী গৃহিণীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে তাহার উপস্থিতি একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করিয়াছে। আধুনিক সমাজের জীব শাশ্বতী—তাহার মনের দুইটি রূপ—একটি অতি আধুনিক হারীতের সহধর্ম্মিণী, অপরটি প্রাচীন সামাজিক জীবনের আস্বাদ গ্রহণে ব্যাকুল।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'কালো হাওয়া' উপন্যাসখানি অপ্রকৃতিস্থ মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। গল্পের বাঁধুনি, ভাব ও ভাষা কেমন আলগা ধরণের—একটা নিবিড় গ্রন্থিবন্ধন তাহার মধ্যে নাই। হৈমন্তী অত্যন্ত অস্বাভাবিক—মিলি ত' ছায়ালোকের অধিবাসিনী। হৈমন্তীর চরিত্রে অস্বাভাবিক জেদ বরাবরই ছিল লেখক বলিয়াছেন। কিন্তু স্বামী ও সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রত্যেক হিন্দুনারীর মজ্জাগত সংস্কার। সেই সংস্কারের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হওয়ার

কার্য্যকারণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক। হৈমন্তী কর্ত্তৃক অরিন্দমের হত্যা এবং তাহার উন্মাদগ্রস্ততা এ যেন অনেকটা আকস্মিক ঘটিয়া যায়। উপন্যাসের প্রয়োজনে সেখানে ঘটনার এরূপ পরিণতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নিরঞ্জনের সহিত বুলির সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একমাত্র নিরঞ্জনের ব্যাপারে মিনির চরিত্রের ঈর্ষ্যাদিগ্ধ দিকটি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে খানিকটা রক্তমাংসের মানুষ করিয়াছে। অরুণকে লেখক শয়তান করিয়াছেন। টাটার ব্যাধি এবং মৃত্যু তাহার মনে একটি রেখাও পাত করে নাই। উজ্জ্বলা অত্যন্ত দুর্ব্বল চরিত্র। অরুণকে সংশোধন করিবার বা গৃহমুখী করিবার কোন চেষ্টা তাহার দিক দিযা হয় নাই। অরুণের ব্যাধি খুব সম্ভব তাহার জীবনীশক্তিকে কুরিয়া কুরিয়া খাইয়াছে এবং তাহাকে ক্রমেই দেহে মনে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। হৈমন্তীর ধর্ম্মান্ধতা এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসের পায়ে সমস্ত সংসারকে বলি দেওয়া—এ জাতীয় ঘটনা ভারতীয় জীবনযাত্রায় কখনও কখনও ঘটে। লেখক তাহার চরম অবস্থাই কল্পনা করিযাছেন। আমাদের দেশ সহজতঃ ধর্ম্মপ্রাণ কিন্তু সেই দুর্ব্বলতার দিক লক্ষ্য করিয়া এমন অনেক স্বার্থপরায়ণ সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তির মা মহামায়ার মত আবির্ভাব হয়। বহু সংসারে সর্ব্বনাশও ঘটিযা গিয়াছে। কিন্তু এর মূলে থাকে প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতা। মঙ্গল এবং কল্যাণই ধর্ম্ম—যে উপদেশ আমাদের জীবনে তাহা না আনে তাহা অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূল শক্তি নিহিত প্রেমে। হৈমন্তীর আত্মপ্রিয়তাই তাহাকে মা মহামায়ার ভক্ত করিয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্মের শক্তি ও প্রেমের শক্তি তাহার নিজের মধ্যে থাকলে সে এমন করিয়া সংসারকে ও নিজেকে ব্যর্থ করিতে পারিত না। বুলি সেই প্রেমশক্তির সন্ধান পাইয়াছিল। বাবাকে ভালবাসিয়া সে সেই প্রেমশক্তির রহস্য অনুধাবন করিয়াছিল। তাই অরিন্দমের মৃত্যুর পর নিরঞ্জনের প্রেম তাহাকে ভয়াবহ বিলুপ্তির পথ হইতে রক্ষা করিয়া নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

অচিন্ত্যবাবুর উপন্যাস 'যায় যদি যাক' সমাজের এক প্রচণ্ড ভাঙনের পটভূমিকায় রচিত। বাঙ্গালা দেশের সমাজে ও দেশে এক প্রচণ্ড দুর্নীতি ও দুর্ভাগ্যের উন্মত্ত ঝটিকা বহিয়া চলিয়াছে। মানুষের মেরুদণ্ডকে শিথিলীকৃত করিতে, প্রেমকে কামের সেবায় নিয়োগ করিতে দেশব্যাপী একটা চেষ্টা চলিতেছে। মানুষের লোভ, কামনা কতখানি নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতায় পরিণত হয় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বারিধি। অথচ এরাই অতি ভদ্র সভ্য শালীন মুখোস পরিয়া আমাদের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষের প্রতি এতটুকু দয়া বা

ভালবাসা ইহাদের জীবনে ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় না। সমাজকল্যাণের দোহাই দিযা ইহারা মানুষকে নরকের কীট করিযা তোলে। সেবাকে সে উপভোগ করিযা বিপদ সম্ভাবনায তাহাকে জীর্ণপত্রের মতই ঠেলিযা দিযাছে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

সুধীন সেবার জন্য প্রতীক্ষা করিযাছে—লাঞ্ছিতা সেবাকে অসীম প্রেমে ও ক্ষমায আশ্রয দিযাছে, সমাজকে মর্য্যাদা দিযাছে। দেহাতীত প্রেমই এই ক্ষমা করিতে পারে। সেবাও তাহার মূল্য বুঝিযা তাহার যোগ্য সহধর্ম্মিণী হইযাছে। বারে বারে বারিধির প্রলোভনকে পদাঘাত করিযাছে। বারিধির প্রেমহীন প্রতিহিংসা সেবার গার্হস্থ্যজীবনে তাণ্ডব বাধাইযা তাহাকে পথের ভিখারী করিযাও তৃপ্ত হয নাই। সেবার সুদৃঢ়তাকে ভাঙ্গিতে না পারিযা অবশেষে মৃত্যুপথযাত্রী সুধীনের পার্শ্ব হইতে জোর করিযা সে সেবাকে নির্ব্বাসন দিযাছে। সেবা ও সুধীনের মৃত্যুঞ্জযী প্রেম, জীবনযুদ্ধে অদম্য রণ—গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। কিন্তু পরিশেষে সেবা ও সুধীনের পরিণাম আমাদের চিত্তে যেন অসাড়তা ও বীভৎস রসের সঞ্চার করে। একটা রসের তৃপ্তি, যাহা মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ তাহা আমরা পাই না। মৃত্যুতে উভযের পরিসমাপ্তি ঘটিলে কাব্যের উৎকর্ষের সেখানে হানি হয না। নিছক বাস্তব ঘটনা মাত্রই সাহিত্য হইলে সংবাদপত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইতে পারিত।

অচিন্ত্যকুমারের 'অনন্যা' উপন্যাস একটি মেযের শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রযাসের কাহিনী। তাহার মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত আছে, তাহার পিতামাতা তাহাকে উপ্ত করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেযের মত তাহার স্বাধীনতা খর্ব্ব না করিযা তাহাকে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ দেন। কিন্তু ক্রমেই সাংসারিক দারিদ্র্য, নিজেদের সংযমের অভাব ও হরেনের স্বার্থপরতা তাঁহাদের স্বার্থপর করিয়া তুলিল। বড় বড় কথার মালা রচনা করিযা বীথিকে জীবনে সার্থক হইতে দিতে তাঁহারা চাহিলেন না। কথার মাযায বদ্ধ করিযা তাঁহাদের সংসার পালনের যন্ত্ররূপে সে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হরেনের মুখে এই স্বার্থপরতার কাহিনী পাই। বীথিকে সমরেশের সহধর্ম্মিণী হইযা সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে তাঁহারাই বাধা দিলেন। অবশেষে দোলাচলবৃত্তিপরাযণা বীথিকে সমরেশের প্রেমই জয় করিল।

অচিন্ত্যকুমারের 'ঊর্ণনাভ' গ্রন্থে দারিদ্র্যক্লিষ্ট কুবেরের কবি-প্রতিভাকে

বিকাশ করিবার জন্য সুশান্ত তাহাকে সর্ব্বপ্রকার আরাম ও বিলাসের সুযোগ দিল। কিন্তু যে মানসিক স্ফূর্ত্তি, সহজ ভাব কবিতার জন্ম দেয়, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিল। সুশান্তের তীক্ষ্ণ অভিভাবকত্ব, সারাদিনের রুটিন তাহার কবিপ্রাণকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল এবং কাব্যেরও মৃত্যু ঘটিল। কুবেরের সৃষ্টির প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে ঘটিল বেবির আবির্ভাব। সুশান্তর অভিভাবকতার কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত কবিপ্রাণ বেবির চিত্তে জ্বালা ধরাইয়া দিল। কুবেরের রচনা ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে আকৃষ্ট করে। বেবির প্রভাব কুবেরের হৃদয়দ্বারের রুদ্ধ স্রোতোমুখ উন্মুক্ত করিল। চতুষ্পার্শের বিমুখতা তাহার কবিতাকে আরও উদ্দাম, জীবন্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে বেবির তীব্র জ্বালাময়ী বাণী ও সুশান্তের নির্লিপ্ততা তাহাকে সম্পূর্ণ সজাগ করিয়া তুলিল। সে সুশান্তের নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া মুক্ত স্বাধীন জীবনে বাহির হইয়া পড়িল। বেবিও তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তনে অতি সহজেই সুশান্তের বাহু ত্যাগ করিয়া কুবেরের সঙ্গিনী হইয়াছে। বেবির প্রেমে কুবের বুঝিল জীবনের বৃহত্তর মূল্য। সুশান্তও অনুভব করিল জবরদস্তি করিয়া কাহারও ভাল করা অত্যাচারেরই সামিল। কুবেরকে অনুগ্রহ করিতে গিয়া সে নিজের বিলাসের খেয়ালকেই চরিতার্থ করিতেছিল—কাব্যের অনুরোধে নয়। তাহার অতিব্যস্ততা, এই বিলাসের খেয়াল বেবির হৃদয়ে সাড়া জাগাইতে পারিল না।

অচিন্ত্যবাবুর 'কাক জ্যোৎস্না' উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর যে পরিচয় আমরা পাই তাহা যেমন অস্বাভাবিক তেমনই অবাস্তব। সাহিত্য খাঁটি বাস্তব মাত্র বর্ণনা করে না, কিন্তু তাহার মধ্যে বস্তুরস থাকা প্রয়োজন। কুয়াশাচ্ছন্ন বিবরণ, অর্দ্ধবিকৃতমস্তিষ্ক পাত্রপাত্রী পাঠক-চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। উপন্যাস পড়িয়া পাঠককে বিস্ফারিত নেত্রে যদি ইহার অর্থ খুঁজিতে অভিধান ও শব্দকল্পদ্রুম ঘাঁটিতে হয় তাহা হইলে অন্ততঃ সাহিত্যপাঠের আনন্দটুকু তাহার থাকে না। পাত্রপাত্রীর কার্য্যকারণ সকলই অকস্মাৎ ঘটিয়া যায়। আধুনিক নরনারী কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না—আপনার মনোবিলাস লইয়াই ব্যস্ত থাকে—কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রশ্ন তাহাদের মনেই ওঠে না। সুধী নমিতাকে বর্জ্জন করিতে চায়, কেননা সে তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। আত্মতৃপ্তি আধুনিক যুগে এতই বড় হইয়াছে যে সেখানে ভালবাসিয়া গড়িয়া

লওয়ার প্রশ্ন অবান্তর দাঁড়াইয়াছে। সুধী নমিতাকে ভালবাসে নাই, নমিতাও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবাহজীবনে প্রেমের তৃষ্ণা ভোগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার অতৃপ্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিবার কোন ক্ষেত্র পায় নাই। সুধীর অকস্মাৎ মৃত্যু ও সাংসারিক পরিবেশ তাহাকে তাই এক জলশূন্য দিগন্তবিস্তারী রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। পতিগৃহে ও কাকার গৃহে সে সম্মান, মর্য্যাদা, শান্তি কিছুই পায় নাই। এদিকে অজয় ও প্রদীপ তাহাকে বারংবার উত্তেজিত করিয়াছে গৃহত্যাগ করিবার জন্য। দুজনেই নানা কথার ছলে নমিতাকে উত্তেজিত করিযাছে—একটা বিরাট ভবিষ্যৎ চিত্র আঁকিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিযাছে। কিন্তু একমাত্র আপনাপন লালসাকে তৃপ্ত করা ছাড়া আর কিছুই তাহাদের সমর্থন করে না। বিশেষ করিয়া প্রদীপ নমিতার গৃহে যে কাণ্ড করিযা বসে তাহাকে গুণ্ডামি ছাড়া কি বলা চলে। গৃহের অত্যাচারে নমিতা পথে বাহির হইযা প্রদীপের সঙ্গিনী হইতে চাহিলে সে প্রথমেই সন্ত্রস্ত হইয়াছে, অনিচ্ছায় তাহার সঙ্গী হইয়াছে। অবশেষে নমিতাকে পূর্ণ করতলগত করিবার জন্য ব্যগ্র বাহু বাড়াইযাছে। নমিতাও এই লালসার সন্ধান পাইযা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং প্রদীপকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অজয় উন্মাদের মত নমিতার সন্ধানে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার সেই উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা বন্ধ হইয়াছে তাহাকে প্রদীপের সঙ্গিনী দেখিযা। সে ঘৃণাভরে স্থান ত্যাগ করিয়াছে। যেন তাহার সঙ্গিনী হইলেই নমিতা একটা বড় কিছু হইয়া উঠিত। ইহারা নমিতাকে গৃহকোণচ্যুত করিযাছে কিন্তু আশ্রয় দেয় নাই। প্রেম যেখানে নাই, কামনা যাহার ইন্ধন, সেখানে এমনি করিযা জীবনের বিনিময়ে ভুলের মাশুল চুকাইতে হয়। উমা যতই সাফাই গাক, প্রদীপকে মহৎ বলিয়া আমরা মানিতে পারি না। সে স্খলিতচরিত্র—প্রেমের ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

অচিন্ত্যবাবুর 'আসমুদ্র' উপন্যাসে বনানী ও সৌম্যের সম্পর্ক অনেকখানি রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। বনানী নিজেই রহস্যের আবরণে ঘেরা। সে কি যে চায়, কি তাহার উদ্দেশ্য, কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। আপনার মনো-বিলাসটুকু লইয়াই সে তৃপ্ত থাকিতে চায়। উপন্যাসের প্রথমভাগে শিপ্রা ও সৌম্যের সম্পর্ক অনেকখানি সহজ, স্বাভাবিক। এই সহজ জীবনে শিপ্রারই নিমন্ত্রণে বনানীর প্রবেশ। কিন্তু শিপ্রার মনের অজ্ঞাত কোণে সন্দেহের বীজ জাগিয়া উঠে। ক্রমেই তাহার জ্বালাময়ী শিখা নিজের জীবন নিঃশেষিত ও

স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যে ঈর্ষ্যা তাহাকে পাগল করিল, তাহার কলুষিত কালিমা, তাহার শ্বাসরোধকারী ধূম্র ক্রমেই সৌম্যকে বনানীর পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল পরিবেশে ঠেলিয়া দিল। শিপ্রার স্বসৃষ্ট বিষবৃক্ষের ফল ফলিল। অবশ্য শিপ্রাও নিজের ভুল বুঝিল। সৌম্য ও বনানীর মিলন ঘটাইতে, স্বামীকে সুখী করিতে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসখানি গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। বিভূতিভূষণের রচনায় গ্রাম্য প্রকৃতি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সুষমা সৃষ্টি করিয়াছিল, মাণিকবাবুর উপন্যাসে তাহার স্থান নাই। গ্রাম সেখানে কুশ্রী—উপন্যাসের নায়ক গ্রামের পচা কাদা, পাঁক ও ব্যাধিজর্জ্জরিত গ্রামবাসীর সঙ্কীর্ণ জীবনকেই লক্ষ্য করিয়াছে। প্রেমের দৃষ্টি তাহার কোনদিন ছিল না—তাই গ্রামে চিরকাল থাকিতে বাধ্য হইয়াও গ্রামকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। মতির প্রেমোন্মুখ চিত্তকে সে দেখিতে পায় নাই—কুসুমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাহার মনকে লইয়া সে খেলা করিয়াছে, সেনদিদির প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ শেষ হইয়াছে তাহার রূপের সঙ্গে। এমন কি সেনদিদির মৃত্যুশয্যায় সে যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছে—সেনদিদির পুত্রকে সে সহ্য করিতে পারে নাই। গোপালের সুগভীর বাৎসল্যকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাহাকে ভালবাসিয়া গোপাল ও কুসুম গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। হারু ও ভূতোর মৃত্যুতে একটা শ্মশানবৈরাগ্য তাহার জাগিয়াছিল—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে স্বসৃষ্ট নেশায় মশগুল থাকিতেই চায়। তাই গোপালের গৃহত্যাগে সর্ব্বস্ব বেচিয়া তাহার গ্রাম ত্যাগ করা হইয়া উঠে না। হাসপাতালের আধিপত্যও সে ছাড়িতে পারে না। এই নেশায় মত্ত হইয়া সে সকল কিছু হারাইয়াছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমুদ এই উপন্যাসে এক অদ্ভুত রোমান্টিক সৃষ্টি। বাঙ্গালার মাটিতে সৃষ্ট হইয়া সে এই ভবঘুরে জীবনের আস্বাদ কিরূপে গ্রহণ করিল তাহা ভাবিবার বস্তু। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া গ্রামের মেয়ে মতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জীবন লইয়া এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা—সাংসারিক সকল কিছুর উপর এমন গভীর ঔদাসীন্য—এমন চরিত্র বড় বিরল। কুমুদ ও শশী—দুই যেন পরস্পরের বিপরীত। এক কর্ম্মের নেশায় উন্মাদ—বাহিরে বৈরাগী ; দ্বিতীয় প্রচণ্ড উদাসীন—বাহিরে ভোগী। একজনকে প্রেম সার্থক করিল, নূতন জীবন গড়িয়া উঠিল। দ্বিতীয়জন

জীবনে বঞ্চিত হইল এই প্রেমের দৃষ্টির অভাবে।

মাণিকবাবুর 'দিবারাত্রির কাব্য' আধুনিক জীবনেরই চিত্ররূপ। এ যুগের নরনারী মানসিক সমতা হারাইয়াছে—একটা রুগ্ন, বিকারগ্রস্ত, ক্ষুধিত, অতৃপ্ত চিত্তবৃত্তি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুপ্রিয়া, হেরম্ব, মালতী, অনাথ, এমনকি শেষাশেষি অশোক ও আনন্দ—প্রত্যেকেই অসুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সুস্থ মনোবৃত্তি তাহাদের নাই—জীবনে কোন পথের সন্ধান তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই। কেবল নিজেদের বিকৃত মন দিয়া কতকগুলি অর্থহীন বাক্যকুহেলির সৃষ্টি করিয়াছে। আজকের সমাজ—ভাঙনের সমাজ—মানুষ ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে। হেরম্ব দুর্ব্বলচিত্ত, হৃতযৌবন, দেহে মনে অবসাদগ্রস্ত। সুপ্রিয়াকে সে গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহার অতৃপ্ত ক্ষুধার্ত্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করাইতে পারে নাই, কিন্তু সবলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত জোরও তাহার নাই। তাহার এই দুর্ব্বল দোলাচলবৃত্তিপরায়ণ চিত্ত সুপ্রিয়ার জীবনকে ধ্বংস করিয়াছে। অশোকের শান্ত জীবনেও ঝড় উঠিয়াছে যাহাতে সে সুপ্রিয়াকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অনাথকে হেরম্ব শ্রদ্ধা করে—কিন্তু অনাথ তাহারই প্রতিবিম্ব। সেও দুর্ব্বল রক্তহীন মানুষ। তাহারই আকর্ষণে মালতী গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সেই ভালবাসার মর্য্যাদা অনাথ দেয় নাই। মালতীকে সে ঘৃণা করিয়াছে—তাহার জীবনে ব্যর্থতা আনিয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। মালতী জীবনে প্রেম চাহিয়াছিল। কিন্তু অনাথের মধ্যে ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্ষণিকের নেশা। প্রেমের অর্থ সে বোঝে নাই—মালতীকে সেই নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে সে ধীরে ধীরে বিকৃত জীবনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। হেরম্বও এমনি দুর্ব্বলপ্রকৃতি কল্পনা-সর্ব্বস্ব। তাহার বিশ্লেষণমাত্র সম্বল। প্রেমকে সে কখনও সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। দুইটি নারী তাহার সংস্পর্শে আসিয়া ধ্বংস হইয়াছে। সুপ্রিয়া সংসারের সাধারণ মানবপ্রেমের প্রতীক, সে নীড়ধর্ম্মী। আনন্দ আকাশধর্ম্মী, সে সংসারের সকল কিছু বাধাবন্ধ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নীলাকাশে উড়িয়া যাইতে চায়। এই দুই বিপরীতধর্ম্মী প্রেমকে একসূত্রে বাঁধিবার ক্ষমতা হেরম্বের ছিল না। ইহাদের কাহাকেও সে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারে নাই।

উপন্যাসের ভাষায় ও ভাবে কাব্যধর্ম্মের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। ইহার কাহিনী ও ভাষা গদ্যজগৎ ছাড়াইয়া রূপকথা জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্ত' অতি আধুনিক উপন্যাসের দলে পড়ে। আধুনিক

সাহিত্যে যৌনকামনার একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা অনুভূত হয়। সত্যবান গ্রন্থের নায়কমাত্র নহে, সে আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবশক্তির প্রতীকস্বরূপ। তাহার মনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই গ্রন্থের আগাগোড়া স্থান অধিকার করিয়া আছে। সতী, সুরমা ও বনানীর প্রতি তাহার মনোভাব বিশ্লেষিত হইয়াছে, অপর চরিত্রগুলি তাহারই মনের আলোকে বিশ্লেষিত হইযাছে। বহুকাল ধরিয়া একটা বঞ্চনা, একটা অতৃপ্তি এদেশের জনসাধারণ ভোগ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বহির্জগতের মুক্ত আলোবাতাসের সন্ধান দিয়াছে। কিন্তু এই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় নাই। একটা তীব্র অতৃপ্ত কামনা অবাধ যৌনমুক্তিকে কামনা করিয়াছে। কিন্তু সে পথে তৃপ্তি সাধিত হয় নাই। সত্যবান বনানীর যৌনতৃপ্তি ঘটাইযাছে কিন্তু তাহার মনের ক্ষুধা, প্রেমের ক্ষুধা মিটে নাই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শিশিরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার প্রেম পূর্ণ হইতে চাহিযাছে—কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। সুরমা তাহার যৌনক্ষুধাকে অবৈধ উপায়ে মিটাইতে গিয়া মানসিক আহারে বঞ্চিত হইয়াছে। অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা অবশেষে তাহাকে গৃহত্যাগ করাইযাছে। মানুষ বৈচিত্র্য-প্রয়াসী—কেননা তাহার স্রষ্টাই বিচিত্রধর্ম্মী। তাই সতীর সুদীর্ঘ স্থির অচঞ্চল প্রেমে সত্যবানের চিত্ত নব নব বৈচিত্র্য সন্ধান করিয়া বিমুখ হইয়াছিল। বনানীকে সে সতীরই তরুণ জীবনের প্রতীক হিসাবে কামনা করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে নানা বিপথ ঘুরিয়া তাহার চঞ্চল চিত্ত সতীর হৃদয়রাজ্যের স্থির বেদীর উপর গিয়া বিশ্রাম লইয়াছে।

গোপাল হালদারের 'একদা' বইখানি ইহার ব্যতিক্রম। সেখানে বাঙ্গালার তরুণসমাজের অন্য এক নূতন পরিচয় রচিত হইযাছে। মণীশ, সুনীল, অসিত, ইন্দ্রাণী জীবনের সার্থকতাকে খুঁজিয়া পাইতে চাহে। মন লইয়া খেলার দিন

গোপাল হালদার

আজ অতীত। কঠিন বাস্তবকে তাহারা জানিতে চায়। বাস্তবজীবনে যেখানে সহস্র দুঃখ বেদনা ফেনায়িত রহিয়াছে সেখানে অতিসভ্য মার্জ্জিত মনের শিল্পবিলাস—মনের সূক্ষ্ম নিক্তির ওজনে বিচার অর্থহীন এবং হাস্যকর। চারিদিকে যখন আগুন জ্বলে—দেশের প্রাণশক্তি যখন বিপর্য্যস্ত তখন সেই প্রাণকে বাঁচাইতে হইবে। তাহার জন্য বহু প্রাণবলি প্রয়োজন। সংসারের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সত্ত্বা ইহাদের আত্মাকে পীড়িত করে। বৃহত্তর জীবনচেতনায় অসীম অনন্তপুরুষ তাঁহারই অনন্ত কর্ম্ম-জীবনের পথে উহাদের আহ্বান করিয়া লন। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ ভোগ

তাহাকে বাঁধিতে পারে না। এই আদর্শবাদী মানুষ খুব বেশী জন্মে না—সংসারের চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া শৈলেন সাতকড়ির মত অনেকেই অনুভূতিহীন জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত হয়। জীবনের অতি স্থূল প্রয়োজন—অর্থ উপার্জ্জন, আহার, নিদ্রা ও জীবধর্ম্মপালন এই মাত্রেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু সত্যকারের আদর্শবাদী তাহার আত্মার ধর্ম্ম ভুলিতে পারে না। অনন্ত জীবন তাহাদের সম্মুখে প্রসারিত। জীবনের বাঁধাধরা নিয়মগুলি মানিয়া সেই পথে তাহাদের জীবন চলিতে পারে না। বৃহত্তর মহত্তর জীবনের দাবীকে মিটাইতে তাহারা আগাইয়া যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাদিক দিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। একদিকে নিদারুণ অভাব, ব্যাধি, শিক্ষাসঙ্কট—আর একদিকে দেশকে সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা পাশ হইতে মোচনের চেষ্টা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমা হইয়াছে। সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি জ্বলিয়া যাইতেছে—প্রচণ্ড কামনা ও লালসা মনুষ্যসমাজকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। দারিদ্র্যের দায়ে মানুষ পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। মনুষ্যসমাজের এই দারুণ দুর্য্যোগের কাহিনী 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসে লেখক জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। বাঁচিবার তাগিদে পিতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া হরনাথ সুষমাকে গোবিন্দ মোক্তারের কামনার বহ্নিতে সমর্পণ করে, উমেশ ও গঙ্গা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে—বৃহত্তর স্বার্থকে শেখরের সহিত বলি দেয়—শঙ্করের মা ও রামধনিয়া দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নসংস্থান করে। মানুষের জীবনে কোন মহৎ বৃত্তি স্থান পায় না—হরিশ ডাক্তার উমার চিকিৎসা করিতে আসিয়া নিজের কামনাকে তৃপ্ত করে—গোবিন্দ মোক্তার পিতৃত্বকে পদদলিত করে।

নবেন্দু ঘোষ

কিন্তু চতুর্দ্দিকের আকাশস্পর্শী এই ক্ষুদ্রতা, লাঞ্ছনার মধ্যে মানুষের আত্মাপুরুষ নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। শেখর মানুষকে ভালবাসে—সেই ভালবাসায় নিজের প্রাণকে বলি দেয়। প্রমথ সংসারকে দারিদ্র্যের মুখে ঠেলিয়া দিয়া চল্লিশ কোটি মানুষের দুঃখকে নিজের করিয়া লয়। এ যুগের মানুষ দিলীপের মতই পথভ্রান্ত—উন্মাদের মতই পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। চতুর্দ্দিকে সমস্যার বেড়াজাল—বেদনার কাঁটাবন—এ যুগের উপন্যাসের ভাষাও তাই সুশৃঙ্খল নয়—মানুষের মনের মতই কুহেলিপূর্ণ ও সমস্যাতীক্ষ্ণ। প্রচণ্ড বেদনা ও অভাববোধ মানুষকে রোমান্টিক করে। বীণা, দিলীপ, কলাবতী, এরা

প্রত্যেকেই যেন কিছুটা অবাস্তব কল্পজগতে বাস করিতেছে। কল্যাণীর চরিত্র স্বাভাবিক এবং পূর্ণাঙ্গ। একটি সন্তানকে সে বলি দিয়াছে, কন্যা মৃত্যুপথযাত্রিণী, নিদারুণ অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্টা—তথাপি অবশিষ্ট সন্তান দিলীপকে এই মহা দুর্দ্দশাকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সে দাঁড়াইয়া আছে—কিন্তু এই দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নাই—প্রতিকূল ভাগ্যের সহিত তাহার অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। সে অন্তরে বিশ্বাস করে এই দুঃখদুর্দ্দশার অমানিশার অন্ত হইবে—মানুষ সকল অপমান ও লাঞ্ছনাকে অতিক্রম করিবে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' অতি বৃহৎ উপন্যাস। আধুনিক শিল্পযুগের প্রভাব সমাজে ও জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। শিল্পাঞ্চল লইয়া ইতিপূর্ব্বে ছোট বড় রচনা লেখা হইয়াছে, কিন্তু এ ধরণের পূর্ণাঙ্গ বিরাট উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে লেখা হয় নাই। মালিকদের দম্ভ ও আকাশস্পর্শী লোভের কাছে মানুষের জীবনের মূল্যবোধ অস্বীকৃত হইয়াছে। কারখানায় শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা, পারস্পরিক অসহযোগিতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের ফলে নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থকে বলিদান লেখক সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। আবার এই সংকীর্ণ স্বার্থপরিপূর্ণ পৃথিবীতে অনিরুদ্ধের মত স্বার্থলোলুপ ব্যক্তির কন্যা মন্দাকিনী, সীতারামের মত সংকীর্ণচিত্ত লুব্ধের পুত্র দেবু। মন্দাকিনী পিতার স্বার্থলোলুপতার পরিচয় পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছে, বঞ্চিত শ্রমিকের অন্ন মুখে তুলিতে তাহার বাধিয়াছে। দেবুর আদর্শ, তাহার ব্যক্তিত্ব এবং মানবতাবোধ তাহাকে গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহিরের মুক্তাকাশে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। মন্দাকিনীর মৃত্যুতেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইলেই সুন্দর হইত। মন্দাকিনীর মৃত্যুর পর দেবু বিবাহ করিয়া সংসারী হইযাছে, অতি সাধারণ জীবন যাপন করিয়াছে। আদর্শবাদী দেবুর এরূপ পরিণতি আমাদের ব্যথিত করে। মন্দাকিনী তাহারই জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে—অথচ তাহার কোন ছাপই তাহার মনে থাকে না। অমলার উজ্জ্বল চরিত্রটিও শেষ পর্য্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ঘোষাল শ্রমিকস্বার্থের জন্য নিজের প্রাণ দিয়াছে। তাহার স্ত্রী হইয়া অমলা স্বামীকে ভুলিয়া গিয়া দেবুর প্রেম লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। উপন্যাসের শেষে দেবু ও অমলা, উভয় চরিত্রই অত্যন্ত নিষ্প্রভ এবং

গৌরীশঙ্কর ভটাচার্য্য

কিঞ্চিৎ হেয় হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিকত্বের দোহাই দিয়া মানুষের চরিত্র জোর করিয়া নিকৃষ্ট করিলে তাহা মোটেই বাস্তবানুগত হয় না বরং অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচনা এইখানেই শেষ হইল। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলি সকল যুগেই এক, যদিও ভাব ভাষা ও বস্তুতত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে উভয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

সাহিত্যে প্রেম—দেহী ও দেহাতীত

(ক)

মানুষের জীবনে প্রেম বা প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বৃত্তি। সংসারে মানুষ যাহা কিছু করে তাহার পিছনে একটি গভীর প্রেমের সম্বন্ধ থাকে। কর্ত্তব্যবোধ ও প্রেমকে আমরা অনেক সময়েই পরস্পরের বিপরীত ধারণা করিয়া থাকি। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধও এই প্রেমবস্তুটি হইতে আসিয়া থাকে। মাতাপিতার প্রতি প্রেম সন্তানকে কর্ত্তব্যে উদ্দীপিত করে। নিছক উদরান্নের সংস্থানেই মানুষ কর্ম্ম করে না, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের কর্ত্তব্যবোধই তাহাকে অলস হইতে দেয় না। সেই কর্ত্তব্য-পালনের দায়িত্ব স্ত্রীপুত্রের প্রতি প্রেম হইতেই আসিয়া থাকে। নারীও তাহার গৃহকর্ত্তব্য পালন করে—স্বামী সন্তানের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়াস করে—তাহার সেই দায়িত্ববোধ ও কর্ত্তব্যপালন সেই ভালবাসার প্রবৃত্তি হইতেই আসিয়া থাকে।

মানবজীবনে প্রেমের প্রয়োজন

প্রেমকে ব্যাপক অর্থে এখানে প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু প্রেমের একটি সঙ্কুচিত সংজ্ঞা আছে। তাহা নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ। মহাপ্রকৃতি পরমপুরুষকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে। প্রকৃতির চঞ্চল লীলাবিক্ষেপে পুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইতেছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের সহস্র সৃষ্টি সংঘটিত

হইতেছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি প্রাকৃত নরনারী। তাহাদের আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলাকেই সহজভাবে আমরা প্রেম বলিয়া থাকি। জাগতিক জীবনে নরনাবীর মিলন মাত্রেই প্রেম আখ্যা লাভ করে। কিন্তু যাঁহাবা রসবোদ্ধা, সূক্ষ্মহৃদযবৃত্তিসম্পন্ন তাঁহারা দৈহিক উত্তেজনার বশে মিলন এবং একত্র সহবাস মাত্রকেই প্রেম বলিতে পারেন না। আহার-নিদ্রার মত দৈহিক প্রবৃত্তিও প্রাণীমাত্রের স্বভাব-ধর্ম্ম। সুতরাং যেখানে কেবলমাত্র দেহজ আকাঙ্ক্ষাই প্রধান—রতিসুখতৃপ্তিই মূল উদ্দেশ্য সেখানে প্রেমের অস্তিত্ব নাই। তাহা নিছক প্রবৃত্তি বা কাম। দৈহিক কামনাকে অতিক্রম করিয়া নরনারী যখন নিজস্ব বলিতে কিছুই রাখে না, স্বকীয় সুখ দুঃখ সকল কিছুই ভালবাসার পাত্রের জন্য উৎসর্গ করেন, তখন সেই বৃত্তিই প্রেম হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রেম কোন স্বর্গরাজ্যস্থিত নন্দনকাননের ফলবিশেষ নহে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই এই প্রেম ও কামকে আমবা নিরন্তর দেখিতে পাই। ইহা আমাদের জীবনের গভীরতম এবং প্রধানতম সংস্কার। এই প্রেমের অভাব ঘটিলে আমাদের জীবনযাত্রা দুরূহ হইয়া উঠে। মানুষে মানুষে এই প্রেমের অভাব স্বার্থ, লোলুপতা ও নিষ্ঠুরতাকে ডাকিযা আনে। আবার এই প্রেমের স্পর্শেই অতি কঠিন হৃদয সরস হইয়া কল্যাণ-কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করে। এই প্রেমই মানুষকে তাহাব তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে লইয়া যায। মানুষ ইহাকেই অবলম্বন করিয়া অসীম অনন্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

দেহাতীত প্রেম

"এই প্রেমগীতি হার
গাঁথা হয নরনারী মিলন মেলায,
কেহ দেয তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিযজনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ;
দেবতারে প্রিয করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

সাহিত্যে এই প্রেমই প্রধান বৃত্তি। দেহী এবং দেহাতীত প্রেমের কথা সর্ব্বকালের সকল সাহিত্যিকই লিখিযাছেন। জগতের আদিকাব্য রামায়ণ এই প্রেমের কথা লইযাই রচিত। প্রেমমুগ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটির বিয়োগে দ্বিতীয়ের অসহ্য মনোবেদনা আদিকবির অন্তরে প্রথম কবিতার

জন্ম দিল। তাই শৃঙ্গারকেই আদিরস বলা হইযাছে। রামসীতার সুগভীর প্রেম, পরস্পরের জন্য ব্যাকুলতা এবং বিচ্ছেদবেদনাই রামাযণের উপজীব্য। সেই গভীর প্রেমে বিঘ্ন ঘটাইযাছে মূর্ত্তিমান কাম রাক্ষসরাজ রাবণ এবং লালসার প্রতিমূর্ত্তি শূর্পণখা। রাম সঙ্গের কামনা তাহাকে প্রতিহিংসাপরাযণা করিযাছে, রাবণের কামকে সে উদ্দীপিত করিযা সীতাকে হরণ করাইযাছে। রামের ক্রোধাগ্নিতে তাহার পিতৃভূমি ভস্মীভূত হইযাছে।

প্রেমের আদর্শটি বঙ্গীয সাহিত্যে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে জানা ছিল না। মঙ্গলকাব্যগুলি এবং অনুবাদগ্রন্থগুলিতে সমাজের নানাকথা পাওযা যায। কিন্তু সেখানে গার্হস্থ্য জীবন ও কামনারই বিক্ষোভ দেখা যায। বিবাহিত নরনারীর দৈহিক মিলন বর্ণনাতেই কবি তাঁহার সকল কথা বলা শেষ করিযাছেন। দেহাতিরিক্ত কোন মনোভাব সেখানে প্রশ্রয পায নাই।

জযদেব বিদ্যাপতি এই বিষযে প্রথম নূতন পথের সন্ধান দিলেন। তাঁহাদের কাব্যে দৈহিক মিলন এবং দেহজ কামনা অনেকখানি স্থান লইযা আছে কিন্তু বহুস্থলেই এই কামনার উর্দ্ধে মন চলিযা গিযাছে। দেহকে অতিক্রম করিযা এই যে প্রেম তাহাই কাব্যকে রসসুষমা ও অনির্ব্বচনীয সৌন্দর্য্য দান করিযাছে। গীতগোবিন্দ শৃঙ্গাররসের কাব্য। কাব্যের বহুস্থলেই রাধাকৃষ্ণের মিলন এবং নানা কেলি-বিলাস বর্ণিত হইযাছে। কৃষ্ণের বহুবল্লভ রূপটি কবি নানা শ্লোকে পরিস্ফুট করিযাছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম এখানে অনেকখানি দেহজ কিন্তু কযেকটি শ্লোকে রাধার বেদনা যেভাবে কবি বর্ণনা করিযাছেন তাহাতে গীতগোবিন্দ আমাদের অন্তর্জগতে একটি অপূর্ব্ব রসের সৃজন করে।

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

> "হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
> বিরহবিহিত মরণেব নিকামম্॥"

ব্যাকুল হৃদযে রাধা হরির নাম জপ করিতেছেন, বিরহ তাঁহার কাছে মৃত্যুতুল্য হইয়াছে। প্রেমের মধ্যে কামনার ইঙ্গিত আছে কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা আছে। কামনাবৃন্তের উপর প্রেম সুরভিত শতদল হইয়া যখন ফুটে তখনই তাহা সাহিত্য হয। গীতগোবিন্দেও এই প্রেমের কথা —সেখানে কামনার ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু সেই কামকে অতিক্রম করিযা প্রেমের সৌরভ ছুটিয়াছে।

"নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিনীয় বসন্তং।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্॥

*　　*　　*

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলং।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্॥

*　　*　　*

রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়নসরোজম্।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্॥"

রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস বর্ণনায় এবংবিধ পদগুলিতে ইন্দ্রিয়কামনার চরম রূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখানেই গীতগোবিন্দের সব কথাটুকু শেষ হয় নাই। ইহার পরেও আছে দেহাতীত প্রেমের কথা—দুঃখের মধ্য দিয়াই প্রেমের পূর্ণ পরিচয়। রাধা কৃষ্ণবিরহে এই ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমকে পাইয়াছেন।

"ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥"

*　　*　　*

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥"

কবি বিদ্যাপতি রাজকবি—রাজকীয় রুচিকে তৃপ্ত করিবার জন্য নানা অলঙ্কারে তাঁহার কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। রাধার রূপকে সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে কৃষ্ণ দেখিয়াছেন—রাধার যৌবনশ্রীকে নানাভাবে তিনি বিশ্লেষণ করিতেছেন। রাধাকে সখীবৃন্দ কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য নানা কৌশল শিখাইতেছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনে মদনই গুরু হইয়াছেন—কৃষ্ণের কামনাকে উদ্দীপিত করিবার জন্য রাধা নানা ছলাকলার আশ্রয় লইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির পদ খুবই সুন্দর। চিত্রধর্ম্মী এই পদগুলি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করে, চোখের সম্মুখে একটা ছবি পরিষ্কার আঁকিয়া দেয়। কিন্তু কেবলমাত্র ইহাতেই যদি বিদ্যাপতির পদ শেষ হইত—যদি না তাঁহার পদে জীবনাধিক প্রেমের পরিচয় আমরা পাইতাম, তাহা হইলে মহাকালের হস্তে আজ অবধি ইহার সমাদর থাকিত না। জীবনের গভীরতম প্রদেশ হইতে যাহার উদ্ভব, দেহের সকল রক্তকণায় যাহার অস্তিত্ব, সেই প্রেমকেই বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীতে

বিদ্যাপতি

উপস্থিত করিযাছেন। সমসাময়িক বহু অলঙ্কারসমৃদ্ধ কাব্য লুপ্ত হইয়াছে বা অবজ্ঞাত হইয়া লোকচক্ষের অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। শৃঙ্গার রসের নানা বিচিত্র বিলাস আমাদের মনকে সাময়িকভাবে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু মানুষ তাহার দৈহিক প্রয়োজন মাত্রকেই সর্ব্বস্ব ভাবিতে পারে না। মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা ঐহিক প্রয়োজনকে মিটাইয়া তাহার উর্দ্ধতন গতি। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অনেক সময়েই আপনার পরম সত্তাটিকে বিস্মৃত হয়—কোনক্রমে দেহের প্রয়োজনগুলি মিটাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে চায়। কিন্তু মানুষের অন্তর-পুরুষ এই ক্ষুদ্র ভোগাসক্তির বন্ধন হইতে কিছুটা মুক্তি চায়। ভোগাসক্তি মানুষের প্রকৃত পরিচয় নহে। সাহিত্যেও সেইজন্য কাম ও প্রেমের কথা—নিছক দেহী প্রেম সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই—কামনা দুঃখের পুটপাকে শুদ্ধ হইয়া যখন দেহাতীত প্রেমে পরিণত হইয়াছে, তখনই তাহা সাহিত্যকে অমরত্ব দান করিযাছে। যথার্থ সাহিত্যের ইহাই স্বরূপ।

বিদ্যাপতির রাধা এই প্রেমের জন্য সকল দুঃখ বরণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে বহু স্থলেই প্রেমের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনের কথা আছে। দেহবোধ ক্রমেই লুপ্ত হইয়াছে—এমন কি স্ত্রীপুরুষ-ভেদও ঘুচিযা গিযাছে।

"আন জনমে হব কাণ ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥"

প্রতি মুহূর্ত্তের উৎকণ্ঠার দিবস শেষ হইল—প্রতি দিন প্রহর গণিয়া মাসও শেষ হইল—ক্রমে বৎসরও অতিক্রান্তপ্রায়—রাধা সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত এবং বিচ্ছেদ-বেদনায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অবশেষে যখন সুদীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটিল তখন সেখানে বিলাস কেলির কথা পাওয়া যায় না—হৃদয়ে হৃদয়ে একটা নিবিড় ঐক্যের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে।

"অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।"

বিদ্যাপতির নব নব ভাবোল্লাসের শেষ ও সেই সঙ্গে অশেষ কথা,—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥"

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। চণ্ডীদাস পার্থিব ও অপার্থিব দুই প্রেমরাজ্যকে একটি স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়াছেন।

"চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা॥"

প্রেমের জন্য প্রাণ যে তুচ্ছ—জীবনকে উৎসর্গ করিলে, স্বার্থ বলিযা কিছুই নিজের দিকে না রাখিলে তবেই সেই অমূল্য প্রেমসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদে তাই পাতায় পাতায় এই প্রাণবিসর্জ্জনের কথা। প্রাচীন সাহিত্যে প্রেমকে এতবড় মূল্য কেহই দেন নাই। তাই চণ্ডীদাসের পদাবলী আজিও স্বর্ণাক্ষরে রচিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র দুটি মানুষের প্রেম নহে—মানুষের কবি এই প্রেমকে জগৎব্যাপী দেখিতে চাহিয়াছেন। প্রেম ছাড়া সংসার অচল—এই সার তত্ত্বটি তিনি উপলব্ধি করিবাই গাহিয়াছিলেন—

চণ্ডীদাস

"পীরিতি নগরে বসত করিব
পীরিতে বাঁধিব ঘর
পীরিতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলই পর।"

প্রকৃত প্রেম তপস্যারই নামান্তর। সেখানে প্রেমিকের দৃষ্টিকে আবেশবিহ্বল করিবার জন্য বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। হৃদয়ের প্রেমাকূতিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। রাধার হাবভাব বিলাসকলার পরিচয় এখানে নাই। রাধা এখানে যোগিনী।

"বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।"

এই প্রেম একা রাধার উপচিত হয় নাই। প্রেমিকও রাধার প্রেমে আত্মহারা—রাধার নামমাত্রে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় বিবশ হইয়া পড়ে।

"মরি কোন বিধি আনি' সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মুরছি' পড়ল হামে।"

প্রেমের লক্ষণই তাহা দেহভেদ ঘুচাইয়া দেয়—এমন কি পরস্পর স্বকীয় সত্ত্বাকে বিস্মৃত হন।

"সই মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়
ভাবিতে তাহার রূপ॥"

চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেখানে প্রেমের আর্ত্তি অতি তীব্র। একটা তীক্ষ্ণ বেদনার সুর সমস্ত পদাবলীর ভিতর দিয়া অনুরণিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এক উচ্চ জগতের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দেহাকাঙ্ক্ষার কথা সেখানে পাই না, দেহবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কামনার চিহ্নমাত্র কোথাও থাকিতে পায় নাই।

এই জাতীয় কামগন্ধহীন প্রেমের কথা সকল বৈষ্ণব কবির পদেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য হয়। বলরামদাসের পদেও আসক্তিহীন রূপ-বর্ণনা দেখিতে পাই। কৃষ্ণের রূপ লালসাকে উদ্দীপিত করে নাই—তাহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের সকল তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

বলরামদাস

"মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥"

এই রূপের আকর্ষণ রাধাকে সংসারের সকল কিছুতে অনাসক্ত করিয়া দিয়াছে—তাহার চিত্ত আর কোন কিছুতে নিবিষ্ট থাকিতে পারিতেছে না।

"শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।"

জ্ঞানদাসের পদে বাহ্যরূপের চাকচিক্য, তজ্জন্য অলঙ্কারের আড়ম্বর স্থান পাইয়াছে। দৈহিক রূপ এবং সেই রূপের স্তুতিগান তাঁহার বহু পদেই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য প্রতিভাশালী কবি হইয়াও চণ্ডীদাসের ভাবানুগত কবি বলিয়াই তিনি পরিচিত। স্বকীয় বিশিষ্টতা সাহিত্যক্ষেত্রে

তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই। এযুগে প্রেম আর নূতন নাই—তাহাব সকল দিকটি উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য সমসাময়িক পদাবলীতে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশকে আলোড়িত করিয়া পদ রচিত হয় নাই। তবে কোথাও কোথাও জ্ঞানদাসের পদে কামগন্ধহীন সর্ব্বচিত্তবৃত্তিলোপকারী প্রেমের দেখা পাই। সেইজন্যই এই যুগের গতানুগতিক পদাবলীর রাজ্যের মধ্যে জ্ঞানদাসের পদগুলি দীপ্তি লাভ করিয়াছে। সহজ কথায় সহজ ভাবটি বলা হইয়াছে। সংসারের সকল কলঙ্ক, লোকনিন্দার ভয় প্রেমশক্তিতে শক্তিমতী শ্রীমতীর নিকট শ্যামের কাছে তাহা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এ প্রেমে লুকোচুরি নাই—কারণ এখানে কামের কথা নাই। শ্রীমতী তাই অপযশ ঘোষণাকে গ্রাহ্যও করেন নাই।

জ্ঞানদাস

"অপযশ-ঘোষণা যাক দেশে দেশে
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙা পায় এ তনু সঁপিল
তিল তুলসীদল দিযা॥"

ইহাই ত' প্রেম—সংসারের লাভালাভকে তুচ্ছ করিয়া—কেবলমাত্র প্রেমাস্পদের প্রীতিকামনা মাত্রেই আপনার সুখ পর্য্যবসিত হয়। ইহা অনেক উচ্চতর রাজ্যের সামগ্রী। এই ভাবের জন্যই জ্ঞানদাসের পদ রসিকজনের নিকট আজিও আদৃত।

কেবল রাধাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইযাছেন তাহা নহে। কৃষ্ণও এই প্রেমময়ীকে পূজা করিযাছেন।

"ভাঙ্গিয়া চূড়ার ফুল হাতে করি নিল।
নমঃ প্রেমময়ী বলে চরণেতে দিল॥"

এই যে প্রেমের কথা—প্রেমেতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়া গেল—এত বড় ভাবের কথা আর কেহ একালে বা সেকালে বড় কম শুনাইয়াছেন। প্রেমের নাম পূজা—তাহা পরস্পরের ইন্দ্রিয়সেবা মাত্র নহে। তাই জ্ঞানদাসও সেই শেষ ও অশেষ কথাটি বলিয়াছেন। প্রেমে দেহবোধ লুপ্ত হইবে—ইন্দ্রিয়কামনার চিহ্নমাত্র রহিবে না।

"শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।

একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥"

গোবিন্দদাস কবিরাজ এই প্রেমের পূজায় আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কৃষ্ণবল্লভা রাধাকে আরতি করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস

"জয় জয় বৃষ ভানু নন্দিনী
শ্যামমোহিনী রাধিকে।

* * *

গোবিন্দদাস তথি মাগয়ে ভকতি
নমো নমো দেবী রাধিকে ॥"

জ্ঞানদাসের মত গোবিন্দদাসের কৃষ্ণও রাধার চরণে হাত দেন, অভিসারিকার ক্লিষ্ট পদে হাত বুলাইয়া ক্লান্তি দূর করেন। গোবিন্দদাসের পদে প্রেমের বিচিত্র রূপ ফুটিয়াছে! দশেন্দ্রিয় প্রেমিকের রূপে আবদ্ধ—তাহার সকল শক্তি ঘুচিয়া গিয়াছে, চিত্ত অবশ হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমতী রাজনন্দিনী, কিন্তু এই প্রেমের আকর্ষণে তিনি দুর্য্যোগময়ী রাত্রি এবং প্রখর তপন কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। রাধা তিমিরাভিসারে যাত্রা করিয়াছেন—ঝঞ্ঝা এবং বর্ষণ প্রবলবেগে চলিতেছে—গভীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া গিয়াছে—বজ্রপাত হইতেছে। সর্পসঙ্কুল পথে পদে পদে পিছল এবং কঙ্কর। কিন্তু এই ভীষণ পথে রাধা অনন্তের উদ্দেশ্যে অভিসার করিয়াছেন—জীবনের মূল্য সেখানে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, কামনা বসনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র প্রেমই সর্ব্বস্ব হইয়া গিয়াছে।

"অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জীউ কাঁপ ॥

* * *

ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তঁহি বরিখত অনিরত জলধার ॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে গঙারব সো সুকুমারী ॥"

"ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নবনাগরী
জীবই বহু পুণ-ভাগ॥
যো পদতল বল কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টক ময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশঙ্ক॥"

"কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কহিহুঁ নাহি টলই।"

ইন্দ্রিয়বোধ লুপ্তিতেই এই প্রেমের কথা গোবিন্দদাস শেষ করেন নাই; তিনি প্রিয়তমকে বিশ্বের সকল কিছু বস্তুনিচয়ের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইযে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥"

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান প্রধান মহাজন পদাবলীকে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম সেখানে উভয়বিধ প্রেমের কথাই আছে। কিন্তু দেহাতীত প্রেমের কথাই বৈষ্ণব সাহিত্যকে চিরন্তন সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। আধুনিক যুগসাহিত্যেও এই প্রেমই প্রধান উপজীব্য বস্তু। সেখানেও আমরা দেখাইব যেখানে দেহাতীত প্রেম সেখানেই সাহিত্য সাময়িক গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াছে।

উভয় সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রধানতঃ ভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে পার্থিব প্রেমই একমাত্র উপজীব্য।

(খ)

আধুনিক কালের প্রথম কবি রঙ্গলাল। তাঁহার ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ ‘কাঞ্চী কাবেরী’ ‘কর্ম্ম দেবী’ প্রভৃতি কাব্য এক নূতন ভাবে রচিত। জাতীয়তাবাদের প্রথম সুর তাঁহারই কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। বীররসের সঙ্গে আদি ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁহার কাব্যে হইয়াছে। রঙ্গলালের কাব্যে আদি রসের এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখিতে পাই। এখানে প্রেমের জন্য জীবনবিসর্জ্জন কবি দেখাইয়াছেন—পৃথিবীর সকল প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া প্রেমই বড় হইয়াছে।

রঙ্গলাল

‘কর্ম্মদেবী’ কাহিনী-কাব্য এই প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী ভট্টিরাজ অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন। রাঠোর ভূপতির পুত্র অরণ্যকমলের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ কর্ম্মদেবী অস্বীকার করেন। অরণ্যকমলেব প্রতিহিংসা এবং বিপুল সেনাবল কর্ম্মদেবীকে ভীত করিতে পারে নাই। যাঁহাকে একবার চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পতিগৃহ যাত্রা কালেই কর্ম্মদেবীর ক্ষণিক স্বামীসঙ্গেব অবসান ঘটিল। প্রতিহিংসাপরারণ অরণ্যকমল সাধুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং সাধু নিহত হইল। কর্ম্মদেবী মৃত্যুসংবাদ পাইয়া স্বামীশূন্য জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। সাধুব কৃপাণ লইয়া নিজের বামবাহু ছেদন করিয়া ভ্রাতার হাতে দিয়া বলিলেন,

“আমাদের কুল-কবিবরে দিও
এই হস্ত রতন-মণ্ডিত।
সতীত্বের সঙ্গীত-আখ্যানে ভাই
গান যেন দাসীর চরিত।”

তাহার পর ডানহাতটি কাটিয়া লইয়া পতিগৃহে পাঠাইলেন।

“এই হস্ত পাঠাইও আমার
হৃদয়নাথ-পিতার নিকটে
জানিবেন এই কথা তিনি ভাই
বধূ তাঁর সুতযোগ্য বটে॥

পিতা স্থানে দাসীর এ শেষ ভিক্ষা
সাধু সহ দহি কলেবর
এই স্থানে সরসী খনন করি
নাম দেন কর্ম্মসরোবর ॥"

প্রেমের ও বীরত্বের এক উজ্জ্বল কাব্য রঙ্গলাল রচনা করিয়াছেন। এই প্রেম—যাহার নাম জীবনবিসর্জ্জন—যেখানে দেহবোধ অতিক্রান্ত হইয়াছে—তাহার কথাই রঙ্গলালের কাব্যকে উচ্চমূল্য দিয়াছে।

'পদ্মিনী উপাখ্যান'ও এই প্রেমের ও বীরত্বের কাহিনী। পদ্মিনীর রূপ-লালসায় কামোন্মত্ত হইয়া আলাউদ্দীন খিলজী চিতোর আক্রমণ করিয়াছে। কামনার বহ্নি সমগ্র চিতোরকে ধ্বংস করিল, কিন্তু দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দীন তবুও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিল না। সতীত্ব গৌরব ত' এই প্রেমেরই বিজয়কেতন। রাজপুতনারীগণ নিজেদের অবিচলিত প্রেমশিখাটিকে নিষ্কম্প রাখিবার জন্য জহরব্রতে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। প্রাণ তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ। নির্ম্মনুষ্য চিতোর দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দীনের প্রতি যেন বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। দিগ্বিজয়ীকে এই সতীত্বের মহা গৌরবের নিকট—প্রেমের জন্য এতবড় ত্যাগস্বীকারের নিকট—মাথা নত করিতে হইল। দেশপ্রেমও এই উপাখ্যানের প্রধান উপজীব্য বস্তু। এই উভয় প্রেম এই কাহিনীকে এত মধুর এবং চিরন্তনী করিয়াছে।

মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন বিদ্রোহী কবি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের ভাবগত ও ভাষাগত এক প্রচণ্ড বিপ্লব তিনি আনয়ন করিলেন। কিন্তু এই বিপ্লবী কবির রচনায় সাহিত্যের মূল লক্ষণটি বজায় রহিয়াছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' মূলতঃ বীররসের কাব্য, কিন্তু শৃঙ্গার ও করুণ রস সেখানে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়া কাব্যের দীপ্তি বাড়াইয়াছে। সীতাকে রাবণ কামোন্মত্ত হইয়া তাহার নিভৃত প্রণয়কুঞ্জ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিল—কিন্তু বিরহী রামচন্দ্রের অন্তরে যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহাতে লঙ্কা ধ্বংস হইল। রাবণ দুর্ব্বার নিয়তিকে ইহার জন্য দায়ী করিয়াছে, মধুসূদনও সেই দিকেই আলোক-পাত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় কথা রাবণ প্রেমকে অপমান করিয়াছে—সীতাকে রামচন্দ্রের বক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া বন্দিনী করিয়াছে। অবিরত এই বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস লঙ্কার আকাশ বাতাসকে অভিশপ্ত করিয়াছে। এই

দীর্ঘশ্বাস রাবণের সুখের সংসার ছারখার করিয়াছে। গভীর প্রেমাবদ্ধ দুইটি চিত্ত —মেঘনাদ ও প্রমীলা—রাবণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। মেঘনাদ লঙ্কায় আসিয়া সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছেন—প্রমীলার নিকট ফিরিতে পারেন নাই। স্বামীর জন্য বিহ্বল হইয়া প্রমীলা অবশেষে লঙ্কায় ফিরিতে মনস্থ করিয়াছেন। সখাগণ শত্রুসৈন্যের কথা বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই বাধাদানে প্রমীলা প্রচণ্ড তেজে বলিলেন—

> "কি বলিলি বাসন্তি।
> পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি যবে নদী বাহিরায়
> সিন্ধুর উদ্দেশে কার সাধ্য
> রোধে তার গতি।"

সত্যই তাই, এই প্রেমের বলেই সর্ব্বজয়ী হইয়া প্রমীলা অতি সহজেই লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়াছে। নদী যেমন সিন্ধুর উদ্দেশে বিপুল প্রবাহে বহিয়া যায়, যে তাহার গতিরোধ করে সেই নিমজ্জিত হয়—সেইরূপ এই প্রেম-প্রবাহিনীকেও রুদ্ধ করিবার শক্তি সংসারে কাহারও নাই। শেষ পর্য্যন্ত মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলাও নিজের জীবনকে মূল্যহীন ভাবিয়াছেন, স্বামীর চিতায় আপনার দেহকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমকেই সঙ্গী করিয়াছেন।

অশোক কাননে বন্দিনী সীতা প্রেমের আর এক করুণ চিত্ররূপ। সীতার কারুণ্য, তাঁহার বিচ্ছেদ-কাতরতা মধুসূদনকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই কয়েকটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিরহক্লিষ্টা তাপসিনী সীতামূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। দিবারাত্র রামের সঙ্গই তিনি চিন্তা করিয়াছেন। এই জীবন্ত প্রেমমূর্ত্তির নিকট কামার্ত্ত রাবণের সকল পরাক্রম শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। দেহাতীত প্রেম মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' চিরপুরাতন চিরনূতন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। মধু কবি তাঁহার ধর্ম্ম ছাড়িয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রাণধর্ম্ম—তাহার রসের উৎসটিকে ত্যাগ করেন নাই। সেই চিরন্তন ধর্ম্ম প্রেমেই অবস্থিত। বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবী শ্রীরাধাকে অবলম্বন করিয়া মধু কবি প্রেমের বিচিত্র রূপের এক মধুর গীতমালিকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধা যমুনাতটে বংশীধ্বনি শুনিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন। জলধর-পিপাসিনী চাতকীর মতই তিনি অস্থিরা। তাঁহার সেই ব্যাকুলতার কথা বলিয়া কবি

বৈষ্ণবকবিজনোচিত ভাবেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।

"চাতকী আমি সজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকিলো এখন ?
যাক মান যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ।" (বংশীধ্বনি)

কৃষ্ণবিরহিণী রাধা মৃত্যুকামনা করিয়াছেন। "পৃথিবী" কবিতায় রাধার বিরহবেদনা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বসন্তের অভাবে পৃথিবী যেমন শোভাশূন্যা শ্রীরাধাও কৃষ্ণবিরহে জীবন্মৃতা।

"হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচগো তুমি কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি থাক হে ধৈরজ ধরি,
কালে, মধু বসুধারে করে মধুদান।" (পৃথিবী)

"মলয়-মারুত" ও "নিকুঞ্জ বনে" কবিতায় রাধার বিলাপ মধু কবি বড় করুণ সুরে বলিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা 'শ্যাম কোথা, শ্যাম কোথা' করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এই পদগুলি পড়িলে বৈষ্ণব পদাবলী ও মাথুর পদগুলির কথা মনে করাইয়া দেয়। বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকটি পদের সহিত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজীসভ্যতাপুষ্ট মধু কবির রচিত পদের বিচিত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"রোপিণু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল সারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥" (শেখর)

"সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥

* * *

নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজ মাঝে ॥”

মধু কবির ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্যে এ জাতীয় পদের সন্ধান আমরা পাই।

“উতরিবে যবে যথা রাধিকা রমণ
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী সরমে কহিতে নারি,
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে আমি দিব কয়ে।” (মলয়-মারুত)

বিরহখিন্না রাধার বেদনা কবি অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই সহিত শেষ দুই ছত্র একটি চিরন্তনী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা একটি কোমল-মধুর নারীহৃদয়ের একটি অতিসুন্দর চিত্র মধু কবি অতি সামান্য কথায় প্রকাশ করিয়াছেন।

“কহ সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথায় আজি তোমার . ন ?
তব পদে বিলাপিনী, কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর।” (নিকুঞ্জবনে)

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে চেতন অচেতনে জ্ঞান হারাইয়াছেন।

মধু কবি মিলনের পদগুলিতে রাধার প্রিয়সম্ভাষণের যে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসম্মিলনের পদগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

“পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচজুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি।
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গনে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিহানে ॥

কদলি রোপব হম গরুয়া নিতম্ব।
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥"

মধু কবিও সেই কথাই বলিয়াছেন।

"সখি রে,—
এ যৌবনধন, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু, হইবে চন্দন বিন্দু;
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,
ভাবিয়া মনে।
কঙ্কন-কিঙ্কিনী ধ্বনি, বাজিবে লো সঘনে।"

দেখা যাইতেছে মধু কবি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও বৈষ্ণব কবি সাহিত্যের যে চিরন্তন রস পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও বিমুখ হন নাই।

নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্য 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এখানেও প্রেমের ভাব কতদূর ঊর্দ্ধে যাইতে পারে তাহার কথা আমরা পাই। সুভদ্রা পরম প্রেমময়ী—কৃষ্ণের ভগিনী ও শিষ্যা। তিনি এই প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিতা। শত্রুমিত্র-ভেদ ভুলিয়া কুরুক্ষেত্র শিবিরে সেবা করিয়াছেন। সুলোচনার প্রশ্নের উত্তরে সুভদ্রা কয়েকটি অমূল্য কথায় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীতে প্রেমের সূত্রপাত হয়—তাহার পর তাহা বিশ্বজনে প্রসারিত হইয়া বিশ্বনাথের উদ্দেশে ছুটিয়া যায়। তাঁহার এই প্রেমের আদর্শ শৈলের জীবনেও দেখিতে পাই। শৈল অর্জ্জুনকে গভীরভাবে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার সে প্রেমের কোনদিনই বহিপ্রর্কাশ ঘটে নাই। সমগ্র জীবন ধরিয়া সে সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—অর্জ্জুনের কল্যাণ কামনাই তাহার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। জরুৎকারু প্রেমের আর এক চিত্র। কৃষ্ণকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার দেহের প্রতি শোণিতকণায় বহিত। কিন্তু সে প্রেমে কামনার নির্য্যাসই অধিক ছিল—প্রেমের সুরভিটি তখনও ছুটে নাই। তাই প্রাপ্তিকেই সে বড় ভাবিয়াছিল। কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাইয়াছিল। নিজের কামতৃপ্তিই তাহার নিকট প্রধান হইয়াছিল—তাই প্রেমাস্পদের মঙ্গল কামনা না করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—

নবীনচন্দ্র

"জ্বালাইলে যে শ্মশান, করিবে অনার্য্যা প্রাণ
তব তপ্ত রক্তে নিবারণ।"

সত্যকারের প্রেম প্রতিদান প্রত্যাশা করে না, তাহা কেবলমাত্র দিয়াই সুখী। জরুৎকারুর কামনা অবশেষে কৃষ্ণের প্রাণহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং নিজেও সেই ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। প্রকৃত প্রেমের অভাবে তাহার জীবনে এক ব্যর্থ জ্বালাময় অগ্নিদাহের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব দেখা যায়। 'কুরুক্ষেত্রে' ও 'প্রভাসে' কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলতা এবং নাম-প্রেমের গৌরব ঘোষিত হইয়াছে।

আখ্যায়িকা কাব্যের পর গীতিকবিতার যুগ। গীতিকবিতা মানুষের নিবিড় রসানুভূতিকে প্রকাশ করে।

বিহারীলাল

বিহারীলালের "প্রেম-প্রবাহিনী" এই দেহাতীত প্রেমের কথা লইয়াই রচিত। সংসারে প্রেম অবহেলিত, কবি তাই বিষণ্ণ—অকস্মাৎ দৈবীপ্রেমের আনন্দ তিনি উপলব্ধি করিলেন।

"আজি বিশ্ব আলো কার কিরণ-নিকরে,
হৃদয় উথলে কার জয়ধ্বনি করে,—
ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরী-তান উঠিছে কেবল।
মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে,
দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ-ভরে।"

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গল'। এখানে ভাবাবেগ খুব সুপরিস্ফুট নহে—কিছুটা ঘোলাটে। কিন্তু ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় কবি তাঁহার অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীকে ভালবাসিয়াছেন। তাঁহারই প্রেমে সমস্ত সংসারকে ভুলিয়া তাঁহারই উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি, কিন্তু সাহিত্যের মূল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ইহা সম্পূর্ণ মনোগত বিষয় লইয়া রচিত। বাল্মীকির কবিমানসে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব হইতে কাব্যের মূল বিষয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। ক্রৌঞ্চবিরহ কবিগুরুর মানসলোকে করুণার জন্ম দিল। সেই করুণার প্রস্রবণ বাহিয়া দেবীর আবির্ভাব ঘটিল। ইনি বিহারীলালের সারদা। এই সারদার উদ্দেশ্যে কবি সংসারের সকল চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া

অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন।

"কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে॥"

কবি সারদাকে অন্বেষণ করিয়া বিষণ্ণ, ব্যথিত—কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র রূপে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছেন। অবশেষে হিমালয়ের উদার প্রশান্ত পটভূমিকায় কবি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতাকে পাইয়াছেন এবং বিমল আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে।

"এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!"

বিহারীলালের নিকট প্রেম ও সৌন্দর্য্য এক হইয়া গিয়াছিল। সারদার মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়াছেন। নরনারীর চিরন্তন অনন্ত প্রেম সারদারই লীলার স্ফূর্ত্তি। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব কবির মনে সন্দেহ জাগাইয়াছে। প্রেম, স্নেহ সকলই জীবনের ভুল কি না কবি জানিতে চাহিয়াছেন কিন্তু কবি নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই প্রেম জীবনের ভুল হইলেও তাহাই বিশ্বসৃষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে এবং অগ্রগতির পথে চালিত করিতেছে। প্রেমের উৎসের অন্তরালে আছেন অনন্ত মায়ারূপিণী, অনন্ত রহস্যময়ী সারদা। বিহারীলালের কাব্যে প্রেমের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বিহারীলালে সারদাকে অবলম্বন করিয়া যে মিষ্টিসিজমের সূত্রপাত দেখিতে পাই, তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গভাবে বৈষ্ণব

রবীন্দ্রনাথ

কবি ছিলেন। সংসারের রূপ, রস, গন্ধের ভিতরই তিনি তাঁহার জীবনদেবতাকে অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেই জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে অভিসারের কথাই

আমরা পাই। প্রকৃতির সঙ্গে একদিকে তিনি উপনিষদের ঋষির মতই একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন—অপরদিকে প্রেমবিহ্বলচিত্তে সেই অনন্ত অসীমের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সকল কাব্যগ্রন্থে সাংসারিক ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া বৃহতের সহিত মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিশোর কবির প্রথম রচনাতেই যে ভাব স্ফুট হইয়াছে তাহা ঐ দেহাতীত প্রেমেরই কথা। সব কথার সার তত্ত্বটি কবির intuition তখনই অনুভব করিয়াছিল। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে রাধা মরণকে শ্যামাপেক্ষা প্রিয় ভাবিয়াছে, কিন্তু কবি জানাইয়াছেন প্রেম মরণেরও অধিক—

"ভানুসিংহ কহে, ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি—
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহু দেখ বিচারি।"

যদিও বৈষ্ণব-কবিগণের ভাবের অনুকৃতি এখানে আছে, তবু প্রকৃত সত্য কবির হৃদয়ে তখনই আলোকপাত করিয়াছিল।

কবি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" রচনা করিলেন। কবি-মানসের অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণ, বিশ্বের সহিত একাত্ম হইবার একটা বিপুল প্রয়াস অপূর্ব্ব ছন্দে রূপ পাইয়াছে।

"রাহুর প্রেম" কাব্যে কবি কামনান্ধ প্রেমের এক বর্ণনা দিয়াছেন—এই দেহীপ্রেম তাহার প্রেমাস্পদকে সঙ্কীর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহার সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়—আপনার ভালবাসার ক্ষুধাকেই বড় করিয়া তোলে।

"জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়,—
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরাময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া এই তো নিয়ম ভবে—
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে॥"

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দৈহিক প্রেমের তীব্রতা এবং আকর্ষণ সনেটগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। "চুম্বন" "বাহু" "চরণ" "স্মৃতি" "হৃদয় আসন" সর্ব্বত্রই দৈহিক প্রেমই মূর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু দেহের মিলনেই তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। দেহাতীত প্রেমের জন্য কামনাকে অতিক্রম

করিতে তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়াছে।

"দাও খুলে দাও সখী, ওই বাহুপাশ
চুম্বন মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস—
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
* * *
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধোনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥" (বন্দী)

"কেন" "মোহ" "মরীচিকা" প্রভৃতি সনেটে মোহভঙ্গের জন্য বেদনা রূপ পাইয়াছে—একটা প্রচণ্ড অতৃপ্তি এবং অপূর্ণতা লইয়া কবি বেদনার্ত্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন। কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—

"বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে!
মিলন-দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে॥" (বিরহানন্দ)

এই তত্ত্বের ভাবটি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে কবি পাইয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণও বিরহকে সকল ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিযাছেন, কেন না বিরহে প্রেম চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করে। মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের ভাবনা থাকে তাই মিলন এত মধুর।

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" (চণ্ডীদাস)

'মানসী' কাব্যগ্রন্থে দৈহিক প্রেমের পরম কথা ও চরম পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে "নারীর উক্তি" ও "পুরুষের উক্তি" কাব্যে। দৈহিক কামনা মাত্র যেখানে সম্বল সেখানে আকর্ষণ পুরাতন হইলেই ছিন্ন হইয়া যায। জাগতিক নরনারীর মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। মোহপাশ ছিন্ন হইলেই আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটে, তখন প্রিয়পাত্রকে আর ভাল লাগে না।

"মনে হয়, এ কি সব ফাঁকি!
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
* * *
এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে!
উঠিবারে করি প্রাণপণ—
* * *

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান ধারণায় !
*   *   *
সৌন্দর্য্যসম্পদ মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা !"

'সোণার তরী' কাব্যে কবি প্রকৃতির সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বের সহিত নিজের সত্তাকে তিনি মিশাইয়া দিতে চাহিযাছেন। "সমুদ্রের প্রতি", "বসুন্ধরা", "যেতে নাহি দিব", "বন্ধন" প্রভৃতি কবিতায় এই জগৎসংসার তিনি সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং ধরণীর প্রতি ধূলিকণার সহিত প্রেমবন্ধন অনুভব করিয়াছেন। এইখানেই কবি আপনার অন্তরাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "মানস সুন্দরী" কবিতা বাহ্যতঃ জাগতিক প্রিযার উদ্দেশ্যে লেখা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু অন্তরস্থিত সেই পরমা দেবীকেই তিনি হৃদয়ের গভীরতম উত্তাপ দিয়া ভালবাসিয়াছেন এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছেন। এই চাওয়ার মধ্যে অবশ্য কামনার তরঙ্গবিক্ষেপই অধিক। "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় তাঁহার চিত্ত এই মানসীর উদ্দেশ্যে অভিসারযাত্রা করিযাছে।

'বিদায় অভিশাপ' কাহিনী কাব্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রেমের কথা। দেবযানী কচকে সংসারের বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে অভিশাপ দিল। আপনার কামনার তৃপ্তিই তাহার বাঞ্ছা ছিল, সেইজন্য কচের মহত্তর উদ্দেশ্যকে সে সার্থক করিবার চেষ্টা করিল না। কিন্তু কচ দেহী প্রেমকে অতিক্রম করিয়াছিল, শান্ত হৃদযে সে এই বিচ্ছেদকে সহ্য করিল, অভিশাপকে গ্রহণ করিল এবং প্রেমাস্পদার মঙ্গল কামনা করিল।

'চিত্রা'য "বিজয়িনী" কাব্যে কবি মদনের পরাজয় বর্ণনা করিযাছেন। কামনাহীন রূপের নিকট মদনের উদ্যত ধনুও স্তব্ধ হইয়া যায়। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী পরিপূর্ণা, সেখানে কামনার আবেগ স্থির হইয়া যায়। "জীবনদেবতা" ও "অন্তর্য্যামী" কবিতায় কবি বাক্যমনের অতীত অনুভূতিগ্রাহ্য সেই পরমপুরুষ বা পরমাপ্রকৃতিকে অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি গভীর প্রেমে কবি অপ্রাপ্তির তীব্র বেদনা ভোগ করিযাছেন। তাঁহার সহিত মিলনের জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

"মদন ভস্মের পরে" কবিতা আদিরসের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। ক্ষুদ্র ভোগ-

কামনার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ না রাখিয়া কবি বিশ্বের সমগ্র রূপ নিচয়ে এই রূপের অতীতকে দেখিয়াছেন। কবি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাধকের মহাভাব লাভ করিয়াছেন।

"বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।"

"অভিসার" কবিতায় বাসবদত্তা আপনার রূপলাবণ্য দিয়া উপগুপ্তকে জয় করিতে গিয়া ব্যর্থ হইল। কিন্তু যেদিন করাল ব্যাধিতে আক্রান্তা বাসবদত্তাকে নগরবাসীগণ পরিত্যাগ করিল সেদিন উপগুপ্ত তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। বাসবদত্তার অভিসার যাত্রা সার্থক হইল—রূপলাবণ্য পরাস্ত হইল, অন্তরের প্রেম কালব্যাধিকেও ভয় করিল না—কেননা প্রেম অমৃত পানে জয়ী। মৃত্যুঞ্জয়ী এই প্রেমের কথা কবি বহুক্ষেত্রেই বলিয়াছেন—

"প্রেম বলে
সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির অধিকার লিপি। তাই স্ফীত বুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু, তুমি নাই।'—হেন গর্ব্ব কথা!" (যেতে নাহি দিব)

"পরিশোধ" কাব্যে শ্যামা বজ্রসেনের রূপে মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে পাইবার কামনায় প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী উত্তীয়কে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করে। নিজের কামনা তাহার হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। বজ্রসেন নিজের মুক্তির এই দারুণ মূল্য এবং শ্যামার কামনার বীভৎস রূপ দেখিয়া শ্যামাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। শ্যামাও প্রেমকে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র দৈহিক লালসাকেই বড় করিবার শাস্তি পাইল।

'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতি গ্রন্থে কবিচিত্ত অন্তর দেবতার প্রতি অভিসারে যাত্রা করিয়াছে। তাঁহার প্রেমে আপনাকে বিলাইয়া দিতে

চাহিয়াছেন, তাঁহার জন্য তিনি অচিরবিরহিণীর মত ব্যাকুল প্রতীক্ষারতা। বৈষ্ণব কবির সঙ্গে তাঁহার এখানে ঐক্য ঘটিয়াছে। হৃদয়স্বামী তাঁহার হৃদয়ের বড় কাছাকাছি আসিয়াছেন। ভারতীয় সাধনাধারার মূল তত্ত্ব—পরম পুরুষের সহিত ক্ষুদ্র সত্ত্বার গভীর আকর্ষণ ও মিলনের কথাই এই কবিতাগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে।

"জীবনের সহজ অনুভূতির মধ্যেই যে পরম উপলব্ধির মৌলিক তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই তত্ত্ব পরম কবিত্বময় প্রস্ফুট রূপ লাভ করিয়াছে। রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা কবিরই, সাধারণ জীবধর্ম্মীর নয়। রূপরসের তৃপ্তিতেই কবির সাধনার পূর্ণতা। জীবধর্ম্মের সাধনায় তৃপ্তি নাই, সেখানে অপরিপূর্ণতার বেদনা, জন্ম হইতে জন্মান্তরের আকূতি।" (সুকুমার সেন)

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।" (গীতাঞ্জলি)

"অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
এমন সুমধুর॥" (গীতাঞ্জলি)

"শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে

* * *

তোমারে সঘনে রহে আঁকড়িয়া, হিয়া কাঁপে থর থরে—
দুঃখ দিনের ঝড়ে।

* * *

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন তলে রহিবে জাগিয়া—
শতযুগ করি মানিবে তখন ক্ষণেক অদর্শনে
তুমি বুঝিয়াছ মনে॥" (বালিকা বধূ)

"তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাজ।
নাইবা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয়রাজ॥" (দান)

"তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে,
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে?" (কৃপণ)

'বলাকা'র কবিতাগুলির মধ্যে যাহা কিছু জীর্ণ পুরাতন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা প্রকট হইয়াছে। "চরৈবেতি" মানুষের আত্মাপুরুষের কথা। 'বলাকা'য় আত্মার সেই মহাবন্ধনমুক্তির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ প্রেম ও মোহাবেশ জীবনকে রুদ্ধ করে, তাহার প্রকাশের পথকে বন্ধ করে।

"যে প্রেম সম্মুখ-পানে
চলিত চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে—
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।" (শা-জাহান)

"বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে, না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান॥" (দান)

রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেমিক—সমগ্র বিশ্বের সহিত তাঁহার প্রীতির বন্ধন। তাই মানবাত্মা যখনই অবমানিত হইয়াছে—নিপীড়িত মানবের দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সাধনার ধারা, বিশ্বের সহিত একাত্মাতবোধ কবির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। 'বলাকা' কাব্যের মধ্যে এই একাত্মতা ও বেদনাবোধ রূপ পাইয়াছে।

"জানি জানি, তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা সম বাণ বাজিবে বক্ষে।

* * *

বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয় ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥" (শঙ্খ)

বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়তাণ্ডবে কবি রুদ্রেরই মার্জ্জনাদণ্ডাঘাত লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস, এই যে আত্মত্যাগ, এই যে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা, এ তপস্যার মূল্যে স্বর্গও বিক্রীত হইয়া যায়। সুতরাং

"বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যু ঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্য সীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

'পূরবী'র সুরে সন্ধ্যার গোধূলিচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। "আহ্বান" কবিতায় কবি তাঁহার পরম প্রেমিকের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

"আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিযা।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিযাছে দ্বার
থাকিযা থাকিযা।

* * *

নিদ্রাহীন বেদনায ভাবি, কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।"

পরম পুরুষের প্রেমে তিনি নিজেকে নিঃশেষে মিলাইযা দিতে চাহিযাছেন।

"তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশীর রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয আমার আলো মিলিযে খেলা হবে
নয আরতির বাতি॥" (খেলা)

'মহুয়া' পুরাপুরি প্রেমকাব্য। প্রেমের নানা বিচিত্র কথা, মিলন-বিরহের মন-দেওযা-নেওযার পালার কথা এর নানা কবিতায কবি লিখিযাছেন। এই প্রেমে কোন বন্ধন নাই—কেবল প্রেমের ভেলাটিকে আশ্রয করিযা অনন্ত পথে অভিসার।

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজনে চলতি হাওযার পন্থী।

* * *

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ ;

*　　*　　*

ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তি-প্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে দীপ্ত ॥" (পথের বাঁধন)

প্রেমের শক্তির নিকট জীবনের সকল দুর্য্যোগ এমন কি মৃত্যুভয়ও তুচ্ছ। কেবলমাত্র সুখের ললিত তরঙ্গে গা ভাসানোতেই প্রেমের পরিচয় পূর্ণ হয় না। নির্ভরতাই প্রেমের বৃহৎ স্বাক্ষর, দুজনের মিলিত জীবন সত্যের উপর দুঃখ ঝঞ্ঝার বেগে অচঞ্চল থাকিয়া প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার বাণী কবি জানাইযাছেন।

"আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।

*　　*　　*

উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দ্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।

*　　*　　*

মৃত্যুর মুখে দাঁড়াযে জানিব—তুমি আছ, আমি আছি ॥" (নির্ভয়)

ত্যাগের মধ্যেই প্রেমের মর্য্যাদা—ভিক্ষার আকিঞ্চনে প্রেমকেই অবমাননা করা হয়। প্রেম ভিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায না—তাহাতে প্রেমকেও পাওয়া যায না—নিজের আত্মাকেও অবনমিত করা হয। অনন্ত বিচ্ছদকেও কবি ক্ষণিকের কামার্ত্ত মিলন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করিয়াছেন।

"প্রেমেরে বাড়াতে গিযে মিশাব না ফাঁকি
সীমারে মানিয়া তার মর্য্যাদা রাখি—
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয় ॥" (দায়মোচন)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মননাতিরেক ও হৃদয়বিরলতা, সাধারণভাবে সত্যেন্দ্র কাব্যের এই দুই প্রধান লক্ষণের কথা স্বীকার করিলেও তাঁহার শেষ পর্ব্বের রচনায় নারীপ্রেম ও সৌন্দর্য্যপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে।

'ফুলের ফসল' কাব্যে কবির রচনায় প্রেমের তীব্র আবেগ ও বিচ্ছেদের

কারুণ্য গানে ফুটিয়াছে ।

"হায় ভালবাসার আলয় সে যে
চির স্বপনে।
আমি বাঁধিতে তায় চেয়েছিলাম
জীবন-পণে।
সে যে সুখের বুকে কেঁদে উঠে
দুখের পায়ে প'ড়ল লুটে,
জ্যোৎস্না রাতে এসে, মিশে
গেল তপনে।"

প্রকৃতির রূপে রসে কবির অন্তর যখন পূর্ণ হইয়াছে, তখন প্রেমের মুগ্ধ আবেশ তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। 'কুহু ও কেকা'র নিম্নোদ্ধৃত পদটি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদকে মনে করাইয়া দেয়।

"হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ কুহর মাঝে স্বপন ঘেরা গহ্বরে।
যেখানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎস্না
স্মিরিতি সাথে পীরিতি আজি মন্দ্র-মধু-মন্থরে।"

"সেই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউঁ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ-বান হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা॥" (বিদ্যাপতি)

"এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান।
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥" (চণ্ডীদাস)

স্থূল চক্ষুকর্ণকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত কবিকল্পনা রূপে প্রেমে বিচিত্র কাব্যানুভূতির সৃজন করিয়াছে।

"স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া।" (জ্যোৎস্না-মদিরা)

"সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য এক নারীমূর্ত্তির রূপক আশ্রয় করে গূঢ়-গভীর ধ্যানের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। সেই সৌন্দর্য্যধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে কবি দেখিয়াছেন যে মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য বটে, কিন্তু তা অনির্ব্বচনীয় অরূপেরই সংকেত।" (হরপ্রসাদ মিত্র)

"প্রিয় প্রদক্ষিণ", "তুমি ও আমি" প্রভৃতি কবিতায় নিবিড় মিলন ও বিরহের বেদনার উপলব্ধি কবি করিয়াছেন।

"তুমি ও আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুলজনমে ;—ছিলাম যখন পাপড়ি ঘেরা সিংহাসনে ;

* * *

তফাৎ হয়ে নেইকো তৃপ্তি, দুঠাঁই হয়ে দুখ মেনেছি
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি, হারিয়ে পাওয়ার স্বাদ পেয়েছি।"

"শোভিকা" কাব্যে রূপ ঐশ্বর্য্য, ভোগলালসাকে সকল কিছুই প্রেমের স্পর্শে কেমন করিয়া তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে তাহা নটী শোভিকার মর্ম্মকাহিনীর মধ্য দিয়া কবি ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মন যাহা চায় হায় গো সে ধন
বাহু যদি ঘেরে রাহুর মত

* * *

ভোগের পরশ নাশে ভালবাসা
পাণ্ডু অরুচি দেয় গো উঁকি।"

"এত কাছে হায় তবু এত দূর।
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর
কাছে আসি ভালবেসে,—
নিশাস নিশাস মেশে,
নাগাল না পাই তবু পরাণ বঁধুর।

(চিরসুদূর—ফুলের ফসল)

"ভুলব ভেবে ভুল করেছি
ভোলা অত সহজ নয় ;
অনেক দিনের অনেক দুখের
ভালবাসা অনেক সয়।" (পুরানো প্রেম)

এই রূপাতীত প্রেম—দেহাতীত সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে মর্ম্মগ্রাহী কবি

অনুভব করিয়াছিলেন। তাই সেই চিরসত্য, মৃত্যুহীন সুন্দরের বন্দনাগান তিনি মৃত্যুছায়াতলে বসিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"আনন্দে তোর নিত্য-বোধন, পূজা শিরীষ ফুলে,
আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে,
রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের রক্ত নদীর কূলে,
পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে।" (কে)

করুণানিধান

কবি করুণানিধানের কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য একটা রহস্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার কবিতায় রূপের পূজা আছে কিন্তু এই রূপের সীমা ছাড়াইয়া অরূপ দেখা দিয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসিয়াছেন—প্রকৃতির রূপ-সম্ভোগে তিনি আবেগময়ী ভাষায় প্রকৃতি লক্ষ্মীর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই প্রকৃতি প্রেম ও রূপসম্ভোগকে অতিক্রম করিয়া অরূপ উঁকি মারিয়াছেন।

"শেষ মিনতি শেষ-তৃষাতে
পাইনি নাগাল আকুল হাতে ;—
রূপ হারালো রূপের লীলা
বন-পলাশে আলোক ঢেলে।" (শতনরী)
"পূর্ণিমার কোন্ পাবে
ডাকে যেন কে আমারে
সুপ্ত অজগব রাত্রি-রূপ ;" (শেষ)

করুণানিধান অন্তরে বৈষ্ণব কবি। প্রীতিবিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি জগৎকে দেখিয়াছেন। প্রকৃতির রূপ রসে তিনি মাধুর্য্য বিকীরণ করিয়াছেন—তিনি মধুর রসের কবি।

"সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী।
কোন সে দেশে হাওয়ায় ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী।" (মনোহারিকা

"চৈত্র-রাতি, আকুল রতি ফুল শরে।
ঘর ছেড়ে চল্ তমাল-বীথির পথ ধরে।
কোন্ পুলিনে নীল-সলিলে
খেলবি খেলা সবাই মিলে ;
মন্ত্র নিবি বন্-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধ'রে !"

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যের "ভিতর দিযা একটি বিশিষ্ট ভাব-সাধনা প্রকাশ পাইতেছে। উহা রূপের সাধনা, সৌন্দর্য্যের সাধনা, এবং সেই হেতু উহা সার্ব্বভৌমিক বা সার্ব্বজনীন। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যপ্রীতিরও এখানে একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে ; এই পিপাসা ইন্দ্রিযতৃপ্তির পিপাসা নয—ইহাই প্রেম। এই পিপাসা পরম-সুন্দরের নিকট আত্মনিবেদন করিযাই কৃতার্থ হয, নিঃশ্রেযসকে লাভ করে ; উহা সেই অপর সৌন্দর্য্য-পিপাসা নয, যাহা সুন্দরকে ভোগ্যবস্তুরূপে একরূপে আত্মাসেবার উপকরণরূপে ভোগ করিতে চায।" (মোহিতলাল মজুমদার)

কবি কুমুদরঞ্জন খাঁটি বৈষ্ণব কবি। কবি প্রকৃত প্রেমিক—বিশ্বের ছোট বড় সকল বস্তুনিচযে তাঁহার অন্তরের মধু ঝরিয়া পড়িযাছে।

"হযত আমার এ পথে আর
হবে নাক' আসা,
দুধারে যাই রোপন ক'রে
বুকের ভালবাসা।
*　　*　　*
মমতা মোর পথের কীটও
পায যেন হায, পায যেন গো
*　　*　　*
হযত কারো হরবে ক্ষুধা
আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারো করবে দেহ
অশ্রু দীঘির জল।" (হয়ত)

মানব-প্রীতি ও প্রকৃতি-প্রেমই কুমুদরঞ্জনের কাব্যে বড় হইযা দেখা দিয়াছে।

"পথে দেখেছিনু হা-ঘরে বালক
কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যেতে
ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ বাদলে ম্লান মুখ তার
উঁকি ঝুঁকি মারে চিতে।" (পথের দাবী)

"যেন মা তোমার স্নেহের দীঘিতে
কমলের সাথে নাইতে পাই
যেন মা তোমার বিপিন-ভবনে
পাপিয়ার সাথে গাইতে পাই।" (পল্লী-শ্রী)

"আর কি তোমার কোমল কোলে মা
পাব না ক' আমি ফিরতে—
শৈশব-সুখ-স্বর্গ আমার
সরযূর তীর তীর্থে?" (প্রবাসী)

প্রিয়া-বিরহ কবি অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রেমকে একেবারে নিজস্ব ব্যাপার ভাবেন নাই। প্রেমের স্বরূপ বিষয়ে কবি খাঁটি কথা বলিয়াছেন।

"মধুর ভবে শুধু নীরব ভালবাসা,
হৃদয়-অনুভব হৃদয়ে :
জগৎ মাঝে রয়ে জগৎ ভুলে থাকা,
একেতে মিশে থাকা উভয়ে।

* * *

সুনীল নভসম প্রেম যে নিরমল
নাহিক উচ্ছ্বাস তাহাতে,

* * *

প্রণয় ফুরাইলে জাগিয়া উঠে ভাষা—
দেখানো আলপনা-চাতুরী। (প্রেম ও ভাষা)

এবার আধুনিক কাব্য কবিতার যুগ। নানা বিপর্য্যয় এবং সমস্যাকীর্ণ পথে আজিকার কবিদের যাত্রা সুরু হইয়াছে। কিন্তু এই ভাঙ্গা-গড়ার দিনে প্রকৃত কাব্যের বহিরঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইলেও অন্তরঙ্গ লক্ষণ চিরকাল এক। এই যুগের কবি দৈহিক প্রেমের বিকারকে অধিকতর বিশ্লেষণ করিয়াছেন—কিন্তু তাহাকেই শ্রেয় বলেন নাই। কবি যদি তাহা করিতেন তবে উহা অকাব্য হইত।

আধুনিক কবি প্রেমকে ছাটিয়া ফেলিতে চান, কেননা আজিকার সমস্যাকীর্ণ জীবনযাত্রায় মনোবিলাসের সময় নাই। কিন্তু প্রেম ত' মাত্র অবসর যাপন নয়, তাহা মানুষের রক্তগত সংস্কার। জীবধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ ও উন্নত সংস্কারই প্রেম। কবি তাই বিরহিণী প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন।

প্রেমেন্ মিত্র

"প্রিযার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায নিশীথ মাযা।

* * *

বুঝি ছুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে।
সে মিনতি রাখি সময় যে হায নাই।" (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

প্রেমের আবির্ভাবে আধুনিক কবির হৃদযও স্নিগ্ধ হইয়াছে—জীবনের সর্ব্বত্রই ইহার মাধুরী বিকীর্ণ হইয়াছে।

"তোমার নযন হ'তে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায ;
মিছে আজ হৃদযের
স্মরণ বাড়াতে চায
মরণ শাসায।"

সংসারে প্রেম মঙ্গল ও কল্যাণ আনে, সংসার শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। এই প্রেমের অভাবই মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পরস্পর লোভোন্মত্ত হইয়া অমঙ্গল ও অশান্তি ডাকিয়া লইয়া আসে। কবি অন্তর হইতে আকুলভাবে এই প্রেমকে আহ্বান করিয়াছেন।

"পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না পায় ;
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি,
আমাদের বেদনায়।
তারা যেন সবে ভালবাসে।"

"বুদ্ধদেবের মনের ধর্ম্ম প্রেম। তিনি প্রধানতঃ প্রেমের কবি। এজন্য তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ......প্রধানতঃ প্রেমের কাব্য।" (দীপ্তি ত্রিপাঠি) তাঁহার কবিতার মধ্যে দৈহিক বাসনার তীব্রতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। লালসার অগ্নিশিক্ষা তীব্রভাবে তাঁহার কবিতায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই কামনাকে তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তীব্র তৃষ্ণা ও তৃপ্তিহীনতার অনির্ব্বাণ জ্বালা—একটা প্রচণ্ড বেদনা, ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা তাঁহার কবিতায় রূপ পাইয়াছে। তিনি বিধাতাকে অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছেন, কামনার লোলুপ জিহ্বা সুন্দর ও কল্যাণকে বিতাড়িত করে।

বুদ্ধদেব বসু

"আনন্দ নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়।"
(বন্দীর বন্দনা)

"সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।
* * *
যৌবন আমার অভিশাপ।" (শাপভ্রষ্ট)

প্রেমের দেহীরূপ কবির অন্তরে কামনার প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়াছে। কামনার নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্য কবির ব্যাকুল পিপাসা জাগিয়াছে। তিনি কবির সত্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছেন কামনার পরিতৃপ্তিতেই মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ নয়—

"বিধাতা, জানো না তুমি কি অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।" (বন্দীর বন্দনা)

দেহের আশ্রয়েই প্রেমের অবস্থান কিন্তু সেই কামনার অগ্নিকে প্রেমে শুদ্ধ

করিয়া কবি দেহী ও দেহাতীত প্রেমের দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন।

"এই দেহ-ধূপ দহি' উঠিয়াছে কামনার ধূম,—
তাহারই সুগন্ধে মোর স্নায়ুতন্ত্রী শিহরিত ! সেই মোর কলঙ্ক কুসুম।"
(পাপী)

দেহের বর্ণনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে দেহের কারাগার হইতে তিনি বারংবার মুক্তি চাহিয়াছেন। দেহেব কামনার সঙ্গে প্রেমের যে সম্পর্ক নাই— দেহ উপভোগ যেখানে মুখ্য সেখানে যে প্রেম থাকিতে পারে না তাহা তীব্রকণ্ঠে কবি বলিয়াছেন—

"চর্ম্ম সাথে চর্ম্মের ঘর্ষণ
একমাত্র সুখ যাহাদের, সন্তানেরে স্তন্যদান
উচ্চতম স্বর্গলাভ—তাহাবা কী বুঝিবে প্রেমের ?"
(কোনো বন্ধুর প্রতি)

আধুনিক যুগের সমস্যা, দারিদ্র্য, জীবনসংগ্রাম প্রেমকে পদে পদে ব্যাহত করে—কেবল দিনযাপনের গ্লানিতেই তাহা পর্য্যবসিত হয়। প্রেমকে আধুনিক কবি তাই বারবার বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই কবি অনুভব করিয়াছেন প্রেম সহজাত বৃত্তি। তাই আধুনিক যুগের মানুষ মিথ্যা প্রেমকেও সত্য বলিয়া ভাবিতে চায়।

"মিথ্যা কবি' বহো 'ভালবাসি' —
(পরক্ষণে ভুলে যাও—আমি রাখি মনে)
কিবা তব আসে যায়।" (অমিতার প্রেম)

তিনি ত অনুভব করিয়াছেন "জৈবকামনার বন্ধন মোচনের জন্যই প্রেমের প্রয়োজন।" (দীপ্তি ত্রিপাঠি)

প্রেমের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বুদ্ধদেবের রচনায় আমরা দেখিতে পাই। কখনও প্রেমিকের মর্ম্মে প্রিয়ার নামটুকু মন্ত্রজপের মতই ঝঙ্কৃত হয়—

"তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্ম্মের মাঝে মর্ম্মরি বাজে, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !" (কঙ্কাবতী)

বৈষ্ণব কবিতায় রাধা কৃষ্ণের নাম জপিতে জপিতে অবশ হইয়াছেন। কৃষ্ণও তাঁহার বাঁশীতে অহরহ 'রাধা রাধা' বাজাইয়াছেন। শ্যামের নাম শুনিয়া রাধা বলিয়াছেন—

"সই, কে গো শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

কর্ম্মমুখর বর্ত্তমানকাল—তবুও অসংখ্য কর্ম্মের ফাঁকে প্রেমিকের মনে প্রিয়ার স্মৃতি অহোরাত্র জাগে।

"দিনের কাজের হাজার আওয়াজ হাজার হাওয়ার জোয়ার বহে,
* * *
আমি সে দিনের শব্দের নীচে, আমি সে কাজের শব্দের পিছে শুনি,
আমার বুকের হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে শুনি—"
(কঙ্কাবতী)

বুদ্ধদেব বসুও এই দেহাতীত প্রেমকে কামনা করিয়াছেন। জৈব প্রেমকে সহজে অতিক্রম করা যায় না—কিন্তু এই কামনার ইন্ধনকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেহাতীত প্রেমের জ' কবি ব্যাকুল হইয়াছেন।

"বাসনায় ব'ক্ষামাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
* * *
আনন্দ নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
* * *
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে 'য়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই :—ক্ষণতরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য উচ্ছ্বাসে—
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।" (বন্দীর বন্দনা)

"তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন সুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধা-জীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে মুহূর্ত্তে গেয়ে ওঠে গান
অনন্তের চির বার্ত্তা নিয়া ;
সে কেবল বারবার অসীমের কাণে কাণে একটি গোপন বাণী কহে—
তবু আমি ভালবাসি, তবু আমি ভালবাসি আজি!"

দেহই যে প্রেমের শেষ আশ্রয়স্থল নয়, দেহের ঊর্দ্ধে প্রেমের স্থান তাহা

কবি অনুভব করিয়াছেন।

"দেহ ঝরে যায় কপট হাওয়ায়
তবু থাকে ভালবাসা ?" (শীত ও বসন্ত)

বুদ্ধদেব প্রকৃত প্রেমের কবি। তাঁর কবিতায় প্রেমের তীব্রতা অনুভূত হয়।

"সব থেমে যায়—চিরকাল চলে প্রেমের গতি,
কঙ্কা, শোনো,
কঙ্কা গো।"

তাঁর একটি কবিতার নায়িকা কবির কবিতা পড়িয়া তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়কালে কবিকে একান্তই দেহসর্ব্বস্বা উজ্জলার প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধা হন। কেননা কবির হৃদয়ের তিনি যে পরিচয় পাইয়াছেন তাহা উজ্জলার হৃদয়পর্ব্বতে কেবল ধাক্কাই খাইবে। তাই বরুণ মিত্রের নিকট আত্মসমর্পণ আহত হৃদয়ে প্রলেপ দিয়াছিল—কিন্তু তাঁহার হৃদয় নিঃসৃত প্রেম নির্জ্জন গৃহে চন্দ্রালোকে যেন আরও গভীর হইয়া উঠিল।

বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে তিনি বলিয়াছেন প্রণয়ের মৃত্যু নাই—জীবনের নানা বিবর্ত্তনে তার নবজীবন দেখা দেয়, তার রূপান্তর ঘটে। ভালবাসার একটা তীব্র আবেগ তিনি তাঁর রচনায় ঢালিয়া দিয়াছেন। প্রেমের স্বরূপ তাঁর প্রেমসন্ধানী হৃদয়ের নিকট ধরা পড়িয়াছিল।

"মনে হয়—আর কারে নয়—ভালবাসি ভালবাসারেই।

* * *

যে ভালবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু
তীব্র, মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয়।"

সুধীন দত্তের কবিতায় দুরূহতা ও দুর্ব্বোধ্যতা খুব বেশী। বহু স্থলেই কবিতার অর্থ আবিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন। বিদ্যাসাগর-পূর্ব্ব যুগের দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেহাতীত প্রেমের কথা সুধীন দত্তও বাদ দেন নাই।

সুধীন দত্ত

"অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।

* * *

আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য তুমি তোমারই স্মরণ ॥
তবু মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয়।"

এমন তীব্র ব্যাকুলতা ইদানীংকালের কবিতায় দুর্লভ বলা চলে। প্রেমিকার জন্য হৃদয় মন দিয়া সর্বাঙ্গীন প্রাপ্তির তৃষ্ণা বৈষ্ণবকবির পদকে মনে করাইয়া দেয়।

"কালি হতে মন করিছে কেমন
হৃদয়ে ভিতরে জাগে ॥
শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি মোর সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে ॥
কি হইল অন্তরে, হিয়া জর জর
বিহ্বল সন্ধান শরে।" (চণ্ডীদাস)

সাহিত্যে কবির ভাব চিরন্তন, কেবল তাহার বহিরঙ্গটি পরিবর্ত্তিত হয়।

এই জাতীয় ভাবের কথা সুধীন দত্তের কাব্যে আরও পাওয়া যায়। আধুনিক কবি হইয়াও প্রেয়সীর প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে বিমুখ বা বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে নাই।

"সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, কভু ভুলিব না।"

আধুনিক কালের কবি হইলেও সুধীন দত্ত ভারতবর্ষের কবি। তাই প্রেমকে তিনি চিরন্তন বস্তু বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

সুধীন দত্ত জীবনের তিক্ত দিককে দেখিয়াছেন—মিলনের মুহূর্ত্তে কবির নিকট তাঁহার প্রেম ছলনার বস্তু মনে হইয়াছে। তিনি মনে করেন—

"অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ :
অসঙ্গত চিরপ্রেম ; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায ;" (মহাসত্য)

যৌবনান্তে রূপের মাধুরী দূর হইবে—প্রিয়ার জরাজীর্ণ দেহে রতি স্মরভির কণামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না—ইহাই সুধীন্দ্রের দর্শন।

"চিকণ চিকুর তব হবে যবে তুষার ধবল,
রজনীগন্ধার যষ্টি ওই ঋজু বরদেহখানি
তাকাবে ধুলার পানে, উবে যাবে রতি পরিমল ;" (বিলয়)

মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিকট পশুজনোচিত—স্বহৃদয়ে তিনি এই পাশবিক নৃত্যই অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সকল দর্শন সকল জ্ঞানের শেষে কবি সেই চিরনূতন, নিত্যসুন্দর অথচ নশ্বর প্রেমের মধ্যেই ব্যাকুল হৃদয়ে আশ্রয় চাহিয়াছেন।

"তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম ॥"

এখানে কবি উদ্বেলহৃদয় প্রেমিকের মতই প্রিয়ার নাম জপ করিয়াছেন। কবি আধুনিক দুর্বোধ্যতা, দর্শন সকল কিছুকে দুহাতে ঠেলিয়া বৈষ্ণব প্রেমিকের মত উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রিয়ার নামকে আপনার হৃদয়ের পটে রক্তের আখরে লিখিয়াছেন।

বিষ্ণু দে প্রেমের পূর্ণ রূপ দেখিতে পান নাই। এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থায় প্রেমের সহজাত কুসুমটি যে ঝলসাইয়া যায় সে কথা কবি বহু স্থানেই বলিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ রুদ্ধশ্বাস জীবনে প্রাণ মৃতপ্রায়—প্রেমের ধারাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহে মনে বসন্ত আছে—কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তি যে-সমাজের বনিয়াদ সেখানে মানুষের সকল তৃষ্ণাই শুকাইয়া জীবন্মৃত্যু ঘটে। মুষ্টিমেয়র স্বার্থ মানুষকে মানুষের প্রাপনীয় হইতে বঞ্চিত করে।

বিষ্ণু দে

"এদিকে শরীর মন হল বরণীয়,
বসন্ত আসে পাত্রী যে কেউ হোক।"

"ব্যর্থ জীবনের পঙ্গু উপভোগ তৃষ্ণা চরণ দুটিতে করুণ ও হাস্যকর রূপে ফুটে উঠেছে।" (দীপ্তি ত্রিপাঠী)

"অপস্মার", "যযাতি", "এটাকসিয়া" প্রভৃতি কবিতায় আধুনিক সভ্যতার বিকৃত, অন্তঃসারশূন্য, অচরিতার্থ প্রেমের রূপ ফুটিয়াছে।

কিন্তু এইখানেই যদি কবি থামিতেন, প্রেমের এই কুৎসিত দিকটুকুই কেবল

যদি কবির দৃষ্টিগোচরে থাকিত তাহা হইলে তাঁহাকে কবিদৃষ্টিসম্পন্ন আমরা বলিতে পারিতাম না। তিনি অনুভব করিয়াছেন নূতন সমাজে বলিষ্ঠ প্রেমের জন্ম হইবে। নর ও নারীর পারস্পরিক সাহচর্য্যে ও প্রেমে, নিষ্ঠায় ও কর্ত্তব্যে, সুখে-দুঃখে, লাভে-অলাভে পূর্ণতা লাভ করিবে। তাহাদের এই প্রেমের শক্তি নূতন সমাজ গঠন করিবে—সংগ্রামের শক্তি যোগাইবে।

"আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী
প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কর্ম্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত
পাড়ে পাড়ে চিকিমিকি এক ও অনেক।

(নদীর উৎস যদি জানা থাকে)

প্রিয়া তাঁহার প্রাণদায়িনী—সকল কর্ম্মশক্তির উৎস, তাই তিনি নদীপ্রবাহের সহিত তুলনীয়া।

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতি প্রেমিক শান্ত রসের কবি। প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে তিনি স্নিগ্ধত্ব বিকীরণ করিয়াছেন। আধুনিককালে মানুষের হৃদয় পিষ্ট, মন বিক্ষিপ্ত—প্রেমও তাই অপাংক্তেয়। দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রেমের জন্ম হয় না—তাই কামনাই মুখ্য হইয়া উঠে।

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"

"সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে।"

জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন" একটি অপূর্ব্ব কবিতা। প্রেমের স্নিগ্ধালোকপাতে সমস্যাকীর্ণ অশান্ত হৃদয় কি ভাবে আশ্রয় পায় তাহারই অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি এই কবিতাটি।

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

* * *

অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,

তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে বনলতা সেন।

* * *

সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রেমের রোমান্টিক স্বপ্নমাধুরী চূর্ণ হইযাছে। বিরহ বিচ্ছেদে প্রেমের সমাধি রচনা হয় তিনি বিশ্বাস করেন। প্রিয়ার বিচ্ছেদ তাঁহাকে পূর্ণতা দেয নাই—তাঁহার দেহ মন আত্মাকে অঙ্গারের মতই জ্বালা দিয়াছে।

"আগুন জ্বলিযা গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন !" (প্রেম)

জীবনানন্দ মনে করেন প্রেম কেবল বেদনা দেয—তাহার মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিবেই। কিন্তু আধুনিক কবির মন ক্ষণস্থায়ীর পথিক হইয়াও প্রেমের স্মৃতি মুছে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিযাছে।

"সব শেষ হবে—তবু আলোড়ন,—তা কি শেষ হবে !"
(অনেক আকাশ)

কিন্তু প্রেমকে তিনি একেবারে মিথ্যা বলিতে পারেন নাই। এই ধ্রুব সত্য বস্তুকে তিনি আলো বলিযাছেন। মানুষের জন্য মানুষীর ভালবাসা যেন হৃদয়ে আলো জ্বালিযা দেয। সেই আলোয প্রিয়াও এক উজ্জ্বল দীপ্তি পাইযাছে।

"আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীব হৃদয।"
(সুবঞ্জনা)

"এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর ;" (সুদর্শনা)

মানুষের প্রেমহীনতা আজিকার সমাজজীবনে সভ্যতার সংকট উপস্থিত করিযাছে, চিরকালীন মূল্যবোধগুলি খসিযা পড়িতেছে—আশ্বাসের স্থির ভূমি তাই আধুনিক কবির মনে বিলুপ্ত হইযাছে।

"ক্যাম্প", "শিকার" প্রভৃতি কবিতায় যুগের মনুষ্যত্বহীন যান্ত্রিক রূপটির কথা কবি বলিযাছেন। প্রেম, স্বপ্ন, সৌন্দর্য্য, সংগীত সকলই আজ মূল্যহীন। "সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে যে একটি পরিপূর্ণতা আছে, বর্তমান যুগ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। রূঢ় হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার আঘাত—বন্দুকের গুলি তারই প্রতীক।

শিকার করছি আমরা নিজেকেই—নিজের জীবনের শান্তি, প্রেম, সৌন্দর্য্যকে।"

(দীপ্তি ত্রিপাঠি)

"সিগারেটের ধোঁয়া,
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।" (শিকার)

বিজ্ঞানকে কবি বিশ্বাস করেন নাই। বিজ্ঞান মানুষের দেহের সুখ-তৃষ্ণা সম্পাদন করে কিন্তু সেই জ্ঞানের সঙ্গে দেহই আছে—প্রেম নাই।

"আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভীড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।"

(১৯৪৬-৫৭)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রেমের তৃষ্ণা আছে—কিন্তু সেই প্রেমকে আধুনিক যুগ সার্থক করিতে দেয় না। তাই কবির অন্তর হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জমান। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য কবি বিশ্বাস করিয়াছেন "সকল সভ্যতাই তার সংকল্প, উদ্যম একদা কালের গর্ভে হারিয়ে ফেলে, কিন্তু নারীর প্রেম মানুষকে যে প্রেরণা দেয় তার ক্ষয় নেই।"

"শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি
তাই ধর্ম, সংঘ, শক্তির চেয়েও মানুষ চায় 'আরো
আলো' : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।"

রাধারাণী দেবী আধুনিক যুগের কবি। কিন্তু তাঁহার রচনায় এ যুগের জটিলতা এবং সমস্যার অঙ্কুশ উদ্যত না। একটি স্নিগ্ধ নারীচিত্তের স্পর্শ তাঁহার সনেটগুলির ছন্দ, ভাব, ভাষায় প্রসারিত হইয়া আছে। প্রেমের গান তিনি অনেক লিখিয়াছেন। এই সুললিত পদগুলির মধ্যে দৈহিক প্রেমের প্রতি অবজ্ঞা এবং দেহাতীত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

রাধারাণী দেবী

"তোমারে বাসিয়া ভালো পূর্ণ আমি আজ।
মোর চিত্তলোকে নাহি কোন দৈন্য আর।

* * *

নিখিল সংসার
আনন্দ আলোকে দীপ্ত আমার নয়নে ;
কোন দুঃখ দুঃখ নয়, বাজে না আঘাত ; (সিঁথিমোর)

প্রেমের স্পর্শে এমনই জন্মান্তর ঘটে। প্রকৃত প্রেম মানুষকে সর্ব্বজয়ী করে—সকল দুঃখকে জয় করিবার অমৃত দান করে। প্রেম তাই সেই প্রেমময়ের আশীর্ব্বাদ।

ভিক্ষাবৃত্তি প্রেমের প্রতিকূল। যেখানেই কামনার দীনমূর্ত্তি সেখানেই প্রেম লুপ্ত হয়।

"আমার হৃদয় দ্বারে এসেছিলো যারা
প্রার্থীরূপে বহুবার,

* * *

তাদের কাঙালপনা অঞ্জলি প্রসার
জাগাইত ঘৃণা মোর। পণ্য বৃত্তি সম
দান করি' বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়া
তুলিত বিরূপ করি' অন্তর আমার।
তুমি চাহো নাই কিছু দ্বারে এসে মম
পূর্ণ হ'লো তাই তব অযাচিত পাওয়া।" (সিঁথিমোর)

(গ)

বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে প্রেমই প্রধান উপজীব্য বস্তু। এখানে দেহী ও দেহাতীত প্রেমের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র।

বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রেম বৃহত্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে এই প্রেমের নানা বিচিত্র রূপ দেখিযাছি। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা পরস্পর প্রেমবদ্ধ। এই প্রেমকাহিনীর পাশাপাশি আরও দুইটি উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় পাই। একটি বিক্ষুব্ধ, অপরটি শান্ত, কল্যাণকর্ম্মে নিযোজিত।

বঙ্কিমচন্দ্র

ওস্‌মান আয়েষাকে ভালবাসে—আয়েষার 'প্রাণেশ্বর' জগৎসিংহ। ওস্‌মান আকাঙ্ক্ষায় অন্ধ। আয়েষার প্রত্যাখ্যান তাহাকে হিংস্র করিয়া তুলিল। কামনামত্ত হইয়া সে জগৎসিংহকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে—আয়েষার ক্ষতি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। অবশেষে নিষ্ফল আক্রোশে আপনি জ্বলিয়া জ্বলিয়া শেষ হইয়াছে। আয়েষা তাহার অন্তরে অবিচল প্রেমদীপটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে—তাহা শত ঝঞ্ঝাবাতেও

নিষ্কম্প। জগৎসিংহের মঙ্গল কামনাই তাহার একমাত্র কামনা ছিল। জগৎসিংহকে একান্ত করিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সে উভয়ের জীবনকে ধ্বংস করে নাই।

বিমলা প্রেমের আর এক মূর্ত্তি। বীরেন্দ্রসিংহের বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াও বীরেন্দ্রের দাসীপরিচয়ে সে রাজগৃহে বাস করিয়াছে, তাহারই সপত্নীকন্যাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। বীরেন্দ্রের প্রতি গভীর প্রেমে এই অসম্মান তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বীরেন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্য তাহাকে দুর্জ্জয় সাহস দিয়াছে—কতলু খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৌশলে স্বামীহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছে। নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সে বীরেন্দ্রের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিল।

'কপালকুণ্ডলা'য় পদ্মাবতীর নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয় পাই। প্রেম তাহার প্রস্তর-কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতে পারে নাই। মক্ষিকাবৃত্তিই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল—কামনার অগ্নিতে সে আজীবন ইন্ধন জোগাইয়াছে। নবকুমারকে দেখিয়া তাহার লৌহহৃদয় বিগলিত হইয়াছে। কিন্তু কামনাই যাহার সর্ব্বস্ব, সে নিজের প্রেমাস্পদের মঙ্গল বিস্মৃত হয়। সংসারে একমাত্র নিজের কামপূর্ত্তিই তাহার লক্ষ্য ছিল। তাই অতি সহজেই সে কপালকুণ্ডলাকে সংসারসুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। নবকুমারের প্রেমেও ত্রুটি ছিল। কপালকুণ্ডলার প্রেমকে নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করে নাই। অবশেষে জীবন দিয়া এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। লুৎফা তাহার অন্তরস্থ কামনাগ্নি দিয়া নবকুমারের গৃহ জ্বালাইয়াছে, স্বয়ংও ভস্মীভূত হইয়াছে আমরা মনে করি।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে একদিকে হিতাহিতবোধশূন্যা কামান্ধা শৈবলিনী—যাহার উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের নিকট সংসার সমাজ পাপ পুণ্য ধর্ম্ম নীতি কল্যাণ সকল কিছু তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। প্রতাপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সে চন্দ্রশেখরের হৃদয়কে মরুভূমি করিয়াছে—তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ে এক কণা অমৃত দান করে নাই। অবশেষে সকল জ্ঞান লুপ্ত করিয়া ফস্টরের নৌকায় উঠিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রতাপপুরের কুঠিতে যাইয়া জাল পাতিয়া প্রতাপ পাখীকে ফাঁদে ধরা। নিজ হৃদয়ের চিন্তায় ব্যাপৃতা থাকিয়া প্রতাপ চরিত্রকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই প্রতাপের প্রত্যাখ্যান তাহাকে কোন্ অতল পাতাল গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সবল সুস্থ প্রেমের ভিত্তি তাহাকে মহা অকল্যাণ, মহা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিল।

জিতেন্দ্রিয় প্রতাপের অন্তরে শৈবলিনীর জন্য গভীর প্রেম সুপ্ত ছিল। এই

প্রেমের কথা শেষমুহূর্ত্তে প্রতাপের মুখে ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতাপের প্রেমে কামনা ছিল না—এই প্রেমের নাম জীবন-বিসর্জ্জন। শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের সংসারকে শান্তি সুখময় করিতে সে শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করে। কিন্তু শৈবলিনীর উন্মাদ বাসনার পরিচয় পাইয়া অবশেষে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেল।

দলনী প্রেমের এক করুণ স্নিগ্ধ মূর্ত্তি। দলনী যেন পদাবলীর রাধা। সে মুগ্ধা নায়িকা। স্বামীর প্রেমই তাহার নিকট সর্ব্বস্ব। বিনা দোষে সে স্বামী বঞ্চিতা হইল—অবশেষে মীরকাশিমের ভ্রান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মৃত্যুদণ্ডাদেশকে সে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইল। সাক্ষাৎ কামস্বরূপ তকীখাঁও এই মূর্ত্তিমতী প্রেমের বিজয়িনী মূর্ত্তির নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না, পলায়ন করিল।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুইটি উপন্যাসেই রূপমোহ এবং তাহার পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মত্ত হইয়া ভ্রমরকে ত্যাগ করিলেন। রোহিণী বালবিধবা, জীবনের যাহা কিছু ভোগ্য তাহা হইতে সে বঞ্চিতা। হরলাল তাহার চিত্তের এই দুর্ব্বল কেন্দ্রের সন্ধান পাইয়া শনি হইয়া ঢুকিয়াছে। বিধবাবিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া সে তাহাকে উইল চুরিতে প্রবৃত্ত করায়। রোহিণীর মধ্যে কামনার বীজ প্রসুপ্ত ছিল। হরলাল তাহাকে উপ্ত করিল এবং সে চৌর্য্যকার্য্যে নামিতে দ্বিধা করিল না। গোবিন্দলালের সহানুভূতি তাহার এই কামতৃষ্ণাগ্নিকে প্রধূমিত করিল। এদিকে লোকাপবাদ ভ্রমরের সন্দেহকে ঘনীভূত করিল। ভ্রমরের প্রেমে অপূর্ণতা ছিল, তাই সে সন্দিগ্ধা হইয়া ঘোর অভিমানে গোবিন্দ-লালকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিল। গোবিন্দলালের প্রেমও অপূর্ণ ছিল। তাই এই সন্দেহঝড়ে সহজেই মঙ্গলবুদ্ধি লুপ্ত হইল এবং রোহিণীর রূপ তাহার সুপ্ত কামনাগ্নিকে প্রজ্জলিত করিল। কিন্তু প্রসাদপুরের বিলাসগৃহে এই কামনার সেবা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—মোহের প্রথম বর্দ্ধমান উচ্ছ্বাস অতিক্রান্ত হইয়া এক গতানুগতিক মোহশূন্য জীবনযাত্রা সুরু হইয়াছিল। রোহিণী গোবিন্দলালের নিকট ক্রমেই ভার হইয়া উঠিয়াছিল। এই বদ্ধ গতিহীন জীবনের অন্তরালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ স্তূপ জমিতেছিল—রোহিণীর পদস্খলন তাহাতে আগুন জ্বালাইল। কিন্তু এততেও রোহিণীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে নাই। তাই গোবিন্দলালের প্রেম হারাইয়াও সে যৌবন ও জীবনে ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িতে পারিল না। এই ইন্দ্রিয়ের কামনার বীভৎস মূর্ত্তি

তাহার কামনার নিকট মৃত্যুবরণ করিল—গোবিন্দলালের মোহভঙ্গ ঘটিল। গোবিন্দলাল অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়া আত্মস্থ হইলেন। ভ্রমরের মূল্য তিনি বুঝিলেন—কাম ও প্রেমের পার্থক্যও বুঝিলেন। ভ্রমর জীবন দিয়া প্রেমের জয় ঘোষণা করিল—গোবিন্দলাল ভ্রমরের প্রেমের মধ্য দিয়া সেই অনন্ত প্রেমময়ের সন্ধান পাইলেন।

'বিষবৃক্ষে'ও এই রূপজ মোহ এবং তাহার পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর জীবনে কুন্দনন্দিনীর আকস্মিক আবির্ভাব একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃজন করিয়াছে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তের সহায়তা করিয়াছে হীরার পাপ মতি। কুন্দের রূপমুগ্ধ নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর অবিচলিত স্থির হৃদয়কে বিস্মৃত হইলেন। এমন কি তাঁহার মুখে হাসি দেখিবার জন্য সূর্য্যমুখী নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করিলেন—আপনার হৃদয়ের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে কুন্দের হস্তে অর্পণ করিলেন। রূপমুগ্ধ নগেন্দ্রনাথের চমক ভাঙ্গিল সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে। সূর্য্যমুখী আপনাকে কণ্টকজ্ঞানে স্বামীর সুখের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুঃখদুর্দ্দশার জীবন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর প্রেম নগেন্দ্রের চেতনাকে নাড়া দিল, তিনিও মোহভঙ্গ হইলে গৃহত্যাগী হইলেন। কুন্দের রূপমোহের বিষময়ফল প্রসূত হইল। সেও নগেন্দ্রের রূপে অন্ধ হইয়া সংসার ভুলিয়া গিয়াছে। তাই কমল যখন তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল সে নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থে নগেন্দ্রকে ত্যাগ করিতে পারিল না। তবে কুন্দের প্রেম নিছক মোহমাত্র ছিল না। নগেন্দ্রকে সে সত্যই ভালবাসিত তবে তাহার সহিত আত্মপ্রীতি মিশ্রিত ছিল। কেবলমাত্র কামনাকে আশ্রয় করিয়া হীরা দেবেন্দ্রের সহচারিণী হইয়াছিল। দেবেন্দ্রের কলুষিত কামনা পূর্ত্তির পর দেবেন্দ্র তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। কামবঞ্চিতা হীরা সহজেই হিংস্র হইয়া উঠিল। তাহার কলুষ হৃদয়ের বিষদিগ্ধ হলাহল কুন্দকে পান করাইল। সংসারে একটি কোমল প্রাণকে ঐ হিংস্র হৃদয় গ্রহণ করিল এবং নিজেও উন্মাদ হইল।

'সীতারামে' দাম্পত্য প্রেমেও রূপমোহ যে কি ভীষণ কুফল প্রসব করিতে পারে তাহার ভয়াবহ চিত্র বঙ্কিম দেখাইয়াছেন। শ্রী অপ্রাপনীয়া হইয়া যতদিন ছিল সীতারাম তাহার সিংহবাহিনী রূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রী তাহার জলন্ত রূপ লইয়া সীতারামের নিকট উপস্থিত হইল। সীতারাম তাহাকে পাইল না—কিন্তু তাহার রূপতৃষ্ণা সংসার, রাজ্য সকল কিছুতেই অবহেলা ঘটাইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীর পলায়নে সে

নরপিশাচ হইয়া উঠিল। শ্রীর প্রতি কামনা রমার মৃত্যু ঘটাইল, রাজ্যও ধ্বংস হইল। শ্রীর যদি সীতারামের প্রতি প্রেম লুপ্ত না হইত—নিষ্কাম ধর্ম্মের মোহে সে যদি না ভুলিত—তাহা হইলে সীতারাম ধ্বংস হইত না। সীতারামের মহিষী হইয়া তাহাকে যোগ্য পথে চালনা করিতে শ্রীই পারিত।

গঙ্গারামের কামনা রমাকে ধ্বংস করিল—গঙ্গারামেরও চরম অবনতি ঘটাইল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেমন উপন্যাসেও এই প্রেমের কথাই প্রধান উপজীব্য বস্তু। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে হেমনলিনীর প্রেমকে আন্দোলিত করিবার অনেকগুলি দমকা হাওয়া বহিয়াছে, কিন্তু এই হাওয়ার ঝাপটায় তাহার চিত্ত-দীপটি নিভে নাই, অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইয়াছে। রমেশের অন্তর্দ্ধান, তাহার চঞ্চল মানসিক অবস্থা, অক্ষয়ের নানা যুক্তি তাহার মনকে দ্বিধাসংযুক্ত করে নাই। হেমনলিনীর একনিষ্ঠ প্রেম অবশেষে সকল দ্বিধা সংশয়কে কাটাইয়া জয়যুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

'চোখের বালি' উপন্যাসে আশা-মহেন্দ্রের প্রেমে অসংযত কামনা ও দেহবিলাসই মুখ্য ছিল। সেই প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি ছিল না, তাই বিনোদিনীর কামনা-চঞ্চল নিশ্বাস এই তাসের প্রাসাদের ভিত্তিভূমি কাঁপাইয়া দিল এবং অতি সহজেই তাহা ধ্বসিয়া গেল। আশা স্বামীবঞ্চিতা হইয়া দুঃখের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়া উঠিল। চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইল—দুঃখের কঠিন প্রস্তরে প্রেমের ভিত্তি গাঁথা হইল। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া গৃহত্যাগ করিল, কিন্তু দেখিল বিনোদিনীর হৃদয়-সিংহাসনে বিহারী আসীন। অপ্রাপনীয়া বিনোদিনীর মোহভঙ্গ হইল—আশার অবজ্ঞাত হৃদয়ের অপরিমেয় বেদনা মহেন্দ্রের বিমুখ চিত্তকে স্পর্শ করিল। মোহভঙ্গে আশার বিশ্বস্ত হৃদয়ের প্রেমের প্রতিদানে তাহার হৃদয়েও প্রেমের জন্ম হইল। দুঃখ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া এই প্রেমকে পাইয়া সে তাহার মর্ম্ম বুঝিল। প্রেম দুর্লভ বস্তু, তাই আশার প্রেমের সহজ-লভ্যতায় মহেন্দ্রের নিকট তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছিল। বিহারীর চরিত্রের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের প্রসারতা বিনোদিনীর চঞ্চল চিত্তকে আবদ্ধ করিল। বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে তপস্বিনী হইল—তাহার আবেগ-চঞ্চল হৃদয় শান্ত হইল। প্রেম তাহাকে সংসারের মঙ্গলকর্ম্মে নিয়োজিত করিল। এমন কি প্রেম তাহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিল যাহার বলে বিহারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংসার-সুখও সে অতি সহজে ত্যাগ করিল।

'চতুরঙ্গ' বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস—ভাষার চোখধাঁধান অলঙ্কার যমকের দীপ্তিতে উপন্যাসখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি। দামিনী শচীশকে প্রেমে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে—কিন্তু শচীশ দামিনীর রূপের মোহে বদ্ধ না থাকিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়াছে। সে অরূপের সাধনায় নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দামিনী শচীশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে, রূপমোহের বন্ধনে সে শচীশকে বাঁধিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীবিলাসের প্রেমে এই বিদ্রোহিনী নারীচিত্ত আশ্রয় পাইয়াছে। তাই মৃত্যুকালে চিরন্তনী নারীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—'যেন জন্মান্তরে আবার তোমাকেই পাই'।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দুইটি প্রেমের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে। নিখিলেশ প্রকৃত প্রেমিক—সে বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় প্রেমের কুসুমটি বিকশিত করিতে চায়। অন্তঃপুরের রুদ্ধ বাতাসে এই কুসুমটি রূপে রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পাবে না। বিমলার প্রেমকে নিখিলেশ এই মুক্ত হাওয়ায় আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে বর্দ্ধিত হইতে দিতে চাহিয়াছে। বিমলা নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছে নিখিলেশের প্রেমে ছিল অপর্য্যাপ্ততা, সে বিমলার প্রেমের প্রতিদানের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বিমলা কেবল পাইয়াই গিয়াছে—তাহার প্রতিদানে তাহার দিক দিয়া কিছুই দিতে হয় নাই। তাহার ফলে বিমলার প্রেমে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দমকা হাওয়ার একটা কম্পনে তাহার প্রেমের দীপশিখাটি অতি সহজেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মমোহ তাহার এত প্রবল হইয়াছে যে, সে নিখিলেশের মঙ্গল, সংসারের কল্যাণবুদ্ধিও হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার এই আত্মমোহাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে সুযোগান্বেষী সন্দীপ। সন্দীপ তাহার পরিচয় গোপন রাখিয়াছে। বিমলাকে দেশসেবার নামে ভয়াবহ হত্যালীলায় প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সন্দীপের নিকট আত্মসুখই সবচেয়ে বড়। তাই নিজের ইন্দ্রিয়লিপ্সা ও ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে সে বিমলাকে মহা ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সন্দীপের কামনার নগ্নমূর্ত্তি অকস্মাৎ তাহার নিকট ধরা পড়িয়াছে। নিখিলেশের বেদনার্ত্ত হৃদয় তাহার অন্ধ দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। নিখিলেশের প্রেমের মূল্য সে অনুভব করিয়া সন্দীপের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে এই মোহ তাহাকে চৌর্য্যবৃত্তিতে পর্য্যন্ত নামাইয়াছে। সন্দীপের আদর্শ কখনই মহত্তর হইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত তাহার মোহমুক্তি ঘটিল—কিন্তু সম্ভবতঃ তাহাকে ইহার জন্য

একটা বড় মূল্য দিতে হইল। প্রেমকে অবহেলা করিয়া সে মোহকে বড় করিয়াছিল—তাই সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে একটা করুণ খেদোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

'যোগাযোগে'র নায়িকা কুমুকে মনে হয় পদাবলীর রাজ্য হইতে বাস্তবের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছে কিন্তু তাহার দুই চোখে এখনও সে জগতের মায়াঞ্জন মাখানো রহিয়াছে। প্রেম তাহার নিকট পরম সম্পদ, প্রেমিক তাহার নিকট পূজার্হ। হৃদয়ের সকল প্রীতি ও ভক্তি দিয়া সে মধুসূদনকে বরণ করিয়াছিল। একটা গভীর অনুভূতির সঙ্গে সে প্রেমিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রীগুলি মধুসূদনের কামনার প্রচণ্ড দাবীতে বেসুরো বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়-বীণায় মধুসূদন সুরের ঝঙ্কার তুলিতে পারে নাই—সজোরে আঘাত করিয়া তন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কামনার উগ্রতা তাহার প্রেমকে ব্যাহত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে বিপ্রদাসের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সন্তানের দাবীতে তাহাকে ফিরিতে হইলেও অন্তর হইতে তাহার তাগিদ আসে নাই। মধুসূদনও স্বেচ্ছাচারী এবং উগ্র দাবীদার হইয়াও কুমুর হৃদয়ের অমৃতের সন্ধান মধ্যে মধ্যে পাইয়াছে। তাই শ্যামার লুব্ধতা তাহার দেহের ক্ষুধা মিটাইতে পারে নাই—কেননা সেখানে সে প্রাণের সুধার সন্ধান পায় নাই। কুমুর অসহযোগ তাহাকে নতিস্বীকার কিছুটা করাইয়াছে। দাবীর প্রচণ্ডতার নিকট কি ভাবে প্রেমের মুকুল ঝরিয়া যায় তাহাই উপন্যাসে দেখানো হইয়াছে।

'শেষের কবিতা' এক বিচিত্র প্রেমোপন্যাস। এখানে সংকীর্ণ ও বৃহৎ প্রেমের চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছে। বিবাহে অনেক প্রেমেরই সমাধি ঘটে। বিবাহে অনেকের কাছে পাওয়াটাই বড়—চাওয়া পাওয়ার সম্বলমাত্র থাকিলে সেখানে অল্পদিনেই মোহভঙ্গ ঘটে। প্রেম আর জীবনে নবীনতা ও বৈচিত্র্য সৃজন করিতে পারে না।

শোভনলালের প্রেমকে লাবণ্য স্বীকার করে নাই। কিন্তু অমিতের প্রেমবন্যায় সে প্রেমের সত্য ও দুঃখকে উপলব্ধি করিল। শোভনলালের বিরহী পত্র তাহার হৃদয়ের সদ্যমুক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সে উন্মুখ শোভনলালের দীর্ঘ প্রেমের তপস্যার প্রতিদান দিতে রাজী হইয়াছে। কেটির প্রেমের দীর্ঘ তপস্যা লাবণ্যের নিকট অপরিচিত জগতের দ্বার খুলিয়া দিল। ফ্যাশনবিলাসী কেটির অন্তরালবর্ত্তিনী যে একটি তপস্বিনী ব্রতচারিণী বিরাজ করিতেছিল তাহা চঞ্চল অমিতের চিত্তকেও স্পর্শ করিল। দিগন্তবিহারী অমিত

ছুকোঁটা চোখের জলের মায়ায় ধরা পড়ে নাই—সুদীর্ঘ দিনের তপস্যারই মূল্য দিয়াছে। লাবণ্য নিজের ভুল বুঝিয়া অবজ্ঞাত অবহেলিত শোভনলালকে গ্রহণ করিল, অমিতকেও কেটির প্রেমের মূল্য দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিল। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ব্যবহারে প্রেমের মূল্য কমিয়া যায়। লাবণ্য অমিতের সহিত তাহার প্রেমসম্পর্ককে এক অতি দূর স্বপ্নজগতের দুর্লভ বস্তু রূপে পাইতে চায়। তাই তাহার শেষ পত্রে অমিতকে জানাইয়াছে তাহাদের প্রেম অন্তরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে। বহির্জগতের ধূলামলিন স্পর্শে তাহা ম্লান হইবে না—তাহা চিরকালীন অম্লান বস্তু হইয়া রহিবে। প্রেমের একটা অভিনব ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস জগতে আনিলেন। চাওয়া পাওয়ার ঊর্দ্ধজগতে এই প্রেমের খেলা।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেমের জয়গান করিয়াছেন বলিয়া একটি ধারণা সাধারণ্যে প্রচারিত আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তিনি কোথাও নীতিবিগর্হিত জীবনকে সমর্থন করেন নাই। রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তকে বিদায় দিল তখন শ্রীকান্তের মুখেই লেখক বলিয়াছেন যে, "কোন ছোট প্রেমের ইহা সাধ্য ছিল না।" বড় প্রেমেই প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করা চলে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে অতি সহজেই একান্ত নিজস্ব করিয়া লইতে পারিত—কিন্তু সেই প্রলোভন তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই। নিজের অনিচ্ছাবশতঃ পদস্খলনকে সে মানিয়া লইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শ্রীকান্তের সামাজিক মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতে দেয় নাই। অথচ শ্রীকান্তের জীবনে তাহার সুতীক্ষ্ণ মঙ্গলদৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়াছে। অন্নদাদিদি শ্রীকান্তের জীবনে

শরৎচন্দ্র

অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন—সকল নারীজাতিকেই শ্রীকান্তের চোখে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু এই অন্নদাদিদির জীবনে প্রেম যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর জন্য তিনি সংসার, লোকমর্য্যাদা, সমাজ সকল কিছুই ছাড়িয়াছেন। স্বামীর গৃহে কেবলই দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন—স্বামীর অত্যাচারও নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর মৃত্যুতে সম্ভবতঃ বৈরাগিনী জীবন গ্রহণ করিয়াছেন।

'চরিত্রহীন' গ্রন্থে কিরণময়ীর দীপ্ত জ্বালাময়ী চরিত্র সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। রোহিণী, বিনোদিনী, দামিনী চরিত্র ইহারই পুরাবর্ত্তিনী। কিরণময়ী স্বামীর চিকিৎসার জন্য অনঙ্গ ডাক্তারের কামনা চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয়। উপেন্দ্রের সহায়তায় তাহার সে ঘৃণিত জীবনের

অবসান ঘটিল। কিন্তু কিরণময়ী স্বয়ং উপেন্দ্রের প্রেমলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সুরবালার একনিষ্ঠ প্রেমে আবদ্ধ উপেন্দ্রের চিত্ত বিচলিত হইল না। কিরণময়ী সুরবালার সুগভীর ও সুদৃঢ় প্রেমের পরিচয় পাইয়া আপনার অন্তরস্থ দাবাগ্নিতে আপনি ভস্মীভূত হইয়াছে। উপেন্দ্রের একান্ত স্নেহপাত্র দিবাকরকে তাই সে অতি সন্নিকটে টানিয়া লইল। কিন্তু তাহার হৃদয়ের কামনা-শিখা ক্রমেই দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। উপেন্দ্রের তিরস্কারে প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে দিবাকরকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু নিজেও বীভৎস জীবনের সম্মুখীন হইল। তাহার অন্তরস্থ কামনা তাহাকে দগ্ধীভূত করিতে লাগিল। অবশেষে উপেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে তাহার সমস্ত চেতনা লোপ পাইল। অপরিমেয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেজস্বিতা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। উদগ্র কামনার ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া সে নিজেই ধ্বংস হইল।

অপরদিকে নিষিদ্ধ প্রেমের আর এক উদাহরণ সাবিত্রী। কিন্তু সাবিত্রীর প্রেমে কামনার চিহ্ন ছিল না, সেইজন্য সে নিজেকে নিঃশেষ করিয়াও সংসারে সতীশকে মঙ্গলের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। নিজের দুর্ভাগ্য সে একাই বহন করিয়াছে। লোক অপবাদ হইতে সতীশকে বাঁচাইতে চাহিয়াছে এবং নিজের সম্বন্ধে হীন কলঙ্ক প্রচার করিয়া আপনাকে সতীশের নিকট হইতে অপসারিত করিয়াছে। অবশেষে তাহার এই লাঞ্ছিত জীবনে এই তপস্যার মূল্য সে লাভ করিয়াছে উপেন্দ্রের স্নেহ পাইয়া। সতীশ ও সাবিত্রীর সম্পর্ক প্রথমটা মোহজড়িত হইয়াই ছিল, কিন্তু সাবিত্রী যেন দিব্যদৃষ্টি বলে সতীশের অন্তঃকরণকে দেখিতে পাইল। তাহার লালসায় ইন্ধন না যোগাইয়া—তাহাকে ধ্বংস না করিয়া সে যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনীর মত সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুরবালার চিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র একটি একনিষ্ঠা, বিশ্বাসপরায়ণা মূর্তিমতী প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। সুরবালার স্নিগ্ধ মূর্তি কিরণময়ীর জ্বালাময়ী প্রতিচ্ছবির পার্শ্বে হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

'গৃহদাহে'র অচলা দোলাচলবৃত্তিপরায়ণা। সে মহিম ও সুরেশ কাহাকেও সত্যকারের ভালবাসে নাই। মহিমকে সে মনে করিয়াছিল ভালবাসে, সেইজন্য সুরেশের উচ্ছ্বসিত প্রেম-অর্ঘ্য সে গ্রহণ করে নাই—তাহার প্রেমোদ্বেল হৃদয় তাহাকে নাড়া দিতে পারে নাই। মহিমের দারিদ্র্যের সকল পরিচয় জানিয়াও সে বড় প্রেমের বড়াই করিতে গিয়া তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিজের প্রেমের ভিত্তিমূল খুব দৃঢ় ছিল না। তাই দারিদ্র্যের বাস্তব

অভিজ্ঞতায় সহজেই মোহাবরণ খসিয়া গেল। পারস্পরিক মতদ্বৈধতা এবং দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ক্রমেই দুজনকে প্রেমহীন মরুর দিকে আগাইয়া দিতেছিল। মৃণাল ও মহিমের মধ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া একটা কুৎসিত ঈর্ষ্যার সন্দেহ এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল। এই সময়ে সুরেশের আবির্ভাব। অচলার চিত্তবৃত্তিকে সে সবলে আকর্ষণ করিল। মহিমের গৃহই শুধু পুড়িল না—তাহার সংসারও পুড়িল। অসুস্থ মহিমকে লইয়া যাত্রাকালে তার মতিভ্রম ঘটিল সুরেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া। সুরেশ প্রথম দফায় একবার মহিমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অচলাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এবার সে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল অসুস্থ মহিমকে ছাড়িয়া আসিয়া—অচলাকে ভুলাইয়া লইয়া আসিয়া। নানা দুর্ব্বিপাকে অচলা সুরেশের জীবনের সহিত জড়াইয়া গেল। একদিকে সুরেশের উদ্বেলিত কামনার মোহবাষ্প তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিল, আর একদিকে মহিমের অচঞ্চল প্রেমের আকর্ষণ তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিল। মনের স্থির লক্ষ্য তাহার ছিল না, প্রেম ও বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমি তাহার টলটলায়মান, জীবন-যুদ্ধে সে ক্ষতবিক্ষত, বিপর্য্যস্ত, ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার গভীর গহ্বর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল মৃণাল। মৃণাল চিরন্তনী প্রেমধর্ম্মের প্রতিভূ। তাহারই সহায়তায় মৃণাল অচলাকে মহিমের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

'দেবদাসে' দেবদাসের ভীরুতা তাহাদের প্রেমকে সার্থক করিতে পারে নাই। পার্ব্বতীর সাহস ছিল, প্রেমের দৃঢ়তা ছিল। সে তাহার প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত দেবদাস দুজনের জীবনকেই ব্যর্থ করে। পার্ব্বতী আপনার চিত্তবলে ভুবন চৌধুরীর পত্নী হইয়া সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী হইল, কিন্তু দেবদাসের দুর্ব্বল চরিত্র এই ব্যর্থতাকে চিত্তবলে জয় করিতে পারিল না। সে আপনার অন্তর্দাহে বিষকে অমৃত বলিয়া পান করিল। উচ্ছৃঙ্খল লালসার এক ভয়াবহ জীবন তাহার বরণীয় হইল এবং মৃত্যুতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। শেষ মুহূর্ত্তে পার্ব্বতীর অন্তঃস্থিত গভীর প্রেম প্রকাশিত হইল—বড় ঘরের ঘরণীর মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া সে পথে ছুটিয়া আসিল।

'শেষের পরিচয়' গ্রন্থে সবিতা ক্ষণিকের মোহে স্বামী, কন্যা, গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। সারাজীবন ধরিয়া রমণীবাবুর লালসার সঙ্গিনী হইয়াছে কিন্তু সে এতটুকু শান্তি পায় নাই। নিজের কৃতকর্ম্ম তাহাকে অবিরত দগ্ধ করিয়াছে। সরল স্বামীর বিশ্বাসকে প্রবঞ্চিত করিয়া, তাঁহার প্রেমকে অবহেলা করিয়া সে

জীবনে এতটুকু সুখী হয় নাই। তাহার মোহের ফল বজ্ররূপে ফিরিয়াছে। বেণুর বিবাহে সে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু নিজের গর্ভজাত সন্তানকে সে শৈশবে পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে সে চেনে নাই। রেণু বিবাহের অনুষ্ঠানকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। সন্তানকে বুকে টানিয়া লইবার জন্য তাহার দারুণ বুভুক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রেণু অভিমানে তাহার মাকে কোনদিন স্বীকার করিতে পারে নাই, সবিতার পাপের ধনের কণামাত্র গ্রহণ করে নাই। সবিতার মোহের বিষময় ফল তাহার জীবনে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। রমণীর সহিতও সে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অবশেষে রেণুর মৃত্যুতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে। সে নিজের রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া অসহায় দরিদ্র স্বামীর দুঃখের অংশ-ভাগিনী হইয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

'শেষ প্রশ্ন'র কমল একনিষ্ঠ প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছে। শিবনাথের সহিত তাহার সম্পর্কও তাহার মতের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখ দিয়াও সেই গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের শেষ ও অশেষ কথাও বাহির হইয়াছে। অজিতের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে সে জানাইয়াছে যে অজিতকে ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি তাহার যেন না হয়।

শরৎচন্দ্রের সকল উপন্যাসেই দেহী ও দেহাতীত প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং দেহী প্রেমকে অতিক্রমের চেষ্টা দেখা যায়। দেহ কোথাও সর্ব্বস্ব হয় নাই।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে পুরাতন হিন্দু আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উপন্যাসে আদর্শের জয়গান রসসঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটাইলেও মোটামুটি সর্ব্বত্র তাহা উপন্যাসের ঘটনাস্রোতের সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মন্ত্রশক্তি'তে বিদ্রোহিনী বাণী অম্বরনাথকে তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে সরিয়া আসিয়াছিল। অম্বরও নিঃশব্দে বাণীর পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। অম্বরের প্রতীক্ষার তপস্যার ফল ফলিয়াছে। প্রকৃতি বাণীকে ভিতরে ভিতরে বদলাইয়াছেন। অবশেষে অম্বরের মৃত্যুশয্যায় বাণীর সহিত তাহার মিলন হইয়াছে। অম্বরের মৃত্যুম্লান মুখচ্ছবি বাণীর ভ্রান্ত গর্ব্বাচ্ছাদিত চিত্তাকাশকে মেঘমুক্ত করিয়াছে। সে পুরাতনী সতীদের মতই স্বামীর প্রাণ পুনরুদ্ধার তপস্যায় বসিয়াছে। গ্রন্থের শেষ অংশে চমৎকারিত্ব আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ এ জগতের সীমা যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অধঃপতিত, নিষ্কম্প-হৃদয়

অনুরূপা দেবী

মৃগাঙ্কও অজ্ঞার দীর্ঘ প্রেমতপস্যার অবসানে আপন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

'বাগ্দত্তা' উপন্যাসে প্রচণ্ড রূপমোহের পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। কমলা মণীন্দ্রের বাগ্দত্তা এবং পরস্পর পরস্পরের হৃদয় জানিত। শচীকান্ত কমলার রূপমোহে উন্মত্ত হইয়া ছলনা করিয়া কমলাকে বিবাহ করিল। তাহার এই উন্মত্ত কার্য্যকলাপ কমলার বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিল। মণীন্দ্রের পরিবর্ত্তে শচীকান্তের সহধর্ম্মিণী হইয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। শচীকান্ত যে উদ্দেশ্যে কমলাকে বিবাহ করিল তাহা সিদ্ধ হইল না, কমলার হৃদয় পাইল না। অবশেষে কমলার আকস্মিক অনুশাসনে সে জীবন বিসর্জ্জন দিল। কমলা শচীকান্তের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া নিজের হৃদয়ে শচীকান্তের আসন স্থাপন করিল। কমলাও পার্থিব প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তি পাইল।

'মা' উপন্যাস প্রেম ও সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার একখানি বিশাল চিত্র। একদিকে পিতৃভক্ত স্বামীর বিনাদোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগে আমাদের মন সাড়া দেয় না, অপরদিকে মনোরমার একনিষ্ঠ পতিপ্রেম আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। মুগ্ধা নায়িকার মতই তাহার স্বামীপ্রেম সকল বিচারশক্তি ও যুক্তির উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই প্রেমের বলে সে যেন কোন অন্য জগতের অধিবাসিনী হইয়াছে। অরবিন্দ যেন রামের প্রতিচ্ছবি ; কিন্তু রামচন্দ্রের মত একপত্নীক নহেন। তিনি বাহ্যতঃ কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন—ব্রজরাণীকে স্ত্রীর পরিপূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু দিবারাত্র এই অন্যায় অবিচারে মর্ম্মদাহের তুষানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। মনোরমা স্বামীর সান্নিধ্য না পাইয়াও স্বামীর চিত্তজগতকে চিনিত। তাই অজয়ের বিদ্রোহে সে মনে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিল। ব্রজরাণীর নিকটও স্বামীর চিত্ত সুপরিজ্ঞাত ছিল। ব্রজরাণীর দিব্য পাইয়া সন্তানের কল্যাণ-কামনায় তিনি স্নেহের ভগিনীর নিমন্ত্রণেও যাইতে পারেন নাই—নিন্দার ডালি মাথায় লইয়াছেন। ব্রজরাণী স্বামীর চিত্তজগতের পূর্ণাঙ্গ স্থানটুকু দখলের জন্য উন্মত্তবৎ আচরণ করিয়াছে। অবশেষে মনোরমার সারাজীবনব্যাপী তপস্যার ফল সে অনুভব করিয়াছে—পরম স্নেহে অজয়কে একমাত্র অবলম্বন করিয়া সেও পরম শান্তি পাইয়াছে।

'মহানিশা'য় ভাগ্যবিড়ম্বিতা অন্ধ ধীরা স্বামীর জীবনকে সার্থক করিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

'উত্তরায়ণে' স্বর্ণলতার তীব্র সন্দেহ ও সমীরের প্রতি তীব্রাসক্তি নিজ

জীবনকে ধ্বংস করিযাছে। সমীরের জীবনেও অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছে।

'চক্রে' ব্যারিষ্টার সাহেব কৃষ্ণার প্রেম লাভের জন্য নানা কুচক্র বিস্তার করিয়াছেন—বিনয়কে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করিযাছেন। কিন্তু কৃষ্ণার প্রেম জয়ী হইয়াছে। নিজের প্রেমাস্পদকে রক্ষা করিতে আপনাকে প্রকাশ্য আদালতে হেয় করিযাছে এবং অবশেষে উর্ম্মিলার সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়া নিজে সরিয়া দাঁড়াইযাছে।

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই নিতান্ত ছোট ঘরের ছেলে—বসনও দেহবিলাসিনী। আমাদের সমাজে ইহারা অত্যন্ত হেয় জীব। কিন্তু লেখকের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের সন্ধান খুঁজিয়া পাইযাছে।

তারাশঙ্কর

ঠাকুরঝির প্রেমের আলোকে নিতাইযের জীবনে সেই অনন্ত প্রেমমযের আলোর আশীর্ব্বাদ পড়িযাছে। ঠাকুরঝির সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই—কিন্তু ঠাকুরঝির হৃদযরহস্যের সন্ধান পাইযা সে গৃহত্যাগ করিযাছে যাহাতে ঠাকুরঝি সুখী হয়, স্বামীগৃহে শান্তিতে থাকে—তাহার চিত্তবিক্ষেপ নিশ্চল হয। কিন্তু ঠাকুরঝি নিতাইযের প্রেমে চিত্তবৃত্তির সাম্য হারাইযা ফেলিল। উন্মাদগ্রস্ততা এবং অবশেষে মৃত্যু তাহার পরিণাম হইল।

বসন গণিকা—কিন্তু নিতাইযের প্রেমে সে যেন নূতন জীবন লাভ করিল। রোগশয্যায বসনের বীভৎস ব্যাঁধিজর্জ্জর দেহের সেবা দলের সকলকেই বিস্মিত করে। গণিকা দেহের ক্ষুধাই মেটায—তাহার উপরে কিছু থাকে না। কিন্তু দেহাতীত প্রেম এখানে সকল কিছুকে আলো করিয়া দিযাছে।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে প্রেমের কথা বিশেষ নাই—সেখানে আধুনিক মানুষের জীবনমরণ সমস্যাই বড হইযা উঠিযাছে। তবু বিলুব স্মৃতি দেবুর সারা জীবনকে ভরিযা রাখিযাছিল—অহর্নিশ বিলুব চিন্তা তাহার মনে সকল কাজের মধ্যেও উঁকি দিত। ন্যায়রত্ন মশাই তাহাকে বলিযাছিলেন মৃত মানুষ ফেরে না, কিন্তু বিলুর মৃত্যুতে তাহার প্রেমে দেবু পণ্ডিত চিত্তের স্থিরতা, সংযম আয়ত্ত করিযাছে। অবশেষে বিলুর প্রেমে সে আপনার জীবন গ্রামের সেবায় বিলাইযা দিযাছিল। গ্রামের মানুষের উপর ছিল তাহার অপরিসীম ভালবাসা। মানুষের প্রেমে সে গণিকা দুর্গার সহানুভূতিও লাভ করিযাছিল। বিশুও মানুষকে ভালবাসিযাছিল—তাই প্রাচীন সংস্কারের সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ ঘটিল। সংসারকে দূরে সরাইয়া সে সেবাব্রতে নামিল—কিন্তু সংসারও দেবু

পণ্ডিতের মত তাহাকে সহজে গ্রহণ করিল না। সেবা করিতে গেলে সেখানেও সমান হৃদয় হওয়া চাই—তবেই দয়াধর্ম্ম সার্থক হয়।

'মন্বন্তর' উপন্যাস মানুষের প্রেমহীনতার—চরম হিংসা ও নীতিহীনতার বিচিত্র কাহিনী। চতুষ্পার্শ্বের এই কামনা লালসার দৃশ্যের পার্শ্বে কানাই ও লীলার প্রেম ও মহত্তর জীবন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন উপন্যাসখানির উপর আলোক-পাত করিয়াছে।

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে মানুষের লোভ, প্রেমহীনতার ভীষণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রায় ও চক্রবর্ত্তী দুই পরিবারে হানাহানি বংশ ধরিয়া চলিয়াছে। ইন্দ্র রায় মহীন চক্রবর্ত্তীকে অপমান করিতে গিয়া নিজের বোনের অপমানের কারণ হইয়াছেন। সাঁওতালদের পরিশ্রমলব্ধ জমির অংশ লইতে চাষীরা মারামারি করিয়াছে, শ্রীবাস তাহার লুব্ধ হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইয়াছে কলওয়ালা বিমলবাবু। তাহার লোলুপ হস্তবিস্তার সাঁওতালদের ভূমিহীন করিয়াছে, তাহার সম্মোহন নারীকে তাহার শান্ত গৃহকোণ হইতে টানিয়া আনিয়াছে, নানা ব্যভিচার ও মদ্যপান প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সহিত মামলায় দুই জমিদার বংশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এই দুর্ব্বার লোভ, মানুষে মানুষে প্রেমের অভাব, পৃথিবীতে এমনই অমঙ্গলের সৃজন চিরদিন করিয়া আসিতেছে।

রামেশ্বরের সন্দেহবীজ, নিজের দুর্ব্বল চরিত্র এক ভীষণ পাপের জন্ম দিয়াছে—পুত্রহত্যা ও স্ত্রীহত্যার প্রতিফলে সে নিজে জীবন্মৃত হইয়া থাকিয়াছে। এমনকি তাহার পাপ যেন সমগ্র কাহিনীর উপর করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

ইহারই পাশে চিরসহিষ্ণু ধরণীর প্রতিমূর্ত্তি, অসীম মমতার প্রতিচ্ছবি সুনীতির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হৃদয়ে এই বীভৎস ঘটনাবলীর উপর যেন শান্ত প্রলেপ ছড়াইয়া দেয়।

সুনীতির পুত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে অহীন। মায়ের মমতামন্ত্রে সে দীক্ষা পাইয়াছে। চরের উপর যে লোভ যে অত্যাচার চলিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়াছে। মানবপ্রেমের মন্ত্র সে গ্রহণ করিয়াছে। উমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করিয়া সে সেই মন্ত্রের কথা শোনাইয়াছে। উমাও স্বামীর ধর্ম্ম বুঝিয়াছে, গৌরবিনী হইয়াছে। ইন্দ্র রায় রংলালের মুখে লাথি মারিলে সেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। অবশেষে অহীন ধরা পড়িলে সকলে কাতর হইলেও সে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছে। মানবপ্রেমের মূল্য দিতে

অহীন্দ্র সকল ক্ষতি, সকল দুঃখ নিঃশব্দে গ্রহণ করিয়াছে।

'আরোগ্য নিকেতনে' জীবন মশাযের চরিত্র একটি অপূর্ব্ব বস্তু। সংসারে তিনি নিগ্রহ ভোগ করিযাছেন। প্রথম প্রেমপাত্রী মঞ্জরী তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে—তাঁহার হৃদযসঞ্জাত গভীর প্রেম সেই প্রতারণাতেও লুপ্ত হয নাই। আপ্রৌঢ়, সম্ভবতঃ আমৃত্যু, তিনি মঞ্জরীর স্মৃতিকে স্মরণ করিযাছেন—সেই স্মৃতিতে প্রবঞ্চনাভোগের বেদনা ছিল, কিন্তু জিগীষা ছিল না। জীবনের সাযাহ্নে বৃদ্ধা, অক্ষমা, অর্দ্ধোন্মাদিনী মঞ্জরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইযাছে এবং তাহার মৃত্যু জীবন মশাযের চিত্তকে কারুণ্যে ভরিযা দিযাছে। বিবাহিত জীবনে খর-জ্বালাময়ী, চিত্তদাহকারিণা আতর বউযের অভিমান এবং কর্কশ বাক্য তাঁহার সঙ্গী হইযাছে, কিন্তু কিছুই তাঁহার চিত্তের মানদণ্ডকে টলাইতে পাবে নাই। তাঁহার পিতৃ-পিতামহের অর্জ্জিত শিক্ষা—মহাশযত্বের শিক্ষা—দরিদ্র আতুর জনসাধারণকে নারাযণ-বোধে ভালবাসিযা সেবার শিক্ষা জীবন মশাযের হৃদযে এক অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার অক্ষয করিযা রাখিযাছিল। সে ভাণ্ডার প্রেমের। তাই ডাক্তারীবিদ্যার প্রচুর আযোজন ও উন্নত ব্যবস্থাপত্রাদি সত্ত্বেও লোকে তাঁহার নিকট আসিত। প্রদ্যোত ডাক্তার তাঁহাকে অবজ্ঞা করে—কিন্তু পরমানন্দ মাধবের পূজারী জীবন মশায তাহার আহ্বানে মঞ্জুব চিকিৎসার ভার লইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করেন না। সেই পরমপুরুষের প্রেম তথা মানবজাতির প্রতি প্রেমই তাঁহাকে অচঞ্চল, বিগতস্পৃহ, স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি করিযাছিল।

বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মানুষের জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব সমস্যা; প্রেম বিরহ সেখানে স্থান পায নাই। 'পথের পাঁচালী'তে অপু দরিদ্রেব সন্তান এবং নিজেও দরিদ্র। কিন্তু তাহার দারিদ্র্য তাহার চিত্তের প্রসারের পথে বাধা হয নাই। সে প্রকৃতির রাজ্যের গোপন ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের সংবাদ পাইয়াছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন এই ধ্যানী চরিত্রকে সংসারের কোন ঘটনাই যেন স্পর্শ করে না। প্রকৃতিপ্রেম বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বস্তু।

প্রবোধ সান্যাল

প্রবোধ সান্যালের 'আঁকাবাঁকা' উপন্যাসখানি বিচিত্র প্রেমকাহিনী। মীনাক্ষী ও কঙ্করের প্রেম সংসারের সকল তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ও জৈবিক আকর্ষণকে ঠেলিযা প্রাণপণে উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাদের দেখিযাই যেন কবির অমর কবিতাটি মনে পড়ে—

"ছুটিনি মোহন মরীচিকা-পিছে পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—তুমি আছ, আমি আছি ॥"

তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই—কেননা বিবাহে প্রেমের সমাধি রচনা হইয়া অনেকক্ষেত্রে দৈহিক প্রবৃত্তির তাড়নাই মুখ্য হইয়া উঠে। পরস্পরের ক্ষণমাত্র চাঞ্চল্য পরস্পর কর্তৃক ভৎর্সিত হইয়াছে। প্রেম তাহাদের নিকট অতি মহামূল্য সম্পত্তির মত ব্যবহৃত হইয়াছে—আসক্তি, কামনা তাহার শুভ্র অঙ্গে চিহ্নপাত করিতে পারে নাই। যেমন নিজেদের জীবনে, তেমনই অপরের জীবনেও বিকৃত দেহকামনাকে তাহারা প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। সুধীর ও কমলা মোহাবিষ্ট হইয়া এক বিকৃত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অন্ধকার জীবন যাপন করিতেছিল। নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় কমলা অবশেষে মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু তখন প্রকাশের পথ বন্ধ। এই ঘৃণ্য, ক্লেদাক্ত জীবন হইতে মীনাক্ষী তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে এবং সুস্থ সবল জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মিসেস্ রায়ের ভদ্রবেশে মানুষের লালসার ইন্ধন জোগানর বৃত্তি তাহাদের সবল চরিত্রের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। ইন্দুমতীর ঈর্ষ্যা-কলুষিত চিত্ত উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে। কল্যাণী দেবীকে তাহার সুপ্ত কামনা স্বামীর গৃহে স্থির থাকিতে দেয় নাই—অবশেষে বৈজ্ঞানিকের সুদীর্ঘ গবেষণাকে ধ্বংস করিয়া এবং নিজের জীবন বলি দিয়া তাহার অতৃপ্ত কামনার অবসান ঘটিয়াছে। কামনার এই ভীষণ রূপ দেখিয়া তাহারা শিহরিত হইয়াছে।

প্রবোধ সান্যালের অপর একটি উপন্যাস 'শ্যামলী'ও দেহাতীত প্রেমের সুন্দর আলেখ্য। শ্যামলী ভদ্রঘরের কন্যা কিন্তু বিনয়কে ভালবাসিয়া সে গৃহত্যাগ করে। ক্রমেই তাহার অবনতি ঘটে—সে দেহ-ব্যবসায় করিয়া বিনয়ের সকল কিছু অভাব ও বিলাসের খোরাক যোগাইত। কিন্তু দেহ তাহার পবিত্রতা হারাইলেও অনন্ত প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে তাহার কণ্ঠনিঃসৃত ভাবগম্ভীর কীর্ত্তন সুধাংশুর চিত্তকে স্পর্শ করিল। সুধাংশুর শিক্ষায় সে বুঝিল বিনয়ের সহিত তাহার যে সম্পর্ক সেখানে প্রেম নাই—মোহ ও প্রবৃত্তিই তাহার একমাত্র অবলম্বন। এখানে কল্যাণ নাই—আছে আত্মার ক্রমাবনতি। প্রকৃত প্রেম কখনও মানুষকে নরকে নামাইতে পারে না। বিনয় তাহাকে ভালবাসে না, কেবলমাত্র নিজের প্রবৃত্তির ক্ষুধা মিটায়। সুধাংশু তাহাকে কুৎসিত জীবন

হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু বিনযের মোহ এমনই প্রবল যে সে বিনয়কে গোপনে আহ্বান করিয়া আনিল। সুধাংশু ভগ্নহৃদয়ে শ্যামলীকে ত্যাগ করিল। শ্যামলী দুঃখ পাইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল। সুধাংশু তাহার কল্যাণের জন্য সামাজিক অপযশকেও গ্রাহ্য করে নাই, পারিবারিক অশান্তিকে সহ্য করিযা লইয়াছিল। সুধাংশুর ত্যাগের অর্থ বুঝিয়া সে জীবনের কোন পথ না পাইযা আপনাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুধাংশুর কল্যাণদৃষ্টি তাহাকে পুনরুদ্ধার করিল এবং বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ দিল। আশ্রমের পবিত্র আনন্দময সাহচর্য্যে শ্যামলীর সুপ্ত জ্ঞান ফুটিল। সে মহান্ সেবাধর্ম্মে আপনাকে বিলাইযা দিল। এমন কি সুধাংশুর পারিবারিক জীবনে পুনরায শান্তি স্থাপিত করিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। সুধাংশুর সাহচর্য্যের লোভও সে দমন করিল। শ্যামলীর প্রেমের আলোকে লীলার ভোগলিপ্সা শান্ত হইযাছে—সেও প্রেমের ধর্ম্ম বুঝিয়াছে। সুধাংশুর আদর্শে নরেন ও লীলা অনুপ্রাণিত হইয়াছে—তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া উভযে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইযা পবিত্র ভদ্র জীবন যাপন করিয়াছে।

বনফুলের সুবৃহৎ উপন্যাস 'জঙ্গম' নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ—বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ। এখানে কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রধান হয নাই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীই এই উপন্যাসের আগাগোড়া কাহিনীর প্লট যোগাইযাছে।

বনফুল

তাঁহার 'দ্বৈরথ' গ্রন্থে চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন দুই ক্ষমতাশালী জমিদার ক্ষমতার দর্পে অন্ধ হইযা মানুষের হৃদযের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিযা গিয়াছিল। প্রজার জীবন—সেপাইদের জীবন তাহাদের কাছে উপায সাধনের যন্ত্রমাত্র ছিল। মানুষকে বীভৎস মৃত্যু দান করিতে তাহাদের কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু এই প্রেমহীনতা—মানুষের প্রতি অবিচারের ফল তাহাদের নিজেদের গাযে আসিয়া লাগিল। গোলক সার শোচনীয পরিণাম এবং চন্দ্রকান্তের উগ্রমোহনকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা বহ্নিকুমারীকে স্বামীর মানরক্ষার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিল। স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমে সে গোলক সাকে উদ্ধার করিতে যাইযা হিংস্র শৃগালের কবলে যমঘরে প্রাণ দিল—উগ্রমোহনের নিষ্ঠুরতার প্রতিফল উগ্রমোহন ফিরিয়া পাইল। দ্বন্দ্বমান মাতঙ্গযূথের স্বর্ণসূত্রটি আত্মকলহে ছিন্ন হইল। কিন্তু এই মহৎ মৃত্যু ব্যর্থ হইল না—এক অদৃশ্য বন্ধন উভয়কে একত্র করিল—নিত্য হিংসা এবং নিষ্ঠুরতা হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করিল।

বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাস স্বাতী ও সত্যেনের প্রেমের দীর্ঘ কাহিনী এবং শেষ পর্য্যন্ত বিবাহবন্ধনে উহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিশোরী স্বাতী শুভ্রকে প্রেমনিবেদনের সুযোগ দেয় নাই—ইতিপূর্ব্বেই তাহার অনুভূতিশীল হৃদয় কামনার লোলুপতার সন্ধান পাইয়াছিল। মজুমদারের ব্যগ্রতা এবং লোলুপতা তাহার মনকে প্রথম হইতে বিরূপ করিয়া তোলে।

বুদ্ধদেব বসু

শাশ্বতী ও বিজুর আপ্রাণ চেষ্টা ও ভীতিপ্রদর্শন তাহাকে কামনার নিকট নত করিতে পারে নাই। সত্যেনের অন্তরলোকে ইহজগতকে অতিক্রম করিয়া যে একটি ঊর্দ্ধগগনচারী চিত্তবিহঙ্গ ছিল সে স্বাতীর মধ্যে সঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইল। স্বাতীও তাহার নীড় খুঁজিয়া পাইল।

পাশাপাশি শাশ্বতী ও হারীতের দাম্পত্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সত্যকার প্রেমসম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। চোখের ভাললাগাকে প্রথম যৌবনের আবেগে বড় বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই দুজনের জীবনযাত্রা নিছক একত্র বাস দাঁড়াইয়াছে। শাশ্বতী অন্তরে তৃপ্তিও পায় নাই, সুখীও হয় নাই।

'কালো হাওয়া' উপন্যাসে হৈমন্তীর চরিত্রে লেখক প্রেমহীনতার ভয়াবহ প্রভাব দেখাইয়াছেন। হৈমন্তী অত্যন্ত আত্মপ্রিয়া। স্বামী, সংসার, সন্তান সবকিছুকে বাসনার আড়ম্বরের নামে সে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত। সত্যকারের দাম্পত্যস্পৃহা তাহার নাই বুঝিতে পারা যায়। অরিন্দমের অর্থই যে তাহাকে মা মহামায়ার নিকট প্রিয় ভক্ত করিয়াছিল তাহা হৈমন্তী বুঝিয়াছিল। মা মহামায়ার চরণাশ্রয়ই যদি তাহার জীবনের লক্ষ্য হইত তাহা হইলে অরিন্দমের অর্থের জন্য সে তাহার গৃহে থাকিত না। তাহার ভোগলোলুপতা ও ভোজনবিলাসও লেখক বিদ্রূপের ছটায় প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ অরিন্দমের অর্থ তাহার কাম্য হইলেও নিজের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সে অরিন্দমকে সহ্য করিতে পারে নাই। অরিন্দমের প্রতি তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না। নিজেকে বড় করিবার চেষ্টায় ধর্ম্মের নেশায় মাতাল হইয়া সে যে-পথ বাছিয়া লইল তাহা শেষ পর্য্যন্ত অরিন্দমের হত্যা এবং উন্মাদগ্রস্ততায় শেষ হইল।

অরুণ তাহারই গর্ভজাত সন্তান। তাই একমাত্র কামনাই তাহার জীবনে সর্ব্বস্ব। উজ্জ্বলার প্রেমেও পূর্ণতা ছিল না—তাহা অরুণের মত উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রকে বাঁধিতে পারিল না। অরুণ সন্তানের মৃত্যুতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়াও নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অবশেষে তাহার উগ্র কামনা মহামায়ার

করাল গ্রাসের ফাঁদে পড়িয়াছে।

মিলিও ধর্ম্মের ভান করিয়াছে। ধর্ম্মের নেশা তাহার চিত্তবৃত্তিকে অহিফেন ধূমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মকে সে চিনিত না। অরিন্দম উজ্জলার চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করায় তাহার চিত্তে এই হতভাগিনীর উপর সমবেদনা ও ভালবাসার অনুভূতি আসে নাই। নিরঞ্জনকে সে নিজেই প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু বুলি ও নিরঞ্জনের প্রেমও সে সহ্য করিতে পারে নাই। মিলি কাহাকেও ভালবাসে নাই—তাই নিজের জীবনে একটা মহা শূন্যতা ও বঞ্চনা সে পরে অনুভব করিযাছিল।

একমাত্র বুলি তাহার বাবাকে ভালবাসিয়া প্রেমের গোপন রহস্যটি বুঝিয়াছিল। নিরঞ্জনের প্রেম তাই তাহাকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিল। অরিন্দমের মৃত্যুর পর স্বার্থসর্ব্বস্ব অরুণের কর্ত্তৃত্ব, হৈমন্তীর উন্মাদনা, এবং মিলির নির্লিপ্ততা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিত। কিন্তু নিরঞ্জনের সহিত পলায়ন করিয়া গিয়া সে সহজ সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

অচিন্ত্যকুমারের 'যায় যদি যাক্' উপন্যাসে সুধীনের প্রেম আধুনিক বাগ্‌সর্ব্বস্বজাতীয় নহে—তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া সে এই প্রেমকে সার্থক করিতে জীবনযুদ্ধে প্রয়াসী হইয়াছে। মৃত্যু তাহার পরিণতি হইয়াছে, কিন্তু লেখকের সহানুভূতির অভাব তাহাকে চির আকাঙ্ক্ষিত সেবার ক্রোড়ে মৃত্যু দেয় নাই। সেবাকে সে সত্যই ভালবাসিত। সেবা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও সে সেবার জন্য প্রতীক্ষা করিযাছে। লাঞ্ছিতা, অপমানিতা

অচিন্ত্যকুমার

সেবাকে তাহার প্রেমের বাহুতে আশ্রয় দিয়াছে—সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা দিয়াছে। বারিধির প্রতিহিংসা তাহাকে আমৃত্যু অনুসরণ করিয়াছে। হীতেন বাবু তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন সেবাকে বিবাহ করিবার অপরাধে কিন্তু তথাপি সে দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়াও সেবাকে ত্যাগ করে নাই। পুরশ্রীর প্রলোভন, অনন্ত সুখের স্বপ্ন, তাহাকে টলাইতে পারে নাই। সে আমৃত্যু সেবার পার্শ্বে দুর্ভাগ্যের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছে। প্রেমই তাহাকে এই শক্তি যোগাইয়া দিয়াছে।

সেবাও সুধীনের সংস্পর্শে আসিয়া প্রেম ও কামের তফাৎ বুঝিয়াছে। বারিধির ঘৃণ্য সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সে সুধীনকেই বরণ করিয়াছে। পিতামাতার অত্যাচার সহ্য করিয়াও সুযোগসন্ধানী দেহসর্ব্বস্ব বারিধিকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুধীনের উপর অবাঞ্ছিত বোঝা চাপাইতে না দিয়া সে

নিজেই ডাক্তারের কাছে যায়। অবশ্য তাহার ভ্রান্তির অবসান ঘটে, যদিও এইটাই তাহার পক্ষে বারিধির প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ যোগাড় করিয়া দেয়। বুভুক্ষু সংসারকে উপবাসী রাখিয়াও সে বারিধির প্রলোভন বারংবার দৃঢ়পদে ঠেলিয়া দেয়। জীবনের চরম পরিণতিতে দেহবিক্রয় করিতে সে উদ্যত হইয়াছে তথাপি বারিধির সাহায্য লয় নাই। কিন্তু লেখক বারিধির প্রতিহিংসা জয়যুক্ত করিয়া পাঠকচিত্তকে ক্লিষ্ট করিয়াছেন। এই গভীর পারস্পরিক প্রেম, জীবনযুদ্ধে অদম্য যোদ্ধাদের মরণপণ যুদ্ধ আমাদের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। কিন্তু শেষকালে সুধীনের মৃত্যুশয্যায় সেবার নিরুদ্দেশ চিত্তকে ব্যথিত ও বিষণ্ণ করিয়া তোলে।

'অনন্যা' উপন্যাসে বীথির পিতামাতা বীথিকে মহৎ জীবন লাভের চেষ্টায় শিক্ষার প্রভূত সুযোগ দেন। কিন্তু নিজেদের অসংযম সন্তানের পর সন্তান সৃষ্টি করিয়া সংসারে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিল—বীথির জীবনও গতানুগতিক অর্থ উপার্জ্জনের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। হরেনের স্বার্থপরতা ইহাতে যোগ দিয়া অবস্থা আরও জটিলতর হইল। বীথির জীবন ক্রমেই নিষ্পিষ্ট হইতে সুরু হইল। তাহার জীবনে আসিল দুইটি দ্বন্দ্ব—এক দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় সমরেশের প্রেমের দাবী। অবশেষে সমরেশের প্রেমই জয়ী হইল। বীথির জীবন অসার্থক হইল না। সমরেশকে বরণ করিয়া তাহা সার্থক হইয়া উঠিল।

'উর্ণনাভ' উপন্যাসে লেখক দেখাইয়াছেন যে প্রেম মানুষের জীবনে একটা মহত্তর, বৃহত্তর অনুভূতি। প্রকৃত প্রেম মানুষকে ভয় হইতে, নিষ্ক্রিয়তা হইতে রক্ষা করে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট কুবের সুশান্তের অভিভাবকতায় সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া স্বকীয় ব্যক্তিত্ব এবং কবিসত্তাটিও বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাহার জীবনে বেবির আবির্ভাব হইয়াছে। বেবির প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাকে সচেতন করিয়াছে : তাহার জ্বালাময়ী বাণী, তাহার সাহচর্য্য কুবেরকে উদ্দীপিত করিয়াছে। সুশান্তের অভিভাবকতাকে অস্বীকার করিয়া সে হৃদয়ের রক্ত দিয়া কবিতার বন্যা বহাইয়া দিল। সুশান্তও বেবিকে ক্রোড়গত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেবির তীব্র দাহকারী বাণী, সুশান্তের ব্যস্ততা ও নির্লিপ্ততা কুবেরকে আপনার অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করিয়াছে। সুশান্তে বেবিকে ভালবাসার চেয়ে কুবেরের উপর জয়ী হইবার জোরটাই বেশী দেখা যায়। বেবিও সুশান্তের অতিমার্জ্জিত বিলাসী অথচ

খেয়ালী চরিত্রকে ভালুবাসিতে পারে নাই ; কুবেরের কবিচিত্তকে সে বারবার আঘাত দিয়া প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিবার যোগ্যতা দিয়াছে। অবশেষে কুবের সুশান্তের নিশ্চিন্ত অভিভাবকতা ত্যাগ করিয়াছে। এই সাহসিকতার মূল্য-স্বরূপ বেবিকে সে লাভ করিযাছে। বিক্ষিপ্ত দুই চিত্ত একত্র বদ্ধ হইয়াছে।

'কাকজ্যোৎস্না' উপন্যাসে দৈহিক কামনা বড হইলে কি ভাবে জীবনের সকল শান্তি ও কল্যাণ বিনষ্ট হয তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই। সুধী নমিতাকে ভালবাসিতে পারে নাই, কেননা তাহার আত্মতৃপ্তি ঘটে নাই। এইখানেই কাহিনীর দুর্ব্বলতার মূল সূত্র। প্রেম সকল সমযেই একমুখা হয না। তাই নমিতার দিক হইতে চেষ্টা থাকিলেও সুধীর নির্লিপ্ততায তাহার প্রেমও পূর্ণ হইতে পারে নাই। সুধীর অবসান ঘটিল, কিন্তু সামাজিক আইন নমিতার স্কন্ধে যেন শাস্তির ভার স্বরূপ হইল। সুধীর সহিত তাহার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে নাই—অথচ তাহার চিত্তকে শাসিত করিবার জন্য চারিপাশে আযোজন চলিযাছে। এমনই অবস্থায অজয তাহাকে ডাক দিযাছে—কথার কুযাসায আচ্ছন্ন কিছুটা হইলেও নমিতা অজযের লালসার মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইযাছিল। সে অজযের সঙ্গিনী হইতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু সামাজিক শাসন বিনা কারণে তাহার উপর বর্ষিত হইল। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্ত স্বামীর প্রেমকে নূতন করিযা লাভের জন্য ব্যস্ত হইযা উঠিল। কিন্তু প্রদীপের দস্যুতা তাহাকে গৃহকোণে স্থির হইযা থাকিতে দিল না। প্রদীপের ও অজযের মনোভাব পরস্পরের প্রতি ব্যবহারেই প্রকাশ পাইল। নমিতা গৃহের অত্যাচারে পথে নামিল, কিন্তু প্রদীপের হৃদযে প্রেম ছিল না তাই সে সবল বাহুতে নমিতাকে আশ্রয দিতে সঙ্কুচিত হইল। অবশেষে গ্রামের নিভৃত কুটীরে নমিতা তাহার ক্ষুধার ভোজ্য হইতে রাজী না হওযায সে তাহাকে ত্যাগ করার সংকল্প করে। নমিতা সমাজকে অস্বীকার করার জন্য প্রদীপের সঙ্গ পুনরায গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার লালসার নিকট আত্মবিসর্জ্জন করিতে রাজী হয না। অজযের মূর্ত্তি তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িল। অজয তাহাকে সংসারের বন্ধন ছাড়িবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু সে কেবল অজযের সঙ্গী হইবার জন্য। শেষ পর্য্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে সে তাহার জীবনের অবসান ঘটায়।

'আসমুদ্র' উপন্যাসে সন্দেহবীজ কি ভাবে ঈর্ষার এবং পারিবারিক জীবনের শান্তি ধ্বংস করে তাহা দেখানো হইযাছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে শিপ্রা ও সৌম্যের দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতা ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ একটি সুন্দর বীণার

তারে যেন বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শিপ্রার মধ্যে প্রেমের আত্মসমর্পণের ভাব অপেক্ষা প্রভুত্বপ্রিয়তা, স্বত্ববোধ ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। বনানীকে স্বগৃহে স্থান দিয়া সে ক্রমেই ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলিয়াছে। তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে সৌম্য ও বনানীর মধ্যে একটা সহজ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শিপ্রা ফিরিয়া আসিয়া ঈর্ষ্যাকুটিল বক্রকটাক্ষে ইহাদের বিদ্ধ করিয়াছে এবং তাহার কুৎসিত অভদ্র আচরণ সৌম্যকে ক্রমেই বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। শিপ্রার নিকট বারংবার আঘাত পাইয়া তাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে রোগশয্যায় শিপ্রার গুপ্তচরবৃত্তি তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। সে সরাসরি বনানীর সঙ্গ-কামনার কথা ঘোষণা করে। শিপ্রার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং ধোঁয়াটে অস্বাস্থ্যকর মনোবৃত্তি সৌম্যকে বনানীর দিকে ক্রমেই ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। অবশ্য শিপ্রার সুপ্ত স্বামীপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। নিজের দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা সে নিজেই বুঝিয়াছে। ভুল বোঝার পালা শেষ হইয়াছে। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য, বৃহত্তর প্রেমের জাগরণে সে সৌম্য ও বনানীর মিলনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দেশকালকে অতিক্রম করিয়া কোন বৃহত্তর সীমার পরিচয় আমরা পাই না। অত্যন্ত ক্ষুদ্র সত্তার মধ্যে মানবজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সীমিত হইয়াছে। অপূর্ণতা আছে, কিন্তু পূর্ণ হইবার চেষ্টা নাই। মানুষের খণ্ডতা পূর্ণ হয় প্রেমে। সেই প্রেম খানিকটা কোণঠেসা হইয়াছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম অনেক ক্ষেত্রে অপ্রকৃতিস্থ পাত্রপাত্রীর অসংলগ্ন চিন্তার বস্তুমাত্র হইয়াছে। নোংরামি ও কুশ্রীতা সত্য হইলেও তাহা চরম সত্য নহে। মানুষের আত্মাপুরুষ সেখানে ক্লিষ্ট হয়। তাই সাহিত্যে, যেখানে মানুষ জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে ছাড়াইতে চায়, সেখানে পরম সত্য ও সুন্দরের আবির্ভাব দেখিতে চায়। প্রেম সেই সত্য ও সুন্দরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা'র নায়ক গ্রামকে কুশ্রী দেখিয়াছে—মতির প্রেমোন্মুখ চিত্তকে সে অবজ্ঞা করিয়াছে। কুসুমের প্রেম তাহার নিকট খেলার বস্তু হইয়াছে—সেনদিদির রূপের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। গ্রামকে ভালবাসে নাই অথচ স্বাধিকার প্রমত্ততা এত অধিক যে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামত্যাগ ঘটে নাই—গভীর বিরাগ লইয়াও সে গ্রামে রহিয়া গিয়াছে। গোপাল বিষয়-

সর্ব্বস্ব হইয়াও বাৎসল্য সম্পদে ধনী। তাই অতি সহজেই সে পার্থিব মোহমুক্ত হইয়া গিয়াছে।

'দিবারাত্রির কাব্যে' এই অসংলগ্নতা মাত্রা ছাড়াইয়াছে। হেরম্ব সুপ্রিয়াকে ভালবাসিত, কিন্তু সে নিজেই মেরুদণ্ডহীন। সুপ্রিয়ার জীবনে ঝড় তুলিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রেমে এমন বলিষ্ঠতা নাই যে সুপ্রিয়াকে আশ্রয় দিতে পারে। অন্য দিকে আনন্দ তাহাকে ভালবাসিয়াছে—সে আশ্রয়ের অপেক্ষা করে নাই, কিন্তু হেরম্ব তাহার প্রেমকে পূর্ণতা দিতে পারে নাই। সুপ্রিয়ার সংসার ধ্বংস হইয়াছে—অশোকের শান্তি গার্হস্থ্য জীবন তাহারই জন্য চূর্ণ হইয়াছে। তাহার শ্রদ্ধাপাত্র অনাথ হেরম্বেরই অন্য সংস্করণ। মালতীকে সে গৃহত্যাগ করাইয়াছে অথচ তাহাকে ভালবাসে নাই। আনন্দের কথার মধ্যে মালতীর জীবনের করুণ দিকটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মালতীর প্রেমতৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই—অনাথের জন্য সে সংসার ছাড়িয়াছে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাইয়াছে গভীর বিতৃষ্ণা। প্রেমের এত বড় অপমান তাহাকে উন্মাদগ্রস্তা করিয়াছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তে' অতি আধুনিক যৌনকামনার একটা স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। আধুনিক নরনারী বিজ্ঞানের নানা উপকরণ লাভ করিয়াও অসুখী, কেননা সে আত্মসর্ব্বস্ব। সে মুখে পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে, সংযমের ভান করে—কিন্তু ভালবাসার বন্ধন স্বীকার করিতে চায় না। প্রেমের দায়িত্ব তাহার নিকট অগ্রাহ্য, কেননা সেখানে কর্ত্তব্য থাকে। অথচ এই প্রেমকে জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে সে দেহকেই সর্ব্বস্ব ভাবে, কিন্তু শান্তি পায় না। সুরমা অতৃপ্ত ক্ষুধাকে মিটাইতে পারে নাই—ঋষিবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ঘৃত দ্বারা অগ্নি নিভে না—বাসনার শান্তি ঘটে না। একমাত্র প্রেমের নিকট আত্ম-সমর্পণ এই বাসনাকে দূর করে, সেখানেই মানুষ জীবনের পরম চরিতার্থতা লাভ করে। সত্যবান সতীর প্রেমকে পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিয়া বনানীর দেহ-তটিনীতে অবগাহন করিয়াছে। কিন্তু অতৃপ্তির দাহ তাহার মিটে নাই—তাই সতীর সেই চিরপুরাতন চিরনবীন প্রেমপ্রবাহিনীর স্নিগ্ধ ধারা পানে তাহাকে তৃষ্ণা মিটাইতে হইয়াছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

'একদা' ও 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসে মানুষের জীবনের এক চরম ভূমিকম্প, প্রচণ্ড ধ্বংসের বর্ণনা পাই। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী একদিকে মানুষের প্রাণশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, অপরদিকে অন্নগত প্রাণ মানুষের

জীবন নিয়া প্রেমহীন লুব্ধ মুষ্টিমেয় মানুষ ছিনিমিনি খেলিতেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও লালসার অগ্নিতে, সমাজ সভ্যতা ধর্ম্ম ন্যায় নীতি প্রেম সৌন্দর্য্য—সকল কিছুই ভস্মীভূত হইতেছে। উদরান্নের দায়ে পিতা পুত্রীকে বিক্রয় করে, মাতা দেহবিক্রয় করিয়া সন্তানকে পালন করে, শ্রমিক শ্রমিককে প্রবঞ্চনা করে—হত্যা করে, চিকিৎসক রোগীকে দেখিতে আসিয়া কামনা তৃপ্ত করে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতা ও নীচতার মধ্যেও মানুষের আত্মাপুরুষ আপনাকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করে। 'একদা' গ্রন্থের মণীশ, সুনীল, অমিত, ইন্দ্রাণী দুঃখবেদনার অগ্নিতে নিজেদের শুদ্ধ করিয়া চারিপার্শ্বের দগ্ধ প্রাণকে অমৃতস্নেহে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করে। জীবনের অতিস্থূল প্রয়োজন তাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। 'ডাক দিয়ে যাই' গ্রন্থে শেখর শ্রমিকদের ভালবাসিয়া সহকর্ম্মীর ছোরার আঘাতে প্রাণ দেয়। প্রমথ চল্লিশ কোটি মানুষের দুঃখ নিজের দুঃখ করিয়া লইয়াছে—সংসারের সকল সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের প্রেরণার উৎস দরিদ্রা জননী কল্যাণী। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াও মৃত্যুপথযাত্রিণী কন্যার শিয়রে বসিয়া অবশিষ্ট পুত্র দিলীপকে মানুষের দুঃখমোচন করার ব্রত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দেন।

নবেন্দু ঘোষ
ও
গোপাল হালদার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসও সেই লোভের কাহিনী। মালিকগণ নিজেদের মুনাফা হইতে শ্রমিকদের অংশ দি.ত প্রস্তুত নন —অথচ উহাদেরই রক্তজলকরা পরিশ্রমে তাহাদের সকল মুনাফা। লোভ সাধারণ মঙ্গলবুদ্ধিকে লুপ্ত করে—দেবালের ম. শ্রমিক-দরদী কর্ম্মীর প্রাণ যায়। শ্রমিকগণও স্ব স্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে পরাঙ্মুখ। সীতানাথ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। নিজেদের স্বার্থে বৃহত্তর শ্রমিক স্বার্থকে ইহারা বলি দেয়, তাই মালিকগণের লোভের খোরাক হইয়া দাঁড়ায়। অনিরুদ্ধ মল্লিক ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল কিন্তু এই লোলুপতা, উগ্র কামনা তাহারই সংসারকে ধ্বংস করে। আদারিণী কন্যা তাহারই স্বার্থলোলুপতায় গৃহত্যাগ করে। দেবুর বৃহত্তর আদর্শ মন্দাকে গৃহের ক্ষুদ্র কোণ হইতে বহির্বিশ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দেবুর চরিত্রেরও দুর্ব্বল দিক ছিল, তাই তাহারই জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী মন্দাকে সে আশ্রয় দিতে পারে নাই। মন্দার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহার পর দেবু ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিয়াছে। সে অতি সাধারণ মানুষ হইয়া

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

গিয়াছে। ঘোষালের স্ত্রী অমলার সহিত দেবুর সম্পর্ক কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ হয়। এই ঘটনায় দুজনেরই চরিত্র নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে—এবং অনবরত প্রেমের পাত্র পরিবর্ত্তনই যেন তাহাদের চরিত্রের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মোটামুটি উপন্যাসের শেষ অংশ পাঠককে হতাশ করে।

নবম অধ্যায়

সাহিত্যে রোমান্টিকতা

রোমান্টিসিজন্ কথাটি বিদেশী শব্দ—ইহার যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া কঠিন। স্বপ্নাতুরতা বা ভাবাতিশয্য বলিলে ঐ শব্দের একমুখী বিচার হয়। সুতরাং ইহার যথার্থ প্রতিশব্দ এ পর্য্যন্ত কেহই দেন নাই। তবে রোমান্টিসিজম বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাহিত্য রোমান্টিকতা লইয়াই গঠিত—তাই সাহিত্যের লক্ষণগুলি আলোচনাকালে রোমান্টিসিজম্ বস্তুটি কি আমাদের দেখা প্রয়োজন।

সাহিত্যের রোমান্টিক ধর্ম্ম

সাহিত্য মাত্রেই দেয় অলৌকিক আনন্দের স্পর্শ। সাহিত্য আমাদের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের আবেদন আনিয়া দেয়—তাহার সুখ দুঃখ ক্রোধ বিস্ময় সকল কিছুই ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সামগ্রী। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে অনুভবগুলি কর্কশ, রুক্ষ ও ধুলিমলিন হয়—সাহিত্যে তাহারাই কবির মায়াবী কল্পনাদণ্ডের প্রয়োগে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির বস্তুতে পরিণত হয়। এই অলৌকিক আনন্দের সংবাদটুকু না থাকিলে সাহিত্য বর্ণনা হইয়া দাঁড়ায়। তাহা রস স্বজন করে না—পাঠকের চিত্তে অনুভবের আলোড়ন তোলে না। এই অনুভবের প্রয়োগ ব্যাপারটিই রোমান্সের মারফৎ উপস্থিত হয়।

সাহিত্যের ভাব ও বস্তুরূপ কালের প্রবাহে পরিবর্ত্তিত হয়—কিন্তু সাহিত্যের আসল স্বরূপ সকল যুগেই এক থাকে। কেননা এই লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে সাহিত্য অসাহিত্যে পরিণত হয়। রোমান্টিকতা সাহিত্যের একটি বিশেষ ও প্রধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে—কেননা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রস ঐ রহস্যময়তার রাজ্যে, ঐ অতীন্দ্রিয়তার দেশে। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই মতের সত্যতা উপলব্ধি করিব যে রোমান্টিকতা

ভিন্ন সাহিত্য দৃঢ়ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত হইতে পারে না। রোমান্টিকতার বুদ্ধিগ্রাহ্য তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করা যায় না—উহা কবির মনোধর্ম্ম। "বাহির হইতে অন্তরে ফিরিয়া আসা এবং অন্তর হইতে রহস্যের জাল বুনিয়া বহির্বস্তুর উপর তাহার আরোপ, ইহাই যথার্থ রোমান্টিক ধর্ম্ম।"

(শশীভূষণ দাসগুপ্ত)

বস্তু, ইন্দ্রিয়গোচর জগতের সীমার মধ্যেই অসীমের আসনখানি পাতা। সেই সীমার মাঝেই অসীমের আসা-যাওয়া চলিতেছে। কবির অনুভূতি সেই অসীমকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মানুষ সেই অসীমেরই অংশ, ক্ষুদ্র মানবসত্তার মধ্যে অসীমের অনন্ত প্রকাশ—মানুষও অনন্তসম্ভাবনাময় হইয়া উঠে। অনেকের ধারণা ফুল, জ্যোৎস্না, পাখী, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়মাত্রেই রোমান্টিকতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু রোমান্টিকতার বিষয়ে এই সঙ্কীর্ণতম সংজ্ঞা অত্যন্ত ভ্রান্ত। রোমান্টিক মানস আমদের স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ বস্তু বা ক্ষেত্রে তাহা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। রোমান্টিকতার আসন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতিই আমাদের জীবনের রোমান্টিকতার পরিচয়। তাহার প্রকাশ কেবল প্রেমে নহে, জ্ঞানেও।

সাহিত্যের শেষ মূল্য আনন্দে। এই আনন্দের অবস্থান সুন্দরে। আনন্দই সুন্দর—তাই পরম আনন্দময় পুরুষ আমাদের নিকট পরম রূপের অধিকারী। সাহিত্যও সেই আনন্দ সুন্দরের আরাধনা করে। মানুষের অন্তরস্থিত প্রকৃতিও শিল্প, সংগীত, সাহিত্যে আপনার অগোচরে সেই চির সুন্দর ও চির আনন্দকে প্রণতি জানায়। যেখানে সুন্দর ও আনন্দ সেখানেই চির সত্যের অবস্থিতি। এই সত্য সুন্দরের পরিচয় রোমান্টিকতার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়। তাই যেখানে আনন্দ বিঘ্নিত—বিকৃত রসের কারবার যেখানে—সেখানে মন আপনিই রসগ্রহণে নিবৃত্ত হয়। কুৎসিত বস্তু সাহিত্যে রূপ পায়—কিন্তু তাহাকেই পরম সত্য বলিয়া আমাদের মন কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদ সাহিত্যই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সকল কাব্যের বিষয়বস্তু অনেকটা একই ধরণের —বর্ণনাই সেখানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। আর একই ধরণের ঘটনা মঙ্গলকাব্যের বিষয়। নায়কেরা সকলেই দর্পী ও সম্ভ্রান্ত। দেবতা তাঁহার প্রতিষ্ঠার জন্য নায়ককে নানা বিপদের মধ্য দিয়া তাঁহার মহিমা বুঝাইয়া দেন।

অবশেষে নায়ক তাঁহার পূজা করিয়া সুখ ও শান্তি লাভ করেন। ইহা ছাড়া নায়িকার বারমাস্যা, বিবাহ, মিলন ও বিরহ বর্ণনা থাকিবেই। এখানে কবির বর্ণনাশক্তির পরিচয় যতটা পাই—তাহা অনেকক্ষেত্রে ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছে কিন্তু অলৌকিক রসের পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সুর আমরা শুনিতে পাই তাহা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রাজ্যের সুর। এই পদগুলিতে আমরা বস্তুগত জীবনের মধ্যে এক অলৌকিক অপার্থিব স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিতে পাই—এক নূতন রাজ্যের পরিচয় জানিতে পারি। সে রাজ্য, সে সঙ্গীত—প্রেমের, রোমান্সের। আমাদের লৌকিক ভালবাসার বন্ধনগুলি—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবকে বৈষ্ণব কবি এক অলৌকিক রাগিণাতে প্রকাশ করেন। সেই অলৌকিক ভাব পাঠক ও শ্রোতার চিত্তে এক অননুভূতপূর্ব্ব রসের ব্যঞ্জনা আনিয়া দেয়।

সে যুগে সাহিত্য যেখানে প্রেমের কথা বলিতে গিয়া শৃঙ্গারের নানা কলার বিবরণ দিয়াছে, কবি জয়দেব সেখানে তাঁহার 'গীতগোবিন্দম' কাব্যে হৃদয়ের নানা ভাবোল্লাসের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। দেহের কথা সেখানে আছে—দেহমিলনের জন্য নায়ক-নায়িকার আগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে—প্রেম রক্তমাংসের অতীত অশরীরী বস্তু নহে, কিন্তু সেখানেই প্রেম সীমাবদ্ধ নহে। শ্রীরাধার মাধবের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, হা-হুতাশ, নামজপ সকলই এক রহস্যময় অতীন্দ্রিয় হৃদয়রাজ্যের সংবাদ দেয়। সেখানে বস্তুগত জগৎ লুপ্তপ্রায়, কেবল রাধাবল্লভ তাঁহার হৃদয়-শতদলে অবস্থান করিতেছেন। পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দও নরমূর্ত্তিতে রাধার বঞ্চিত প্রিয় রূপে ধরা দিয়াছেন—অসীম প্রেমে বদ্ধ হইয়া সসীমের নিকট একান্ত হইয়া গিয়াছেন। অসীমের এই সসীম হইবার লীলা, প্রেমের বিচিত্র ভাবের মধ্যেই গীতগোবিন্দের রহস্যময়তা।

জয়দেব

বিদ্যাপতি ও জয়দেব দুইজনেই ছিলেন রাজকবি। তাহার উপর ছিল তৎকালীন সাহিত্যিক রুচি ও আদর্শ। ইঁহাদের উভয়ের রচনাতেই প্রেমের নানা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং চাতুরী স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সেই সকল ছলাকলাপূর্ণ পদগুলির ফাঁকে ফাঁকে এমন পদেরও সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে হৃদয় ব্যক্তিগত বস্তুতেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া অলৌকিক দিব্য প্রেমরসের সন্ধান পাইয়াছে। বৃন্দাবনের কিশোরী রাধার মধ্যে জগতের চিরন্তনী প্রেয়সীর সন্ধান কবি দিয়াছেন। কেবল চিত্র-

বিদ্যাপতি

তুলিকায় আঁকা নহে, হৃদয়ের রঙে রঙীন করিয়া তাহার রূপসজ্জা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদেই কামনার উৎপত্তি, দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতি পারস্পরিক মিলন কামনা করে। এই কামনাবৃন্তের উপরই প্রেমশতদলের স্থিতি। বিদ্যাপতি নানা পদে এই কামনার বিচিত্র রূপ, নানা কেলিবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রেমের চরমাবস্থা সংকীর্ণ দেহসীমাকে অতিক্রম করিয়া রাধা কৃষ্ণের দেহ একই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। প্রেমের সেই তুরীয় অবস্থায় রাধা কৃষ্ণ হইতে চাহিয়াছেন—

"আন জনম হব কান ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥"

প্রেমের নিকট প্রাণও যখন তুচ্ছ হইয়া যায় তখনই মৃত্যুহীন রহস্যময় এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই প্রেমের শক্তি বড় বেগশালিনী। শ্রীমতী দুর্য্যোগময়ী তমসা রজনীতে, গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্নে, শিশিরের হিমশীতল নিশীথে চিরবাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে অভিসার করিয়াছেন। গৃহের আরাম, রাজভোগ, মানসম্ভ্রম—জাগতিক সকল কিছুই তুচ্ছ হইয়াছে। ইহাকে সামান্য নরনারীর জৈব আকর্ষণ বলিয়া অভিহিত করা যায়। কবি দেখাইয়াছেন আমাদের এই মর্ত্ত্যজীবনেই দেহের আকর্ষণ এক বিচিত্র প্রেমাবেশে পরিণত হয়—দেহজ্ঞান তুচ্ছ হইয়া প্রেমাস্পদের প্রীতি সম্পাদনই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। দেহের সীমার মধ্যেই এই অসীম প্রেমের রহস্যময় গতি। অভিসার, মাথুর ও ভাবসম্মিলনের বহু পদে এই রহস্যের পরিচয় কবি রাখিয়াছেন।

শ্রীরাধার অভিসারের পদগুলিতে এই জীবনাধিক প্রেমের জন্য, অনন্ত রহস্যের জন্য—ইহজগতের প্রিয় দেহও তুচ্ছ হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে প্রেমের রহস্য সুন্দর রূপ পাইয়াছে।

"রয়নি কাজের বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোসে বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার ॥

* * *

আপন অহিত-লেখ কহইতে পরতেখ
হৃদয়ক ন পাইঅ ওর।
* * *
চরণ বেধিল ফণি, হিত কএ মানিল ধনি—
নেপূর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছঞো তোহি সরূপ কহসি মোহি
সিনেহ কতদূর ওর ॥"

"নব অনুরাগিণি রাধা।
* * *
একলি কয়লি পযান।
পন্থ বিপথ নাহি মান ॥"

কৃষ্ণের অভাবে রাধিকার সকল কিছুই শূন্য হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তমই তাহাকে পূর্ণ করিয়া রাখেন, তাই তাঁহার অভাব রাধিকাকে প্রাণশূন্য দেহের মত অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে। প্রাণ থাকিতেও আর একজনের অভাব জীবিতকে জীবন্মৃত করে—ইহা এক বিচিত্র রহস্য।

"শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী ॥"

প্রেমাস্পদের সহিত মিলনকালে বস্ত্র বা অলঙ্কারের ব্যবধানও সহ্য হয় না—এ যেন সসীম দেহে অসীম হইবার—একাত্ম হইবার নিবিড় বাসনা। রাধার দুঃখের পরিসীমা কে করিবে—সেই পরম প্রিয় বহুদূরে।

"চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥"

প্রেমে অভিমান নাই, প্রিয়ের উপর দোষারোপ নাই, কেবল নিজ অদৃষ্টই দায়ী হইয়াছে।

"পিয়কে দেখি নহি যে ছিল করমে ॥"

বসন্ত বর্ষা শরৎ প্রভৃতি নানা ঋতুতে রাধার প্রিয়সঙ্গলালসার নানা বিবরণ পাই কিন্তু ইহা চিরাচরিত মঙ্গলকাব্যের নায়িকার বারমাস্যা বিবরণী হইতে পৃথক।

দীর্ঘ বিরহান্তে প্রেমিক ধরা দিয়াছেন প্রিয়ার বাহুবন্ধনে। প্রিয়বিহনে

দেহজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল—প্রিয়স্পর্শে দেহজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। শারীর বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব কিভাবে ভুল হইয়া যায় ইহা এক বিচিত্র রহস্য।

"অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ— অলপ-ভাগি নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥"

চণ্ডীদাসের পদাবলী অপূর্ব্ব রোমান্টিক প্রেমকাব্য। চণ্ডীদাসের রাধাকে ভাবিতে গেলে তাঁহার রূপযৌবন সজ্জা কিছুই মনে পড়ে না, কেবলই মনে হয় তিনি কৃষ্ণময়ী রাধা—যাঁহার অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণ বিরাজ করেন। রূপে প্রেমের শুরু—রূপকে অতিক্রম করিয়া প্রেম তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়াছে কোন্ অসীম রহস্যরাজ্যের উদ্দেশ্যে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধার বিরহকে অসহ্য বলিয়াছেন—কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা প্রিয়ক্রোড়ে বিরহ চিন্তায় ভীতা হইয়া পড়ে।

চণ্ডীদাস

"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁন্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

রাধার নিকট পার্থিব জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বহির্দৃষ্টিতে তিনি উন্মাদিনী। সংসার সমাজ সকল কিছুই তাঁহার নিকট অস্তিত্বহীন। নব জলধরের বর্ণে, ময়ূরের নীলাভ কণ্ঠে তিনি প্রিয়ের রূপ দেখিতে পান। রাধার প্রিয়তম প্রকৃতির মধ্যে ছড়াইয়া আছেন।

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
* * *
এক দিঠি করি ময়ুর-ময়ুরী—
কণ্ঠ করে নিরখনে।

কৃষ্ণের নাম শুনিয়া রাধা বিহ্বলা—প্রেমের এমন রহস্যময় শক্তি কেহ পূর্ব্বে এমন করিয়া দেখান নাই। প্রেমে দেহের মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু প্রিয়তমের নামে সর্ব্বেন্দ্রিয় এমন করিয়া অবশ হইবার কথা জানা যায় না। নামের কি অপূর্ব্ব শক্তি!

"সই, কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম।
* * *

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে বা পাইব তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয় !"

রূপ দেখিতে দেখিতে দুজনাই মুগ্ধ বিহ্বল—রূপের চিন্তা মুছিয়া গিয়াছে—কেবল পলকহীন নেত্রে এক গভীর মিলনের লীলা চলিতেছে। দেখার মধ্য দিয়াই যেন উভয়ে উভযকে একত্র করিয়া পাইয়াছেন।

"সই এমন সুন্দর বর কানু।
হেরিয়া সে মুরতি সতী ছাড়ি নিজপতি
তেযাগিয়া লাজ ভয় মান ॥"
"যেই সে দেখিল তৈখন হতে
কিছু না সম্বিত পাই ॥

* * *

কালি হতে মন করিছে কেমন
হৃদয়ে ভিতরে জাগে ॥
শুইতে না হয নিঁদের আলিস
ক্ষুধা-তৃষ্ণা গেল দূরে।"

প্রেম যে একজন্মের সম্পর্ক নহে, তাহা যে জন্মজন্মান্তর ধরিযা চলিতে থাকে—দুইটি হৃদয় প্রেমে চিরবদ্ধ হইয়া থাকে, কবি তাহা জানাইয়াছেন। জন্মাজন্মান্তর ধরিয়া প্রেমের এই এক রহস্যময় গতি চলিতে থাকে।

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥"

প্রেমের মহারহস্য—জীবনের বিনিময়ে প্রেমের আবির্ভাব চণ্ডীদাস অতি সহজ ও গভীর কথায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"সই কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল।"

প্রেমের উদ্দেশ্য আত্মসুখ নহে—প্রেমের এমনই রহস্য যে তাহা উপজিত হইলে হৃদয়ে সুখের কামনা আর থাকে না। কৃষ্ণবিরহে প্রেমের এই তীব্রবেদনা

চণ্ডীদাসের রাধা নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছে। শারীর বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই মিথ্যা হইয়া যায় প্রেমের কাছে। প্রেমাস্পদের অভাব কেমন করিয়া জীবন্মৃত করে তাহা এক বিচিত্র রহস্য।

প্রেমের শেষ রহস্য ও অশেষ কথাটি চণ্ডীদাস অনেক স্থানেই বলিয়াছেন। ইহাই চণ্ডীদাসের রোমান্টিক প্রেম-কাব্যের মূল সুর। প্রেমেতে দেহের ভিন্নতা মাত্র থাকে—মন আত্মার দ্বিত্ব ঘুচিয়া এক হইয়া যায়।

"চণ্ডীদাসে কয় দুয়ে এক হয়
হয় বা না হয় ভিন্ন।
রহে সে রসিয়া দুহু মিশাইয়া
রাই কানু একই তনু॥"

ইহাই প্রেমের সার কথা, প্রেমের আসল রহস্য।

বলরামদাসের পদে তৎকালীন যুগের প্রভাব পড়িয়াছে। এ-যুগে প্রেমের রহস্যময়তা দূরে গিয়াছে, প্রেমের বর্ণনায় পূর্ব্বের উন্মাদনাও গিয়াছে। কবি যেন দূর হইতে আরাধ্য দেব-দেবীর প্রণয়-লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমের বর্ণনায় প্রাণধর্ম্ম কিছু সঙ্কুচিত—তাই পূর্ব্বের রহস্যময়তাও তেমন নাই। অবশ্য বলরামদাসের পদে প্রেমের গভীরতার কথা আমরা একেবারে পাই না বলিতে পারি না। রসোদ্গারের পদগুলিকে বলরামদাসের শ্রেষ্ঠ পদচয়ন বলা যায়। কৃষ্ণের প্রেমের নিবিড়তার বড় সুন্দর বর্ণনা—প্রেমের রহস্যের একটি চিত্র—সহজ ও সুন্দর ভঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রিয়াকে লইয়া যে কি করিবে প্রেমিক ভাবিয়া পায় না—ভালবাসার অফুরন্ত তরঙ্গপ্রবাহে উভয়ে ভাসমান। ভালবাসার নিবিড় তপ্তস্পর্শ—মানবিকতাবোধ এবং তাহার সহিত এই সসীম দেহে প্রেমে অসীমতার বিস্তার—রহস্যের কথাটুকুও আমরা পাই।

বলরাম দাস

"বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগি থাকে,
তমু সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহোঁ, পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।

অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥”

প্রেমের এক বিচিত্র অভিব্যক্তি এই পদটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। হৃদয়-রহস্যের কথা, প্রাণ-কেমন-করা অনুভূতির কথা বলরামদাসও বলিয়াছেন।

“পরাণ যেমন করে কি কহব কায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাস বলে অবশ পরশে ॥”

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাসের পদে গতানুগতিকতা এবং বর্ণনার আধিক্য থাকিলেও বহু পদেই প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের রাধা মুহূর্তের জন্যও শ্যামস্পর্শ ছাড়িতে প্রস্তুত নহে।

“কহত পরাণ সখি আঁখিতে অঞ্জন মাখি
অঙ্গেতে কস্তুরী করি তায়।”

জ্ঞানদাসের ভণিতায় শ্রীরাধার উক্তি যেন কবির উক্তির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কবির সত্তা মুছিয়া গিয়াছে—কবি নায়িকা হইয়া গিয়াছেন। পদরচনা-কালে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যবোধ চলিয়া গিয়াছে।

“গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি, তিন তুলসী দিয়া ॥”

রাধার আর্তি বৈষ্ণব কবি মাত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা কানুর যৌবনের বনে মন হারাইয়াছেন। শ্যামের লাবণ্য-সাগরে তাঁহার দৃষ্টি ডুবিয়া গিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতি রাধার দৃষ্টির অগ্রভাগ হইতে সরিয়া গিয়াছে। অন্তরে কৃষ্ণমূর্তি, বাহিরেও সকল বস্তুতে সেই তরুণেরই মূর্তি। জ্ঞানদাসের নৌকাখণ্ডের পদগুলি পড়িতে পড়িতে সব কিছু লুপ্ত হইয়া যায়—কেবল অকূল ভবসমুদ্রের কাণ্ডারীকে মনে করাইয়া দেয়।

“মানস গঙ্গার জল ঘন করে টলমল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।”

জ্ঞানদাসের পদ সীমা হইতে অসীমের দিকে যাত্রা করিয়াছে। প্রাকৃত রূপ বর্ণনায় তাহার সুরু, অসীম রহস্যের দিকে তাহার পাড়ি।

"ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম-নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তব আগে কি ছার যমুনা ॥"

* * *

আমরা আহীর নারী কুলশীলে পরিহরি
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী শুন ওহে গুণমণি
কত না করহ প্রবঞ্চনা ॥"

জ্ঞানদাসের বংশীশিক্ষা পদগুলিতে রহস্যময় বংশীর রহস্যের কথা পাই। রাধা যে বংশী শুনিয়া কুলত্যাগিনী—মান অপমান, লোকলজ্জা, সমাজ, ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই ভুলিয়াছেন—তাহার রহস্য ভেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ বংশী ত সহজ নয়—এই বংশী মহামন্ত্র প্রণবধ্বনি—ইহারই আশ্চর্য্য সুরে ষড়ঋতুর প্রকাশ হয়—জীবজগতের ধারা প্রবহমান হয়।

"মুরলী করাহ উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥

* * *

কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ূরিনা ॥
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটযে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥
কোন রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥"

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগ এবং রসোদ্গারের পদগুলি অতি অপূর্ব্ব। প্রেমের বিচিত্র রহস্য—সর্ব্বস্ব ভুলিয়া সেই হৃদয়েশ্বরের জন্য রাধার তীব্র ব্যাকুলতা পদগুলিতে নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মরণাধিক প্রেমের কথা অনেক বৈষ্ণব কবিই বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদাস নূতন সুরে নূতন ভাবে কথা বলিলেন। প্রেমে সুখ নেই—প্রেমের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। প্রেমের এমনই শক্তি যে সে বিধাতার বিধান উল্টাইয়া দেয়, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপদেশ কথা শুনে না। এখানেই প্রেমের চিরন্তন রহস্য।

"সই পিরিতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম-কথা ॥
* * *
সভাই কহয়ে পিরিতি-কাহিনী
কে বলে পিরিতি ভাল।
কানুর পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥"

জ্ঞানদাসের নামে প্রচলিত একটি বিখ্যাত পদে প্রেমের নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটিত হইয়াছে। হৃদযের যে সুগভীর স্তরে প্রেমের উদ্ভব সেখানে কবির দৃষ্টি পৌঁছিয়াছে। এই প্রেম "হৃদয়মূল হইতে উদ্ভিন্ন আনন্দ বেদনার যুগ্মবৃন্তে প্রস্ফুটিত অনবদ্য ভাবকুসুম।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
* * *
পিযাস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িযা গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
মরণ-অধিক শেল ॥"

আত্মনিবেদনের পদে জ্ঞানদাসের রাধা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রিয়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। আপনার দিকে কণামাত্র রাখেন নাই। এমন করিয়া শরণ লইলে তবেই ত সেই পরমপুরুষ কাছে আসিয়া ধরা দেন।

"তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥
আনের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শতশত গুণে প্রিয়তম করি মানি ॥"

গোবিন্দদাসের পদে কলাকৌশলের যেমন দক্ষতা দেখি, ভাবের দিক দিয়াও পদগুলি অনবদ্য বলা চলে। ভাব ও রূপের এক বিচিত্র সমন্বয় হইয়াছে

পদগুলিতে। রাধার রহস্যবিজড়িত প্রেম এবং তাহারই সাধনা গোবিন্দদাসের পদে রূপ পাইয়াছে। রাধার প্রেম এমনই যে সেখানে প্রাণ ত' অতি তুচ্ছ বস্তু—সামাজিক সম্ভ্রমতার জন্য মানুষ তাও বিসর্জ্জন দেয়—আর সেই প্রাণাধিক মানও প্রেমের কাছে মূল্যহীন। এই প্রেম কি বস্তু যেখানে বর্ষা-রজনীর ঘোর দুর্য্যোগকে অবহেলে রাধা অতিক্রম করিয়া যান—পদকর্ত্তার সেই পদটি পড়িতে পড়িতে বিস্ময়বসে মন অভিভূত হইয়া যায়। প্রেমের এ এক বিচিত্র রহস্য।

গোবিন্দদাস

"কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।"

কেবল তাহাই নয়, স্বহৃদয়ের অনুভূতি দিয়া অনুভব করিয়াছেন অপরের উৎকণ্ঠা। দুইটি হৃদয় একই সঙ্গে একই অনুভূতিতে চালিত হইতেছে—এ কি অদ্ভুত অবস্থা।

"যৈছে হৃদয় করি পহু হেরত হবি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।"

দর্শনমাত্রেই প্রেমের তুফান ছুটে—দেহজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়—দুই নয়ন প্রেমাশ্রুতে ভরিয়া যায়—স্পর্শ ত' দূরের কথা।

"দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া সাগরে ডুবি গেল॥
দুহুঁ জন নয়ন হোয়ল যব থির।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ হেরি ঢরকত নীর॥"

সহস্র বিপদ রাধার কাছে কিছুই নয়—কিন্তু কৃষ্ণবিরহ অসহনীয়। কৃষ্ণ-বিরহই রাধার কাছে একমাত্র দুঃখ বা বিপদ।

"সজনি অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদ লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু বিচ্ছেদ হয় জানি॥"

কেননা রাধার অন্তরে কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না।

"পাপ পরাণ মম আন নহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।"

প্রেমের কি বিচিত্র মহিমা! যিনি চিত্রিত সর্প দেখিয়া ভীতা হইতেন, তিনি এখন মণির আলোক গোপন করিবার জন্য সর্পের মস্তকে হাত দেন। রাজনন্দিনী

গৃহে পদব্রজে অন্দরমহল হইতে সদর পর্য্যন্ত যান নাই তিনি অন্ধকার নিশীথে পদব্রজে অরণ্যপথে যাত্রা করিয়াছেন।

"ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি' চমকি' ঘন কাঁপ।
অব অন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই :
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥

* * *

যো পদতল থল- কমল সুকোমল
ধরণী-পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কটে বাটহি
আওত যাওত নিশঙ্ক॥"

শ্রীমতী কৃষ্ণের স্পর্শ পঞ্চভূতের ভিতর দিয়া কামনা করিয়াছেন। হৃদয়ের নিবিড়তম অন্তর্দ্দেশে এই প্রেমের জন্ম—ভিতর বাহির সেই প্রেমে ভরপুর। তাই সমগ্র প্রকৃতির রূপে প্রিয়তম ছড়াইয়া গিয়াছেন। সীমার মধ্যে এই অসীমের আবির্ভাব প্রেমেই সম্ভব।

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥

* * *

যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥

* * *

যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ধাম॥"

শ্রীরাধার সর্ব্বত্র শ্যামময় হইয়াছে—এখানেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা :

"লোচন শ্যামর, বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার, হৃদয়ে মণি শ্যামর
শ্যামর সঙ্গী করু কোর॥"

শ্যামকে রাধা চিরদিনের মত হৃদয়ে পাইয়াছেন—প্রেমের ভাবে চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। তিনি শ্যামময় হইয়া গিয়াছেন—বিশ্বসংসারের সঙ্গে বহিঃসম্বন্ধমাত্র

রহিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ে চির-একান্ত চিরবাঞ্ছিত ধন।

"হৃদয়-মন্দিরে মোর কাহু ঘুমাওল,
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন-গৌরব চৌর সদৃশ ভেল,
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥

* * *

ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপতিক ধান।

* * *

যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে,
গোবিন্দদাস এক সাখী॥"

সাহিত্য মাত্রেই রোমাণ্টিক। বৈষ্ণব পদাবলী অপূর্ব্ব রোমাণ্টিক গীতিকবিতা: এখানে সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান মিলে, পার্থিব প্রেমের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গের সুর ভাসিয়া আসে। কিন্তু এই রোমাণ্টিকতা কেবল বৈষ্ণব পদাবলীরই আশ্রয়মাত্র নহে। সর্ব্বকালের সাহিত্যেই এই রোমাণ্টিকতাকে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। জীবনের দৈনন্দিনতা, খণ্ডতাকে সাহিত্য রসে ভাবে পূর্ণতা দান করে—দুঃখের ঘটনাও পাঠকচিত্তে আনন্দলোক রচনা করে। বাস্তবের ইতিবৃত্ত বর্ণনা সাহিত্য নহে—সেই ইতিবৃত্ত রসসমৃদ্ধ ও পূর্ণ হইলে তবেই তাহা সাহিত্য হইয়া উঠে। আধুনিক সাহিত্যও এই রোমাণ্টিক ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। কেননা রোমাণ্টিকতাই সাহিত্যের প্রাণধর্ম্ম।

(খ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্য ক্রমেই গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালা, দাশু রায়, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির হাতে পড়িয়া সাহিত্য হইতে রস ক্রমেই বিদায় লইতেছিল। ছেলেভুলানো খেলাতেই তৎকালীন সাহিত্যিকগণ ব্যস্ত ছিলেন। কথার নানা ফুলঝুরি ক্ষণিকের জন্য শ্রোতা ও পাঠক চিত্তকে চমক দিত, কিন্তু একটা পরম রসতৃপ্তির কথা পাঠক ও লেখক ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এই অবস্থার অবসান ঘটাইলেন রঙ্গলাল। ঈশ্বর গুপ্তের তিনি বিশেষ

স্নেহভাজন ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের রস তাঁহাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দান করিল। চিরকালীন সাহিত্যধর্ম্মের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ইংরাজী কাব্যের রোমান্স রস রঙ্গলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত করিয়া এক নবযুগের সূচনা করিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে পরাধীনতার যে বেদনা ছিল—রঙ্গলাল উপযুক্তকালে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাহার রূপ দিলেন। ইতিহাসকে নূতন সুরে নূতন ভাবে তিনি পরিবেশন করিলেন। মামুলী বর্ণনামূলক কবিতার আধারে রঙ্গলাল নূতন রসের পরিবেশন করিলেন। সেই আধারের উপাদান হইল—দেশপ্রেম, বীরত্ব ও প্রেম। এই তিনটির রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটিয়া অপূর্ব্ব রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যগুলি রচিত হইল। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী' ও 'কাঞ্চী-কাবেরী' এই তিনখানি কাহিনী-কাব্যেই আমরা রোমান্স রসে অবগাহন করি।

রঙ্গলাল

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে আলাউদ্দীন খিলজী চিতোর অধিকার করিয়াছেন। পদ্মিনীকে লাভ করিবার উন্মাদ বাসনা তাঁহাকে এতদূর তাড়িত করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মিনী অধরাই রহিয়া গিয়াছেন। দেশপ্রেমে পরিপূর্ণবক্ষ রাজপুত পুরুষগণ সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। রাজপুত নারীগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। উপহাসাস্পদ সম্রাট মাথা নত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রেম, বীরত্ব ও তেজস্বিতায় মিলিত করুণ-মধুর কাব্যখানি এক অনির্ব্বচনীয় রসে চিত্ত পূর্ণ করিয়া দেয়।

'কর্ম্মদেবী'ও বীরত্ব ও ব্যথামধুর প্রেমের কাহিনী। সাধুর সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহ, অরণ্যকমলের প্রতিহিংসা ও সাধুর মৃত্যু—প্রেম ও বীরত্বের একটি উজ্জ্বল চিত্র। কাহিনীর শেষভাগে কর্ম্মদেবীর হস্তচ্ছেদন একটি বিস্ময়রসে আমাদের চিত্তকে আপ্লুত করে। পদ্মিনী এবং কর্ম্মদেবী উভয়েই বৈষ্ণব নায়িকার মতই—চিরন্তনী নায়িকার মতই দেহজ্ঞান ভুলিয়াছেন—স্বামীর প্রেমে নিজেদের সমস্ত সত্তা মিশাইয়া দিয়াছেন। কাহিনীগুলি পড়িতে পড়িতে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।

মধুকবি বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সুরে জয়ভেরী বাজাইলেন। তাঁহার এক হাতে বাঁশী, আর এক হাতে ভেরী—মধুরে কোমলে রুদ্রে একটা বিচিত্র কল্পনাজগতের চিত্র উপস্থিত করিলেন।

মধুসূদন

'মেঘনাদ বধ' কাব্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আলোড়িত হইয়াছে। তবে

মেঘনাধ বধের রোমান্স বেশীর ভাগই বস্তুগত, ভাবগত নহে। গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত—তিন সাহিত্যেই কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। হোমার ও বাল্মীকির কাব্যকে গ্রহণ করিয়া নূতন ছন্দে নূতন কাব্য রচিত হইল। বিভিন্ন ঘটনার চিত্রণে রোমান্স রস ফুটিয়াছে। এই রোমান্স পূর্ণতা পাইয়াছে বীররসে। বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের রণসজ্জা, রাক্ষসবাহিনীর দর্প, মেঘনাদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যাবলী, লক্ষণের মায়াদেবীর পূজা সম্পাদন, নরকের নানা অদ্ভুত ও বীভৎস বর্ণনা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন প্রভৃতি সকল কিছুই আমাদের চিত্তকে বিস্ময়রসে আপ্লুত করে। মেঘনাদবধের প্রধান রহস্য যাহা আমাদের চিত্তকে আগাগোড়া আকৃষ্ট করিয়া রাখে তাহা দৈবনির্ব্বন্ধবাদ। ত্রিভুবনজয়ী রাবণ নিষ্ঠুর অদৃষ্টের চক্রে পিষ্ট হইয়া নিয়তির দুর্ব্বারতাকে স্বীকার করিয়াছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী রাবণ জীবনে যে ভুলগুলি করিয়াছেন অদৃষ্টের দুর্ন্নিবার চক্র সেই ভুলের বিচার করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রাবণ বলিয়াছিল—

> "সওয়া লক্ষ ছেলে আর বিশলক্ষ নাতি।
> আর কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি।"

তেমনই মধুসূদনের রাবণও বলিয়াছে—

> "কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
> হরিলি এ ধন তুই? * * *
> * * * কে আর রাখিবে
> এ বিপুল কুলমান এ কাল সমরে।
> বনের মাঝারে, যথা শাখাদলে আগে
> একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
> নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
> তেমনি দুর্ব্বল, দেখ করিছে আমারে
> নিরন্তর। হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
> এর পরে!"

রাবণের সমস্ত শৌর্য্য, সমস্ত বীরত্ব সামান্য নর-বানরের নিকট নত হইল—ইহাই রাবণের অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টবাদই মেঘনাদ বধের রোমান্স রসের যোগান দিয়াছে।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য মধুকবির কাব্য প্রতিভার একটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটিত

করিয়াছে। রাধা প্রেমে চেতন অচেতনের ভেদজ্ঞান হারাইয়াছেন। মলয় মারুত, পৃথিবী, নিকুঞ্জবন প্রভৃতি প্রকৃতির অচেতন বস্তু নিচযে তিনি শ্যামের সন্ধান করিয়াছেন। শ্যামের সহিত মিলনে কামনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিজ দেহ দিয়া শ্যামের পূজা করিয়াছেন—দেহের প্রতি অঙ্গ পূজার বিভিন্ন উপচার হইয়াছে। প্রেমই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রোমান্স।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও এই প্রেমই রোমান্সের প্রেরণা মূলতঃ যোগাইয়াছে। তবে অন্যান্য রসেরও সন্ধান পাওযা যায়। রুক্মিণী, উর্ব্বশী, শকুন্তলা প্রভৃতির পত্রে প্রেমের একটি করুণ নিবিড় স্পর্শ পাওযা যায। প্রেমের এক বিচিত্র প্রকাশ তারার পত্র। তারার প্রেম অবৈধ—ইহা একান্তই দেহসর্ব্বস্ব এবং রুচির নিম্নতার পরিচাযক। কিন্তু তাহার পত্রে একটা তীব্র আবেগ ধ্বনিত হইয়াছে। জনার পত্র বীররস ও রুদ্ররসের মিশ্রণ। মনে হয ইহা যেন নারীর হস্তরচিত নহে—যুদ্ধোন্মত্ত সেনাপতির রচনা—কিন্তু তাহার ফাঁকে ফাঁকে অভিমানিনী স্ত্রী ও পুত্রহারা জননীর মর্ম্মবেদনার সুরও কানে আসে।

মধুকবি প্রধানতঃ ক্লাসিক কবি—তাঁহার রচনা ভাস্কর্য্যধর্ম্মী, কিন্তু তাঁহার রচনায় রোমান্সের সন্ধান আমরা পাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের মূলমন্ত্র জাতীযতাবোধ—স্বাধীনতার জন্য বীরত্বব্যঞ্জক আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিমী সভ্যতার আলোকে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনক্ষেত্রের পরিধি উদ্ভাসিত হইযা উঠিল। বাঙ্গালীর জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর বাজিয়া উঠিল। সাহিত্যেও সুরু হইল বীরযুগ। হেমচন্দ্র এই বীরযুগেরই কবি।

হেমচন্দ্র

'দশমাবিদ্যা'য় হেমচন্দ্র পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি মিশাইযা কাব্য রচনা করিয়াছেন। নারদ মহাদেবের নিকট জানিতে চাহিলেন সৃষ্টিরহস্য। মহাদেব নারদকে দেখাইলেন, এক অনাদি শক্তি এই অসীম অনন্ত শূন্য পথে অসীম অনন্ত কালে ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি ও পরিচালিত করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনে ব্রহ্মাণ্ডের দশটি রূপ ভাসিয়া উঠিয়াছে। আদ্যাশক্তি দশ রূপে এই দশ ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান করেন। ইহাই দশমহাবিদ্যা। দশ ব্রহ্মাণ্ড মূলে এক, দশমহাবিদ্যাও সেই একেরই অংশ।

এখানে রহস্যের কথা আছে—কিন্তু সেই রহস্য কাব্যকলার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট না হইয়া অস্পষ্ট রহিয়াছে।

'বৃত্রসংহার' কাব্যের উপাখ্যান অংশে গাম্ভীর্য্য ও লোকোত্তর মহিমা মিলিত হইয়াছে। দেবগণ অসুর হস্ত হইতে হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য মিলিত সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই সংগ্রামের গৌরবকে জয়যুক্ত করিতে, অত্যাচারীর দর্পকে চূর্ণ করিয়া সংসারে মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠা করিতে দধিচীমুনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই সমগ্র কাব্যকে এক অতি উচ্চ সুরে বাঁধিয়াছে। বৃত্রসংহার কাব্যও নিয়তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"হেমচন্দ্রের ভিতরে একটি অন্তরীক্ষবিহারী—মহাশূন্যবিহারী কল্পনা ছিল। মহাশূন্যে ক্রমবিবর্ত্তমান এবং ক্রমপ্রকাশমান বিশ্বসৃষ্টির আদি রূপটি তাহার অব্যক্ত বিরাট বিস্ময় লইয়া কবিমনটিকে যেন নিরন্তর বিক্ষুব্ধ এবং বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।" (শশীভূষণ দাশগুপ্ত)

নবীনচন্দ্র সেন

নবীন সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' খণ্ড গীতিকাব্যের সমষ্টি। এখানে রোমান্টিক প্রেমের কথাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে। গীতিধর্ম্মী এই কবিতাগুলিতে হতাশা ও দুঃখের সুর, আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে বাজিয়াছে, কিন্তু অসংযত ভাবাতিশয্য অনেক স্থলে পীড়াদায়ক হইয়াছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতির পরাধীনতার বেদনা মূর্ত্ত হইয়াছে।

নবীন সেনের ত্রয়ীকাব্য—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র মর্ম্মকথা নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম প্রেম। নবীনচন্দ্রের কাব্যে কল্পনার উচ্ছ্বাস এবং ভাবাতিশয্যই মুখ্য স্থান লইয়া আছে। মহাভারতের যুগে জাতিতে, রাষ্ট্রে এবং ধর্ম্মে বিভেদ চলিতেছিল। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই বিভেদকে দূর করিয়া জাতিগত, রাষ্ট্রগত এবং ধর্ম্মগত ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিলেন। তাঁহার মহাভারতের মূর্ত্তি ছিল—'এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন'। মহামানবের এই মিলনাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নই ত্রয়ী কাব্যের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।

"মহাভারতের বিপুল মহিমায় চিত্তের উদ্বেলতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমই 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র জন্মরহস্য। এই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—এই কৃষ্ণপ্রেমই সব কাব্যের ভিতর দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। * * * সমগ্র ঘটনাস্রোত—সমগ্র বর্ণনা জুড়িয়া কবি-হৃদয়ের একটা উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীত যেন থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে।" (শশীভূষণ দাশগুপ্ত)

বিহারীলালের কাব্য জীবনের গভীরতর আনন্দ উপলব্ধির উৎস হইতে

উৎসারিত। বিহারীলালের রচনায় ইমোশনের উদ্দেশ্যে কবিচিত্ত অভিসারে যাত্রা করিয়াছে। 'সারদামঙ্গলে' কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে যেরূপ বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করেন তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সারদামঙ্গলে রোমান্টিক কবিকল্পনাই সমস্ত স্থান জুড়িয়া আছে। "সাধের আসনে" এই রোমান্টিক তত্ত্ব সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। কবির অন্তরলক্ষ্মী বিশ্বের সকল বস্তুনিচয়ে অধিষ্ঠান করেন বিচিত্র রূপে। ইঁহাকেই যুগে যুগে কবি ও সাধক খুজিয়া বেড়াইয়াছেন।

বিহারীলাল

"কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে॥"

(সাধের আসন)

বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিকতা একটি প্রধান উপাদান। বৈষ্ণব কবিতা মুখ্যতঃ রোমান্টিক। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ক্লাসিক কাব্য রচয়িতা হইলেও তাঁহাদের কাব্যে রোমান্টিকতা বহুস্থানেই লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত রোমান্টিক যুগ সুরু হইয়াছে বিহারীলাল হইতে।

বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল প্রেম, সকল করুণার অন্তরালে আছেন রহস্যময়ী বিশ্ববিমোহিনী দেবী সারদা। তাঁহাতেই বিশ্বের সকল রহস্যের অধিষ্ঠান। বিশ্ব জুড়িয়া কবি সেই অনন্ত রহস্যময়ীর খেলা দেখিয়াছেন। কবি তাঁহার কাব্যে এই রহস্যময়ীর ধ্যান করিয়াছেন। এই অপ্রাপনীয়া অধরা রহস্য-সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে হৃদয়ে পাইতে চাহিয়াছেন। বিশ্বনিখিলের মূলরহস্য সৌন্দর্য্যরূপিণী এই সারদাই বাণীরূপে ভক্ত, কবি ও সাধকের অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন যুগে যুগে।

কবি তাঁহার কাব্যে এই পরিপূর্ণাকে পাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু অপ্রাপ্যের বেদনা কবিকে বিষাদমগ্ন করিয়াছে। বিশ্বের অন্তর্নিহিতা এক আদিশক্তির কথা পুরাণ ও চণ্ডীতে আমরা পাই। কবি ভারতের সেই শাশ্বত রহস্যকেই কাব্যের মাধ্যমে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিচিত্ত এবং বহির্জগৎ—উভয়ের মধ্যে দেবী চিররহস্যময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যে, প্রেমে, আনন্দে মিলন ঘটাইয়াছেন। কবির মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত বাসনার শতদলে যিনি চরণ স্থাপনা করিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টির আদিকবি ব্রহ্মার মানসী।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিকতার আদর্শ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত বলা চলে।

তাঁহার রোমান্টিকতার মধ্যে কল্পনার প্রসার ও ভাবের ঐশ্বর্য্য আছে—কিন্তু ভাবাতুরতা নাই। তাঁহার কাব্যে আছে একটি স্থির অব্যয় বিশ্বাস। এই বিশ্ব বহুধা-বিভক্ত কিন্তু মূলে এক—সেই এক প্রেমে অবস্থিত। সমগ্র বিশ্বের বস্তুনিচয়ে একটি গভীর আকর্ষণ বর্ত্তমান। গাছ যে ফুলকে ধরিয়া রাখে, মাটির যে অবলম্বনে গাছ আছে—গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা চলিতেছে—তাহারই প্রকাশ মানুষের হৃদয়ে। মানুষের হৃদয়ে মানুষের প্রতি এই আকর্ষণ প্রেমে প্রকাশ পায—এই আকর্ষণ সমগ্র বিশ্বের যে আকর্ষণ আছে তাহারই একটি প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ

প্রেম সৃষ্টির একটা বিচিত্র রহস্যের সন্ধান দেয। বুদ্ধির অগম্য একটা বোধিচেতনার অস্পষ্ট গোধূলি লগ্নে সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য আমাদের রোমান্টিক দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল তাঁহার জীবন এক জন্মে সীমাবদ্ধ নয। তাঁহার জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া জীবনদেবতা প্রকাশিত হইতেছেন। এই অব্যয বিশ্বাসটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধের মূলে আছে। "বসুন্ধরা", "সমুদ্রের প্রতি", "অহল্যা" প্রভৃতি নানা কবিতায তিনি অনুভব করিযাছেন এই তৃণ, মাটি, গাছপালা সকলের সঙ্গেই তাঁহার নাড়ীর যোগ আছে। তিনি এই পৃথিবীর সঙ্গে বহুবার একাত্মতা কামনা করিযাছেন।

"আমারে ফিরাযে লহো
সেই সব-মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে···

* * *

নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হযে
সকলের সনে।" (বসুন্ধরা)

জীবনদেবতা কবির অন্তরতম ধন। তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য ঈশ্বর নহেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভূতির দ্বারা অনুভূত দেবতা।

"ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?

দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষা সম।" (জীবনদেবতা)

কবি হৃদয়ে তাঁহার স্পর্শ পান কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ পান না। কবির কল্পনার সৃষ্টি সমগ্র বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্য্যকে আহরণ করিয়া গড়িয়া উঠে। কবির মানসী বহির্বিশ্বের রঙ্গে রাঙিয়া উঠিয়া নূতন রূপ ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে কাব্যলক্ষ্মী বা অন্তরলক্ষ্মী, খেলার সঙ্গিনী হইয়া ছিলেন। পরিণত যৌবনে সেই মানসসুন্দরী মর্মের গেহিনী হইয়াছেন। তাঁহাকে বহির্জগত হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছে।

"ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছে মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" (মানসসুন্দরী)

তাঁহাকে একান্ত করিয়া পাইবার জন্য কবির তীব্র আকুলতা জাগে। তাঁহার অভাবে জীবন বিষাদময় হইয়া উঠে।

"সেই তুমি
মূর্ত্তিতে কি দিবে ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?

* * *

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই; বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।

* * *

তবু কোন মায়াডোরে চির সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিনী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাইতো এখনও মনে আশা জেগে রয়,
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।" (মানসসুন্দরী)

রবীন্দ্রনাথের রচনার গোড়ার দিকে অবশ্য অব্যয়বোধ বা বিশ্বাস ছিল না, জীবনসংগ্রাম হইতে তিনি পলায়নপর হইয়াছেন, কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসার মধ্য

দিয়া—রূপমুগ্ধতার মধ্য দিয়া তাঁহার রোমান্টিক লীলাসঙ্গিনী মিষ্টিক জীবনদেবতায় পরিণত হইয়াছেন।

কবির নিকট প্রকৃতির বস্তুনিচয় তাহার বস্তুত্বেই সীমাবদ্ধ নহে—কবির সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অনুভূতি তাহাতে আলোড়িত হয় এবং বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তিনি চিত্তের এই অনুভূতিতে নিমজ্জিত হন। অন্তরের সেই অনুভূতিতে তিনি বস্তুনিচয়ের উপর রহস্যময় রূপ আরোপ করেন। কবি তাঁহার চিত্তের সম্পূর্ণতা একটি নারী বা বস্তুবিশেষে আরোপ করিতে চান—কিন্তু সীমাবদ্ধ পার্থিব বস্তু অসীমতাকে ধরিতে পারে না। কবির মনে অপূর্ণতার বিষাদ জাগিয়া উঠে। কবির অনুভূতি যখন আরও গভীর হয় তখন সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি অখণ্ডরূপ কবি দেখিতে পান।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সৃষ্টির রূপমুগ্ধ এবং ইহার অসীম ব্যঞ্জনা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। কবি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার মনে সৃষ্টির সঙ্গে সমস্তক্ষণ একটা সজীব খেলা চলিতেছে এবং সৃষ্টির এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতায় পরিণত হইয়াছে। বহির্বিশ্বের সমস্ত রহস্যকে অবলম্বন করিয়া কবিচিত্তের একতানতাকে অবলম্বন করিয়াছে—তাঁহার জীবনদেবতার বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন প্রেম ও সৌন্দর্য্যবোধ পৃথক নহে—গভীরতর স্তরভেদ মাত্র। অসীমের আভাষ যেখানে সেখানেই সুন্দরের অবস্থান। প্রকৃতির মধ্যে এই অনন্তবোধ যতক্ষণ সীমাবদ্ধ ততক্ষণই তাহা সৌন্দর্য্যবোধ। মানুষের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাই প্রেমে। আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার মধ্যে অনন্তের সন্ধান পাই। তাই নারীকে ভালবাসা সৌন্দর্য্যানুভূতিরই গভীরতর প্রকাশ। মানুষের প্রেম কেবল দেহ উপভোগেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—কারণ সে প্রেমের মূলমন্ত্র অমৃতের আকাঙ্ক্ষা। কবির নিকট নারী তাই অনন্তের প্রতীক।

"সমুদ্রের প্রতি" "বসুন্ধরা" "অহল্যার প্রতি" "মাটির ডাক" "বনবাণী" "পৃথিবী" প্রভৃতি কবিতাগুলির ভিতরে পার্থক্য অনেক আছে। মানসিক পরিণতির বিভিন্ন স্তরে কবিতাগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু দৃষ্টির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে—সে ধর্ম্ম পৃথিবীর সহিত কবির যোগ। এই যোগের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা থেকে উৎসারিত হইয়াছে।

"সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় তিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার প্রতি অণু পরমাণু পৃথিবীর সঙ্গে এক হইয়াছিল। সমুদ্রের তরঙ্গ-আন্দোলনে তাঁহার

পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে।

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজ্ঞাত ভুবনপ্রাণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।"

(সমুদ্রের প্রতি)

"অহল্যার প্রতি" কবিতায় তিনি প্রশ্ন করিযাছেন অহল্যা পৃথিবীর সঙ্গে এক হইয়া কি পৃথিবীর অনুভূতি অনুভব করিযাছে।

"আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হযে এক দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?

*   *   *

জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,

*   *   *

অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্ম -মাঝে-মাঝে ?

*   *   *

যেদিন বহিত নব বসন্ত সমীর
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলক প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ?"   (অহল্যার প্রতি)

কবি এই পৃথিবীর আহ্বানে—মাটির টানে বারবার ফিরিতে চাহিয়াছেন।

"বাঁধন ছেঁড়া এই যে নাড়ি
সইবে না আর ছাড়াছাড়ি।"

কবি নিজের সঙ্কীর্ণ পরিধিকে অতিক্রম করিয়া বহুর সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। অসীমের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে আত্ম

অতিক্রম করিয়া বহুর সঙ্গে যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। ক্ষুদ্রত্ব হইতে বৃহত্বে পরিণত হইবার প্রবণতা মানবের সাধারণ ধর্ম্ম। আদিম পৃথিবীর বুদ্ধিহীন বৃত্তিহীন প্রাণধারার আনন্দকে কবি গ্রহণ করিতে চান।

শিল্প হৃদয়ের উদার উল্লাসের প্রকাশ। এই শিল্পের জগতে আসিয়া কবি কৃত্রিম সভ্যজগতকে অতিক্রম করেন। রবীন্দ্রনাথও আত্ম অতিক্রম করিয়াছেন। অনুভূতির গভীরতা ও সীমাহীনতার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহার আধ্যাত্ম বিকাশ। পৃথিবী সকল প্রাণধারার উৎস। তাঁহার প্রতি যুগের কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রীতির উৎসও এই পৃথিবীর প্রাণধর্ম্ম।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিধর্ম্মে ভারতীয় বিশেষ ধর্ম্মের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের কবিতা হইতে স্থুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রতি আত্মীয়তাবোধ দেখিতে পাই।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার ছন্দকুশলতা এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বহু রচনা—"গান্ধীজী" "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" "আমরা" প্রভৃতি কবিতায় একটা ইতিহাসের মালা ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। সেখানে তাঁহার মননশীলতা আমাদের বিস্মিত করিয়াছে। তাঁহার রচনায় অসংখ্য ও অভিনব শব্দের প্রযোগবিধি আমাদের চিত্তে চমক লাগাইযাছে—কিন্তু কবিতায হৃদয়ের যে নিবিড় উত্তাপের প্রযোজন—গভীর ধ্যানদৃষ্টির সন্ধান আমরা চাই—তাহা সত্যেন দত্তের কাব্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি—স্থতরাং কবির হৃদয় এবং দৃষ্টি রোমান্টিকতাকে বরণ করিবেই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মননাতিরেক তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।

'বেণু ও বীণা'য় সত্যেন্দ্রনাথের আবেগবিহ্বল কবিচিত্তের স্পর্শ পাই। আকাশে বাতাসে অরূপের যে বাঁশীটি বাজিয়াছে তাহারই স্থরমূর্চ্ছনায় কবির প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি ব্যগ্র ব্যাকুল আলিঙ্গনে সেই অধরাকে ধরিতে চাহিয়াছেন। সেই অশ্রুত বাণীকে তিনি 'বেণু ও বীণা'র তানে বাজাইয়াছেন।

"কতদিন হল বেজেছে ব্যাকুল বেণু
মানসের জলে বেজেছে বিভোল বীণা,

তারি মূর্চ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয় হীনা।
পরাণ আমার শুনেছে সে মধুবাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহার গানে,
হে মানসী দেবী! হে মোর রাগিনী রানী!
সে কি ফুটিবে না বেণু ও বীণার তানে?"

(বেণু ও বীণা—আরম্ভ)

রোমান্টিক কবিদের মতই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে এক অখণ্ড নারীমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়াছেন।

'ফুলের ফসল' কাব্যগ্রন্থে বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুনিচয়ের মধ্যে তিনি সেই অখণ্ড রূপের প্রতিমাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করিয়া আনন্দের শিহরণ জাগিয়াছে।

"আজ চোখের আগে কেবল জাগে
মৌন দু আঁখি।
পাতার রাগে পাতার বরণ
বলছে কি পাখী!
ওগো অকূল সাগর মথন করে
কি ধন জেগেছে!
ঘূর্ণি লেগেছে!" (ঘূর্ণি—ফুলের ফসল)

প্রকৃত রোমান্টিক কবির মতই তিনি বিশ্বজগতের মধ্যের সেই সুর সেই ক্ষণিক সৌন্দর্য্যকেই সুরে সঙ্গীতে চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাহিযাছেন।

"ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে
কামনা বুঝি কণক-ধুনী সুমেরু চূড়া লঙ্ঘিতে।
মানস-লীলা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে।"

(দুই সুর—কুহু ও কেকা)

রোমান্টিক কবি জীবনের নিত্যতায় বিশ্বাস করেন। দেহের অবসান ঘটিবে কিন্তু কবির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে না। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবি-আত্মার প্রকাশ ঘটিবে। প্রস্ফুটিত ফুলদলে, দখিনা বাতাসের মর্ম্মরধ্বনিতে, নিশীথের ভুবনপ্লাবিনী জ্যোৎস্নায়, কোকিলের কুহু তানে, কবিসত্তার বিচিত্র

আবির্ভাব আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে সম্ভাব্য হইবে।

"যেদিন আবার ফুটবে মুকুল
সেদিন আমায় দেখতে পাবে ;
ফাগুন হাওয়া বইলো ব্যাকুল
থাকবো দূরে কোন হিসাবে।
আসব আমি স্বপন ভারে ;
গভীর রাতে ভুবন পরে :
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে
গাইব যখন কোকিল গাবে।"

(আবার—কুহু ও কেকা)

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে বাংলার রসজীবন অসংখ্য কবিতায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কুমুদরঞ্জন একটি নূতন রসরূপের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা অতি সরল ও সহজ। বর্ণনায় চমক নাই, কিন্তু ভাবের মাধুর্য্য ও ভাষার কোমলতা—সকল কিছু মিলাইয়া একটি অখণ্ড রসের দ্যোতনা আনিয়া দিয়াছে। অবশ্য কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ভাবের আধিক্যে অনেক সময় কবিতার দৃঢ়তা লুপ্ত হইয়া নিতান্ত শ্লথবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই দোষকে অতিক্রম করিয়াও তাঁহার কবিতায় আমরা একটি সহজ সরল নিসর্গ-সুন্দর অবিকৃত রূপের পরিচয় পাই।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুমুদরঞ্জনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ভক্ত ও সাধক। তাঁহার ভক্তিনম্র দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল বস্তুনিচয়ে সেই পরমসুন্দরের রূপের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার সেই স্নিগ্ধ হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিতা-কুসুমের জন্ম হইয়াছে—তাহার স্নিগ্ধ সৌরভ আমাদের অন্তরে মাধুর্য্য বিকীরণ করিয়াছে। কবির কবিতার মূলমন্ত্র প্রেম। এই ভালবাসার বলে বিশ্বসংসার তাঁহার আপনজন হইয়াছে—অসীম তাঁহার নিকট সসীম হইয়াছেন। দেহান্তের পরেও মর্ত্ত্যের ধূলিতে তিনি তাঁহার প্রেমকে বিছাইতে চাহিয়াছেন।

"হয়ত আমার এ পথে আর
হবে না ক' আসা,
দুধারে যাই রোপন করে
বুকের ভালবাসা।

ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমর করে যাই রেখে যাই
ক্ষণিক কাঁদা-হাসা।" (হযতো—অজয)

রোগশয্যায় দেহযন্ত্রণা কবিকে কাতর করে নাই। জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করিয়া জন্মান্তরে নবীন জীবন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

"ইচ্ছা করে নূতন দেশে
নূতন হয়ে জন্মাতে।
* * *
পীড়ায় যখন অবশ তনু
ফুরায় যখন আনন্দ,
মৃত্যু যে অমৃত বিলায়
নয়কো মোটেই তা' মন্দ।
* * *
তুফানের এই ভাসান ভেলা—
সাঙ্গ করে আলোর মেলা,
অন্ধকারে ফিরছে খুঁজে
বাঁধা ঘাটের পৈঁঠারে।"
(রোগশয্যায—স্বর্ণসন্ধ্যা)

অতি সাধারণ বহু পরিচিত ভাব-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া একটি বিশিষ্ট প্রাণমনের পরিচয়, রঙে রূপে, ভাষায় ছন্দে কবির হস্তে মূর্ত্তি ধারণ করে।

করুণানিধান

করুণানিধানের কাব্যে এই মূর্ত্তিকেই স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। ভাষা ও ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে ভাব শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। কবি প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য হইতে বস্তুপুঞ্জকে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সুনিপুণ তুলিকায় তাহাকে অসীম সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়াছেন। করুণানিধানের কাব্যে কবিহৃদয়ের একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যানুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"দুর্ব্বা-শ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,

ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে
গাঙের বুকে স্তরে স্তরে।" (দ্বিপ্রহরে)

"কোটি বনফুল অঙ্গে দোদুল,
কত রঙ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান
শুনিছে পাষাণ কালো।
স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জ-বনানী,
সবুজ টোপর পরি,
ঝর্ণা তলায় ঝরিছে কাহার
রতনের শতনরী।" (হিমাদ্রি)

এখানে কবি স্বকীয় ভাবানুভূতি ও আবেগ ছন্দে ও ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রকৃতির রূপের মধ্য দিয়া কবি আবেশ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির রূপবর্ণনার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যপিয়াসী, প্রেমপিপাসু কবিপ্রাণের আকূতি প্রকাশ পাইয়াছে বহু স্থানেই।

"হেথায় তারা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোৎস্না-মাঝে,
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চ বাজে।
* * *
অস্ফুট-ভাসে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে উঠে।
তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ, বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা।" (স্বপ্নলোকে)

কবিতাটির মধ্যে কবির কাব্যলক্ষ্মীর পরিচয় পাই। কবির অন্তরের সুষমাবিজড়িত ভাবটি একটি সূক্ষ্ম মায়াজলের আচ্ছাদন দিয়া অপূর্ব্ব সুষমা ও বর্ণালীতে রূপ পাইয়াছে। সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নাবেশ করুণানিধানের কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহার কাব্যে রোমান্স সৃজন করিয়াছে। প্রকৃতির

রূপের মধ্য দিয়া অসীম অনন্ত রূপের ছায়া তাঁহার কাব্যে পড়িয়াছে। জীবন মৃত্যু সকল কিছুকে অতিক্রম করিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপের বিকাশ—তাঁহার প্রাণ সেই রূপের স্পর্শে শিহরিত হইয়াছে। অনন্ত রূপের রহস্য তাঁহার কবির অনুভূতিতে যেন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

"শেষ মিনতি শেষ-তৃষাতে
পাইনি নাগাল আকুল হাতে ;—
রূপ হারালো রূপের লীলা
বন-পলাশে আলোক ঢেলে।" (শতনরী)

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি অধিক প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তারাশি কবিতা হইতে পারে না। যে চিন্তার মধ্যে দিব্য আবেশ নাই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্যে রসবোধ নাই—সেখানে তাহা সার্থক কবিতা হইয়া উঠিতে পারে না। কবির অনুভূতি একটি রূপময় অনুভূতি। সেই অনুভূতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় রচনার ভাষায়। কবির অনুভূতি যদি সত্য হয়—বস্তুর রূপের একটি জীবন্ত চিত্র—রসের একটি হিল্লোলিত তরঙ্গ দৃষ্টিতে পড়িবে। যতীন্দ্রনাথ অনুভূতির গভীরতায় চলিত প্রচলিত অপ্রচলিত সকল শব্দকে ভাষার অপূর্ব্ব বিন্যাসে অনুভূতির মায়া পরশ বুলাইয়া সাজাইয়াছেন। কবিতার ভাব একান্ত বস্তুগত, ভাষাও গদ্যধর্ম্মী, কিন্তু তাহারই মধ্যে রসের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ

"কোন গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হতে উড়িয়া চলে ?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।

* * *

কোন শেফালীর একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে !
কোন বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে ?" (বোঝা)

"ধরণী তোমার প্রমোদ-প্রবাস—
বাঁধনি কো হেথা ঘর ;

বিশ্বশুদ্ধ বুকে টেনে, বলো—
সবাই আমার পর।
নিষ্কলঙ্ক নিকষ-হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন.
রূপের গরব ভেঙেছে, কবিয়া
রূপা হ'তে তারে দীন।" (বারনারী)

শুষ্ক ইট কাঠের পাথরপুরী কলিকাতা। সেখানে আকস্মাৎ বকুলের বিহ্বল সুরভি কবিচিত্তকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে। এই রুক্ষ প্রাণহীন নগরীতে বকুলের উপস্থিতি যেন প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যকে উপহাস করে।

"পাষাণের বুকে,—যেতে যেতে ভাবি জ্যৈষ্ঠ দুপুরবেলা,—
বকুল রোপিল কোন্ অরসিক পথ-কর্ত্তার চেলা?
কানন-রাণীর শিশু-কন্যায় হরণ করিয়া কে বা
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া করায় পথের সেবা?
* * *
শ্যামল বনের অমল স্মৃতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে।
নব তৃণ-তরে যে চুম্ব বরে,— তপ্ত পাথরে লুটে।
মনে নাই তার বনের বর্ষা, শোনেনি সে কুহুতান,
দলে দলে কাক ডালে ডালে বসি' ক'রে তা'রে অপমান।"

যতীন্দ্রনাথ কবিতায় তত্ত্বকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে একটি তীক্ষ্ণ সজ্ঞানতা আছে, অনুভূতির আবেগে তিনি নিজেকে আত্মহারা হইতে দেন নাই। কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত এই তীক্ষ্ণ বাস্তবতা হইতে মুক্তি চাহিয়াছে। একটা তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ, প্রাণের অতৃপ্তির পিপাসা, তাঁহার রচনায় বাস্তব অনুভূতির পরেও জাগিয়া থাকিয়াছে। "বেদেনী", "বারনারী' প্রভৃতি কবিতায় ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"বেদের আদরে বেদেনী রে তোর
চুলে ধরিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
* * *

গোপনে ছোপানে হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন্ ফালি,
চির হা-ঘরের ঘরণী রে তুই
ঘাগরায় দিস তালি।
তবু যে বেদেনী বেদের ভক্ত
বিস্ময় সবে মানে ;
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায়
মোহিনী-মন্ত্র জানে। (বেদিনী)

মোহিতলাল মজুমদার

মোহিতলাল পুরাপুরি দেহবাদী কবি, কিন্তু তাঁহার কাব্যে অনেক সময় রোমান্টিক দৃষ্টি ফুটিয়াছে। প্রকৃতির রূপ রসকে তিনি নারীর রূপের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়াছেন। তাঁহার কামনাতুর নারী-বন্দনার মধ্যে অরূপের সুর আসিযা পড়িয়াছে।

"চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি,
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্নময়ী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী।" (পান্থ)

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহের সুরই প্রধান। তাঁহার প্রেমের কবিতায় দৈহিক আসক্তি ও বিদ্রোহের সুর আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অন্তরে রোমান্টিকতার ছোঁয়া লাগিযাছে। কবি বুঝিয়াছেন তাঁহার প্রিয়া এক জন্মের নহে—জন্মজন্মান্তরের সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার প্রতিজন্মের প্রিয়ার মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছেন।

"প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সেই তুমি,
ধরা দেবে তায়।" (অনামিকা)

করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলালের পর কবিতায় যে যুগের আবির্ভাব ঘটিল তাহাকে সাধারণ কথায় অতি আধুনিক বা বাস্তবাতিরেক যুগ বলা হয়। এই যুগের কবিতা এক কথায় অনেকের মতে রূঢ়বাস্তবসম্বলিত কাব্য। কিন্তু আধুনিক কবিতার এবংবিধ ব্যাখ্যা যথার্থ কি না তাহা আলোচনা

করিবার সময় আসিয়াছে। কবিতাকে রোমান্টিক হইতে হইবেই। বিষয়বস্তুতে সে যতই বাস্তবঘেঁষা হউক—ভাষার বিন্যাসে তাহা রোমান্টিক না হইলে তাহা কবিতা হইবে না। রোমান্টিকতা ছাড়া কাব্যের গতি নাই। চাঁদ এযুগের কবির হাতে কাস্তে এমনকি ঝলসানো পোড়া রুটিও হইযাছে, কিন্তু সেই উপমার বিন্যাসে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে—কল্পনার মাযার স্পর্শ লাগিযাছে।

কবিতার মূল বস্তুজগতের ভূমিতে আবদ্ধ—বস্তুজগত হইতে সে তাহার জীবনীরস আকর্ষণ করে। এই ভূমির অবর্ত্তমানে কবিতা অর্থহীন হইযা পড়ে। কিন্তু তবুও সাহিত্য রচনাকালে বস্তুজগতকে কিছু স্বতন্ত্র করিতে হয। কবি বস্তুজগত স্বকীয় ভাবের মাধ্যমে পাঠকের মানসলোকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস করেন। কবির ধর্ম্ম রূপের মাধ্যমে অরূপ, ভাষার মাধ্যমে ভাষাতীতকে প্রকাশ করা। কবি ছন্দ ও অলঙ্কারের সহাযতায কাব্যে আনেন অনির্ব্বচনীয সুর। এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধির মধ্য দিয়াই কাব্যের রসের আস্বাদ ঘটে।

কবিতা যখন বাস্তবজীবনের কথা বলে তখন তার ভঙ্গিটী বাস্তবাতীত হওযা চাই। না হলে কাব্য শুধু বক্তৃতা হইবে—তাহা অন্তরের অন্তরতম বাণী হইবে না। কবিতা বক্তৃতা হইলে তাহার চিরন্তন আবেদন থাকিবে না। ক্ষণকালীন চাৎকার মানুষকে আকৃষ্ট করিবে কিন্তু মোহভঙ্গে তাহা মহাকালের দরবার হইতে অপরিচযের আবর্জ্জনায নিক্ষিপ্ত হইবে।

জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য আনন্দ-বেদনা সবই প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু জীবনের এই সত্য—প্রাত্যহিক প্রযোজনের গণ্ডী অতিক্রম করিযাও এক অপার সৌন্দর্য্যলোক আছে। দৈনন্দিন তুচ্ছতাকে সেই কল্পনার মাযাদণ্ডস্পর্শে রূপে অসীম করিযা তুলিতে হয, তবেই তাহা কাব্যের সীমানায আসিয়া দাঁড়ায। এই যে নিত্য বস্তু—এই বস্তুরাজ্যের সীমায় প্রযোজনাতীতের আবির্ভাবের উপলব্ধি—বাস্তবকে বাস্তবাতীত লোকে উন্নীত করাই রোমান্টিজ্‌মের লক্ষণ।

বস্তুজগতের রূঢ় সত্যও রোমান্টিক কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে। বস্তুর—সাহিত্যের মাধ্যমে কল্পনা ও ভাবের সংযোগে রূপান্তর হয—সেখানে রূপাতীত জগতের ছায়া আসিয়া পড়ে—দৈনন্দিন তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আনিয়া দেয়। সুতরাং আধুনিক কবিতা সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ হইয়াও রোমান্টিক।

"কবিতা মানেই রোমান্টিক চেতনা সম্বলিত জিনিস। * * * রোমান্টিকতার

ছোট্ট সংজ্ঞা হচ্ছে—বাস্তবকে কবিকল্পনার দ্বারা বাস্তবাতীতের পর্য্যায়ে উন্নীত করা। আজকের দিনে বাংলাদেশের ছোট বড় মাঝারি সব কবিই ত' কল্পনার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাঁদের বক্তব্যকে প্রাণময় করে তুলছেন—এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই আজকের যেগুলি আধুনিক বাংলা কাব্য—তা নিশ্চয়ই রোমাণ্টিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, হোক না তা বাস্তবাত্মক।" (শুদ্ধসত্ত্ব বসু)

"কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কপাট।
কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধুধু করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।" (কাক ডাকে)

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কাকের ডাক একটি অতিপরিচিত ঘটনা। কিন্তু কবি এখানে এই একান্ত বস্তুতান্ত্রিক ঘটনায় অনির্ব্বচনীয় সুরের ঝংকার আনিয়াছেন। কবির ধ্যানস্তিমিত মাধ্যাহ্নিক উপলব্ধির নিবিড়তা এখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আরও একটি অলস মধ্যাহ্নের বর্ণনা পাই। তুলির একটি-দুটি টানে মধ্যাহ্নের তন্দ্রাচ্ছন্ন উদাস রূপটি কবি ফুটাইয়াছেন। অতি সাধারণ ঘটনা অসাধারণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

"সমস্ত দুপুর ধরে
একা একা ঘাটের কিনারে।
ঝাঁকড়া অশথ গাছে একটি কি দুটি পাতা নড়ে,
দু-একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়,
ঘুরে ঘুরে খসে পড়া শুকনো পাতায়।
কখনো বা স্তব্ধ হয়ে শোনে,
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।" (প্রেতায়িত)

অশথ গাছের ঝিরঝিরে পাতা নড়া যেন গাছের উদাস চিন্তা—গাছের পাতা ঝরা যেন চিন্তার স্রোত খুলে দেওয়া। ঘুঘুর ডাক কবির কাছে পৃথিবীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে হইয়াছে।

"কত বৃষ্টি হ'যে গেছে,
কত ঝড, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে।
আমারও হৃদয তাই
সব কিছু ভুলে গিযে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব।" (নীল দিন)

অন্তরে মিলনের আলোক ঝলসিত হইযা উঠিযাছে—বিচ্ছেদের মেঘান্ধকার, হতাশার দীর্ঘশ্বাসের ঝড—সকল কিছুকে কবি অতিক্রম করিযাছেন। মনের উৎকণ্ঠা, তীক্ষ্ণ আবেগ যেন প্রকৃতির সঙ্গে এক হইযা গিযাছে।

"তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্মষ সওযা যায না কো;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুঁইযে পডে
গলানো সোনার মতো রোদ।"

মিলনের যে অসহ্য পুলক কবি প্রকাশ করিযাছেন তাহাই কবির কাব্যকে চরম রোমাণ্টিক করিযাছে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁহার নিজের কথায তাঁহার কবিতার রোমাণ্টিকতার পরিচয দিযাছেন।—"সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতর যত বাধা, যত মানসিক প্রলোভন ও দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নসঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা"—কবিতায রূপ পাইযাছে।

বুদ্ধদেব বসু

প্রিয়ার প্রেমে কবি অসীমতার জ্ঞান লাভ করিযাছেন—প্রিয়ার কেশের বিপুলতা দেশ কাল সময নিরবচ্ছিন্ন হইয়া গিযাছে। জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অসীম দীপ্ত লোকে তাঁহার প্রাণময বিহার ঘটিয়াছে।

"তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার বেণাতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জ ফুঁড়ে ;—
সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।"
(শেষের রাত্রি)

প্রিয়ার প্রেমে, তাহার দেহের সীমানায় কবি অসীমে শান্তিরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

"তারার অগ্নিতে ছড়ালো মগ্নতা তোমার কালো চুল ;
তোমার কালো চুল যুগ-যুগান্তের দূর সীমান্তে
ছড়ালো শান্তি, অতল অন্তিম শান্তি, শান্তি,
শান্তি, কঙ্কা,
কঙ্কা, শান্তি। (কালো চুল)

আকাশে, চাঁদে, তারায়, জলে, মেঘে, বজ্রে, বিদ্যুতে, দিগন্তপারে, গাছের ছায়ায়, জলস্রোতে—প্রকৃতির সকল রূপের মধ্যে কবিপ্রিয়ার নামটি বাজিয়া উঠিতেছে। কবির প্রিয়া যেন পুরুরবার উর্ব্বশী—সারা বিশ্বে সে ব্যাপ্ত হইয়াছে। কবি এই দেহী প্রেমেই অসীমতা অনুভব করিয়াছেন।

প্রকৃতির রূপের সহজ বর্ণনার মধ্যে কবি আকাশ ও সমুদ্রের মিলনের দৃশ্য কল্পনা করিয়াছেন। নীল সমুদ্রের উপর যেন আকাশ সূর্য্যরশ্মি বেয়ে মিলনের লিপি পাঠাচ্ছে।

"রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্য্যের চুম্বনে।" (চিল্কায় সকাল)

কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন অমৃত লোকের স্পর্শ মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও তাহাকেই তিনি চরম করিয়া রাখিতে চান। ভাষার ছন্দবিন্যাসের মধ্য দিয়া তিনি আত্মার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টির আনন্দ ভোগ করিতে চান। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়াই তিনি প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে ভুলিতে চান।

"যে বাণী বিহঙ্গে আমি করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বৃক্ষে ;···

* * *

তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে—অমর্ত্য অতিথি ক্ষণের
চিহ্ন, যে মুহূর্তে বাণীর আশ্বারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালের, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে, যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মননশীলতা অনেকখানি—বাগ্মিতা কবির রোমান্স-ধর্ম্ম অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, কিন্তু কবি তাঁহার ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাই বাগ্মিতার প্রাচীর ভেদ করিয়া রোমান্সের বনপুষ্প তাহার সৌরভ ছড়াইয়াছে।

কবি মধ্যে মধ্যে অনুভব করিয়াছেন মননের পথে রসপিপাসার তৃপ্তি মিটে না, আশাহীন নীরন্ধ্র পথে যাইতে যাইতে ক্লান্ত দেহ ও মন বোঝা হইয়া উঠে।

"নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী
নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা।" (ভ্রষ্টতরী)

কবি অনুভব করিয়াছেন রূপের জগৎ, ইন্দ্রিয়ের জগতে মুগ্ধ হইয়া চিত্তের অবসাদ মুহূর্ত্তের জন্য দূর হইয়া যায়। ক্ষণকালের মুগ্ধতা তাঁহাকে চিন্তার ক্লিষ্টতা ও ক্লীবতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। সেই আনন্দক্ষণে অতীত ও ভবিষ্যৎ এক হইয়া যায়।

"সে চিরমুহূর্ত্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যাপ্ত মুখে।" (ভূমা)

কবি জানেন একদিন ধ্বংস আসিবে। কিন্তু সেই ধ্বংসও যেমন সত্য, মৃত্যুও যেমন চিরন্তন, এই রূপজগৎও তেমনই সত্য। তাই ধ্বংস আছে জানিয়াও রূপ আমাদের আকর্ষণ করে, পলাশের রক্তরাগ মনকে মুগ্ধ করে। কবিচিত্ত অসীমের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। পৃথিবী যথেচ্ছাচারী—কিন্তু কবির হৃদয় সকল নিরাশ্রয়তাকে ব্যেপে নবীন জীবনের স্বপ্ন দেখে। প্রলয়ের মেঘ একদিকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়, অন্যদিকে জীর্ণ ক্লান্ত পথভ্রষ্ট জীবন নবীন আশার আলোক বুকে নিয়ে পঙ্গু পাখায় ভর দিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে।

রোমান্টিক কবিদের মতই সুধীন দত্তের কবিতায় তাঁর প্রিয়া বিশ্বমণ্ডলের বস্তুনিচয়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

"সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে;
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে;

মদনমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি সম ;
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;" (শাশ্বতী)

কবিতার নামকরণটিও বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দের রচনায় বাগ্মিতা ও বাক্যের নানা কৌশল প্রযোগ আছে। রোমান্স কবিতার ধর্ম্ম। বিষ্ণু দের কবিতাও সে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিযাছে। কিন্তু বাক্যাড়ম্বর অনেক স্থলেই বাক্যকুহেলির সৃষ্টি করিযাছে। তাহার ফলে বিষ্ণু দের কবিতা কিছুটা হেঁয়ালী হইযাছে। পাঠকচিত্ত কবিতা পাঠে কিছুটা অতৃপ্ত থাকিযা যায। কবিতার ভাব ও ভাষা উভযই অসম্পূর্ণ বলিযা মনে হয়—রসচ্যুতি অনেক স্থলেই ঘটিয়াছে।

বিষ্ণু দের অতি খ্যাত দুইটি কবিতা—"ক্রেসিডা" ও "পদধ্বনি" পাঠে রোমান্সের স্বপ্নছাযা মনে ঘনায, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবের সূত্র একটির পর একটি অসংলগ্ন তুলিকা বিক্ষেপে ছিঁড়িয়া যায়। এই অসংলগ্নতার জন্য অনেকখানি দাযী অপ্রচলিত এবং উদ্ভট শব্দাবলী।

"কোন হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারালো দিশা ?
লোকোত্তর এ রূপসী বা কেন ? লোকার্যতিক এ মরণ-তৃষা"

এখানে একটি চমৎকার লোকোত্তর রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার পরই কবি যেন ইচ্ছাক্রমেই এই লোকোত্তর রসের চিত্রটির উপর স্বেচ্ছাচার চালাইয়াছেন।

"জানি জানি, এই অলাতচক্রে চক্রমন।
সোৎপ্রাশপাশে বলি নাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জীজিবিষু প্রজাপতির বিপ্রমন।" (ক্রেসিডা)

তখন পাঠকচিত্ত কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

এই জাতীয় উদাহরণ আরও দেখানো যাইতে পারে—

"হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায়-কানায়,
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার,
বৈতরণী-অলকনন্দায় যমুনা-গঙ্গায়
ঘুরে ফিরে আদি অন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।"

(পদধ্বনি)

প্রেমের আত্মহারা মিলনের একটি পরিপূর্ণ রসঘন চিত্র উপমার তুলিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেই এই চিত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ভাষার উদ্দাম এলোমেলো গতিপ্রবাহে।

"পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতিব বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকাবে
তোমাকে জানাই আজ" (পদধ্বনি)

এখানে শব্দের খটখটি নাই, কিন্তু কাব্যের রসের প্রবাহ এখানে যেন ধাক্কা খাইয়া ফিরিযাছে।

এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে বিষ্ণু দের কবি-প্রতিভাকে অস্বীকার করা চলে না। তাঁহার কবিতায় রহস্যের রোমান্সের একটি উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিযাছে।

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার
সোনার কবরীখসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব কবে সম্পূর্ণ দিনের শেষে প্রিয়া
পরিচ্ছন্ন ঘুমে।" (অক্টোবর দিনগুলি)

সন্ধ্যার সূর্য্যাস্তের স্বর্ণময় বর্ণচ্ছটার সহিত কবি প্রিয়াকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়বৃন্তে প্রিয়ার আসন একটি সুকোমল পুষ্পের মতই—তাহার রঙীন আভায় তাঁহার দেহমন আলেকিত।

"সে তরু এ হৃদয়, তুমি যে তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙাফুলে।" (ভিলানেজ)

উপমা, রূপক, ছন্দবিন্যাস সকল কিছু মিলাইয়া প্রেমের একটি রোমান্টিক বর্ণনা।

পৃথিবীতে যে একটা মহানরকের অন্ধকার ব্যাপিয়া উঠিয়াছে, হতাশা, গ্লানি, ক্লান্তি ও জীর্ণতাই মানুষের একমাত্র সঙ্গী হইয়াছে, কবি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু কবি রোমান্সে বিশ্বাসী বুঝিতে পারি যখন দেখি পৃথিবী ধ্বংস হইবে কিন্তু তাহারই উপর নূতন পৃথিবীর জন্ম হইবে—কবি তাহারই আগমনী গীত গাহিয়াছেন।

"স্বপ্নে নয়, নরকের পর এ রচনা।

* * *

আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষ
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রূর মৃত্যু দেশে
সীমান্ত রেখার আশা,
··· নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায
ছাড়পত্র নতুন ভাষায নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।"

(অন্বিষ্ট)

জীবনানন্দ দাশের কবিতা চিত্রবহুল। তাঁহার কবিতায় চিত্ররস ফুটিয়াছে কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইয়া—তাহা বিদ্যাপতির মত তুলির রঙে চিত্রিত হয় নাই। জীবনানন্দের কবিতায় সামগ্রিক আবেদনই প্রধান। সৃষ্টির উদার পটভূমিতে কবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতির বিপুল রূপ—সমুদ্র, আকাশ, প্রান্তরে সেই রূপের চিরপরিবর্তনশীল বিচিত্র ক্রীড়ার কথাই পাওয়া যায়। প্রত্যুষের আলোয একটা স্নিগ্ধ বর্ণ আছে—তাহার একটা সুন্দর চিত্র কবি আঁকিয়াছেন। সে চিত্র তাঁহার ভাবের রঙে রঞ্জিত।

জীবনানন্দ দাশ

"কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা; (ঘাস)

নবীন তরুণ সূর্য্যের কিরণের রক্তিমাভা প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সেই

সূর্য্যকিরণ নবীন জীবনের বাণী বহন করিয়া আনে, সৃষ্টির উৎস বহন করিয়া আনে।

"রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল !

*   *   *

মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাড়ারের রস।"

(অবসরের গান)

জীবন-চেতনার কথা কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা যেন অনন্ত রহস্যের দ্যোতনা আনিয়া দিয়াছে।

"তুই শব্দহীন শেষ সাগরের
মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত্ত এই সূর্য্যের আলো।"

(পৃথিবীতে এই)

এই চেতনা যেন গীতার মহাবাণী "অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত" মনে পড়াইয়া দেয়।

আধুনিক যন্ত্রযুগ কবির চিত্তকে নিরন্তর পীড়িত করিয়াছে। যন্ত্রযুগের কুশ্রীতা, নিষ্পেষণ ও অসংগতি কবির অন্তরে গভীর হতাশার সঞ্চার করিয়াছে। কবির মন এই কুশ্রীতা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মুক্তি কামনা করিয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন আধুনিক যুগের মানুষ অসুস্থ মনোবিকারগ্রস্ত জ্বরতপ্ত রোগী। জীবনের অশান্তি হইতে আত্মরক্ষার জন্য কবি মৃত্যুর ক্রোড়কে আহ্বান করিয়াছেন। "মৃত্যুর আগে" কবিতায় মৃত্যুর রহস্যময়ী রূপটি বর্ণিত হইয়াছে।

"মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো—প্রিয়ার মতন !
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;
রোগীর জ্বরের মত পৃথিবীর পথের জীবন ;
অসুস্থ চোখের পরে অনিদ্রার মতন অসুখ ;" (জীবন)

জীবনানন্দ পুরাপুরি রোমান্টিক কবি। তিনি প্রকৃতির সহিত একাত্মযোগ অনুভব করিয়াছেন—ঘাসের সহিত ঘাস হইতে চাহিয়াছেন।

"ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।" (ঘাস)

এক স্বপ্নজগতের দৃশ্য তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে যেখানে প্রেম, অনুভূতি, কল্পনা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে।

কবি উপলব্ধি করিয়াছেন আজিকার এই ধ্বংসের যুগ—অন্ধকারের যুগ অতিক্রম করিয়া এক মহত্তর যুগের আবির্ভাব ঘটিবে। কবির সেই মহৎ আশার দীপ্তি "তিমির হননের গান", "সৌর করোজ্জ্বল", "সূর্য্যতামসী", "সময়ের কাছে", "মকর সংক্রান্তির রাতে", "দীপ্তি", "উত্তর প্রবেশ" প্রভৃতি কবিতায় স্পষ্ট হইয়াছে এবং তাহা এক গভীর বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

"ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্য্যের অস্ত শেষ করে দিযে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয জ্যোতির্ম্ময।"

(উত্তর প্রবেশ)

রোমান্টিক কবি তাঁহার অনুভূতি গভীর হৃদয দিয়া বুঝিয়াছেন মানুষের প্রেমেই যুগান্তর আসিবে।

"আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে" (পৃথিবীতে এই)

প্রাচীন যুগের নানা বিচিত্র কাহিনী—উর, ব্যাবিলন, মিশর, বিদিশা, উজ্জয়িনী, শ্রাবস্তী প্রভৃতির স্মৃতি তাঁহার কবিতায় রোমান্টিকতার রঙীন তুলি বুলাইয়াছে। কবি বর্ত্তমানের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যুগ যুগান্তের সীমানায আপনাকে বিস্তারিত করিযা দিয়াছেন। বিশ্বের প্রাচীন ও বৃহত্তর পটভূমিতে তিনি প্রেমকে সন্ধান করিয়াছেন—কেননা তিনি বুঝিযাছেন প্রেমেই মানুষের মুক্তি।

"সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভনগরে ;

* * *

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ;" (বনলতা সেন)

কবিতা মাত্রেই রোমান্টিক। আধুনিক কবিতা রোমান্সমুক্ত—এই কথা উচ্চ কণ্ঠে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু রোমান্টিকতার একটিমাত্র আদর্শই নাই যাহাতে আধুনিক কবিতা রোমান্সশূন্য বলা যাইতে

পারে। আধুনিক বাংলা কবিতা সেই প্রাচীন বৈষ্ণব গীতিকবিতারই উত্তর পুরুষ। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া—আধুনিক কবির রচনার মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারে সেই একই স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

(গ)

রোমান্টিকতার কোঠা কেবল কাব্যের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নহে। সাহিত্য যদি কেবলমাত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সংবাদ হয় তাহা হইলে সংবাদ-পত্রই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্য তাহা নহে, তাহা চিত্তের স্ফূর্ত্তির সহজতম ও সুন্দরতম বিকাশ। সাহিত্যের একটি অঙ্গ কাব্য—রোমান্টিকতা তাহার প্রাণকেন্দ্র। সাহিত্যের আর একটি অঙ্গ উপন্যাস—সেখানেও রোমান্টিকতা বা লোকোত্তর রস না থাকিলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

রোমান্টিকতা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য্য। সাহিত্যে বাস্তবতার সহিত রোমান্টিকতার সত্যকার কোন বিরোধ নাই। বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ রসোত্তীর্ণ হইয়াই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, তাহা সাহিত্য হইতে পারে না। বিষয়বস্তুর রসপরিণতি ঘটায় সাহিত্যিকের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে —সর্ব্বত্র একটা চিত্ত-সংস্কার শুরু হইয়াছিল। জাতীয়তাবোধের জাগরণও তাহার সহিত অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিন্তায়, কর্ম্মে এই যুগের মর্ম্মকথাটি ব্যক্ত হইয়াছে।

এই যুগের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম রসসঞ্চার এবং রোমান্টিকতা আনয়ন করিয়াছিলেন। রোমান্সের প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রসচেতনা আনিলেন—পাঠকচিত্তে রোমান্স-রসের তৃষ্ণা জাগাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসই রোমান্স-শ্রেণীর—অনেক স্থলেই এই রোমান্টিকতার রঙ ঘনতর প্রলেপ লেপন করিয়াছে। নায়ক-নায়িকা অনেক সময়েই অসাধারণ জগতের অধিবাসী হইয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাহাদের আমরা খুঁজিয়া পাই না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বঙ্কিমের উপন্যাসের মূল্য কমিয়াছে বলা চলে না। দেশীয় সংস্কৃতি-বিমুখ শিক্ষিত জনসাধারণের মোড় তিনিই সাহিত্যের মাধ্যমে ফিরাইয়াছিলেন। রসচেতনা সৃষ্টি করিবার জন্য

এই রোমান্স রসের প্রয়োজন তখন গভীর ভাবেই হইয়াছিল।

বঙ্কিমের উপন্যাসের স্থান কাল ইতিহাসের সুদূর অতীত পটভূমিতে। এই দূর অতীতের সন্ধ্যাচ্ছায়াম্লান পটভূমি রোমান্স সৃষ্টির সহায়তা করিযাছে। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসের রোমান্স অনেকটাই ইতিহাসচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঐতিহাসিক বিপ্লব একজন সাধারণ দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্র সিংহের জীবনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আনিয়াছে। দুর্গজয়ের বিবরণ, বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যু, বিমলার প্রতিহিংসা সকলই যেন চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটের মতই দ্রুততালে চলিয়া গিয়াছে। রোমান্স রসের অফুরাণ যোগান দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিমলার প্রতিহিংসা গ্রহণের চিত্রটি, কতুলখাঁর কদর্য্য উৎসবপুরীর বর্ণনার সকল কিছু আমাদের পরিবেশকে ভুলাইযা দেয।

তিলোত্তমা ও আয়েষা উভয়েই স্বল্পভাষিণা। প্রথমা ব্রীড়ানম্রা, কোমলা কিশোরী, মুগ্ধা নায়িকা—দ্বিতীয়া মহিয়সী, গম্ভীরা, প্রেমে প্রৌঢ়া। অপূর্ব্ব শব্দ সম্পদের সাহায্যে কল্যাণী নারীর দুইটি রূপ ফুটিযাছে।

প্রেমোন্মাদ প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতিনায়ক ওসমান এবং ধীরোদাত্ত নাযক জগৎসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোমান্সের পরিপূরক হইয়াছে। আযেষার অকস্মাৎ প্রেমাভিব্যক্তি যেমন ওসমানের হৃদয়রাজ্যে মহাপ্রলয় ঘটাইয়াছে, তেমনই এই আকস্মিক রহস্যের প্রকাশ আমাদের চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

'কপালকুণ্ডলা'র রঙ্গমঞ্চ তীব্র আলোকে ঝলসিত হয় নাই—আলো-আঁধারের মায়ারাজ্য সেখানে সৃজিত হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় রোমান্টিকতার সুর সবচেয়ে তীব্র—পড়িতে পড়িতে আমরা যেন কোন কল্পজগতে গিয়া উপস্থিত হই। অপ্রাকৃত ইহার প্রাণশক্তির মূলে রস যোগাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসের মধ্যে এখানে কাব্যধর্ম্ম সবচেয়ে বেশী।

যে নারী আবাল্য প্রতিপালিত হইয়াছে প্রকৃতির বিশাল পটভূমিকায়, শান্ত গৃহনীড় তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। বিজন সমুদ্রতীর, কাপালিকের ধর্ম্মসাধনা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমগ্র উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার চরিত্রে রোমান্স ঘনীভূত হইয়াছে। সুকোমল মাধুর্য্য, সাংসারিক ঔদাসিন্য, করুণার দিব্য প্রতিমূর্ত্তি অথচ অদম্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সকল কিছু জড়াইয়া কপালকুণ্ডলা যেন চিরযুগের নায়িকা

হইয়াছে। স্বামীর প্রেম, পরিবারের আদরযত্ন, গৃহসুখ—সকল সত্ত্বেও তাহার চিত্ত অতীত স্বাধীনতাকে কামনা করিয়াছে। "শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?' উত্তরে কপালকুণ্ডলা কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'বলিতে পারি না। বোধ হয় সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।' "

উপন্যাসের কপালকুণ্ডলার চরিত্র ছাড়াও ধর্ম্মসাধনা রোমান্সের রহস্য গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। কাপালিকের শবসাধনা, নবকুমারকে বলিদানের উদ্যোগ—সকলই আমাদের চিত্তে বিস্ময় ও অদ্ভুত রসের সঞ্চার করে। নবকুমারের অকস্মাৎ উদ্ধার এবং বিবাহ যেন কোন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কপালকুণ্ডলার সংসার-বিরক্তির পশ্চাতে ছিল তাহার ধর্ম্মের সহিত গভীর যোগ। নবকুমারের সহিত যাত্রাকালে দেবীপদে বিল্বপত্রার্পণচ্যুতি কপালকুণ্ডলাকে শঙ্কিত করিয়াছে এবং সংসারে অনাসক্ত করিয়াছে।

শ্যামাসুন্দরীর জন্য শিকড় সংগ্রহে যাত্রা করিয়া আকাশপটে ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন তাহার অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। "চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসার-অনাসক্তি, স্বামীপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্ব্বল গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনীধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্ব্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ ও দৈব, সৎ ও অসৎ—একসঙ্গে ভীড় করিয়া রথ-রজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর, সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে, নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে।"

(শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

'কপালকুণ্ডলা'য় রোমান্সের যে গাঢ়তা আছে, 'মৃণালিনী'তে তাহার কিছুটা স্বচ্ছ। এই উপন্যাসখানিতেও ইতিহাস অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। মুসলমান আক্রমণ মৃণালিনীর জীবনে বিপর্য্যয় আনিয়াছে ও তাহাকে পিতার নিরাপদ গৃহাশ্রয় হইতে বাহিরে আনিয়া পথের ভিখারিণী করিয়াছে। গিরিজায়ার মাধ্যমে মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের প্রেমের লীলা বৈষ্ণব পদাবলীকে মনে পড়াইয়া দেয়। গিরিজায়া গানে এবং ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর দূতীকে অনুসরণ

করিয়াছেন। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেমে একটা উত্তপ্ত নিবিড় স্পর্শ আছে। মনোরমার মধ্যেই উপন্যাসের রহস্যময়তা ঘন হইয়াছে। তাহার সহিত পশুপতির সম্পর্ক, তাহার বিচিত্র ব্যবহার, রহস্যময় গতিবিধি—সকলই আমাদের চিত্তে একটি অপরিচিত জগতের সংবাদের আভাষ আনিয়া দেয়। মনোরমাকে অন্যলোকবাসিনী বলিয়া মনে হয়।

'চন্দ্রশেখরে'র রোমান্সের মূলও ইতিহাসের ভিত্তিতে স্থাপিত। সমগ্র দেশে অরাজকতা ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে। মুসলমান রাজত্ব অবসানপ্রায়—চতুর ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হইতে চলিয়াছে। দেশের এই ছিন্ন বিছিন্ন অবস্থা, আকস্মিক বিপ্লব পারিবারিক জীবনের উপর দিয়া প্রচণ্ড সংঘাত তুলিয়াছে। শৈবলিনী এই উপন্যাসের মূল চরিত্র—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের রোমান্স দানা বাঁধিয়াছে।

চন্দ্রশেখরের রোমান্স মুখ্যতঃ মনস্তত্ত্বমূলক। শৈবলিনীর হৃদয়ে যে পাপাগ্নি লুক্কায়িত, ফষ্টরের কামনাগ্নি তাহাতে ঘৃতাহুতি দিয়া প্রচণ্ড দাবানল সৃষ্টি করিল। গৃহত্যাগিনী শৈবলিনীর গোপন ইচ্ছা ছিল প্রতাপকে জয় করা। ঘটনাচক্র সংযোজনে এই রোমান্স ঘনীভূত হইয়াছে। শৈবলিনীর উদ্ধার, প্রতাপের উদ্ধার বর্ণনা এই রোমান্স কাহিনীকে সার্থক করিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে দুই আবাল্য প্রণয়ীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। শৈবলিনী প্রতাপের নিকট প্রতিশ্রুতি দিল তাহাকে ভুলিবার। তাহার পর শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। উৎকট প্রায়শ্চিত্ত, নরক-যন্ত্রণাভোগ এবং উন্মত্ততা শৈবলিনীর মনোরাজ্যে একটা যুগান্তর ঘটাইয়াছে। প্রতাপকে ভুলিয়া সে নবজীবন লাভ করিয়াছে।

'আনন্দমঠ' তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বেদনার মূর্ত্ত প্রকাশ। আনন্দ-মঠকে অবাস্তব ও অযৌক্তিক, কল্পনার আতিশয্য, রোমান্স-সর্ব্বস্ব প্রভৃতি নানা উপমায় ভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু সকল দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও আনন্দমঠের একটি বিশেষ দিক অছে। জাতির তৎকালীন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আনন্দমঠে রূপ পাইয়াছে। আনন্দমঠ পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গালার বিপ্লবী সন্তানগণকে প্রেরণা যোগাইয়াছে। সন্ন্যাসীদের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত আজিও লক্ষ লক্ষ প্রাণে উন্মাদনার সঞ্চার করে। আনন্দমঠের রোমান্স এক সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বহিয়া গিয়াছে। এই রোমান্স দেশপ্রেমসঞ্জাত। কোন এক মোহন মন্ত্রে এই সন্তানসম্প্রদায় গৃহ-সংসার স্ত্রীপুত্রপরিজনের মায়া ত্যাগ করিয়া জীবন-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছে। এক মহত্তর আদর্শে তাহারা এক নেতার অধীনে

সজ্ঘবদ্ধ হইয়াছে।

কল্যাণী আমাদের অতি পরিচিত গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি। শান্তি আমাদের বাস্তবজীবনের পরিচিত মূর্ত্তি নহে। তাহার রীতিনীতি, আচারব্যবহার, নবীনানন্দ রূপে সন্তানদলে যোগদান, ইংরাজ সেনাপতির শান্তির হস্তে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনা আমাদের চিত্তে চমক জাগায়।

দেশমাতৃকার রূপবর্ণনা—মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন—এই ত্রয়ীরূপ দর্শন যেন কবির তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের জলন্ত বর্ণনা কাহিনীকে বাস্তবসন্নিধি দিয়াছে।

মোটামুটি বলিতে গেলে আনন্দমঠ পুরাপুরি রোমাণ্টিক উপন্যাস, কিন্তু বাস্তবতাহীন ভাবসর্ব্বস্ব কাহিনীমাত্র নহে।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচার এবং জীবনে প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন। রোমাণ্টিকতা প্রয়োগবাহুল্য সত্ত্বেও কাহিনী সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ। প্রফুল্লর মিথ্যাপবাদে শ্বশুরগৃহ হইতে বিতাড়ন, নিষ্ঠুর প্রকৃতি হরবল্লভের নির্দ্দয় ব্যবহার, ব্রজবল্লভের পত্নীপ্রেম—সকলই অত্যন্ত সহজভাবে ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পরই দরিদ্রকন্যা ও গৃহস্থবধূ প্রফুল্লের বিচিত্র পরিবর্ত্তন এবং ভবানী পাঠকের হস্তে তাহার নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষা আমাদের মনকে দ্রুততালে নিষ্পন্দভাবে চালিত করে। ঘটনার ক্রমবিন্যাস—ব্রজবল্লভের বন্দী হওয়া, ইংরাজ কর্ত্তৃক দেবীর বজরা আক্রমণ, হরবল্লভের ইংরাজের বন্দীত্ব—সকলই যেন মন্ত্রের মত ঘটে। এই ঘটনাবলীর মধ্যে রোমান্সের চমৎকারিত্ব আছে কিন্তু শক্তিশালী লেখকের রচনার গুণে অবিশ্বাস্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রফুল্লের পতিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে সংসার প্রতিপালন, পুত্রকন্যাপরিবৃতা গৃহলক্ষ্মীর শান্ত মহিমময়ী চিত্রটি আমাদের অন্তরকে বিচিত্র রসে অভিসিক্ত করিয়া দেয়। সে চিত্রে রোমাণ্টিকতা থাকে, সাহিত্যের লোকোত্তর আনন্দও থাকে।

'সীতারামে' বঙ্কিমের রোমান্সকল্পনা কিছুটা অবাস্তব হইয়াছে। সীতারামের হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের মূলে ছিল অপ্রাপনীয়া শ্রীর সিংবাহিনী মূর্ত্তি। শ্রীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই সীতারাম স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। অপ্রাপনীয়া শ্রী সীতারামের নিকট অজ্ঞাত অনন্তের বিচিত্র রহস্যে মণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীর সহিত সীতারামের মিলন সংঘটিত হইয়াছে। সীতারামের পোষিত রূপতৃষ্ণা শ্রীর সন্ন্যাসের কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

রূপতৃষ্ণা তাঁহাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিল, রমা মরিল, চন্দ্রচূড় ও রাজকর্ম্মচারী শাসিত হইল। অবশেষে শ্রীর পুনরায় অন্তর্দ্ধান সীতারামকে কামার্ত্ত হিংস্র পশুতে পরিণত করিল। অন্তরুদ্ধ রূপতৃষ্ণা এইবার প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী কামানলের শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সীতারামের চরিত্রের এই বিচিত্র বিশ্লেষণ, তাঁহার অধঃপতন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আবার শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির সম্মুখে সীতারামের পূর্ব্ব মহত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়াছে। সীতারামের শেষ মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তন রোমান্স ধর্ম্মের ফল, কিন্তু তাহা বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রাখিয়া গিয়াছে।

শ্রী ও জয়ন্ত, এই দুইটি চরিত্রই কিছুটা অবাস্তব এবং অতি রোমাণ্টিক হইয়াছে। জয়ন্তীর আবির্ভাব উপন্যাসে সম্পূর্ণ আকস্মিক। অথচ তাহারই প্রভাব স্বামীগতপ্রাণা শ্রীকে নিষ্কাম সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। শ্রীর পরিবর্ত্তনও কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। যে শ্রী না খাইয়া উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া মনে করিত তাঁহাকে খাওযাইলাম—যে দেওয়ালে চন্দন লেপন করিয়া মনে করিত তাঁহাকে মাখাইলাম, সে কি করিয়া কঠোর সন্ন্যাসিনীতে পরিণত হইল। শ্রীর নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা প্রফুল্লের মত পূর্ণতা লাভ করে নাই—সীতারামের সহধর্ম্মিণী হইযা সে তাঁহার শক্তিদায়িনী হইতে পারে নাই। তাই সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইযাছে—ব্রজবল্লভের মত সোনার সংসার হয় নাই।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুইটি উপন্যাস অনেকখানি বাস্তবানুগ কিন্তু সেখানেও রোমাণ্টিক রসের অপ্রাচুর্য্য নাই। বিষবৃক্ষে কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের সাক্ষাৎ বিচিত্রভাবে সংঘটিত হইযাছে। কুন্দের দুইটি স্বপ্নদর্শন তাহার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিযাছে। কুন্দের অন্ধ আত্মভোলা প্রেম, মৃত্যুবরণ সকলই রোমান্স-ধর্ম্মের আনুকুল্য করিযাছে। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ এবং প্রত্যাবর্ত্তন আমাদের মনে চমক জাগায।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতার দিকে আরও আগাইয়াছেন। এখানে অপ্রাকৃত জগতের প্রভাব, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। এই উপন্যাসের রোমান্স অনেকটা মনোধর্ম্মী। রোহিণীর অতৃপ্ত প্রেমের জন্য পাত্রান্বেষণ, বারুণী পুকুরে আত্মহত্যার চেষ্টা, গোবিন্দলালের পদস্খলন, ভ্রমরের অভিমান—এই সকল ঘটনাপরম্পরা রোমান্সের রসকে ঘনীভূত করিয়াছে। গোবিন্দলালের দ্বারা রোহিণীর হত্যা বস্তুগত রোমান্সের

পরিচায়ক। বারুণী পুকুরের ঘাটে রোহিণী ও ভ্রমরের আত্মার আবির্ভাব উপন্যাসকে অন্য জগতে লইয়া গিয়াছে। উপন্যাসের শেষে গোবিন্দলাল বাস্তব জগতের সীমা ছাড়াইয়া আদর্শলোকে উন্নীত হইয়াছেন। ভ্রমরকে ছাড়িয়া ভ্রমরাধিককে তিনি হৃদয়ে পাইয়াছেন। কুশলী শিল্পী নিছক দৈনন্দিন ঘটনার তুচ্ছতার মধ্যেই উপন্যাসের রসকে বদ্ধ রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের মোড় ঘুরাইলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি উপন্যাসকে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অসাধারণত্বের মোহ অপসারণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রোমান্স সুলভ আকস্মিকতা স্থান পায় নাই। অবশ্য রোমান্স সাহিত্যে থাকিবেই, কিন্তু এই রোমান্স বস্তুজগতের ঘটনার আবর্ত্তন নহে। এখানে উপন্যাসের রোমান্স মানবচিত্তের গভীর ভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এখানে রোমান্স সম্পূর্ণই অন্তর্মুখী।

রবীন্দ্রনাথ

'চোখের বালি' বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম খাঁটি বাস্তবানুগ উপন্যাস। উপন্যাসে বহু নাটকীয় মুহূর্ত্ত আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই উত্তেজনাহীন শান্ত বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অখণ্ড রোমান্টিক জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।

অসংযত ও প্রবল আত্মাভিমান-সর্ব্বস্ব মহেন্দ্র স্বভাবে অতি দীন ও দুর্ব্বল চরিত্র ছিল। মহতী বিনষ্টি তাঁহার পরিণতি হইত। কিন্তু অখণ্ড জীবনদর্শনে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন।

বিনোদিনী চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। সে হীরা ও রোহিণীর উত্তরাধিকারিণী—দামিনী, অভয়া ও কিরণময়ীর পূর্ব্বাভাস। তাহার রূপের খর দ্যুতি, তীব্র ব্যক্তিত্ববোধ ও অতৃপ্ত কামনা তাহাকে উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত করিযাছে। মহেন্দ্রের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা তাহাকে বিহারীর প্রতি আকৃষ্টা করিযাছে। মহেন্দ্রকে লইযা সে খেলা করিযাছে তাহার অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণাকে মিটাইবার জন্য। সে অন্তরে বিহারীর ধ্যান করিযাছে—মহেন্দ্রের বাহুবন্ধনে ধরা দেয় নাই। তাহাকে বিনোদিনী বিহারী-লাভের উপায রূপে ব্যবহার করিয়াছে। বিহারীর দ্বিতীয প্রত্যাখান বিনোদিনীর প্রেমকে রক্তমাংসের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া অপার্থিব রাজ্যের সামগ্রী করিয়াছে। বিহারীকে ধ্যান করিতে করিতে সে আদর্শের ধ্যানলোকে পদাবলীর নায়িকায় পরিবর্ত্তিতা হইয়াছে। বিহারীর জন্য সে তপস্যা করিয়াছে—উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মতই সে বিহারীর উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করিয়াছে।

এলাহাবাদে বিহারী বিনোদিনীর প্রেমকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাহিলে বিনোদিনী রোমাণ্টিক নায়িকার মতই প্রেমাস্পদের মঙ্গল কামনায় বিচ্ছেদকে বরণ করিয়াছে। স্থূল বাস্তবতার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া বিনোদিনী আদর্শলোকের অধিবাসিনী হইয়াছে।

"গ্রন্থের শেষ দিক দিয়া বিনোদিনী কল্পলোকের অধিবাসিনী—সে বাস্তব বিশ্লেষণের পরিধি ছাড়াইযা উদার অসীম ভাবরাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় আরোহণ করিয়াছে। তাহার জীবনের শেষ সঙ্কল্পও রোমান্সের রঙীন বাতাসে অঙ্কুরিত হইযাছে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের পরিকল্পনা অনেকটা রোমান্সধর্ম্মী। রমেশের সহিত কমলার জীবন জড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা আকস্মিকভাবে। হেমনলিনীর সহিত রমেশের প্রেমের সূত্রপাতটি ঘটিয়াছে, এমন সময় রমেশের বিবাহ। দৈবচক্রেই নৌকাডুবি হইয়াছে এবং ভ্রমবশতঃ কমলা রমেশের গৃহে আসিয়া উঠিয়াছে। রমেশ এবং কমলার পারস্পরিক বিচিত্র সম্পর্কও অনেকখানি রোমান্সধর্ম্মী। আবার এই দৈবসহায়তা বলেই কমলা রমেশের চিঠি হইতে নিজের জীবনের রহস্য জানিতে পারিয়াছে। অপরিচিত স্বামীর সন্ধানে সে অভিসার যাত্রা করিয়াছে। অবশেষে দৈবের প্রসাদে চক্রবর্ত্তী পরিবারের স্নেহের ষড়যন্ত্র তাহাকে তাহার স্বামীর পার্শ্বে উপস্থিত করিযাছে। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে দৈবের বিচিত্র খেলার কথাই পাই।

হেমনলিনীর চরিত্রের শান্ত রসাস্পদ দিকটি, আত্মমর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়, প্রেমের স্থির উত্তেজনাহীন মূর্ত্তিটি তাহার চারিদিকে একটি লোকোত্তর জগতের পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে।

'গোরা' উপন্যাসে তর্ক অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। গোরার উগ্র ব্যক্তিত্ব, তর্কশক্তি, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি আমাদের সম্মুখে একটি প্রখর দৃঢ় অনমনীয় প্রকৃতির চিত্র উপস্থিত করে। গোরা ভারতবর্ষের মূঢ় দুঃস্থ জনগণের বেদনা মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল। ভারতীয় আদর্শকে সে মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার আদর্শের মধ্য দিয়া সে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ ধ্বনিত করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, করুণা ও সত্যনিষ্ঠা—সামাজিক তুচ্ছতা—সমাজ, ধর্ম্ম ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব গোরার চরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। গোরা জন্মে অহিন্দু, কিন্তু আনন্দময়ীর করুণাঘন মাতৃস্নেহরসে সে পুষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত তাহার রক্তের সম্পর্ক নাই, কিন্তু ভারতের স্নেহ সে মাতৃস্নেহের উদারতায়

লালিত হইয়া লাভ করিয়াছিল। তাই সে জন্মরহস্য জানিতে পারিয়া সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত চিত্তে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

বিনয়ের রোমাণ্টিক প্রেমের প্রকাশ গোরার চিত্তকেও স্পর্শ করিয়াছিল। এই রোমাণ্টিক প্রেম গোরার অপ্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রেমকে যেন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাহাকে সচেষ্ট করিয়া তুলিল। সে অন্তরে ব্রহ্মাস্বাদ আস্বাদনের আনন্দ অনুভব করিল।

সুচরিতা চরিত্রের মধ্যে রোমান্সের ছায়াঘনতা আছে। সে সম্পূর্ণ বাস্তব জগতের জীব। কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শ্বের শান্ত পরিমণ্ডল, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন চরিত্রের মাধুর্য্য, স্থির বুদ্ধির দীপ্তি তাহার চরিত্রে একটি লোকোত্তর মহিমা দান করিয়াছে।

'গোরা' উপন্যাস বাস্তবতা প্রধান। সামাজিক ও ধর্ম্মীয় দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের কথাই আমরা পাই কিন্তু এই বাস্তবপ্রধান উপন্যাসের অন্তরালে ভাবকল্পনার গভীরতা এবং একটি আধ্যাত্মিক সুষমা রোমান্সের স্নিগ্ধ মাধুরী বিস্তৃত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সহজ ধর্ম্ম, একটি ধ্যানতন্ময় প্রশান্ত গভীরতা ইহা লাভ করিয়াছে।

গোরা জীবনকে খণ্ডভাবে দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টির কুহেলি অপসারিত হওয়া মাত্র সে অখণ্ড জীবনদর্শনে দীক্ষা লইয়াছে। "পরেশবাবুর আত্মসমাহিত শান্তিরস গোরাকে দেখাইয়া দিল যে ধর্ম্মের অতিভূমিতে উঠিলে সর্ব্ব বন্ধন দূর হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ অনুযায়ী তিতিক্ষা—ধৈর্য্য সেবার সৌভাগ্য লাভ করে। গোরার জন্মরহস্য ভেদ হইলে সে জানিল যে সে এমন এক স্থান পাইয়াছে যেখান হইতে জাতিভেদাভেদের অতীত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে তাহার কোন বাধা নাই। তখন তাহার কাছে মাতৃস্নেহ এবং দেশপ্রেম এক হইয়া উঠিল। ইহার সহিত সুচরিতার প্রেম ও পরেশবাবুর প্রশান্তি মিলিত হইয়া তাহার চিত্তকে কোমল এবং সেবা-ভক্তির যোগ্যপাত্র করিয়া দিল; গোরার সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করিল।" (সুকুমার সেন)

'গোরা'র পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলি এক অভিনব প্রণালীতে রচিত হইয়াছে। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ' প্রভৃতিতে জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলীর গতি লক্ষ্য করি না। সাঙ্কেতিকতা, রহস্যময়তা, উপন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণের স্থান অধিকার করিয়াছে। উপন্যাস অনেকখানি

কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

'চতুরঙ্গে' গল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয নাই, কিন্তু একটি পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি আছে। শচীশ প্রথম জীবনে নাস্তিক জ্যাঠামশাযের শিষ্য ছিল। কিন্তু সে আত্মসত্তার পরিচয় পায নাই। জ্যাঠামশাযের মৃত্যুর পর সে লীলানন্দ স্বামীব শিষ্য হইযা রসচর্চ্চায মনপ্রাণ সমর্পণ করিল। কিন্তু জীবনকে বাদ দিযা সত্যের সন্ধান পাইল না। দামিনী জীবনে বঞ্চিতা, পরিপূর্ণভাবে জীবনকে ভোগেব আকাঙ্ক্ষা স্বামী মিটাইতে পারেন নাই, গুরু তাহার জীবনের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিলেন না। দামিনী শচীশকে ভালবাসিল। কিন্তু শচীশ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। শচীশের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাডিযাই চলিতেছিল। তাহার রূপের কামনা আছে, কিন্তু তাহার গভীরতব সত্তা অরূপের মধ্যে ডুব মারিবার জন্য ব্যগ্র হইল। শচীশকে ভালবাসিযা বিদ্রোহিনী দামিনী ভক্তিমতী কল্যাণী নারী হইযা উঠিল। কিন্তু শচীশ অন্তরে রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বে উন্মত্ত হইযা উঠিল; সে রূপসাধনা ছাডিযা অরূপ-সাগরে ডুব দিযাছে, রূপের উপর সে জযী হইযাছে।

শচীশকে দামিনী গভীরতর সত্তাব মধ্যে লাভ করিবার জন্য ধ্যান করিযাছে —উহাই তাহার আদর্শ। শচীশের প্রত্যাখ্যান তাহার ধ্যান ও সত্যকে সার্থক করিযাছে।

কবি অত্যন্ত সংক্ষেপে দুইচারিটি মাত্র বাক্যে মনোভাব প্রকাশ করিযাছেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সমস্ত রহস্য ঘনীভূত হইযাছে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনার ঝড় বহিযাছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয অন্তবিপ্লব আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে একটা হুলুস্থূল অনেক সময বাধাইযা থাকে। এই অন্তর্বিপ্লব নিখিলেশের শান্ত গৃহকোণে প্রবেশ করিযাছে এবং বিমলার হৃদযরাজ্যে একটা মত্ততা, উত্তেজনা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে।

নিখিলেশের গভীর প্রেম, অপর্য্যাপ্ত প্রতিদানহীন দান বিমলার প্রেমকে পূর্ণতা লাভ করিতে দেয নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্ত বিমলার চিত্তকে সহজেই বিভ্রান্ত করিল। নিখিলেশ সত্যের সাধক, লক্ষ্যে পৌছানর জন্য সত্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইতে সে চায না। নিখিলেশের শান্ত আত্মমহিমময় আদর্শবাদ, সত্যের প্রতি একনিষ্ঠতা বিমলাকে আকৃষ্ট করে নাই। মানুষের চিরন্তন লোভ ও কামনা, স্বভাবধর্ম্ম বিমলার অন্তরশাযী হৃদযগুহা হইতে বহির্জগতের তাড়নায়

নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল। সন্দীপের চিত্তচমককারী বক্তৃতামালা, তাহার উদ্দীপ্ত কণ্ঠ বিমলার চিত্তের দুর্ব্বলতাকে স্ফীত করিয়া দিল। বিমলার চিত্তবিকার, মোহগ্রস্ততা, সন্দীপের ইন্ধন দান, নিখিলেশের বিরহী হৃদয়ের বেদনা উপন্যাসের সমস্ত রহস্যকে ঘনীভূত করিয়াছে। তবে এই রোমান্স—বিমলার চিত্তবিকার সমস্তই মনস্তত্ত্বমূলক। অমূল্যর স্নেহের ভিত্তিতে পা দিয়া বিমলার স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন, বিমলার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অমূল্যর মৃত্যু, ও নিখিলেশের আঘাত এই রোমান্সের নিঃসরণে সাহায্য করিয়াছে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রোমান্স ঘনীভূত হইয়া কুমুর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে। কুমু আবাল্য সংসারে দুঃখ দেখিয়াছে; ধৈর্য্যপরায়ণ, সত্যে বিশ্বাসী দাদার স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হইয়াছে। নিঃসঙ্গী কুমু দাদার শিক্ষার সহিত নিজের অন্তরের ভক্তিকে মিলাইয়া লইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির মধ্যে নিজের প্রেমের আদর্শ মিলাইয়া দিয়াছিল। স্বামীভক্তির রসে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। বাস্তবজ্ঞানের অভাব তাহার চিত্তে স্বামীসম্পর্ক বিষয়ে অনেকটা রক্তমাংসের স্পর্শ বাঁচাইয়া একটা আদর্শ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল।

"সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে,—ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিনীতে,—'হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ শুন মনমোহন প্যারে' —যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল।" হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, ভক্তি লইয়া সে স্বামীকে বরণ করিয়া লইল। কিন্তু মধুসূদনের স্থূলতা, লালসার অত্যাচার কুমুর ভক্তিনম্র হৃদয়কে আঘাত করিল। সে কুমুর মনের আসল ঠিকানা খুঁজিয়া পাইল না—তাহাকে জোর করিয়া দখল করিল।

মধুসূদনের নিকট হইতে সে দাদার স্নেহের দুর্গে আশ্রয় লইল—সন্তানের দায়ে তাহাকে ফিরিতে হইল। কিন্তু কুমু বুঝিল তাহার অন্তরের সত্যধর্ম্ম বিকৃত হয়। সংসারের সকল দাবীর বাহিরে আনন্দলোকে তাহার মুক্তি অপ্রাপনীয নয। বিপ্রদাসের নিকট প্রেমের, আনন্দের দীক্ষা লইয়া সে পতিগৃহে যাত্রা করিল।

'শেষের কবিতা'য় রোমান্স ও কাব্যধর্ম্মের যুগপৎ সম্মিলন ঘটিয়াছে। এখানে প্রেমের যে বিচিত্র লীলা অমিত ও লাবণ্যকে ঘিরিয়া শিলঙের বিস্তৃত পটভূমিতে চলিতেছিল—তাহা যেন রূঢ় বস্তু, সংসারের মধ্যেই রোমান্সের কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

অমিতের চঞ্চল চিত্ত লাবণ্যের বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইল। শিলঙের বিচিত্র পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যে তাহাদের প্রেমের শতদলটি বিচিত্র বর্ণে গন্ধে রূপে রসে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। লাবণ্যের হৃদয়ের তাপে অমিতের হৃদয় নানা উচ্ছ্বাসে কথার পর কথা সৃষ্টি করিয়া চলিল। অমিতের প্রেমে লাবণ্যের চিত্তও জাগিয়া উঠিল। এই প্রেমের অভিনব বর্ণনা এবং বিচিত্র প্রেমাভিসার 'শেষের কবিতা'য় রোমান্সের রস যোগাইয়াছে। লাবণ্য বুঝিল অমিত তাহার আপন মনের মাধুরী দিয়া "বন্যা"কে গড়িয়াছে। এই রসের স্রোতে ভাঁটা পড়িলে লাবণ্য সম্বন্ধে আর তাহার কৌতূহল থাকিবে না। এমন সময় কেতকী আসিল পুরাতনের দাবী লইয়া। শোভনলালের বিলম্বিত পত্রও লাবণ্যের হস্তগত হইল। নিজ হৃদয় দিয়া শোভনলালের বেদনা সে বুঝিল। অমিতের নিকট বিদায় লইতে গিয়া লাবণ্যের সমস্ত অন্তর কাঁপিয়াছে, কিন্তু তবু সে তাহার প্রতিদিনের সঙ্গিনী হইতে পারে নাই। অমিতের প্রভাব লাবণ্যের রুদ্ধ হৃদয়কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার জীবনে প্রেমের আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। এই প্রেমের আলোকেই সে তাহার চিরন্তন প্রণয়ীকে খুঁজিয়া পাইযাছে। অমিতও প্রেমের এই রহস্যশক্তির পরিচয় পাইয়াছে। সে বলিয়াছে,—'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলাম আমার ওড়ার আকাশ—আজ পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি—কিন্তু আমার আকাশও রইলো—আমি রোমান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও······কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন আমার ঘড়ার তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। কিন্তু লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে হ'ল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

শরৎচন্দ্রের রচনায় হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বাস রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা অধিকাংশই অসাধারণ, বাস্তবজগতের দৈনন্দিন ঘরকন্নার মধ্যে ইহাদের সকলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আবার কয়েকটি চরিত্র খুব বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু সেগুলিও রোমান্টিক মায়াদণ্ডের স্পর্শে অসাধারণ হইয়াছে। তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাসগুলি 'মন্দির', 'বড়দিদি', 'পরিণীতা' প্রভৃতিতে রোমান্টিকতার প্রাচুর্য্য আছে। এখানে মাধুর্য্য ও অনুরাগের চিত্রাবলী রোমান্টিক কল্পনার প্রমাণ দেয়। তাঁর উপন্যাসগুলির করুণরসের মূলেও এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

শরৎচন্দ্র

বর্ত্তমান। 'অরক্ষণীয়া' খাঁটি বাস্তবানুগ উপন্যাস। জ্ঞানদার জীবনের ট্রাজেডি শরৎচন্দ্র রোমান্টিক উপসংহারে শেষ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিজ নিজ হৃদয়াবেগে অনেকক্ষেত্রে চালিত হইয়াছে। তাহাদের জীবন বিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের ভাবনাচিন্তার পথ ধরিয়া। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্টিকতার আর একটি বড় লক্ষণ তাঁহার নায়কনায়িকারা জীবনে আদর্শপন্থী—কোন অন্যায়, অসত্যকে তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্স থাকিলেও তাঁহার জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা ও অকৃত্রিম, প্রগাঢ় সহানুভূতি রচনাকে রসসমৃদ্ধ করিয়াছে।'

'দেনা পাওনা' উপন্যাসে জীবানন্দের সহিত ষোড়শীর আকস্মিক সাক্ষাৎ ও নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রেমের আবির্ভাব—রোমান্টিকতার ফল।

'দেবদাস' উপন্যাসে পার্ব্বতী ও দেবদাসের প্রেম, পার্ব্বতীর বিবাহের পর দেবদাসের অধঃপতন এবং মৃত্যু—সমস্ত মিলিয়া কাহিনীকে করুণ করিয়াছে। উপন্যাসের শেষাংশে দেবদাসের শোচনীয় মৃত্যু এবং পার্ব্বতীর উন্মত্ততা উপন্যাসে রোমান্টিকতা আনিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত চরিত্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। "আমাদের স্কুল-কলেজ-অফিসের লৌহ-নিগড-বদ্ধ, রোগ-শোক জর্জ্জরিত দলাদলি-বিরোধ-কন্যাদায়-বিড়ম্বিত বাঙ্গালী জীবনের প্রান্ত সীমায় যে বিচিত্র রসভোগের এত প্রচুর অবসর আছে, দুঃসাহসিকতার এত ব্যাকুল, প্রবল আকর্ষণ আছে, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচনার এরূপ বিশাল, অব্যবহৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, চক্ষুর ও হৃদয়ের এত অপর্য্যাপ্ত রসদ মজুত আছে তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

বেদের জীবনযাত্রা ও ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক অভিযানগুলির চিত্র রোমান্টিকতার ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের সম্বন্ধ, অনুরাগের সহিত কর্ত্তব্য ও সমাজনিষ্ঠার দ্বন্দ্ব উভয়ের জীবনকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। অভয়া উপন্যাসক্ষেত্রে এক অভিনব অসাধারণ চরিত্র। জীবনকে সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি না দিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পতাকা উত্তোলন করিয়া অভয়া আগাইয়া গিয়াছে। সুনন্দা আর এক বিচিত্র তেজস্বিনী চরিত্র। কিন্তু তাহার হাবে ভাবে অনেকটা রহস্যময়তা আছে। কমলের চরিত্র কিছুটা প্রাণহীন হইয়াছে। সে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবাদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই

অমর সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রাণাবেগকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার প্রেম ও বৃন্দাবনযাত্রা, তাহার ধরণধারণ ও কথা একটা রোমান্টিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে মাত্র।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সতীশ রোমান্টিক প্রকৃতির ; সে ধনবান অথচ সংসার-বন্ধন মুক্ত, উচ্ছৃঙ্খল হইয়াও উদারহৃদয়। উপেন্দ্রের ভূমিকা কিছুটা রহস্যাবৃত। তাহার মাহাত্ম্য উপন্যাসে অনেকটা শ্রুতির উপরই নির্ভর করে। কিরণময়ী চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র পুরাপুরি রোমান্টিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সে হীরা এবং বিনোদিনীর সহোদরা। তাহার খর জ্বালাময়ী রূপের দীপ্তি, প্রখর বুদ্ধি, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি তাহাকে অসাধারণত্ব দান করিয়াছে। সে একদিকে উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে গভীরভাবে, আবার অন্যদিকে দিবাকরকে উপলক্ষ্য করিয়া দেহের ক্ষুধা মিটাইয়াছে। সাবিত্রী চরিত্রে প্রেমের জন্য, কল্যাণের জন্য প্রেমাস্পদকে ত্যাগ মহত্ত্বের গৌরব আনিয়া দিয়াছে।

'গৃহদাহে'র রোমান্টিকতা কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহদাহের সমস্যা সংসারে কচিৎ ঘটিলেও তাহা একান্তই অসম্ভব নহে। অচলার চরিত্রের দোলাচলবৃত্তিপরায়ণতা তাহাকে রহস্যময়ী করিয়াছে। মহিমকে সে ভালবাসিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, অথচ একই সঙ্গে সুরেশের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। সুরেশ তাহাকে ভুলাইলে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে তথাপি তাহাকে আমৃত্যু ছাড়িতে পারে নাই। চিত্তের এই এক বিচিত্র রহস্য অচলা ও সুরেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ প্রকাশিত করিযাছে। সুরেশ ইমোশনাল—ক্ষণে ক্ষণে তাহার চরিত্রে ভাল ও মন্দের খেলা দেখা যায়। সে পুরাপুরি রোমান্টিক। মহিম তাহার শান্ত, সংযত, ধীর ব্যক্তিত্ব লইয়া রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের মনে নিষ্ঠা ও শুচিতার যে আদর্শ ছিল তাহা মৃণাল ভূমিকায় রোমান্টিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে সবিতা চরিত্রে অনেকখানি রহস্যময়তা আছে। সম্ভ্রান্ত গৃহের বধূ এবং গৃহিণী, স্নেহময় স্বামীর পত্নী ও সন্তানের মাতা হইয়াও সে কি করিয়া অতি স্থূল, ইন্দ্রিয়লোলুপ ও কামনাসক্ত রমণীবাবুর সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা লেখক আমাদের দেন নাই। কয়েকবার সে প্রশ্নও উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা সবিতা দেয় নাই। সে অদৃষ্টের দোহাই দিয়াছে, কিন্তু তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে নাই। তাহার চরিত্রের বিশালতা, নিরুদ্ধ মাতৃহৃদয়ের দীর্ণ

বেদনা ছাড়াও একটা তেজস্বিতা, মহত্ত্ব তাহাকে অসাধারণ করিয়াছে। বিমলবাবু ও সবিতার সম্পর্ক একটি সূক্ষ্ম, ভোগাতীত, দেহসম্পর্কশূন্য রহস্য-জড়িত সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। রেণুর মৃত্যুর পর সবিতা সকল ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া অসহায় দরিদ্র স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রেণুর চরিত্রেও অভিমান, নিঃশব্দতা ও জেদ পূর্ণমাত্রায় রহিয়া গিয়াছে। এইগুলি তাহাকে বরাবর অসাধারণত্বের পর্য্যায়ে লইয়া গিয়াছে। রাখাল ও সারদার প্রেমসম্পর্কটি বিচিত্র প্রকৃতির।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে রোমান্টিকতা স্থানে স্থানে মাত্রাতিরেক হইয়া ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার জনপ্রিয় উপন্যাস 'মা' আদর্শের উচ্চ সুরে বাঁধা হইয়াছে। নিরপরাধিনী স্ত্রীকে কেবলমাত্র পিতৃ-আদেশে ত্যাগ সহজেই পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত করে। ইহাই কাহিনীর মূল রসবস্তু। ঘটনা আবর্ত্তিত করিয়াছে মনের দ্বন্দ্ব। উপন্যাসের প্রায় সমস্তটা জড়িয়ে আছে অরবিন্দের নিপীড়িত হৃদয়ের বেদনা, ব্রজরাণীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ ও বাৎসল্যব্যাকুল অন্তরের ক্ষুব্ধতা, মনোরমার শান্ত ধৈর্য্যশীল পতিপ্রেমবিহ্বল হৃদয়ের গভীর আত্মসমর্পণের সুর, অভিমানী স্নেহবঞ্চিত অজিতের চিত্তবিক্ষোভ—সকল কিছু মিলিয়া কাহিনীকে অভিনবত্ব ও রোমান্টিকতা দান করিয়াছে। উপন্যাসের রোমান্স সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক। বাহিরের কোন কার্য্য-কারণ এখানে রোমান্সের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই।

অনুরূপা দেবী

'বাগ্দত্তা' উপন্যাসে অন্তরস্থিত রোমান্সের সহিত বাহিরের কার্য্য-কারণ যোগ দিয়াছে। কমলা ও গৌরীর জীবন লইয়া দৈব এক নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়াছে। গৌরীর জন্মরহস্য ও পিতৃনিরূপণ ব্যাপারে দৈবের রহস্যময় প্রসাদ তাহার জীবনকে সম্পূর্ণতা দিয়াছে। আবার শচীকান্তের হৃদয়গর্ভস্থিত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ন্যায়-অন্যায়-বিচারবোধরহিত প্রেম কমলার জীবনে নিদারুণ দৈবরূপে দেখা দিয়াছে। মণীশের বাগ্দত্তা ও প্রণয়মুগ্ধা কমলাকে সে ছলেবলে বিবাহ করিয়াছে। এই নিদারুণ বিবাহ কমলার জীবনকে গভীর অন্ধকারের গর্ভে নিমজ্জিত করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই দৈবের খড়্গে শচীকান্ত বলি হইয়াছে। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে একটা শিহরণের স্রোত বহিয়া যায়। উমাকান্ত ও মণীশের চরিত্রও অসাধারণ, বাস্তবজীবনের সহিত তাহাদের আদর্শবাদী জীবনের সহজ মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে বাস্তবের সহিত রোমান্সের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। এখানে লেখিকা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের ভাবটির মধ্যে রোমান্সের ইন্দ্রজাল প্রবেশ করাইয়াছেন। কিশোরী বাণীর প্রাণের দেবতা গোপীনাথজীকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের ঘটনাগুলি আবর্ত্তিত হইয়াছে। বাণী অম্বরকে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের অন্ধ সংস্কার তাহাকে স্বামীর বিষয়ে উদাসীন পরন্তু বিদ্রোহী করিয়াছিল। কিন্তু যুগযুগান্তরের স্মৃতি-বিজড়িত মন্ত্রের শক্তি তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যসচেতন করিয়া তুলিয়াছে। অবশেষে অম্বরের মৃত্যুশয্যায় তাহার অনুশোচনা সকল অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়াছে। বাণীর মনোজগতের এই পরিববর্ত্তন রোমান্টিক রাজ্যের আমদানী। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে একাগ্র সাধনাবলে মৃতকল্প স্বামীর পুনর্জীবন দানের সাধনা এবং বাণীর ধ্যানাবিষ্ট তন্ময়মূর্ত্তি তাহাকে অতিমানব আদর্শলোকে উন্নীত করিয়াছে।

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে যে রোমান্সের পরিচয় পাই, তাহার মূল বাঙ্গালার প্রাণসাধনার মৃত্তিকায় প্রোথিত। যে রহস্য বাঙ্গালী সাধককে তন্ত্রের ভয়াল সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, আবার ইষ্টদেবীকে আপন সন্তানভাবে পাইয়াছে—সেই রহস্যের সন্ধান এই উপন্যাসে আমরা পাই। নিতাই কবিয়াল দুর্দ্দান্ত খুনে ডাকাতের ছেলে, আদিম বর্ব্বর বন্যপ্রকৃতি ডোমের ঘরে তাহার জন্ম; কিন্তু এই রক্তধারা তাহাকে চালিত করিল প্রেমের পথে। সে কবিত্বের প্রসাদ অর্জ্জন করিয়াছিল কোন দৈবের প্রসাদে। তাহার হৃদয়ে দেবতাকে সে অনুভব করিল—প্রাণের পিপাসা মিটাইতে সে গায়ক কবিয়াল হইয়া মানবসমাজে হৃদয়ের অমৃত বিলাইতে লাগিল। ঠাকুরঝিকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে গৃহচারিণীর কল্যাণব্রতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গৃহত্যাগ করিল।

তারাশঙ্কর

কবিয়াল হইয়া সে ঝুমুরদলের স্বৈরিণী বসনকে ভালবাসিল। বসন দেহের বিনিময়ে, অর্থের বিনিময়ে হৃদয়কে হত্যা করিয়াছে। নিতাইয়ের প্রেমের স্পর্শে তাহার তৃষিত প্রাণ মুঠা মুঠা অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু অমৃতের আস্বাদ পূর্ণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। মৃত্যু ও প্রেমের দ্বন্দ্ব বসনের জীবনে শেষকালে প্রবল হইয়া উঠিয়া সমগ্র উপন্যাসে একটি করুণ মধুর অথচ প্রেমদীপ্ত রোমান্টিক সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

'কালিন্দী' উপন্যাসে ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির অঙ্গুলি-নিয়ন্ত্রণে পাত্রপাত্রীর জীবন

চালিত হইয়াছে। তরুণ জীবনে রামেশ্বর যে সাংঘাতিক ভুল করিয়াছিলেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র জীবন ধরিয়া করিয়াছেন। রামেশ্বরের ব্যাধিকল্পনা, উন্মাদ জীবনেও সংস্কৃত কাহিনীকাব্যের আলোচনা ও আবৃত্তি সব কিছু মিলিয়া একটা অলৌকিক জগত সৃষ্টি করিয়াছে। পত্নীহন্তা রামেশ্বরের রক্ত তাহার পুত্রদের দেহে প্রবাহিত। সেই রক্তই মহীন্দ্রকে দিয়া খুন করাইয়াছে। অহীন্দ্রও বৈপ্লবিকতার রক্তাক্ত পথে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

কালিন্দীর চর নিয়তির নিষ্ঠুর ইঙ্গিতের মত চক্রবর্ত্তী পরিবারের জীবনে দুর্ব্বিসহ অভিশাপ আনিয়াছে। স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয় সর্ব্বনাশা কালিন্দীর চরকে সকল অদৃষ্টের জন্য দায়ী করিয়াছে। কালিন্দীর চরের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ হৃদয় অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে। মহীন্দ্রের পরিণামের দায়িত্ব এই চরের। আবার এই চরবাসী সাঁওতালগণ মিঃ মুখার্জ্জীর লৌহশাসনে নিপীড়িত হইয়াছে। চর ইহাদের জীবনে সকল দুর্ভোগ টানিয়া আনিয়াছে, পুনরায় তাহাদিগকে মিঃ মুখার্জ্জীর হস্তচালিত যন্ত্রের মতই পূর্ব্বতন প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে সাঙ্কেতিকতা ও রহস্যময়তার তন্তুজাল বোনা হইয়াছে।

'পঞ্চগ্রাম' ও 'গণদেবতা' উপন্যাস বাস্তবপ্রধান, কিন্তু এখানেও রোমান্টিকতা তাহার মায়াদণ্ড স্পর্শ করাইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরিত্রে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক সংস্কারহীন সভ্যতা এবং প্রাচীন সভ্যতার সংঘর্ষে প্রাচীনকে স্থান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু দেশের নাড়ীর সহিত সংযোগহীন আধুনিক সভ্যতার বাণী-বহনকারী বিশ্বনাথও দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। একমাত্র দেবুই এই নাড়ীর সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছে বলিয়া সে আপনজন হইয়াছে। বিলুর স্মৃতি, খোকন ও বিলুর বিচ্ছেদ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা করিয়া তাহার স্মৃতিবিভ্রম ঘটাইয়াছে। গাছের আলো-আঁধারি ছায়ায় একবার দুর্গা ও একবার পদ্মকে সে বিলু বলিয়া ভুল করিয়াছে। অবশেষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাণী তাহার কর্ম্মপথকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তারাশঙ্করের উপন্যাস দুটিতে পল্লীসমাজের প্রাণশক্তি মুমূর্ষু, লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত হইয়া সমাজ কেবলমাত্র প্রাণধারণের গ্লানি বহন করিয়া পথ চলিতেছে। উপন্যাসের শেষে দেবুর কণ্ঠে ঔপন্যাসিকের আশাবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে। তারাশঙ্করের ধ্যানদৃষ্টিতে বিমূঢ় সমাজের ভবিষ্যদ্ সার্থকতার পথের সাধনা ও সিদ্ধির বাণী ঘোষিত হইয়াছে।

'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসের রোমান্স মনস্তত্ত্বমূলক। ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব পটভূমিকায় রচিত। গ্রামের অসহায় দরিদ্র ব্যাধিজীর্ণ নরনারী লইযাই জীবনমশায়ের কারবার। জীবনে তিনি অর্থের প্রাচুর্য্য লাভ করেন নাই, মঞ্জরী তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, আতর বউয়ের বিষাক্ত বাক্যবাণে তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়াছে, একমাত্র সন্তান দুশ্চরিত্র এবং কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে পড়িয়াছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাঁহার হৃদযের ঐশ্বর্য্য, আনন্দের ভাণ্ডার মুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হয় নাই। তাহা সমভাবে বর্ষিত হইযা গিযাছে। পিতৃ-পিতামহের মহাশয়ত্ব তিনি বহন করিয়া লইযা গেছেন। পরমানন্দ মাধবের চিন্তাই তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের উর্দ্ধলোকে উন্নীত করিযাছে। সেখানে প্রদ্যোত ডাক্তারের বিদ্রূপ, গ্রামবাসীর ব্যঙ্গ, আতর বউযের গঞ্জনা —কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

'রাধা' উপন্যাস অতীতের পটভূমিকায় রচিত। ইংরাজ শাসনের প্রাগ্‌যুগে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যেমন মাৎস্যন্যায বিরাজ করিতেছিল, ধর্ম্মক্ষেত্রে তেমনই এক বিশৃঙ্খল চরম নীতিহীনতার—ধর্ম্মের নামে প্রবৃত্তি-মিটানর পালা চলিতেছিল। মাধবানন্দ ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে সমাজ ও জাতির জীবনের ব্যাধিকে উৎপাটিত করিতে গেলেন। অধ্যাত্ম সাধনার বহু উচ্চস্তরের অনুভূতি মাধবানন্দের জীবনকে রহস্যমণ্ডিত করে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের উচ্চতম অনুভূতি লাভ করিয়াও তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যকে বাদ দিতে চাহিলেন। প্রকৃতিহীন পুরুষ জড়, শক্তি বিনা তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয। সেই পরমপুরুষকে তিনি প্রকৃতি সান্নিধ্য হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বিকৃত হইয়া জনচিত্তকে ক্রমেই দুর্ব্বল করিতেছিল। মাধবানন্দ ধর্ম্মকে সংস্কার করিতে যাইয়া তাহার মূলকেই উচ্ছেদ করিযা বসিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া এবং মোহিনীকে তিনি অন্তর হইতে ঘৃণা করিযাছেন। কিন্তু রাধার অপমান কৃষ্ণপ্রিয়ার রসিক আত্মাপুরুষকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। প্রত্যাখ্যাতা মোহিনী প্রেমে সর্ব্বজয়ী হইয়াছে—কামনা-সমুদ্রের ক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ স্নিগ্ধ শান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। ঘটনাবিপর্য্যয়ের মাধ্যমে তাহার দীর্ঘ বিরহপ্রতীক্ষার অবসানে মাধবানন্দের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিয়াছে। মাধবানন্দের শোচনীয দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ইচ্ছামৃত্যু ঘটিয়াছে।

উপন্যাসের আদ্যোপান্ত অতীত রহস্যের ভাণ্ডার-গৃহের ঐশ্বর্য্যের দ্বার মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। সে যুগের পরকীয়া সাধনের গূঢ় রহস্য, ধর্ম্মের নামে

প্রবৃত্তির সেবা, কৃষ্ণপ্রিয়ার উন্মাদনা, তাহার দৈহিক কামনার সহিত সহজাত প্রেমের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম, আত্মহত্যা, মাধবানন্দের অধ্যাত্ম অনুভূতি, মোহিনীর প্রেমিকা মূর্ত্তি এবং জীবন বিসর্জ্জন—সমস্তই এক অপূর্ব্ব রহস্যমণ্ডিত অনাবিষ্কৃত জগতের কথা শুনাইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সংস্কার একটি বিচিত্র রহস্যজগত হইতে আবির্ভূত। তাহারই একটি ধারাকে তারাশঙ্কর উপন্যাসের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ বিচিত্র রহস্যময় রূপ দিয়াছেন।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাচালী' একটি অপূর্ব্ব উপন্যাস। এখানে সমস্যা-কণ্টক নাই, মনস্তত্ত্বের কচ্‌কচি নাই—ইহা একটি কাব্যোপন্যাস। বাঙ্গালীর চির-অনাদৃত, অবজ্ঞাত পল্লীজীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ ভাঁট, ঘেঁটু, আশ-শেওড়ার বন কবির সহানুভূতির পরিনিষেকে স্বর্গের নন্দনকানন হইয়া উঠিয়াছে। সেই স্বর্গরাজ্যে বিচরণশীল দেবশিশু অপুকে লইয়া এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিভূতিভূষণ

তাহার স্বপ্নমদির বিশ্বের বিস্ময়ভরা দুই চোখে অনন্ত অসীম রূপজগত তাহার রহস্যের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এখানে কল্পনার অসামান্যতা নাই—অতি সাধারণ নিত্য বস্তু অতি সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়াই অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই লোকোত্তর কবি-প্রতিভার লক্ষণ। কবির ভাবচিন্তা এই উপন্যাসে একটি রসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির রসোপলব্ধি অতি সহজ কথায় বর্ণিত হইয়াছে।

'পথের পাচালী' ও 'অপরাজিত' এই দুইখানি উপন্যাসে অপুর কল্পনাপ্রবণ অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের অতীত শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী অপুর শিশুচিত্তকে দোলা দিয়াছে। নিশ্চিন্তপুরের ঘন লতাগুল্মচ্ছায়ামণ্ডিত জীবনে সে দূর অতীতকে অবলোকন করিয়া তাহার রহস্যসাগরে অবগাহন করিয়াছে। অপুর কাশী ও কলিকাতার জীবন দারিদ্র্যপিষ্ট হইয়াও মাধুর্য্য হারায় নাই। মা ও অপর্ণার মৃত্যু, লীলার বিবাহ তাহাকে সংসারের মোহবন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তি দিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দিল্লী ও মধ্যপ্রদেশের বিজন অরণ্য অপুর অসীম রূপের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। অরণ্যের নিভৃত বাণী তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। নিশ্চিন্তপুরের সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যজীবনে অপু ফিরিয়া আসিল। এইখানেই সে অন্তরে অসীমকে অনুভব করিয়াছে।

"যে দিব্যদৃষ্টি জগতের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মতলস্থ গভীর

রহস্য-সঙ্কেতটি স্বচ্ছ করিয়া ধরে, জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড প্রকাশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া যুগযুগান্তর-ব্যাপী অশেষ পরিবর্ত্তনের মধ্যে জীবন-ধারায় অনন্ত, অক্ষুণ্ণ পারম্পর্য্য আবিষ্কার করে, পৃথিবীকে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির জটিল কক্ষাবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখে ও জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত জীবনের অসীম, উদার সম্ভাবনায় নিবিড়, সংশয়-লেশহীন আনন্দ অনুভব করে, তাহাই তাহার প্রিয়সন্তানকে নিশ্চিন্তপুরের পরম উপহার।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রবোধ সান্ন্যাল

প্রবোধ সান্ন্যাল আধুনিক যুগের অতি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক। তাঁহার উপন্যাসের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, প্রেমের বিশ্লেষণ অতি-বাস্তব। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া রোমান্টিক প্রেমের বাঁশী বাজিয়াছে।

'আকাবাঁকা' উপন্যাসের মীনাক্ষী ও কঙ্কর সামাজিক মাপকাঠিতে অস্পৃশ্য, কিন্তু তাহাদের প্রেমে তাহারা খাদ মেশায় নাই। বিবাহের বন্ধন নাই, জৈবিক কামনার সকল সংস্কার মুক্ত বন্ধনহারা মুক্তবেণা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর ন্যায় ছুটিয়াছে অনন্তের প্রেম অভিসারে। এই অনন্ত রহস্যময় প্রেমের অভিসার চিররহস্যময়ী শ্রীমতীর প্রেমকে স্মরণ করাইযাছে। এই প্রেমের সুরে সমস্ত উপন্যাসটি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা দুইজনা পরস্পরকে লইয়াই মত্ত; সংসার সহস্র বাধার পর্ব্বত তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, কিন্তু এই বাধা তাহাদের প্রেমস্রোতকে দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত করিয়াছে। প্রেমের এক বিচিত্র রহস্যময় আলেখ্য সমগ্র উপন্যাসের পটভূমিতে চিত্রিত হইয়াছে।

'শ্যামলী' উপন্যাসেও এই প্রেম রহস্যের মূলে রসসিঞ্চন করিয়াছে। দেহব্যবসায়িনীর দলে শ্যামলীর কণ্ঠে দরদভরা কীর্ত্তন, তাহার ভাবোন্মাদিনী রূপ প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কীটদষ্ট কুসুমকে মনে পড়াইয়া দিয়াছে। সুধাংশুর স্নিগ্ধ কল্যাণময় দৃষ্টির আলো উচ্চতর প্রেমের জগতে পথভ্রান্তা শ্যামলীকে বারবার পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। সুধাংশুর হাত ধরিয়া সে কুৎসিত কামনার বীভৎস রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিশ্বজগতের বিশাল উদার মুক্ত নীলাকাশের তলে নিশ্বাস্ লইয়াছে। বিনয়ের আত্মঘাতী প্রেমের মোহমুক্তির ঘোর কাটিয়াছে—সুধাংশু নরদেহে শ্যামলীর নিকট প্রাণের ঠাকুর হইয়াছে। পদ্মাবতীর সহিত প্রচ্ছন্ন আলাপে শ্যামলীর প্রাণের এই গোপন পূজার রহস্যটি প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্র শক্তির

লীলাবিলাস দেখি—প্রেম অসাধ্য সাধন করিয়াছে, অতি নীচস্তরের অধিবাসিনীকে জগদ্ধিতায় আত্মোৎসর্গ করাইয়াছে। শ্যামলী পরিপূর্ণা রোমান্টিক নায়িকা। সে প্রেমের জন্য কুল, গৃহ, সমাজ, ধর্ম্ম ছাড়িয়াছিল। কিন্তু সকল গ্লানির মধ্যে বাস করিয়াও সে তাহার প্রাণের ঠাকুরকে ধরিয়াছিল। তাই তাহার ঠাকুরও তাহাকে সর্ব্বনাশের গহ্বরে নামিতে দেন নাই। সুধাংশুর সন্ধানী দৃষ্টি তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে। উপন্যাসের শেষভাগে সে বৈরাগিনী, সংসারের দুঃখী জীবের সেবায় কল্যাণময়ী লক্ষ্মীরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

বনফুল

বনফুলের উপন্যাস বিশ্লেষণমূলক—জড়প্রকৃতি উপন্যাসের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে রসাবেশ সৃষ্টি হয় নাই—স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বনফুলের কয়েকটি উপন্যাস নিছক বিশ্লেষণ-মূলক না হইয়া রহস্যমণ্ডিত এবং কবিকল্পনার রসে সিক্ত হইয়াছে।

'রাত্রি' উপন্যাসে প্রকৃতির জড়ত্ব মাত্র বর্ণিত হয় নাই। এখানে প্রকৃতি এবং মানুষ যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সমগ্র উপন্যাসে রস ও রূপের পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে। উপন্যাসের ভাষা সম্পূর্ণ কাব্যোচিত—যেন ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিয়াছে। রাত্রি চরিত্র প্রকৃতির মতই নিস্তব্ধ, প্রকৃতির মতই কখনও বা উন্মত্ত ঝড়ের আবেগে আন্দোলিত হয়। রাত্রির জন্মকাহিনীর মধ্যেই এই রহস্যের বীজ নিহিত। মাতার অবিমৃষ্যকারিতা এবং উগ্র কামনার ক্ষুধা নিজের সন্তানকেই আঘাত করিয়াছে। স্বর্ণেন্দু পাপের প্রায়শ্চিত্তে নিজেকে দগ্ধ করিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় এবং রাত্রি সহোদরজাত হইয়াও মাতার পাপের ফলভোগ করিয়াছে। অস্বাভাবিক অবস্থাসঙ্কট রাত্রিকে গৃহত্যাগ করাইয়াছে। কাহিনীবৈচিত্র্যের সহিত বর্ণনা মিলিয়া উপন্যাসখানিকে পুরাপুরি রোমান্টিক করিয়াছে। উপন্যাসখানি আদ্যোপান্ত পাঠে দেহমন শিহরিয়া উঠে।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস অনেকখানি গীতিকাব্যধর্ম্মী। তাঁহার উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অপেক্ষা কাব্যোচ্ছ্বাস প্রাধান্য পাইয়াছে। 'তিথিডোর' উপন্যাসখানিতে অতিবাস্তব ঘটনাপুঞ্জকে রোমান্টিকতার উত্তাপে গলাইয়া লইয়াছেন। প্রেমের বৈদ্যুতিক আলোকে স্বাতী ও সত্যেনের জীবন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাতীর সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হৃদয় শুভ্র ও মজুমদারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার কল্পনাবিলাসী কাব্যধর্ম্মী মন আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, অবশেষে সত্যেনের

হৃদয়ে সে তাহার উপযুক্ত নীড় রচনা করিয়াছে। উন্মুক্ত নীলাকাশে জাগতিক প্রাপ্তির বন্ধনমুক্ত দুই মুক্ত আত্মার বিহার ঘটিয়াছে। তাহাদের মিলনও আশা করা যায় পরিপূর্ণ ও সার্থক হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের মনোধর্ম্ম বুঝিয়াছে। কাব্যচর্চ্চাই ধীরে ধীরে দুইটি সমপ্রাণ হৃদয়কে একটি স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে।

'কালোহাওয়া' উপন্যাসের রোমান্স বহির্জগত হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। অবশ্য ইহার পরিণতির কারণ পাত্রপাত্রীর মর্ম্মমূলেই খুঁজিতে হইবে। হৈমন্তীর অস্বাভাবিক জেদ এবং স্বার্থপরায়ণতার পরিণাম ক্রমেই সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। অরিন্দমের হত্যা এবং হৈমন্তীর উন্মাদগ্রস্ততা অকস্মাৎ ঘটিয়া গিয়া কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিকতার শিহরণ আনিয়া দিযাছে। আকস্মিকভাবে কি ঘটিযা গেল বুঝিবার জন্য পাঠকচিত্তকে লেখক প্রস্তুত থাকিতে দেন নাই। ধর্ম্মের অন্তরালে মা মহামায়ার গ্রাসে সমগ্র সংসারটির ধ্বংসপ্রাপ্তি পাঠকচিত্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। মাকড়সার মতো জাল পাতিয়া সে শিকারকে সম্মোহিত করে এবং অল্পে অল্পে তাহাকে নিঃশেষ করে। মিলি এবং উজ্জ্বলা উভযেই এক অস্বাভাবিক ভাবের পরিমণ্ডলের অন্তর্গত হইযা রক্তমাংসের ছোঁয়ার অতীত হইয়াছে। একমাত্র বুলি এই বিভীষিকাময় পরিবেশ, মা মহামায়ার ক্ষুধার্ত্ত গ্রাসের মুখ হইতে পলাইয়াছে। রক্তাক্ত পিতৃদেহ, নির্ব্বিকার মিলি ও উন্মাদিনী মা তাহাকে কঠোর বাস্তবের প্রতি সচেতন করিয়াছে। প্রেমের যে ঘোর তাহার চক্ষে লাগিযাছিল তাহাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

অচিন্ত্যকুমারের 'যায যদি যাক' রোমান্টিকধর্ম্মী কাব্যোপন্যাস। সুধীনের প্রেমকে অবজ্ঞা করিযা সেবা বারিধির কামনার কুণ্ডে দেহকে অশুচি করিযাছে। কিন্তু সুধীনের মৃত্যুঞ্জয়ী পরম ক্ষমাশীল প্রেম সেবাকে সকল গ্লানি ও অপমান হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেবার প্রত্যাবর্ত্তনকে সে গভীর স্নেহে গ্রহণ করিয়াছে—তাহার সকল বেদনার বিষ নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করিয়াছে। সেবাকে গ্রহণের মূল্যস্বরূপ সে বারিধির প্রতিহিংসানলে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। সেবাও তাহার প্রেমের মূল্য মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের শেষে লেখক এই রোমান্টিক সুরটি বজায় রাখেন নাই। ঘটনার অতি-বাস্তবতা—সেবা ও সুধীনের বিচ্ছেদ—মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের পরাজয় ঘটাইয়া-

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পাঠক চক্ষে উপন্যাসটি লোকোত্তর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'অনন্যা' উপন্যাসে বীথিকে কৈশোর জীবনের প্রারম্ভকালেই স্বাধীন জীবনের মূল্য সম্বন্ধে পিতামাতা সচেতন করিয়া দেন। তাহার কিশোর ও তরুণ চিত্তে একটা মহত্তর বৃহত্তর সার্থক জীবন রূপায়নের স্বপ্ন ও পিপাসা ছিল। কিন্তু সেই রোমান্টিক স্বপ্ন, বাস্তবের রূঢ় অভিজ্ঞতা ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রখর মধ্যাহ্নলোকে তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। পিতামাতার স্বার্থপরতা ক্রমেই তাহাকে অতি সাধারণ গতানুগতিক অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। তাহার আত্মা-পুরুষ এই বাধ্যতামূলক দায়ের নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্য আর্ত্তনাদ করিয়াছে, অন্যদিকে কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব তাহাকে বাধা দিয়াছে। সমরেশের প্রেমকে সে নির্ম্মমভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিযাছে। সমরেশের আকর্ষণকে সে অজগরের সম্মোহিনী শক্তি ভাবিয়াছে। একমাত্র টুটর স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং হরেনের স্বার্থপরতা তাহাকে সত্যদৃষ্টির আবরণ উন্মোচনে সহাযতা করিয়াছে। দাযিত্বজ্ঞানহীন পিতামাতার কবল হইতে আত্মরক্ষার তাগিদ অবশেষে তাহাকে পলাযনে বাধ্য করিযাছে। গ্রন্থের শেষভাগে বীথি পরিপূর্ণ রোমান্টিক নাযিকা—তাহার ঈপ্সিতের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করিযাছে।

'আসমুদ্র' উপন্যাসে অতীন্দ্রিয রহস্যময়তার সুর সমস্ত ক্ষণ ধ্বনিত হইয়াছে। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী, জীবন সমালোচনা—সকল কিছুর মধ্যে একটা সাঙ্কেতিকতা ফুটিযা উঠিয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে কবিত্বপ্রাধান্য বস্তুকে [illegible] দিবার চেষ্টা করিযাছে। সৌম্য ও বনানীর রহস্যময় সম্বন্ধ সাধারণ বস্তুজগতের মাপকাঠি দিযা ব্যাখ্যা হয না। সৌম্য ও বনানীর আলাপের মধ্যে মানবের চিরন্তন আত্মার তৃষ্ণা রূপ পাইযাছে। বনানী পুরাপুরি রহস্যময়ী—তাহার পূর্ণ পরিচয —তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার কোন সংবাদই লেখক আমাদের দেন না। সৌম্যের চরিত্রও স্বপ্নবিধুর। উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র শিপ্রা তাহার ঈর্ষ্যা দ্বেষ লইযা বাস্তব হইয়াছে। সে সৌম্য ও বনানীর সম্বন্ধকে ঈর্ষ্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিযাছে এবং সন্দেহের অগ্নিতে নিজে এবং সৌম্যকেও দগ্ধ করিযাছে। কিন্তু গ্রন্থের শেষে তাহার অন্তরে মহত্তর প্রেম জাগিয়া উঠিযাছে। সে সৌম্যকে বনানীর হাতে দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। সে-ও সৌম্য এবং বনানীর পদানুসরণ করিযা রোমান্টিক নাযিকা হইয়া উঠিয়াছে।

'কাক জ্যোৎস্না' উপন্যাস অনেকখানি উদ্ভট। এখানে পাত্রপাত্রী সকলেই অতি রোমান্টিক। সুধী নমিতাকে লইয়া সুখী হয নাই। কিন্তু তাহার

আকস্মিক মৃত্যু নমিতার জীবনে ওলটপালট আনিয়াছে। অজয় ও প্রদীপ উভয়েই নমিতাকে ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিতে এবং সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া পথে নামিয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছে। ধূমকেতুর মতই তাহা নমিতার জীবনে উপর্য্যুপরি আঘাত হানিয়াছে। কিন্তু নমিতা গৃহত্যাগ করিলে কেহই তখন তাহার সঙ্গী হইতে অগ্রসর হয় নাই। উপন্যাসখানি আগাগোড়া অস্বাভাবিক এবং কল্পনাসর্ব্বস্ব হইয়াছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি অসংলগ্নতা। তাঁহার উপন্যাসগুলি তাই লোকোত্তর রস সৃজন না করিয়া অতি রোমাণ্টিক হইয়াছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় গ্রাম্যজীবনের খণ্ডাংশ চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে একটা অপরিচয়ের সূক্ষ্ম আবরণ রহিয়া গিয়াছে। শশীর জীবনের সমস্যাগুলিও অনেকটা অসংলগ্ন। এই সমস্যাগুলি তাহার জীবনের অন্তর্দ্দেশকে আলোড়িত করে নাই—ঊর্দ্ধাকাশে লঘু মেঘখণ্ডের মত ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। কুসুমের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। কুসুমের প্রেমকে সে অবহেলা করিয়াছে। কুসুমের গৃহত্যাগে তাহার মন বেদনার্ত্ত হইয়াছে—কিন্তু ইহার কোন সুদূর প্রভাব পড়ে নাই।

বিন্দুর দাম্পত্য জীবনও অস্বাভাবিক। স্বামী তাহাকে গণিকার মত ব্যবহার করিয়াছে। ইহার ফলে বিন্দুর মনোবৃত্তি এক অস্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। তাহার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে লেখক রহস্যময় ভাবে নির্ব্বাক রহিয়াছেন, কিন্তু একটা বীভৎস পরিণতির ইঙ্গিত আমাদের চিত্তে শিহরণ সঞ্চার করে।

কুমুদ ও মতির যাযাবর দাম্পত্য জীবনও বিচিত্র। এখানে উভয়ে যেন

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থি।'

এই নীতিকেই স্মরণ করিয়াছে। ইহাদের রোমাণ্টিক জীবনযাত্রা উপন্যাসটিকে অভিনবত্ব দান করিয়াছে।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে চিন্তার অসংলগ্নতা, ভাবাতুরতা, অতি রোমাণ্টিকতা এবং অবাস্তবতার মিলন ঘটিয়াছে। গল্পের পাত্র পাত্রী সকলেই সূক্ষ্ম সাঙ্কেতিক আচ্ছাদনের অন্তরালে অবস্থান করিয়াছে—রক্তমাংসের মানুষের প্রাণের উত্তাপ সেখানে পাওয়া যায় না। সুপ্রিয়া হেরম্বকে চাহিয়াছে কিন্তু

হেরম্ব তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অনাথ ও মালতীর বিকৃত জীবনের মধ্যেই আনন্দের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে। সে হেরম্বের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু হেরম্ব তাহাকে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুপ্রিয়া তাহাকে নীড়ের মায়ায় হাতছানি দিয়াছে। আনন্দ তাহার আদর্শ-লোকের প্রেম লইয়া হেরম্বের পার্শ্ব হইতে সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রকলানৃত্যে আনন্দের উন্মাদনৃত্য এবং অগ্নিকুণ্ডে দেহাবসান রহস্যময় এবং সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা আনিয়াছে। হেরম্ব সুপ্রিয়াকেও গ্রহণ করিতে পারে নাই। দুই প্রেমের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াছে। অশোক ও সুপ্রিয়ার ভয়াবহ দাম্পত্য জীবন—অশোকের সুপ্রিয়াকে হত্যার চেষ্টা, হেরম্বের স্ত্রীর আত্মহত্যা—সমস্তই সাঙ্কেতিক প্রেমবাঞ্জ্যের যবনিকার পশ্চাতে ভয়াবহ পাশবিক নিষ্ঠুর জীবনের ইঙ্গিত দিয়াছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্ত' উপন্যাসে অতি আধুনিক যুগের প্রেমের অতৃপ্তি এবং যৌনবোধ বিশ্লেষিত হইয়াছে—কিন্তু লেখক প্রেমের চির পুরাতন কেন্দ্রে আসিয়া বৃত্তটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উপন্যাসের ভাষা কাব্যাত্মক—কেন্দ্রবিন্দুটিও প্রেমের রহস্যময় ভাব।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সতীর অতি পরিচিত দৈনন্দিন সম্পর্ক তাহার চিত্তে একটি সহজাত বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। সতী ও সত্যবানের প্রেম নানা পারিবারিক ও সামাজিক বাধাকে ঠেলিয়া সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু সত্যবানের অতি আধুনিক চিত্ত প্রেমের নব বৈচিত্র্য অন্বেষণে মানসীর উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করিয়াছে। বনানীর মধ্যে সে তাহার তৃপ্তিকে অন্বেষণ করিয়াছে। পুরী হইতে বনানীর রহস্যময় প্রত্যাবর্তন এবং সতীর অনুপস্থিতিতে বনানীর সাহচর্য্য সত্যবানকে ক্ষণসঙ্গদানের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছে। কিন্তু বনানীর চিত্তও শিশির ও সত্যবান—দুই আকর্ষণে দুলিয়াছে। সত্যবানের নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া সে পুনরায় শিশিরের উত্তাপহীন কর্ম্মসঙ্গিনী হইয়াছে। সত্যবানও সতীর চির-পুরাতন প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম লইয়াছে। সতী ও সত্যবানের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সহবাস, সুরমার সারা জীবনব্যাপী তৃপ্তির অন্বেষণ ও ব্যর্থতার কারুণ্য, বনানী ও সত্যবানের মিলন প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে কবিত্ব শক্তি ও রোমাণ্টিকতার পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।

গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসে সুদূর আদর্শবাদের জন্য জীবনে সকল দুর্গতি ও দুঃখকে বরণ করিবার ইতিহাস আছে। মণাশ, সুনীল, অসিত—

ইহারা সকলেই বর্ত্তমানের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছে। শৈলেন ও সাতকড়ির মত নিস্তরঙ্গ জীবিকার্জ্জনের যন্ত্রমাত্র হইয়া নির্ব্বিচারে জীবনকে কাটাইয়া দিতে পারে নাই। একটা বৃহত্তর মহত্তর জীবন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দৈনন্দিন সকল তুচ্ছতার প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নবযুগের আবির্ভাবকে মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া বিপ্লবীর দল বজ্রকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছে—ইহার জন্য যে কোন মূল্য দিতে তাহারা প্রস্তুত। নিত্য দিনযাপনের গ্লানি তাহারা সহিতে পারে নাই। বিরাট বিশ্বের সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন এবং সেই মিলনের আনন্দময় অনুভূতি অজিতের সত্তাকে বিকশিত করিয়াছে।

গোপাল হালদার

বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিচিত্র দার্শনিক সহনশীলতার গভীর বিশ্লেষণ ও পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। বিপ্লবীর অন্তরে সংশয়ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা বারবার আবর্ত্তিত হইয়াছে। যে মহৎ আদর্শের মঙ্গলপ্রদীপ হস্তে লইযা বিপ্লবীর দল চলিয়াছে—তাহার তৈলনিষেক রক্ত দ্বারা কি সাধিত হইবে? ধ্বংসের লীলার মধ্যে সৃষ্টির নবীন বীজ উত্তপ্ত হইয়া ঝরিযা যাইতে পারে। বিপ্লবীর অন্তরের চিন্তা এবং আদর্শের দ্বন্দ্ব অতি সুন্দরভাবে লোকোত্তর রসে উপন্যাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে।

'ডাক দিযে যাই' উপন্যাসে নবেন্দু ঘোষ বর্ত্তমান জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা, মানুষের লোভ ও কামনার অগ্নিতে অসহায় মানুষের বলি জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করিযাছেন। কাহিনী সম্পূর্ণ বাস্তবানুগা। কিন্তু লেখক উপন্যাসকে মানুষের এই অপমানের মধ্যেই বিসর্জ্জন দেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে তিনি মানুষের মহত্তর আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়াছেন। এই আকাঙ্ক্ষাই উপন্যাসে রোমাণ্টিক রূপ নিযাছে। তপন ভবিষ্যদ্ পৃথিবী, বৃহত্তর মহত্তর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিযাছে। সে কবি—তাহার শিল্প দিযা সে পৃথিবীর মানুষকে সঙ্কীর্ণ জীবনের স্বার্থলোভকে ঝাড়িযা ফেলিযা দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। দারিদ্র্যের ঊষর মরুপ্রান্তরে তাহার জীবন জ্বলিয়া ছাই হইয়াছে—কিন্তু তাহার আমৃত্যু সংগ্রাম দিলীপকে স্বপ্নাবেশ হইতে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। প্রমথ এই মহত্তর আদর্শের জন্যই জীবনের সুখশান্তিকে পরিহার করিয়া বেদনার বন্ধুর পথে ছুটিয়া বেড়াইযাছে, শেখর প্রাণ দিয়াছে। কল্যাণী এই বৃহত্তর মহত্তর জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করার ব্রত দিলীপকে

নবেন্দু ঘোষ

দিয়াছে। কল্যাণীর অন্তরে ধ্রুব বিশ্বাস চির অচঞ্চল দীপশিখার মতই জ্বলিতেছে —দুঃখনিশার অবসানে পূর্ব্বাকাশে নবারুণোদয় ঘটিবেই।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাস অতিবাস্তব যন্ত্রযুগের কাহিনী। এখানে লৌহকারখানা তাহার অতিকায় চিমনি ও বিরাট পরিধি লইয়া দেহ বিস্তার করিয়াছে। কারখানার কর্কশ নির্ঘোষের মধ্যে রোমাণ্টিকতার মাধুরী উপভোগেয় স্থান স্বল্প। কিন্তু কারখানার বাসিন্দারা মানুষ। মানবীয় প্রেম, সুখদুঃখ, লোভ, হতাশা, ত্যাগ, ক্ষোভ—সকলই এখানে আছে, তাই লোকোত্তর রস-সৃষ্টির সময়ও পাওয়া গিয়াছে। দেবুর আদর্শবাদ—ক্ষুদ্র অর্থকরী স্বকীয় স্বার্থের জন্য বৃহত্তর শ্রমিক স্বার্থকে বিপন্ন করিতে দেয় নাই। এখানেও বৃহতের জন্য আকিঞ্চন আছে। মন্দার গৃহত্যাগও এই আদর্শেব প্রেরণায়। কিন্তু সেই আদর্শের অপরিণতি তাহার রোমাণ্টিক মনকে ক্ষুব্ধ করে এবং মৃত্যুতে সে শান্তিকে খুঁজিয়া পায়।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সরযূ এবং অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনীর অতিক্ষুদ্র খণ্ড চিত্র বাল্যপ্রেমের একটি করুণ মধুর স্মৃতিকে প্রকাশ করে। অমলার চরিত্রে লেখক অনাবশ্যক গৌরব দিয়াছেন—কিন্তু উপন্যাসে সে অত্যন্ত নিষ্প্রভ। মন্দার মৃত্যু পর্য্যন্ত উপন্যাসটির লোকোত্তর রস বজায় রহিযাছে। কিন্তু তাহার পরই সুর অনেক-খানি নামিয়া গিযাছে।

সাহিত্যে রোমান্টিকতাই মুখ্য বস্তু। আধুনিক সাহিত্যে রোমান্টিকতা অপরাধ বলিযা গণ্য হয। কিন্তু রোমান্টিকতার সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যাই এই একদেশদর্শী বিচার সম্ভব করে। রোমান্স সাহিত্যকে বস্তু হইতে রক্ষা করে—তাহাকে রসে পবিণত করে। এই রস বা আনন্দ না থাকিলে সাহিত্যের মূল্য থাকে না —তাহা সংবাদ হইযা দাঁড়ায। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের কাল হইতে অতি আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সাহিত্যের যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি প্রবাহিত হইযা চলিযাছে তাহাতে অবগাহন করিলে দেখি রোমান্টিকতা সাহিত্যের প্রাণ। আধুনিক সাহিত্যের দরবারে আজিকার দিনে রস শব্দের উপব বিতণ্ডার যে প্রচণ্ড আঘাত চলিতেছে তাহার উত্তরে এইটুকু বলা চলে যে আধুনিক সাহিত্য কি গদ্যে বা কি পদ্যে রোমান্সধর্ম্মী।

দশম অধ্যায়

সাহিত্যে মানবীয় রস

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য—মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী ও অনুবাদকাহিনী সম্পূর্ণ-ভাবে দেবসচেতন ছিল। দেবতার মর্ত্যে আগমন এবং পূজা প্রচারের জন্যই মানুষের প্রয়োজন হইত। মানুষ সেখানে দেবতার হস্তচালিত পুতুল মাত্র, মানুষের সুখদুঃখ সকলই দেবতার অনুগ্রহের দান। চাঁদসদাগরের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রের লাঞ্ছনা ঘটিযাছে। পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাঁহাকে বিদ্রূপের পাত্র রূপে চিত্রিত করিযাছেন। কিন্তু পদ্মাপুরাণে পদ্মার অপ্রতিহত অঘটনঘটনপটীযসী লীলা বর্ণনার অন্তরালে লখীন্দর ও বেহুলার মানবীয প্রেমের বৈচিত্র্য, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের সাধনা, বিচ্ছেদের মধ্য দিযা বেহুলার প্রেমোদ্বেল করুণমধুর চিত্ত, চাঁদের হৃদযে একদিকে পুত্রশোক, অপরদিকে অনমনীয দৃঢ়তা যথেষ্ট মানবীয উপাদান যোগাইযা থাকে।

সাহিত্যে দেবসচেতনার অন্তরালে মানবিকতা

অবশ্য এই সকল গাথা ও মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি পদাবলী সাহিত্যে দেবলীলার ফাঁকে ফাঁকে মানবের চিরন্তন বিরহ-মিলনের হাসি-কান্নার আনন্দাশ্রু স্বর্গ ও মর্ত্যকে একটি স্বর্ণসূত্রে বাঁধিযাছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর জীবনচরিত কাহিনীকাব্যগুলি দেবতার পরিবর্তে মর্ত্যের মানুষের বিষয লইয়া রচিত হইল। বৈষ্ণব গীতিকবি মহাপ্রভুর প্রভাবে অনুভব করিলেন—

পদাবলীর মানবীয় রস

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" (চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণব কবির দেবতা হৃদযের সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিযাছেন। দেবতা ও মানবে ভেদ নাই উচ্চকণ্ঠে তাঁহারা ঘোষণা করিযাছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য—এই রসগুলির সাধনই বৈষ্ণব সাধকের মতে শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রভু-ভৃত্যের নিগূঢ় মধুর সেবার ভাবটি, সখার সহিত সখার সৌহার্দ্যবন্ধন, মাতার পুত্রের জন্য উদ্বেলিত বাৎসল্য ব্যাকুলতা, নরনারীর পারস্পরিক প্রীতি—এই সকলই মানবীয় সম্পর্কের মধ্যেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই মানুষকে লইয়া সংসারে ঈশ্বর তাঁহার বিচিত্র লীলা সম্পাদন করেন। যুগে যুগে তিনি নরদেহে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের মধ্যে তাঁহার অসীম করুণাধারা বর্ষণ করিয়া গেছেন এবং আজিও করিতেছেন। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।

সাহিত্যেও সেই মানুষের কথা—মানুষের প্রতিষ্ঠা। মানবীয় উপাদান না থাকিলে সাহিত্য সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও সেই মানুষের কথা—যেখানে রাধাকৃষ্ণের দেবত্ব অন্তর্হিত হইয়া মর্ত্ত্যের চিরন্তন প্রেমের কথা—আমাদের গৃহকোণে চলিষ্ণু সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের কাহিনীই রূপ দিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় এই প্রেম—প্রেমের দুঃখ ও মিলনের আনন্দ, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি মানুষের চিত্তের নানা বিচিত্র অবস্থার কথা গীতিকবিতার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতায় সেই প্রশ্নই করিযাছেন—

"হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি
পড়েছিল মনে।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের অমর প্রেমগীতিকাব্যে প্রেমের যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার থরে থরে রক্ষিত আছে তাহার মূলে মানবিক স্পর্শ পূর্ণ মাত্রায় আছে। ইহার পদদ্বয় মর্ত্ত্যের প্রেমের মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়া স্বর্গের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন পক্ষ-বিধূনন করিযাছে। ইহাই বৈষ্ণব গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য।

গীতগোবিন্দের স্রষ্টা কবি জয়দেব তাঁহার গীতিকাব্যে বারে বারে স্মরণ করাইযা দিয়াছেন কৃষ্ণ ভগবান্, তিনি দশাবতার রূপে বারংবার পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী—মান, বিরহ, মানভঞ্জন এবং মিলন বর্ণনাকালে কবি আত্মবিস্মৃত হইয়া গেছেন। পড়িতে পড়িতে পাঠকও রাধা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া যান—সেই প্রেমের নানা বিচিত্র লীলা, পৃথিবীর দুইটি মুগ্ধ হৃদয়ের কাহিনী নূতন সুরে বাজিযা উঠে।

শ্রীশ্রীগীত গোবিন্দম্

(কৃষ্ণ এই মাটির পৃথিবীতে রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে মানবীয় রসের প্রাচুর্য্য থাকিবেই। গোপীগণের সহিত লীলাচঞ্চল কৃষ্ণের প্রেমবিহার শ্রীরাধাকে মানিনী করিল। অভিমানিনী প্রেয়সী সখাকে কৃষ্ণের মানসিক চাঞ্চল্যের কথা বলিয়া মনোবেদনা নিবেদন করিতেছেন।)

"গণযতি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলস্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিং॥"

"সখি আমার চিত্ত হরির গুণগ্রাম গণনা করিয়া ভ্রমেও রুষ্ট হইতেছে না, বরং দোষত্যাগ করিয়া পরিতোষ লাভ করিতেছে। অন্য যুবতীর প্রতি আজ তাঁহার তৃষ্ণা প্রবল। তিনি আমা ব্যতীতই তাহাদের সহিত বিহার করিতেছেন। তথাপি আমার মন কৃষ্ণকে কামনা করিতেছে। আমি কি করিব ?" শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোপবালাদের লইয়া প্রেমলীলামত্ত, দূর হইতে বিরহবিধুরা শ্রীরাধা দেখেন তাঁহার কানু অন্যাসক্ত—অন্যসহবাসমত্ত। শ্রীমতীর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের, কৃষ্ণসহবাসের শত স্মৃতি জাগিয়া উঠে। মধুবনে শ্রীকৃষ্ণ সহস্র লীলা করিয়াছেন। শ্রীমতী জানেন কৃষ্ণ তাঁহারই। কিন্তু নরদেহে এই লীলা—এই লীলার পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদনায় অভিমান ও ঈর্ষ্যার বিচিত্র প্রকাশ। এই অভিমানের রসে প্রণয় মধুর হইযাছে, মানবীয হইযাছে।

রাধাকান্ত মাধবকে রাধার বিহনে সহস্র গোপীসঙ্গ আনন্দ দিতে পারিল না। তিনি অভিমানিনী শ্রীমতীর সন্ধানে বনান্তরালে উন্মাদ হইযা ঘুরিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর নিকট প্রেমাপরাধ করিয়া মানভযে ভীত হরি অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

"ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুষোমি ॥"

"ক্ষমা কর, আর কখনও এইরূপ অপরাধ করিব না। হে সুন্দরী, দর্শন দাও, বিরহযন্ত্রণায ব্যথিত হইয়াছি।"

শ্রীমতীর মানভয়ে ভীত মধুসূদন রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে আসিলে মানিনী রাধা তাঁহার প্রতি কুপিত বাক্য প্রযোগ করিলেন। তিনি অভিমান-ভরে কৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিলেন। সখিগণের প্রবোধবাক্যে কৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন কারলে মানিনীর মানভঞ্জনের অপূর্ব্ব পদ কবি জয়দেব রচনা করিয়াছেন। পদগুলির ছত্রে ছত্রে প্রেমের বিজয় নিশান উড়িতেছে—দেবত্ব লুপ্ত হইয়াছে। চিরকালের প্রেমিকাকে চিরকালের প্রেমিক মাথা নত করিয়া সাধিতেছে—

"স্মর গরলখণ্ডনম্ মম শিরসিমণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

মানভঞ্জনের ছত্রে ছত্রে মানবীয় রস উচ্ছলিত হইয়াছে।

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমণিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্।
দেহি মুখকমলমধুপানম্।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতুভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥"

জয়দেবের পর বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বৈচিত্র্য আরও কিছুদূর অগ্রসর হইযাছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সংস্কৃত পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত জনসাধারণ ও কাব্যরসিকের চিত্তে নবীন অনুভূতি জাগাইয়া দিল। এই পথে বিদ্যাপতি প্রথম পদক্ষেপ করিলেন। মানুষের মনে প্রেমানুভূতির আবেগ, বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, হাসি-কান্নার যে আবেশ সঞ্চিত হইয়া আছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সেই সনাতন হৃদযলীলার সহিত বৃন্দাবনলীলাকে সংযুক্ত করিলেন। ইঁহাদের পদে 'দেবতারে প্রিয করি, প্রিয়েরে দেবতা'—এই ভাবটি রসে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।(চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদের আবেদন বিশেষ গণ্ডী ছাড়াইয়া মানবের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।)

বিদ্যাপতি

(রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেম, ভক্তির যবনিকাকে অনবগুণ্ঠিত করিয়া বিদ্যাপতির পদে এক নূতন ভাবে, নূতন আবেগে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিযাছে। বাস্তব পরিবেশ, বাস্তব অনুভূতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন করিযাছে।)

বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্যপিযাসী শিল্পীর মুগ্ধদৃষ্টিতে লীলাময়ী রাধার চিত্র আঁকিযাছেন—দেহের প্রতিটি রেখার বর্ণনা একটি চিরন্তনী প্রেমোদ্বেলা কিশোরীকে মনে পড়াইয়া—প্রেমপ্রৌঢ়া শাশ্বত রসিকা চিত্তবল্লভা রাধার দেবীত্বকে বিস্মৃত করাইয়া দেয়। বিদ্যাপতির রাধা সর্ব্বত্র বৃন্দাবনের রাধা নন। শাশ্বতকালের কলাকুতূহল-পূর্ণা রহস্যময়ী নায়িকা রাধিকার অন্তরালে উঁকি দেয়।

বর্ণনা

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি পড়িতে পড়িতে উদ্ভিন্ন যৌবনা, সলজ্জা কিশোরীর রূপের চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

"খেলত ন খেলত, লোক দেখি।
হেরত ন হেরত সহচরি-মাঝ॥"
"খনে খন নয়ন কোণ অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই॥

খনে খন দশনক ছটাছট হাস।
খনে খন অধর-আগে করু বাস ॥"

পরস্পর পরস্পরের রূপ দেখিয়াছে। হৃদযে রূপতৃষ্ণা জাগিযাছে, নযনে দেখার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই।

"সজনি ভাল কএ পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদযে শেল দেই গেল ॥"

এখানে রূপ দর্শনে দেহকামনার ইঙ্গিত, সম্ভোগেচ্ছা মানবীয অনুভূতির স্পর্শ আনিযা দিযাছে।

"উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পযোধর হেরু।
পবন-পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু ॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়াযব
টুটব বিরহক ওব।
চরণে যাবক হৃদয-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর।"

"কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে ভেল এত পরমাদ ॥
তব ধরি অবোধি মুগধি হাম নারি।
কি কহি কি শুনি কিছু বুঝই না পারি ॥
শাঙন ঘন সম ঝরু দুনযান।
অবিরত ধস্ ধস্ করযে পরাণ ॥"

হরি বিরহে শ্রীমতীর বিচ্ছেদবেদনা বিদ্যাপতির পদে যেমনই করুণ তেমনই বাস্তব। একজনের অভাব আর একজনকে সংসারে এমনই করিয়া শূন্য করিযা দেয়।

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল ॥
গোকুল উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল ॥"

"শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥"

রাধা কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মর্ত্ত্যের মানবীর মতই কর্ম্মফলকে দায়ী করিয়াছেন—বিরহের মধ্যে স্বর্গের ঐশ্বর্য্যভাব নাই, মর্ত্ত্যের দীনতা আছে। যে প্রিয়ের গর্ব্বে রাধা কাহাকেও গণ্য করেন নাই সেই প্রিয়ের উপেক্ষায় সকলের করুণার পাত্র হইয়াছেন, জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছে।

"পিযাক গরবে হম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিযাক দোখ নহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিযা আন দেশে গেলা।
পিযা বিনে পাজর ঝাঁঝর ভেলা॥"

বিদ্যাপতির মান পদগুলিতেও এই অনুভূতি অতি গভীর। অন্যাসক্ত নাযকের প্রতি কুপিতা মানিনী নাযিকার কোপবাক্য যেমনই মধুর তেমনই অনুভূতিশীল।

"সখি হে, না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ
ঐছন কুটিল কান॥
* * *
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাকর বচনে যাই।
হৃদয মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই॥"

বিদ্যাপতির মিলন-পদে নবোঢ়ার প্রথম মিলন ভীতি, প্রেমিকের প্রথম মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, মিলনের জন্য হৃদযে তীব্র কামনা এবং লজ্জার দ্বন্দ্ব বিদ্যাপতির বর্ণনায বাস্তব হইযা উঠিযাছে।

"পিয়া হিয়া হরষি ধরল নিজপাণি।
পরশিতে বালি মলিন ভই গেলি॥
* * *

নহি নহি কহ নয়নে ঝরু লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গিতে নীবিবন্ধ বিহু খোলি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোযত থরথব কাঁপে॥"

রবীন্দ্রনাথের কথায বলিতে হয—"বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। দূরে সহাস্যে সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল এক একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।...লজ্জায ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।"

(বিদ্যাপতির রাধার প্রেম কবির সহানুভূতিনিষেকে সিক্ত হইয়া পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর প্রভৃতির মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ মানবীয় হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদেও মানবিকতা উপাদানের অভাব নাই। মানবীয় সহানুভূতির প্রাচুর্য্যের ফলে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র প্রাণবন্ত হইয়াছে। ভক্তিরসের

চণ্ডীদাস

গোমুখীগর্ভে চণ্ডীদাসের প্রেম-মন্দাকিনীর জন্ম—তাহার বাণী শুদ্ধমাত্র ধর্ম্মসাহিত্য নহে, তাহার অনেকটাই সার্ব্বভৌম সাহিত্যের নিকষে অম্লানরেখ। পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই—যে ভালবাসা পার্থিব সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দুরাশায় আত্মবিসর্জ্জন করে—লোকলজ্জা, কুলসম্ভ্রম, আত্মীয়গঞ্জনা সকলই যাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়—চণ্ডীদাস পৃথিবীতে সেই ভালবাসাকেই তাঁহার পদাবলীতে রূপ দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁহারা রক্তমাংসে গঠিত মানুষ।

সাধারণ রসগ্রাহী পাঠকের কাছে চণ্ডীদাসের পদের রহস্যমণ্ডিত কাব্যের দিকটিই প্রধান এবং এদিক দিয়া তাঁহার পদাবলী রোমান্টিক প্রেমকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্র আছে, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যায়, মুগ্ধা নায়িকা তাহার প্রিয়তমের প্রেমে ও স্বপ্নে বিভোর।)

"আগো রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

* * *

চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।"

সে তাহার প্রিয়তমকে যমুনায় জল আনিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে—সেই দর্শনের ফলে সংসারের সকল আকর্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে। সংসার, সমাজ, সংস্কার, গুরুজনের রক্তচক্ষু, আত্মীয় অনাত্মীযের নিন্দা, তিরস্কার, লোকলজ্জা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সকলই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।"

অহোরাত্র কৃষ্ণচিন্তা রাধাকে পাইযা বসিযাছে। স্বপ্নেও শ্রীরাধা পরমবাঞ্ছিতের স্পর্শ পান, মিলনের বাসনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। শ্রীরাধার স্বপ্নদর্শন পুরাপুরি মানবীয় রসের পুষ্টিসাধন করিযাছে।

"পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়ে শিযর পাশে।

* * *

শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥

* * *

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল কোলে।

* * *

পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা॥"

মিলনেও বিচ্ছেদের ভয় জাগিয়া থাকে। বিচ্ছেদে অসহনীয় দুঃখ, মিলনেও চির অতৃপ্তি। এই প্রেম যেন বিষামৃত। তাই চণ্ডীদাসের রাধার মিলনেও

সুখ নাই, বিরহের ব্যথা মিলনের মাঝেও হৃদযকে আকুল করে।

"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিযা।"

"আমি যাই যাই বলি' বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥
পদ আধ যায পিয়া চাহে পালটিযা।
বযান নিরখে কত কাতর হইযা ॥
করে কর ধরি পিযা শপতি দেই মোরে।
পুন দরশন লাগি' কত চাটু বোলে ॥"

প্রেমের এমনই খেলা ঘটিযা থাকে। মিলনান্তে পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতিটুকু চাই, মিলনান্তে বিচ্ছেদের ভযে নযন জলে ভরিযা আসে, যাই যাই করিযাও যাওয়া হয না, পা বাধিযা যায।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা মান কবিযাছেন। অন্যাসক্ত কানুকে শ্লেষ মধুব বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন। এই কুপিত বাক্য অভিমানে স্ফুরিতাধরা মানিনী প্রেয়সীকে মনে করাইযা দেয।

"নযনের কাজব বযানে লেগেছে—
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিযা ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল ॥

* * *

সিন্দুবের দাগ আছে সর্ব্ব গায
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল ঝামরু হযেছে
মলিন হযেছে দেহ।
কোন রসবতী পাঞা সুধানিধি
নিঙাড়ি লযেছে সেহ ॥"

শ্রীরাধা প্রেমের দুঃখ পাইযাছেন। কৃষ্ণ তাঁহার একান্তভাবে হয় নাই, আবার প্রতিবেশী এবং গৃহবাসী আত্মীয়ের গঞ্জনা জীবন যন্ত্রণাময করিয়াছে।

"জ্বালার উপর জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হইল বিমুখ ননদি হৈল বৈরী ॥

গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি হবে উপায়॥"

চণ্ডীদাসের অমৃত মধুর পদাবলী স্বর্গীয় রসে অভিসিক্ত, কিন্তু তাহার মধ্যে বাস্তব অনুভূতি এবং মানবীয় রস ওতোপ্রোত হইয়া আছে। চণ্ডীদাসের "পদাবলী যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের হাতে অক্ষয়মিলনের চিহ্নস্বরূপ এক রাগরক্ত রাখীবন্ধন পরাইয়া দিয়াছে।" নান্নুরের কবির কণ্ঠে মানুষের মহিমাগান ধ্বনিত হইয়াছে। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যে ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে। প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ আশ্রয় করিয়া প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। এই পদগুলিতে নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের আদর্শ কতখানি হইতে পারে তাহা কবি দেখাইয়াছেন। পদগুলিতে মানুষের প্রেমের ও মিলনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রাণচঞ্চল পদগুলি মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতা ও হৃদয়াবেগসম্পন্ন। এই কাব্যই মহাপ্রভুকে রাগানুমার্গে গোপীভাবে উপাসনা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত করে। মহাপ্রভু পরবর্ত্তীকালে তাঁহার জীবনাদর্শ ও প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে অসংখ্য কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। পদগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচুর আছে, কিন্তু নায়ক-নায়িকাকে রক্তমাংসের মানুষ বলিয়াই মনে হয়।

মহাপ্রভুর প্রভাব

মহাপ্রভু যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন সেখানে মানুষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভগবান বিচিত্র রূপে যুগে যুগে ধরণীতে আসিয়াছেন। নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাই কৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এই রূপে তিনি বৃন্দাবনে যে প্রেমলীলা করিয়াছেন, স্বয়ং লক্ষ্মী গোপীরূপে সেই প্রেমের অংশী হইতে চাইয়াছিলেন।

নরলীলার শ্রেষ্ঠত্ব

"তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।

তিঁহো এ মাধুর্য্য লোভে, গড়ি সব কাম ভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥"
(চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা)

কর্ম্ম, যোগ, তপস্যা, জপ, ধ্যান, জ্ঞান সকলই মহাপ্রভু প্রেমমার্গের সাধনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। হৃদয়ের আর্ত্তি, প্রেমের ব্যাকুলতা সাক্ষাৎভাবে মানুষকে সহজ পথে চির আনন্দময় দেশে পৌঁছাইয়া দেয়। এই প্রেমের সাধনা মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

"কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি জপজ্ঞান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥" (চৈঃ চঃ)

বলরামদাস

বলরামদাসের পদে শ্রীমতী কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া বিহ্বলা ও বিকলা হইয়াছেন। স্বপনে, জাগরণে, অহর্নিশ কৃষ্ণের রূপ তাঁহার দুই নয়ন ভরিয়া আছে, হৃদয়ে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, একটা প্রচণ্ড তৃষ্ণার বেদনা জাগিয়াছে।

"মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
* * *
চঞ্চল নয়নকোণে জাতিকুল নাশে।
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গী ॥
* * *
পরাণ যেমন করে কি কহব তায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাসে বলে অবশ পরসে ॥"

বলরামদাসের পূর্ব্বরাগের পদে রূপতৃষ্ণা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা অতি তীব্র এবং বাস্তব হইয়াছে। সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা, তীব্র হৃদয়াবেগ পদগুলিকে পুরাপুরি মানবীয় ভাব অর্পণ করিয়াছে।

"দেখিয়া ও মুখছান্দ কান্দে পূনমিক চান্দ
লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
* * * *

আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
কালা-অঙ্গে পড়িছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে— এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেনে দেখিলুঁ তারে, না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরামদাস ভণে— ও রূপ দেখিয়া কোন
পামরী রহিতে পারে ঘরে।"

প্রেম-পাগলিনী রাধা লজ্জা, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সকলই জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। মানবীয় প্রেমেও এমন উন্মত্ততা দেখিতে পাই।

বলরামদাসের আর একটি পদের পরিচয় দেওয়া হইল। মিলন অবসানে শ্রীরাধা গৃহে ফিরিবেন। সহস্র মিলনেও আকাঙ্ক্ষা যায় না—প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রেমিকযুগল বারবার ফিরিয়া দেখিতেছেন, চোখের জলে বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছে।

"পদ আধ চলত, খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি॥
* * *
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোর হি বসন ভিজায়॥"

আত্মনিবেদনের পদে শ্রীরাধা আপনার লাঞ্ছিত জীবনের দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীরাধা গৃহবধূ—লোকলজ্জা, কুলসম্ভ্রম, ধর্ম্মভয় ছাড়িয়া প্রেমে উন্মত্তা হইয়াছেন। ফলস্বরূপ আত্মীয়বর্গের অত্যাচার ও গঞ্জনা অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। এখানে বলরামদাসের বর্ণনায় পূর্ণাঙ্গ মানবীয় ভাব আরোপিত হইয়াছে।

"কাঁদিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখি লোর দেখি কয় কান্দে কানুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥

কানু নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয কাল পাট শাড়ি॥"

জ্ঞানদাসের পদে মানবীয় রস এত স্পষ্ট যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবির মানসীর কল্পনা করিযাছেন। "অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা— 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'—সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন একটি মেযে ছিল। ভালবাসার কুঁড়িধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেযে। চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেযে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস যাঁহাকে আদর্শ করিযাছিলেন তিনি নরদেহে অপার্থিব প্রেমেব লীলা দেখাইযাছেন। সেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তনু প্রেমময় মহাপ্রভুর প্রেমের লীলা দেখিযাই এই যুগের পদকর্ত্তাগণ পদ রচনা করিযাছেন।

জ্ঞানদাসের পদে আছে মানবহৃদযের চিরন্তন আকুতি, আকুল আবেদন। শ্রীরাধা বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণ করিযাছেন। তাঁহার বযঃসন্ধিমূলক পদগুলিতে কিশোরীর দেহে যৌবনেব আবির্ভাব রেখায রেখায কবি ফুটাইযা তুলিযাছেন। কিশোরীর চাঞ্চল্য বিগতপ্রায, মনে নবযৌবনেব আবেশ। বযঃকালীন নানা কৌতূহল হৃদযে চমক দিতেছে।

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হসত না হসত মুখ মুচকাই॥"
"রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥
আধ আধ চাহি নাই পদ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥"
"উলসল উরথল অব ভেল রে।
আয়ত হোয়ত নযান রে॥

* * *

হাস অধর পাশ মিলিত রে,
রতিপতি অনুবন্ধা রে।

উনথিত নিতম্ব স্খলসিত রে
ভাষা অতি ভেল মন্দা রে।"

জ্ঞানদাসের রাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভালবাসিয়াছেন। অহোরাত্রের চিন্তা রাত্রে স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়। স্বপ্নের কাহিনী এবং সম্ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটি বাস্তব চিত্র আঁকিয়া দিল।

"ঝিঁজা ঝিনিক বাজে ডাহুকী সঘনে গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥

* * *

ভুষণ ভূষণ অঙ্গ কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥"

রাধা মনের জ্বালায় প্রার্থনা করিয়াছেন তাঁহার সংসার, সমাজবন্ধন ধ্বংস হইয়া যাক।

"যত গুরু গৌরব এবে ভেল রৌরব
ঘর ভেল তপত অঙ্গার!"

রাধা সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া কানুর স্পর্শ পাইতে চায়—দেহের প্রতি রক্তকণায় কৃষ্ণমিলনের তীব্র কামনা।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া নাহি কান্ধে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

শ্রীরাধা প্রেমে সংসারধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়াছেন। প্রেমের মূল্য দিতে গিয়া তিনি অবিরাম লাঞ্ছিত হইতেছেন। লোকনিন্দা ও আত্মীয়পরিজনের দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্ব্যবহার জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিতেছে।

"ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেনে খেনে জীয়ে প্রাণ খেনে খেনে মরি ॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস করে এই বিষম পিরিতি ॥"
"কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিযা মরি ॥"

জ্ঞানদাসের রাধার প্রেম অধিকতর বাস্তব হইয়াছে যখন দেখি শ্রীরাধা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বিদীর্ণ হৃদয়ে আক্ষেপ করিতেছেন কানু অন্যাসক্ত হইয়াছেন। কানুর হৃদয়ে শ্রীরাধা প্রেম জাগাইয়াছেন, এখন সেই প্রেম অন্য নাযিকার চরণে ডালি হইয়াছে।

"বন্ধুর লাগিযা সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এখন আমার লয অন্যজন
ইহা কি পরাণে সয ॥
সই কত না রাখিব হিযা
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায
আমারি আঙ্গিনা দিযা ॥"

তথাপি শ্রীরাধা প্রেমের গভীরতায পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই কানু অন্যাসক্ত। প্রেমই সেই অন্ধত্ব দিয়াছে।

"যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ে পেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥"

জ্ঞানদাসের সকল পদই মানবীয় রসের স্পর্শ পাইয়াছে। তন্মধ্যে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি পড়িতে পড়িতে বৃন্দাবনের চির কিশোর কিশোরীকে বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়। মনে হয়, ইহা একান্তই একটি প্রেমব্যাকুলা তরুণীর মর্ম্মবেদনা।

গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ রাধার রূপ দেখিয়াছেন। তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়াছে, দেহ মিলনতৃষ্ণায় অধীর হইযাছে। রূপ দেখিয়া দেখিয়া মনের সাধ মিটিতেছে না, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেহ ফিরিয়া চলিল, মন সেখানে পড়িয়া রহিল।

গোবিন্দদাস

"সরবস লেই' পালটি' পুন বিন্ধলি
রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারি ॥
সজনি, কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল—
পালটি না হেরিলুঁ রাধা ॥"

রাধাও কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হইযাছেন। চতুর কৃষ্ণ মিলনের বিচিত্র ইঙ্গিত করিযাছেন। সেই ইঙ্গিতে রাধার দেহে মিলনের প্রবল তৃষ্ণা জাগিযা উঠিযাছে। এই পদটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একটি অপূর্ব্ব মানবীয স্পর্শ লাগিযাছে।

"মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিযে কোন্ মনোরথে আকুল
কিশলযে দলে করু দংশ ॥
অতযে সে মঝুমন জলতহি অনুখন
দোলত চপল পরাণ।"

গোবিন্দদাসের রাধার মন গৃহে নাই। সংসার, স্বামী সকলই বিষ হইযা গিযাছে।

"আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝযে
আন করত হোয আন।
জবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপতিক চান।"

গুরুজনের গঞ্জনা, স্বামীর ভৎর্সনা ও তর্জ্জন, প্রতিবেশীর নিন্দা সকলই কৃষ্ণপ্রেমের নিকট মিথ্যা হইযা গিযাছে। প্রেমের আবির্ভাবে হৃদয়াবেগ বন্যার মতই অসংবরণীয, কুলসম্ভ্রম তাঁহাকে বাঁধিতে পারিতেছে না।

"গুরুজন গঞ্জন গেহপতি তরজন
কুলবতি কুবচন ভায।

যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই
মধুর মুরলী আশোয়াস ॥
কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল
প্রেম পবনে ঘন ডোল।"

কৃষ্ণ মথুরা গেলেন, রাধা নির্ণিমেষ নয়নে তাঁহার যাত্রা দেখিলেন। তারপর শূন্য কক্ষে শূন্য শয্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন।

"শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহি পেখলুঁ নয়ন পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রয় হেরি।
শূনহি মন্দিরে আয়লুঁ ফেরি ॥
দেখ সখি নিলজ জীবন মোর।
পিরিতি জানায়ত অব ঘন রোয ॥"

(সাহিত্য মানবীয় রস ব্যতীত পূর্ণ হয় না, তাহা হৃদয়ের গভীরতম তলদেশকে স্পর্শ করে না। বৈষ্ণব সাহিত্য কেবলমাত্র রোমান্টিক প্রেমসর্ব্বস্ব হইলে তাহা যুগ যুগ ধরিয়া সকল সাহিত্য রসিককে তৃপ্তি দিতে পারিত না। মানবীয় অনুভূতি সাহিত্যের রসকে পূর্ণাঙ্গতা দান করে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদের পদে আমরা ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করি।)

(খ)

সাহিত্যের পরিবর্ত্তন

উনবিংশ শদাব্দীতে বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিল। এতদিন মানুষ তাহার ব্যক্তিগত গুণাবলী লইয়া কেবলমাত্র দেবদেবীর মহিমা প্রকাশের জন্য সাহিত্যজগতে স্থান পাইত। পাশ্চাত্য প্রভাব এই আদর্শকে পরিবর্ত্তিত করিল। প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূলে আঘাত পড়িতেই বিরোধ জাগিয়া উঠিল। এই বিরোধের ফলে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং ধর্ম্মীয় রীতি ভঙ্গ হইল।

মানুষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি

পারিপার্শ্বিকতার উর্দ্ধে মানুষ নিজেকে তুলিয়া ধরিল। তাহার স্বাধীন মতামত ও ইচ্ছা সামাজিক অধিকারের সীমাবহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইল।

জার্ম্মাণ দার্শনিক Fichte উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলনের এক ব্যাখ্যা দেন যে, মানবাত্মা অহর্নিশ গণ্ডীকে অতিক্রম করিবার জন্য প্রাণপণে দ্বন্দ্ব করিতেছে। এই ভাবধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার এক বিচিত্র সামঞ্জস্য আছে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। নারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইয়া দাঁড়াইল—তাহার স্বাধীন সত্তার বিকাশ হইল। রামমোহন, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, বেথুন, প্যারীচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি রোমান্টিক ভাব মধ্যে প্রেমের অনুভূতিকে স্থাপিত করিয়া নারীকে তাহার গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

নারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ

শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকল আহতের সেবারতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শে নবীন সেন 'কুরুক্ষেত্রে' সুভদ্রার চিত্র আঁকিয়াছেন।

পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সুরের আবির্ভাব হইল। ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—"হে পিতৃব্য! তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হেমচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে" লিখিয়াছিলেন। মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ জাগাইয়া তুলিয়াছেন। নবীনচন্দ্রও তাঁহার গীতিকবিতা এবং মহাকাব্যে এই নূতন ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে' শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন আলোচনাকালে তিনি সর্ব্বদাই ভারতের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন।

সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ

এই জাতীয়তাবাদের ধারা ক্রমে আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হইল। মানুষ তাহার আত্মাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তবেই সে দেশকে সেবা করিতে পারে। আধ্যাত্মিকতার এই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। দেশপ্রেমের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে ছাড়াইয়া উপনিষদের ঋষির মতই তিনি বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া উঠিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক আগষ্ট কোঁত প্রচার করিলেন, ঈশ্বরের আরাধনাই মানুষের পূজা। মানুষই আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ শিবরূপে জীবের সেবা, দরিদ্রনারায়ণ ব্রত এবং শ্রীঅরবিন্দের

বাসুদেব—এই মতের পোষকতা করিল। এই আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষকে দেবতার তুল্য স্বর্গীয় মনে করা হইল। বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র দেবদেবীর মহিমা জ্ঞাপনের জন্যই মানুষের প্রয়োজন আবদ্ধ রহিল না। তাহার দোষগুণ সকল কিছু লইয়াই সে ধর্ম্মগত সকল সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠিল।

রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া কাহিনী-কাব্য রচনা করিলেন। এই কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়া চিরন্তন মানবের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ তাঁহার কাব্যের অন্তর্ব্বাণী। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'কাঞ্চী-কাবেরী' প্রভৃতিতে এই পরিচয় মেলে। স্বাজাত্যবোধের মধ্য দিয়া কবির বাস্তববোধের পরিচয় পাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিপরীত সভ্যতার সংঘর্ষে দেশাত্মবোধের জাগরণ হয়। ভারতীয় সাহিত্যে রাজপুতানার চারণদের কবিতায় এই দেশাত্মবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। সমসাময়িক যুগে রঙ্গলালের কাব্যে দেশাত্মবোধের প্রভাব প্রথম দেখা দিয়াছে।

রঙ্গলাল

স্বাদেশিকতার পটভূমিকায় রঙ্গলাল রচনা করিলেন কাহিনী-কাব্য, মধুসূদন রচনা করিলেন মহাকাব্য। মাইকেল তাঁহার কাব্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখাইয়াছেন। রাবণের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা, তাহার মধ্যে রাবণের শৌর্য্যবীর্য্যের আবেদন আমাদের মনে সাড়া জাগায়। আমরা যখন মাইকেলের কাব্য পড়ি, তখন ভুলিয়া যাই এই যুদ্ধ কেবল রামরাবণের যুদ্ধ নয়, মনে হয়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কথাও এখানে বলা হইয়াছে। ঘরেরশত্রু বিভীষণের জন্য আমাদের স্বাধীনতা লক্ষ্মী বন্দিনী হইয়াছে। আর একদিকে মনে হয়, মানুষ অনন্তকাল ক্রূর অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, কিন্তু সেই নিদারুণ অদৃশ্য অদৃষ্ট চিরজয়ী হইয়া থাকিতেছে। অদৃষ্ট নিদারুণ হইলে সহোদর ভাইও পর হইয়া যায়—সংসারের সর্ব্বনাশ করে। রাবণের চিত্র সেইজন্য আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে।

মধুসূদন

মধুসূদন তাঁহার কাব্যে পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া অভিনব মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে রাম দেবতা নহেন—তিনি মানুষ। তাঁহার মহিমা মধুসূদনের কাব্যে স্থান পায় নাই। রাবণ এবং

ইন্দ্রজিতের দীপ্ত শৌর্য্য এবং মহিমা, দৈবের সহিত সংগ্রাম, আমাদের চিত্তকে দেবগণের চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর স্পর্শ করে। 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে রামের জয়লাভ অপেক্ষা রাবণের পরাজয়, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু এবং নিয়তির নির্ম্মম বিধানের নিকট পৌরুষের পরাজয় হৃদয়কে অধিকতর আন্দোলিত করে এবং নয়নকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে। রাবণের জীবনের ক্ষণিক ভুল—সীতাহরণ—দুর্ব্বিপাককে ডাকিয়া আনিয়াছে, দুর্দ্দৈব নিয়তির ক্রূর চক্রান্ত তাহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তে রাবণের জীবনের সকল কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। বিদীর্ণহৃদি পিতৃ-অন্তরের মর্ম্মান্তিক বেদনা এবং অদৃষ্টের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট মানবহৃদয়ের কারুণ্য মর্ম্মভেদী বাক্যে রাবণের বিলাপে ধ্বনিত হইয়াছে।

"হায় স্বর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূট ভরা
এ ভুজঙ্গে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক শিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে ?

* * *

কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী ;"

'মেঘনাদবধ' কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের তীব্র দুঃসাহসিকতা, সমাজকে অস্বীকার করার দুর্নিবার ইচ্ছা, উচ্চাভিলাষ—'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের একটি নবযুগ। এই নবযুগ বা বীরযুগের প্রবর্ত্তক মধুসূদন। এই যুগের মূল মন্ত্র ছিল মনুষ্যত্ববোধ। এই যুগে

হেমচন্দ্র

মধুসূদনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের কাব্যে এই মনুষ্যত্ববোধ, আত্মমর্য্যাদা, জাতীয়তামন্ত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গতানুগতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া

হেমচন্দ্র আনিলেন নবীন যুগের নবীন সুর। তাঁহার কাব্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের প্রাণস্পন্দন আমরা পাইলাম।

'বৃত্রসংহারে' দেবগণ অসুর হস্ত হইতে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। অত্যাচারীর ধ্বংস এবং জগতের মঙ্গলের জন্য দধীচি মুনি দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং দেবগণের প্রাণান্ত সংগ্রাম 'বৃত্রসংহার'কে মানবীয় স্পর্শ দিয়াছে। স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতার সুরে 'বৃত্রসংহার' ঝঙ্কৃত। হেমচন্দ্রের মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য সর্ব্বত্রই মানবিকতার মর্য্যাদা, স্বাধীনতার স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নানা বিষয়ে হেমচন্দ্র খণ্ড কবিতা লিখিয়াছেন। এই কবিতাগুলির ভিতর একটি নূতন সুর আছে। কবি প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছেন—মানুষের মনের সহিত প্রকৃতির নিবিড় অন্তরঙ্গতা যুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের জীবনের সাদৃশ্য কবি লক্ষ্য করিয়াছেন।

জাতীয়তাবোধক খণ্ড কবিতাগুলিতে স্বাধীনতার তীব্র বাসনা ফুটিয়াছে। কবির ব্যঙ্গ কবিতায় আত্মপ্রকাশ অনেকখানি আছে। দেশপ্রিয় কবি দেশের অবস্থা দেখিয়া ব্যঙ্গের অন্তরালে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

নবীন সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' রোমান্টিক গীতিকাব্য। এখানে কবি নিজের হৃদয়সমস্যার কথাই বলিয়াছেন। দেশের অতীত গৌরবের স্মৃতিও তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে।

> "হবে কি সে দিন—কে করে গণনা,
> যেই দিন দীনা ভারত-তনয়
> শিখি রণনীতি, করি বীরপণা
> রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয়ে?"

নবীন সেন

'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক কাব্য গাথায় নবীন সেন তৎকালীন জন মনের বিক্ষোভকে রূপ দিলেন। রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বাধীনতাহীনতার ক্ষোভ জানাইয়াছেন। পলাশীর মাঠে ভারতের স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত হইয়াছে। তাহার বেদনা ও ধিক্কার শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সদাজাগ্রত ছিল। নবীন সেনের কাব্যে সেই ক্ষোভ ভাষা পাইয়াছে। রাজপুত ইতিহাসের আশ্রয় না লইয়া নবীন সেন তাঁহার কাব্যে পরাধীনতার মর্ম্মবেদনা ধ্বনিত করিলেন।

নবীন সেন কাব্যে মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা গীত গাহিয়াছেন। তাঁহার

ত্রয়ীকাব্যে শ্রীকৃষ্ণের যে পরিচয় আছে, তাহা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের নহে, আদর্শ মানবের। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব—তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ভক্তি প্রেম কর্ম্মের একটি পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ—তাঁহার আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছেন।

সেই যুগে জাতিতে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে প্রবল বিভেদ চলিতেছিল। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এই ভেদাভেদ বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি ভারতবর্ষ হইতে এই বিভেদ দূর করিয়া একটা দৃঢ় ঐক্যের বন্ধনে সমগ্র দেশকে বাঁধিতে চাহিলেন। 'এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন'—ছিল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, তাঁহার স্বপ্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে এমনই এক বিবাদ চলিতেছিল। সেই জটিল সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া পুরাণের সহিত মিলাইয়া নবীন সেন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মানুষের প্রতি প্রেম—এই ত্রয়ীকাব্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই মানুষকে ভালবাসিয়া গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। সুভদ্রা—তাঁহার শিষ্যা ও ভগিনী—কুরুক্ষেত্র রণে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে আহতের সেবা করিয়া বেড়াইযাছে। নবীন সেনের কাব্যে এই মানবধর্ম্মই প্রবল হইয়া উঠিযাছে।

গীতিকবিতার প্রধান ধর্ম্ম মানুষের নিবিড় রসানুভূতিকে সংক্ষিপ্ত আয়তনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করে। এখানে কবির ব্যক্তিপুরুষের অন্তরতম প্রকাশ রসাভিব্যক্তির দ্বারা হইয়া থাকে। গীতিকবিতা কবিচিত্তের অনুভূতিকে সার্ব্বজনীন করিয়া তোলে। বৈষ্ণব কবিতায় নিবিড় রসানুভূতির পরিচয় আছে, কিন্তু সেখানে রাধাকৃষ্ণের অন্তরালে কবিচিত্ত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। বিহারীলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারায় একটি নবীন সুরের ঝঙ্কার তুলিলেন। কবির ব্যক্তিমানসের পরিচয় আমরা পাইলাম। বিহারীলাল সারদাকে অবলম্বন করিয়া গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই সারদার পরিচয় কি? তিনি সৌন্দর্য্যরূপিণী, বিশ্ববিমোহিনী মায়া—ইনিই কবির অন্তরে কাব্যলক্ষ্মী। কবি তাঁহার প্রতি নানা মনোভাব বিভিন্ন সর্গে প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারীলালের কাব্যবীণায় স্থানে স্থানে লৌকিক সুর এত স্পষ্ট ও করুণ মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে যে অনেকে মনে করেন সারদা কবির মানুষী সুন্দরী এবং প্রেয়সী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীও তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

বিহারীলাল

"হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?"

কবি তাহার উত্তরে 'সাধের আসন' রচনা করেন।

সারদা বিশ্ববিমোহিনী মায়া, বিশ্বাত্মা দেবী। ইনিই মাতা ও প্রিয়ারূপে কবিকে পালন করিতেছেন। প্রিয়ার ভালবাসায় তিনি নিখিল মানবকে ভালবাসিয়াছেন এবং আপনাকেও।

"ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।"

"নিশীথ সঙ্গীত" কবিতায় কবি হৃদয়ের গভীর প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে প্রেমের অকুণ্ঠিত প্রকাশের সঙ্গে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মিশিয়া মানবীয় হইয়া উঠিয়াছে।

'ধিক্ রে অধম ধিক্'
ভালবাসা 'প্লেটোনিক'
*　　*　　*
দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে !
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজল।"

রবীন্দ্রনাথ পুরাপুরি মানবীয় রসের কবি। তাঁহার কাব্যের বিশ্বপ্রেম এই মানবীয় সহানুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র যুগে কবির চিত্তে

রবীন্দ্রনাথ

একটা সংশয়, বিষণ্ণতার ভাব লাগিয়াছিল। কবি কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র যুগে আসিয়া কবির প্রাণ জাগিয়া উঠিল। সৃষ্টির আনন্দ-উৎসবে তিনিও অংশ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় দেখি নিখিল জীবন প্রবাহের আনন্দময় রূপটি কবির চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। উচ্ছলিত আনন্দধারায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। সংসারের জন্য, জগতের মঙ্গলের

জন্য তিনি প্রাণকে ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

"জগতে ঢালিব প্রাণ
গাহিব করুণা গান ;" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

তাঁহার হৃদয়ের বাধা অপসৃত হইয়াছে—জগতের সহিত তাঁহার হৃদয়ের মিলন হইয়াছে। পৃথিবীর মানুষের সুখ দুঃখ তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইয়াছে।

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরার আছে যত
মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।"
(প্রভাত-উৎসব)

অলস কল্পনার দিবাস্বপ্ন হইতে কবিচিত্ত মুক্তি চাহিয়াছে। তিনি সত্যকার মানব-সংসারের মাঝে জাগিয়া উঠিতে চাহিয়াছেন। আপনার কল্পনার অন্ধ কারাকক্ষ হইতে তিনি বৃহৎ জগতের আনন্দলীলারস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনাই তাঁহাকে আনন্দ দিতেছে।

"একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে!" (একাকিনী)
"একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
একা একটি বনফুল ফোটে ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।" (আদরিণী)

"রাহুর ক্ষুধা" কবিতায় প্রেমের তীব্রতা ও বাসনার ক্ষুধা দেহের নিবিড় স্পর্শ আনিয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্য কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সূচক বলা চলে। ভাব, ভাষা, ছন্দের সমন্বয় এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে। কবি কল্পনাবিলাসের মোহকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন, নিজের একান্ত দুঃখটুকু লইয়া গৃহকোণে নিরালায় বসিয়া থাকিলেন না। সংসারের সুখ দুঃখে কবি যোগ দিয়াছেন।

"মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগযুগান্তর।" (ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি)

"সংসারে ফিরিব ভুলি ছোট ছোট মুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।" (নূতন)

দেশের মূঢ়তা ও দুঃখদুর্দ্দশা কবিকে বেদনা দিয়াছে। বিশ্বসভায় বাঙ্গালার স্থান করিবার জন্য কবি ব্যস্ত হইয়াছেন—

"বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি

* * *

একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—
ঘুচে যায় অপমান।' (আহ্বান গীত)

কয়েকটি কবিতায় পূজারীর ভঙ্গিতে কবি নারীর দেহকে স্তব করিয়াছেন। প্রেমের তীব্রতার মধ্যে বাসনার আবেগ স্ফুটতর হইয়াছে। দেহ-মিলনের কামনা সকল ইন্দ্রিয়, চিত্তবৃত্তিকে মথিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"হৃদয় লুকান আছে দেহের সায়রে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহমন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

কবির আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে প্রেমকে সঙ্গী করিয়া তিনি মানবজীবনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। সংসারের সুখদুঃখকে হাসিকান্নাকে পরস্পর ভাগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কল্পনার রঙীন আকাশে মুক্তপক্ষে বিচরণ করিবেন না।

"চল দোঁহে থাকি গিয়ে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসিকান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়।" (মরীচিকা)

'মানসী' কাব্যে মানবজীবনের সুখ দুঃখের স্রোত ও মানব-হৃদয়ের অস্থির দ্বন্দ্ব ফুটিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-হৃদয়ের নিবিড় একাত্মতাযোগ সাধিত হইয়াছে। "বধূ" কবিতায় শান্ত পল্লীবালার নগরের জনতাপীড়িত রুদ্ধ কক্ষে পিতৃগৃহের জন্য বেদনা ভাষা পাইয়াছে।

'সোনার তরী' কাব্যে কবি মানবজীবনস্রোতে অবগাহন করিয়াছেন। "বর্ষা যাপন" কবিতায় কবি সংকল্প করিয়াছেন অখ্যাত জীবনের তুচ্ছ হাসি-কান্নাকে তিনি কাব্যে রূপ দিবেন। "বৈষ্ণব কবিতা"য় কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন বৈষ্ণব রসসাধনার অন্তরালে মানবজীবনলীলার তত্ত্বটি রসায়িত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি দেবতার প্রেমলীলাকে আশ্রয় করিয়া নিজের প্রেমরসোপলব্ধি গাহিয়াছেন।

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।" (বৈষ্ণবকবিতা)

"যেতে নাহি দিব" কবিতায় মানব-হৃদয়ের প্রেমের ভীরুতা ও ব্যাকুলতা কবি জলে স্থলে সর্ব্বব্যাপী দেখিয়াছেন। প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, সমগ্র জগৎ জুড়িয়া সেই বিচ্ছেদের লবণাশ্রু বহিয়া চলিয়াছে। কবি প্রগাঢ় সহানুভূতি তাঁহার নিজস্ব বিচ্ছেদ বেদনা সকল মানবের সহিত এক করিয়া দেখিয়াছেন।

"কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর,
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।'

* * *

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,

তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।" (যেতে নাহি দিব)

বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবি তাঁহার মানসসুন্দরীকে দেখিয়াছেন। অন্তরে-বাহিরে, জলে-স্থলে সর্ব্বত্র রূপের মধ্যে তাঁহার গতাগতি। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যকে সসীমভাবে মূর্ত্তিমতীরূপে কবি কামনা করিয়াছেন।

"সেই তুমি
মূর্ত্তিতে কি দিবে ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি,
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?" (মানসসুন্দরী)

"বসুন্ধরা"য় কবি জীবনরস পরিপূর্ণভাবে পান করিতে চাহিয়াছেন। মানুষের বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র জীবনযাত্রার সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন। পৃথিবীর রূপ রস সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহার ব্যাকুল পিপাসা জাগিযাছে। এই পৃথিবীর মৃত্তিকায় যুগে যুগে লক্ষ কোটি জীবনের ধারা বহিয়া গিয়াছে—সেই মৃত্তিকার সহিত কবি গভীর প্রেমে নিজেকে মিশাইযা দিতে চাহিয়াছেন।

"এই সব তরুলতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবন পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয় মাঝে;"

"মায়াবাদ", "খেলা", "বন্ধন", "গতি", "মুক্তি", "অক্ষমা", "দরিদ্রা" ও "আত্মসমর্পণ" কবিতাগুলিতে পৃথিবীর প্রতি কবির আকর্ষণ স্পষ্টতর হইযাছে।

"মানব আত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখপানে,
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর!
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে!"

'চিত্রা' কাব্যে কবি কল্পনার আবেশ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় তিনি সংসারের সকল দুঃখ, দৈন্য, কষ্টকে চোখ মেলিয়া

দেখিয়াছেন। ম্লান মূঢ় দেশবাসীর নীরব সহিষ্ণুতা তাঁহার অন্তরপুরুষকে জাগ্রত করিয়াছে—তিনি কর্ত্তব্যবিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন।

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী;

*　　　*　　　*

শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে আশা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

"পুরাতন ভৃত্য" ও "দুই বিঘা জমি" কবিতায় কবির সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিতে চির অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের তুচ্ছ কথা রসসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলিতে ত্যাগের উচ্চ আদর্শের কথা কবি গাহিয়াছেন। ইতিহাস, গাথা, জাতক ও পুরাণের বিরাট মানুষের কথা গাহিয়াছেন। এখানে মনুষ্যধর্ম্ম প্রচলিত সমাজনীতির উপর জয়ী হইয়াছে।

'নৈবেদ্য' কাব্যে কবি মানব-সমাজকে শুভ প্রেরণা, মহৎ কল্যাণবুদ্ধি যোগাইয়াছেন। দেশের মানুষকে কবি জীবনসাধনার কর্ম্মে ব্রতী হইতে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন। সমগ্র দেশব্যাপী অশিক্ষার অন্ধত্ব, যুক্তিহীন বিচারের মূঢ়তা কবিকে পদে পদে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। প্রকৃত ঈশ্বরের পূজা লুপ্ত হইয়াছে। মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারাইয়াছে। সেই মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাবোধকে জাগাইয়া ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মানুষকে অপমান করিয়া দেবতার পূজা হয় না। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়শতদলে পরমদেবতার বাস—মানুষের অপমানে দেবতা ক্ষুব্ধ হয়েন। দেবতাকে খণ্ড করিয়া ফেলিয়া আমরা অখণ্ড মানবদেবতার অপমান করি। সেই অপমানে আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা।

"ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব্ব চির পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো।" (প্রাণ)
"যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, ...
* * *
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।" (প্রার্থনা)

কবি বৈরাগ্য প্রার্থনা করেন নাই, রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় এই সংসারে থাকিয়া হৃদয়ের অমৃত পান করিযাছেন। মানবীয় প্রেমেই তিনি মোহমুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন।

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
* * *
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥" (মুক্তি)

ইউরোপীয় যুদ্ধের রণডঙ্কা, তাহার হিংস্রতা কবিকে ব্যথিত করিল। বিশ্বের মানবসংসারের সঙ্গে তাঁহার ছিল একটি গভীর একাত্মতাযোগ। মানবাত্মার নিপীড়ন, অপমান তাঁহার অন্তরে গভীর বেদনা জাগাইল। কবির হৃদয়ে সর্ব্বমানবের জন্য কল্যাণকামনা সদাজাগ্রত থাকিত। বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের তাণ্ডব, মৃত্যুর উৎসবের মধ্যে কবি বিধাতার ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদকে প্রত্যক্ষ হইতে দেখিয়াছেন। মানুষ আত্মদানে, নিদারুণ দুঃখ ভোগে মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমর জীবন লাভ করিবে।

"বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"
(ঝড়ের খেয়া)

তাজমহল শ্রেষ্ঠ, কেন না সে মানবপ্রেমের স্মারক। যুগ যুগ ধরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া সহস্র মানবের প্রেম গুঞ্জরিত হইয়াছে।

"আজ সর্ব্ব মানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।" (তাজমহল)

'মহুয়া' কাব্যে কবি বিচিত্র ছন্দে নারীবন্দনা করিয়াছেন। নারীপ্রকৃতির বিচিত্র মাধুরী নানা ছন্দে কবি "নারী" কবিতাগুলিতে ফুটাইয়াছেন।

'পলাতকা' ও 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলিতে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী কবির সহানুভূতিস্পর্শে রসায়িত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি পদের পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ শেষ হইবে। কবি অনুভব করিয়াছেন তিনি বিশ্বের সহস্র কোটি মানবের সঙ্গে একাত্ম। তাঁহার বিশেষ সত্তা নাই, মৃত্যুর পর সকল মানুষের যে পরিণাম তিনি তাহাই লাভ করিবেন।

"অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ
পুঞ্জিত তার ধূলায়
তাকে আজও স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব্ব দেহে মনে।
আমিও রেখে যাব কয মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের পরিণাম।"

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কবিতা রচনা করেন, সেই কালে বাঙ্গালা দেশে জাতীয়তাবাদের প্রচণ্ড আন্দোলন চলিযাছে। মানুষ কেবল পরাধীনতার জন্য মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে চাহে না।

সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের অধিকার, সদাজাগ্রত দেশাত্মবোধ সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়া গিয়াছে। "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" "আমরা" প্রভৃতি কবিতায় বাঙ্গালীর অতীত ঐতিহ্য গৌরবকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়া জাতিকে উদ্দীপিত করিতে চাহিয়াছেন। "গিরিরাণী", "কয়াধু" প্রভৃতি কবিতায়

নিপীড়িত মানবাত্মার অপমানের ক্ষোভ তীব্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। মৈনাক এবং প্রহ্লাদের উপর যে অত্যাচার হইযাছে তাহা যেন অসহায় লাঞ্ছিত মানুষেরই কথা। গিরিরাণী ও কযাধু বজ্রকণ্ঠে এই অত্যাচারের প্রতিবাদে জাগ্রত ঐক্যবদ্ধ মানবশক্তির নিকট প্রতিকার প্রার্থিত হইযাছে।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার "সাম্য-সাম" কাব্যে দেবতা ও ধর্ম্মের উপর মানুষকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মানুষ-দেবতার আবাহন গীত তিনি ভৈরবকণ্ঠে গাহিয়াছেন।

"মানি না গির্জ্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর
দেবতা মোদের সাম্যদেবতা, অন্তরে তাঁর ঘর ;
রাজা আমাদের বিশ্বমানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িযা তুলেছি শত অতন্দ্র করে ;" (সাম্য-সাম)

সত্যেন্দ্রনাথ নারীর মধ্যে সকল কলাবিদ্যা, সকল সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতকে প্রত্যক্ষ করিযাছেন। নারীর বন্দনাগানে তিনি হৃদযের ভক্তি উজাড করিযা দিয়াছেন।

"গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী,
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি, সে কেবল তারি, তারি।" (হোমশিখা)

কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যে বড কথা, বড আদর্শের কথা নাই। সংসারে যাহারা সাধারণ মানুষ, সমাজে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বলিযাই পরিচিত, তাহাদের মধ্যেও মহাপ্রাণ লুক্কাযিত থাকে। কবি কুমুদরঞ্জন আমাদের সেই কথাই জানাইযাছেন। তাঁহার কবিতা ক্ষুদ্র পল্লার অসংখ্য সহজ মানুষের কথা লইয়া—সেখান হইতেই কবি ভাব সংগ্রহ করিযাছেন। তাঁহার কবিতায মানবপ্রীতির রস উচ্ছলিত হইয়াছে। দরিদ্র শীতকাতর বালকের ম্লান মুখ তাঁহার চিত্তে উঁকিঝুঁকি মারে। ফলওযালী বুডি ফলের মূল্য খুঁজিযা পায নাই। তাহার সন্ধানী দৃষ্টি কবিকে অনুসরণ করিয়া চলে। নফরচন্দ্র প্রপিতামহের বিনাসর্ত্তে গৃহীত ঋণকে পরিশোধ করাকেই তীর্থভ্রমণতুল্য পুণ্যকর্ম্ম মনে করেন।

কুমুদরঞ্জন

"রেলে যেতে যেতে কবে লয়েছিনু ফল,
দিলাম পয়সা ছুঁড়ি ;
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝার
খুঁজিতে লাগিল বুড়ি।

গাড়ী চ'লে এলো, জানিনে ত' আহা,
গরিব মালিক পেলো কি না তাহা,
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি'
নামায়ে ফলের ঝুড়ি।" (পথের সাথী)

"নফরচন্দ্র সুস্থ হৃদয়ে
এতদিন পরে আজ
শুইলেন আসি আপনার সেই
পৈত্রিক গৃহমাঝ।
হাসিও না শুনি এ তীর্থ ভ্রমণ
হে পাঠক মহাশয়,
গযার পিণ্ডে পিতৃপুরুষ
এত কি তৃপ্ত হয!".

আমরা পল্লার নগণ্য বাসিন্দাকে অবজ্ঞার পাত্র ভাবিযা থাকি, কিন্তু লোকলোচনের অন্তরালে তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমা দেদীপ্যমান হইযা উঠে। কবি সেই মনুষ্যত্বের আদর্শকে পূজা করিযাছেন।

যতীন্দ্রনাথ

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদী কবি। মানবজীবনের বেদনা, বঞ্চনা, দুঃখ, জ্বালা তাঁহার কাব্যে ফেনাযিত হইযাছে। তিনি অনুভব করিযাছেন মানবীয অনুভূতি ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয না। কেবলমাত্র রসের আবেশ সাহিত্যকে ধোঁযাটে করে, সাহিত্যক্ষুধা মিটায না।

"বুঝলে কবি মানবতা বিনা
রসের সৃষ্টি চোখ ভুলান' আখর,
হৃদয-রঙের রং ফলে না যাতে
সে সব ছবি তুলির ঝাপসা আঁচড।"

ভাগীরথীর অফুরন্ত বারিধারায তিনি যুগ যুগ ধরিযা নরনারীর প্রবহমান অশ্রুধারাকে প্রত্যক্ষ করিযাছেন।

"হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী
যুগে যুগে নরনারী—অফুরাণ আঁখিবারি
পুষ্ট করি তব বাহিনী।"

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পেষিত মানবাত্মার নিঃসহায় অবস্থা কবিকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সংসারের সকল দুঃখবেদনাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান ভাবিতে পারেন নাই। কবির মতে ঈশ্বর মঙ্গলময় যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা আত্মবিস্মৃত।

"সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেল ভক্তের সভাতলে,
'ঠাকুরের, আহা! অপার করুণা' কেঁদে কেঁদে তারা বলে,
'দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায সূক্ষ্ম।'
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপর বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক।"

ভাববিলাসিতা, ক্লীবতা ও মিথ্যাচারকে কবি ধিক্কার দিযাছেন। দুঃখ বেদনা সত্য, কিন্তু দুঃখের বিলাস মিথ্যা। কবি মানবাত্মাকে সেই দুঃখবিলাসের উর্দ্ধে লইয়া যাইতে চাহেন।

"মুক্তির আশে চির ক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ—
সে জাগরণের কত যে বেদনা জানি তাহা মনে মন।"

(মুক্তিঘুম—মরুমাযা)

বৈষ্ণব কবির মতই যতীন্দ্রনাথ মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিযাছেন। প্রকৃতির উপরেও তিনি মানুষের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

"বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।

* * *

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

* * *

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবের সুখ।" (দুঃখবাদী)

মোহিতলাল

মোহিতলালের কাব্যের প্রধান আশ্রয় দেহ। ভোগবাদ ও রসপিপাসা তাঁহার কবিতায় তীব্রভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতা ও অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণকে তিনি জানিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রয়োজনকে তিনি লোলুপহস্তে নির্ম্মমভাবে

আদায় করিবেন।

"অন্ন খুটি লব মোরা কাঙালের মত
ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর—
আমরা বর্ব্বর।' (মোহমুদ্গর)

নজরুলের কবিতায় সমসাময়িক জনজাগরণের উল্লাস ঘনীভূত হইয়াছে। তিনি জনসাধারণের কাছের মানুষ। মানুষের জীবনের দুঃখ, বেদনা, জ্বালার তিনি অংশীদার ; জীবনের স্থূল কঠোর তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা নজরুল মর্ম্মে মর্ম্মে জানিয়াছিলেন। তিনি সেই বাস্তব দুঃখ, জ্বালার চারণ কবি।

নজরুল

দারিদ্র্যের অন্তরালে নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তিনি শুনিয়াছিলেন। নজরুল সেই অপমানের বন্ধন হইতে মুক্তির গান গাহিলেন। মানুষের দরবারে তিনি এই লোভ ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন—বজ্রকণ্ঠে এই অপমানকে চূর্ণ করিতে চাহিযাছেন।

"প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্ব্বনাশ।'
(আমার কৈফিয়ৎ)

সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্রের মূলে আছে মানুষের হৃদয়—এইখানেই ভগবান আসন পাতেন।

"সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেথ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম্ম সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।" (সাম্যবাদী)

নজরুল মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। লোভ ও কামনান্ধ মানুষ নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইযাছে। যাহাকে সে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে, পদদলিত করে, তাহারই অন্তরে ভগবান বাস করেন।

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি—

* * *

বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ, দুচোখে স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।"

(মানুষ)

জগদ্ব্যাপী মানুষের লাঞ্ছনার বেদনা কবির দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন মানুষের অসম্মানে মানুষের বেদনায় ভগবান জাগ্রত হইবেন। নিখিল মানবজাতি বোধশক্তি ফিরিয়া পাইবে। অত্যাচারী, লাঞ্ছনাকারীর দিন শেষ হইয়া আসিতেছে।

"এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানবজাতির লজ্জা—সকলের অপমান।
মহা মানবের মহা বেদনার আজি মহা উত্থান।"

(কুলি-মজুর)

অতি আধুনিক যুগের কবিতায় আমরা অতি সাধারণ অবহেলিত নিবন্ন মানুষের কথাই পাই। তাহাদের অচরিতার্থ কামনা, ব্যর্থতার রুদ্ধ ক্রন্দন কবিদের কাব্যে রূপ পাইয়াছে কিন্তু যথার্থ ভাষা পাইয়াছে কি না সন্দেহ। অনেক সময়ে পাশ্চাত্য অনুকরণ ও উগ্র মননশীলতা জনসাধারণের নিকট হইতে কবিদের দূরের মানুষ করিয়াছে। তাঁহাদের কাব্য-রসাস্বাদনে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হইয়াছে।

আধুনিক কবি

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আধুনিক যুগের মানুষের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খুব বেশী পাই। কবি মানুষের মধ্যেই উচ্চতর বৃত্তির মহত্তর বিকাশ দেখিয়াছেন, আবার হিংসা ও কামনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। মানুষের মধ্যে এই বিচিত্র প্রকৃতির লীলা দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়াছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"মানবীর গর্ভ হতেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খ্রীষ্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?"

কবি সকল মানুষের সঙ্গে এক হইতে চাহিয়াছেন। এতদিন কবিরা একাত্মবোধ চাহিয়াছিলেন আত্মায়, হৃদয়ে। আধুনিক কবি এক হইতে চাহিলেন কর্ম্মের অংশী হইয়া।

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের !

*　　*　　*

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,

*　　*　　*

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি আর
খাল কাটি ভাই পথ বানাই, "
(আমি কবি যত কামারের)

কবি সভ্যতার বাঁধাধরা ভদ্রতার ছকবাঁধা জীবনে ক্লান্ত হইযা উঠিয়াছেন। মানুষ কৃত্রিম ভদ্রতা ও সৌজন্যের অন্তরালে হৃদয়ের সহজাত কোমলবৃত্তি ও আনন্দকে লুপ্ত করিয়া দিতেছে। কবি আদিম বর্ব্বর জাতির মধ্যে সেই প্রাণোল্লাস, জীবনের আনন্দকে পান করিতে চাহিয়াছেন। কবিতাটির মধ্যে আরণ্য সরল উদ্দাম জীবন, তাহার আনন্দ, তাঁহার মৃত্যুহীন নির্ভয়তার সুর ঝঙ্কৃত হইযাছে।

"হে-ইতি, হা-ইতি, হা-ই !
বনপথে বিভীষিকা বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ !
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই !
হে-ইতি, হাইতি, হা-ই !

*　　*　　*

আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,

*　　*　　*

কেমন ক'রে থাকবে !
আমাদের জীবনে নেই জলন্ত মৃত্যু,
আছে শুধু স্তিমিত হ'য়ে নিভে যাওয়া,
ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা !
সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।" (নীলকণ্ঠ)

বুদ্ধদেব বস্থর কবিতায় আধুনিক সভ্যতার মানবতাহীন নিষ্ঠুরতার কথা পাই। মানুষ আজ মানুষকে নিজের সঙ্কীর্ণ লোভের তাড়নায় ক্ষুধার রজ্জুতে বন্দী করিতেছে। কবি ঘোষণা করিয়াছেন ভালবাসার অনন্ত ভাণ্ডারেও এই পাপের ক্ষমা নাই।

বুদ্ধদেব বসু

"মানুষেরে বন্দী করার পরম পাপের ক্ষমা
ভালবাসার ভাণ্ডারেতেও নেইতো জমা।"

বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী জুড়িয়া প্রচণ্ড ভাঙ্গনের তাণ্ডব চলিযাছে। পুরাতন সংস্কার, শালীনতা, নীতিজ্ঞান চূর্ণ হইযা যাইতেছে। রক্তমাংসের আদিম কামনা মানুষের অন্তর গহ্বর হইতে হিংস্র কুটিল রক্তাক্ত দশনপংক্তি বাহির করিয়া দেখাইতেছে। এই আধুনিক মনোভাবের সচেতন প্রকাশ 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে। কবির আত্মা প্রবৃত্তির কারাগারে রুদ্ধ, সুন্দর ও কল্যাণের স্পর্শ তাঁহার নিকট অতীত বস্তু—যৌবন দেহের অভিশাপ হইয়াছে। আধুনিক মানুষের প্রাণে অমৃতের জন্য দারুণ পিপাসা, কিন্তু তবুও কি-এক অজ্ঞাত অভিশাপে সেই বীভৎস কামনাগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন দিতে হয়।

"প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী কবি রচেছো আমায়—

* * *

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন" (বন্দীর বন্দনা)

"যৌবন আমার অভিশাপ।" (শাপভ্রষ্ট)

"আসঙ্গ-বাসনা পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক"

(বন্দীর বন্দনা)

কবি অনুভব করিযাছেন কামনার চরিতার্থতাই মনুষ্যত্ব নহে।

"বিধাতা, জানো না তুমি, কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।"

এই দেহের মধ্যেই কবি অমৃতের সন্ধান পাইযাছেন। পঞ্চেন্দ্রিযের সাহায্যেই তিনি রূপ রস স্পর্শ পাইয়া থাকেন। এই নরদেহকে তিনি পবিত্র বলিয়াছেন—তাহাকে আত্মার পূর্ণ অধিষ্ঠান বলিয়া মর্য্যাদা দিযাছেন।

"পবিত্র বলিয়া এই নরদেহে করেছি স্বীকার
দেহস্পর্শে উচ্ছ্বসিছে অমৃত আত্মার;" (পাপী)

বুদ্ধদেবের কাব্যে প্রিয়া সম্পূর্ণ মানবী—প্রিয়ার দেহবর্ণনায় অতি সাধারণ চলতি ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। মোহের ঘোরে না দেখিয়া কবি প্রিয়াকে

সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। প্রেমের মধ্যে আধুনিকা নারীও শোষণ দেখিতে পায়।

"হৃদযের রক্ত তব ক্ষণে-ক্ষণে করিবো শোষণ
কায়াহীন বুভুক্ষু অধরে।" (অপর্ণার শত্রু)

মানুষের প্রাত্যহিক আধুনিক জীবনযাত্রায় প্রেম নিঃশেষিত হয়, কেবল দেহগত কামনা—জৈবিক প্রযোজন মিটাইবার যন্ত্ররূপে নারী পরিণত হয়; মানুষের আত্মার সেই বিরাট অপমান নারী সহে নাই।

"চেযেছিলে প্রতিরাত্রে শয্যার সঙ্গিনী,
প্রত্যহ পরিচারিকা,
সন্তানের মাতা তব, নিপুণা গৃহিণী।
* * * প্রিয়াকে পেতে না আর ;"
(মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান)

বুদ্ধদেব আধুনিক কবি, তিনি দেহের পিপাসাকে চরম বলিতে অস্বীকার করিযাছেন, কিন্তু তাহাকে মিথ্যা বা ঘৃণিত বলেন নাই। মানুষের জীবনে দৈহিক মিলনের একটা বিশেষ প্রযোজন আছে। সেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের তীব্র আবেগ কবির কাব্যে রূপ পাইযাছে।

"বক্ষ তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনের ছাপে—
যুগ্ম সেই অগ্নিগিরি স্পর্শ ভযঙ্কর
যেখানে প্রেম মৃত্যুহীন রাত্রিদিন কাঁপে।" (বিবাহ)

জীবনানন্দ দাস

জীবনানন্দ দাসের কবিতায় আধুনিক কালের দ্বন্দ্ব বিক্ষত মানবের হৃদযের আর্তরূপ ফুটিয়াছে। নিখিল বিশ্বের দুঃখের সঙ্গে কবি হৃদযের যোগসাধন করিযাছেন।

"লভিয়াছ বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন ভাই।"
(নিখিল আমার ভাই)

জীবনের সকল কুশ্রীতা, সৌন্দর্য্যহীনতা, কামনাকে তিনি কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের মোহে স্বপ্নলোক সৃজন না করিয়া তিনি মানুষের আসল রূপটির কথাই বলিয়াছেন।

"পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের সুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালো শিরার অসুখ" (বোধ)

কবির দৃষ্টিতে দেহবোধে প্রেমের অস্তিত্ব—মানুষের এই দেহজাত প্রেম ক্ষণধর্ম্মী।

"দেহ ঝরে—ঝরে যায় মন
তার আগে।" (১৩৩৩)

আবার এই ক্ষণবাদী কবির দৃষ্টিই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। প্রেমকে তিনি জীবনের আলো বলিয়াছেন। মানুষের জন্য মানুষীর হৃদয়ে এই আলো জ্বলিয়া উঠে। প্রিয়ার দেহেও তিনি এই উত্তাপ অনুভব করিয়াছেন।

"আরো আলো মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।"
(সুরঞ্জনা)

"এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর।" (সুদর্শনা)

"মহাপৃথিবী" কাব্যে নিপীড়িত অত্যাচারিত মানবের দুঃখ ও অপমান কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কবি মানুষের আদিম লোভ ও হিংসা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"মানুষ এখনও নীল, আদিম সাপুড়ে :
রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায়নাক' তারা
খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে।"
(পরিচায়ক)

এই লোভের খোরাক যোগাইতে নিরীহ অসহায় মানুষ বলি হইতেছে। নারীর মর্য্যাদা লুণ্ঠিত, পারিবারিক জীবন বিপর্য্যস্ত, খাদ্য পরহস্তগত।

"কত ক্লান্ত জননীর মৃত্যু হ'ল রক্তে—উপেক্ষায়।"
(রক্তিম গির্জ্জার মুণ্ড)

"আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মত বিচক্ষণ,
যে কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে ;"

(সোনালি সিংহের গল্প)

"আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস।"

(সোনালি সিংহের গল্প)

৫০এর মন্বন্তরে শহরের পথে পথে মানুষ মরিয়াছে, কিন্তু সভ্যতাগর্ব্বী শহর সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য দেখাইয়াছে।

"তবুও কোথাও কোন প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে :" (বিভিন্ন কোরাস)

জীবনানন্দের কাব্যে আধুনিক মানুষের বেদনা, অপমান, বঞ্চনার কাহিনী রূপ পাইয়াছে অতি সহজ কথার মাধ্যমে। পৃথিবীতে মানুষ আজ অন্ধ, উন্মত্ত, প্রেমহীন। মানুষের হৃদয় যাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহারাই আজ পৃথিবীর কর্ত্তা। মানুষকে আজ যারা ভালবাসিতে চায় তারা অপমানিত হয়, লাঞ্ছিত হয়। মানুষের জন্য, এই মনুষ্যত্ববোধহীনতার জন্য কবির কণ্ঠে আর্ত্ত ক্রন্দন-ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেযালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

আধুনিক যুগের দুঃখ ও নৈরাশ্যবাদ রূপক প্রতীকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ পাইয়াছে। আধুনিক যুগের মানুষ নিজের ধ্বংস বিষয়ে জানিয়াও চক্ষু

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বুজিয়া থাকে, বর্ত্তমানের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ভবিষ্যতকে ভুলিতে চাহে। মানুষের জীবনে আজ সমস্যা ও ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রধান হইয়াছে। সমাজ ও জীবন এই

প্রচণ্ড ক্ষুধার খোরাক যোগাইতে গিয়া প্রাণক্ষয় করিতেছে।

"মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুখায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ। (নরক)

* * *

যন্ত্রণাই জীবনে একান্ত সত্য, তারি নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥"

আজিকার মানুষ চারিপার্শ্বের অবিশ্বাস ও বঞ্চনা দেখিয়া মনুষ্যধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছে।

"বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃত্তি দেখে, মনুষ্যধর্ম্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী" (যযাতি)

কবি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রলয়ের মেঘকে ঘনীভূত দেখিয়াছেন। মানুষে মানুষে হানাহানি, লোভ, হিংসা পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

"পৃথিবী অনাথ ; যথেচ্ছ পরমাণু
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে॥" (প্রতীক্ষা)

বিষ্ণু দে আত্মসচেতন কবি। পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

"আমাদের কাজ পদে পদে আপন পরের বাহির ঘরের
নতুন নতুন মীড় আমাদের মুক্তি নেই সাপের একক স্বর্গে
আমরা মানুষ" (সন্দীপের চর)

বিষ্ণু দে

আধুনিক যুগের ক্লান্তি, দৈন্য, সমস্যাক্রান্ত উদ্দেশ্যহীন জীবনের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত বিষ্ণু দে দেখিয়াছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা এবং জীবনের জটিলতার ভারক্লিষ্ট মানুষের কথা তিনি "চোরাবালিতে" বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু রূপটি কবির চোখে ধরা পড়িয়াছে।

"সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুঠি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাস প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পনৃজ্-হাতে।" (জন্মাষ্টমী)

এই রুগ্ন জীর্ণ সভ্যতার সৃষ্টি আধুনিক নরনারীও অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু কবি

ইহাকে সত্য ও মানুষের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি নূতন পৃথিবীর গান গাহিয়াছেন যেখানে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্ববোধের স্বর্গলোক রচিত হইবে।

"আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রূর মৃত্যুদেশে
সীমান্তরেখার আশা,

* * *

নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায
ছাড়পত্র নতুন ভাষায নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।"

(অন্বিষ্ট)

কবি চাহিযাছেন সংহতি—জীবনে মানবিকতাবোধকে, সুন্দরকে আনিতে চাহিয়াছেন।

"আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্য্যাস্তে ও সূর্যোদযে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবন ছড়াযে
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।" (অন্বিষ্ট)

মানুষের মধ্যে একতা আসিবে, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে চূর্ণ করা হইবে না।

"এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক
সোহংকামযত দ্বিতীযো মে আত্মা জাযেতেতি॥" (বহুবড়বা)

আধুনিক কবি সমর সেনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ধ্বনিত হইয়াছে নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনাভিলাষী মানুষের উদ্দেশ্যে। একদিকে দৈন্য-দুঃখ পীড়িত সর্ব্বহারা মানুষ বেদনার অশ্রুতে ধরণী প্লাবিত করে অন্যদিকে মানুষ নিরুদ্বেগে নিষ্কম্পচিত্তে সংসার ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে থাকে।

সমর সেন

"বর্ষাকালে
অনেক দেশে যখন অজস্র ঘর বাড়ি ভাঙবে,
ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ

* * *

তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস
ফিরে যাবে তুমি বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।" (মেঘদূত)

আধুনিক কালের মনোভঙ্গ, ক্লান্তি ও বিষাদ সমর সেনের কবিতায় রূপ পাইয়াছে।

"মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মত উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে" (একটি বেকার প্রেমিক)

গ্রামের যে ছবি আমাদের মনে আছে, আধুনিক কবি তাহার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া দেন। গ্রামের জীবন আজ নিরুত্তাপ, অতি গতানুগতিক, কোনক্রমে দিনযাপনের চেষ্টায় পর্য্যবসিত।

"রাত্রে কাণ পেতে শোন বাঁশবনে মশার গান ;
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গোরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে ;" (নিরালা)

বৈষ্ণব কাব্যের যুগ হইতে অতি আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত কাব্যের আলোচনায় দেখা গেল কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দের বহিরঙ্গমূলক নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যুগের সঙ্গে কবিতা তাহার রূপ পাল্টাইয়াছে। কিন্তু অন্তরঙ্গে কবিতার মূল ভাবটি এক রহিয়া গিয়াছে। মানুষের রচিত কাব্য একান্তই মানবীয। এই মানবীয রসের আবেদন হৃদযে পৌঁছাইলে চিত্তকে তাহা আলোড়িত করিয়া তোলে। এই মানবীয রস ব্যতীত কাব্য হৃদযে স্পন্দন জাগাইতে পারে না।

(গ)

উপন্যাসের জন্ম আধুনিক যুগে। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়া উঠার সঙ্গে সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব। মানুষ দৈবকে ছাড়িয়া মানুষের সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিল। অতিমানুষ বা দেবতা নায়ক না হইয়া সাধারণ মানুষ তাহার জীবনের সুখদুঃখ লইয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথা সাহিত্যরসের উপাদান হইল। উপন্যাসের কার্য্য হইল অতি সামান্য লোকের দৈনিক জীবন লিপিবদ্ধ করা এবং মানুষের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা ফুটাইয়া তোলা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রধান চিন্তা ছিল জাতীয়তাবোধ।

পরাধীনতার জ্বালা এবং স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাক্যে যেমন রূপ পাইয়াছে, উপন্যাসেও তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের আর একদিকের চিত্র আমরা পাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সমাজে একদল শিক্ষিত যুবক উচ্ছৃঙ্খল স্রোতের বেগে দেশীয় সকল সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া পতঙ্গের মত পশ্চিমী সভ্যতার অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছে। একদিকে পরিবারে পরিবারে বিদ্রোহ, অপর দিকে সনাতন রক্ষণশীল আচারপন্থী বিমূঢ় অভিভাবকগণ। নূতন পুরাতনের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ উপন্যাসের চিত্রপটে গভীরতর বর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল।

বঙ্কিমচন্দ্র

এইযুগে গদ্যসাহিত্য বা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আক্রমণ সমাজের মূল ধরিয়া নাড়া দিল—দেশীয় যাহা কিছু এই বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে ছিল স্বদেশের জন্য গভীর প্রেম। তিনি এই প্রেমের দৃষ্টিতে সমাজের ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়াছিলেন। দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা তাঁহাকে এই দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিল। সকল যুগে সাহিত্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে মানুষ। বঙ্কিমও সাহিত্যে এই মনুষ্যত্বের আদর্শ গাহিয়াছেন। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা, মানুষের মহিমা গানই তাঁহার সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। যুগসঙ্কট তাঁহার প্রতিভাকে জাগ্রত করিল। মানুষের গভীরতম দুর্দ্দশা তাঁহাকে বিচলিত করিল। মানুষের ব্যক্তিরূপের সহিত সার্ব্বভৌমরূপকে যুক্ত করিয়া তিনি চিরন্তন মানুষের কথা বলিলেন। মানুষের পূজা মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান বঙ্কিমের সাহিত্যের মূলমন্ত্র। বঙ্কিমের অন্তরে বাস করিত একটি দরদী কবিপ্রাণ। মানুষে মানুষে গভীর প্রেমে, নিবিড় সহানুভূতিতে সেই পরিচয় সাহিত্যের পাতায় লিখিত হইয়াছে। তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন সামাজিক আইন মানুষকে কতখানি পিষিয়া মারে। কুন্দ নগেন্দ্রকে তাহার তরুণ হৃদয়ের সব মধুটুকু দিয়া ভালবাসিল। কুন্দের মৃত্যু হইয়াছে—সে অন্ধের মত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছে, পতঙ্গের মত তাহার জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সেই অসহায় নিষ্পেষিত জীবনের কথা আমাদের হৃদয়ে তুফান তুলিয়াছে। কুন্দের মৃত্যুতে সূর্য্যমুখী বলিয়াছে—"ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপ স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।" মানুষের প্রতি গভীর প্রেম—

অসীম করুণা বলেই বঙ্কিম কুন্দকে সম্মানের সিংহাসনে বসাইয়াছেন। কুন্দের প্রেমকে লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সকল আদর্শবাদ সত্ত্বেও মানুষের জীবনকে, তাহার হৃদয়কে স্বীকার করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র অতি কুচরিত্র প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তাহার এই অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এই অতি দুঃশীল মানুষটির জীবনের করুণ দিকটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মুখরা কুরূপা স্ত্রী তাহার জীবনে অশান্তির প্রবাহ আনিয়াছে। সেই অশান্তি এবং অতৃপ্ত কামনা তাহাকে পাপের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাস। পাত্রপাত্রী এখানে ঘরের মানুষ, কাছের লোক বলিয়া সহজে মনে হয় না। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম, ওসমানের ঈর্ষ্যানল, আযেষার গাম্ভীর্য্য এবং উদ্বেলিত প্রেম, বিমলার প্রতিহিংসা—সকলই যেন চিত্রপরম্পরা ঘটিয়া যায়। তাহারা মানুষ হইয়াও রক্তমাংসের স্পর্শ হইতে দূরে থাকিযাছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুর জেবুন্নিসার ঈর্ষ্যা ও প্রণয়, চঞ্চলকুমারীর ভাগ্য লইয়া বিধাতার লীলা—সকলই যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে অতিক্রম করিয়া গেছে। দিল্লীর ঐশ্বর্য্য, রাজপুত শস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, মোগল বাহিনীর বিরাট সমারোহ আমাদের চক্ষুকে বিস্মিত করে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ, তাহার দৈনন্দিন সুখদুঃখের কাহিনী এক একবার ঝলক দিয়া যায় মাত্র।

'কপালকুণ্ডলা'য রোমান্স রসেরই প্রাধান্য—ইতিহাস এখানে তাহার বিশাল দেহকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইযাছে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিপালিতা, সামাজিক সকল সম্বন্ধের উর্দ্ধে সে মানুষ হইয়াছে। বিভীষণ কাপালিকের পালিতা কন্যা হইয়া এবং তন্ত্রের ভয়াল কার্য্যাবলী দেখিয়াও তাহার মধুর প্রকৃতি বিকৃত ও রুক্ষ হয় নাই। মানবীসুলভ কোমল বৃত্তি দয়ামায়া প্রভৃতি তাহার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল। নবকুমারকে সে এই মানুষী করুণা বলেই রক্ষা করিয়াছিল।

লুৎফার মধ্যে মানবীর আর এক চিত্র। সে ভ্রামরীবৃত্তিপরায়ণা। নবকুমারের রূপ তাহার তৃষ্ণা জাগাইল—ঈর্ষ্যা ফণা তুলিয়া ধরিল। তন্ত্রসাধক কাপালিকের ভয়াল ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ মানসে সে কপালকুণ্ডলার

পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাহার বৃত্তি তাহাকে দুর্ব্বল মানুষের স্তরে নামাইয়া আনিয়াছে। শ্যামার স্বামীপ্রেমাকর্ষণের চেষ্টার মধ্যে কৌলীন্য প্রথার দ্বারা নিষ্পেষিত সেযুগের অসহায় নারীর কথা আমরা পাই।

'চন্দ্রশেখর'ও রোমান্টিক ও ইতিহাসমূলক উপন্যাস। কিন্তু এখানে ইতিহাস ও রোমান্সের আবরণী সরাইয়া মানুষের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রশেখরের পাণ্ডিত্যের, ব্রাহ্মণত্বের আবরণ শৈবলিনীর গৃহত্যাগে এক মুহূর্ত্তে ফাটিয়া বাহির হইল। মানুষ চন্দ্রশেখর, বিবহী প্রেমিক চন্দ্রশেখর হৃদয়ের রক্ততুল্য সকল পুঁথি শৈবলিনীর গৃহত্যাগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। জিতেন্দ্রিয় প্রতাপের মৃত্যুকালে ষোড়শ বৎসরের সুগুপ্ত প্রেম বজ্রনিনাদে ঘোষিত হইয়াছে। শৈবলিনীকে সে সযত্নে পরিহার করিয়াছে, তাহাকে পাপীয়সী বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছে, কিন্তু প্রতাপ রক্তমাংসে গঠিত মানুষ—তাই বাল্যপ্রেম তাহার হৃদযের অন্তস্তল ভেদ করিযা জগতের সম্মুখে বাহিরে আসিযাছে। শৈবলিনীর চিত্র একদিকে কুলত্যাগিনী পাপীযসীর—আর একদিকে তাহার চরিত্রের একটি করুণ ব্যর্থতার চিত্র। সে প্রতাপ পাখীকে ধরিবার হাস্যকর চেষ্টায গৃহত্যাগ করিযাছে, কিন্তু সেই প্রতাপই তাহাকে অস্বীকার করিযাছে। উপর্য্যুপরি ঘটনাস্রোত তাহার চিত্তে একটা বিপুল আলোড়ন আনিযা দিযাছে। তাহার মনোরাজ্যে গভীর বিপ্লবের এবং রামানন্দ স্বামীর যৌগিক প্রযোগে চিত্তের বিস্তারিত পরিবর্ত্তনের সংবাদ আমরা পাই। কিন্তু এতবড় আযোজনেও হৃদয হইতে প্রতাপের স্মৃতি মুছিল কই? প্রতাপকে সে তাহার সহিত জীবনে দেখা করিতে নিষেধ করিল কেন? প্রতাপকে দেখিলে তাহার দুর্ব্বল মানবচিত্ত আত্মসংযমে অক্ষম হইবে।

দলনীর মৃত্যুতে নবাবের অনুতাপের বুকফাটা আর্ত্তনাদ মানুষের ভুলের মাশুল গণনা দেখাইযা দেয়। নবাবী পরিচ্ছদের অন্তরালে মানুষের হৃদয় নামক বস্তুটির বড় নিকট স্পর্শ পাওযা যায।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুরাপুরি সামাজিক উপন্যাস। রোহিণীর অতৃপ্ত কামনা গোবিন্দলালের সংসার জ্বালাইযাছে। বঞ্চিতা রোহিণীর জীবনের পরিণামের বহু নিন্দা পরিবাদ আধুনিককালে হইযাছে। কিন্তু রোহিণী যাহা করিয়াছিল তাহা কি মানবধর্ম্মোচিত? ইহাকে মানুষ কোন দিনই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবিতে পারে না। কুন্দের জন্য বঙ্কিমের অকৃপণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু রোহিণী ভ্রামরীবৃত্তিপরায়ণা। সে গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করিযাছে,

ভ্রমরের প্রেমপূর্ণ একটি কুসুমিত হৃদয়কে দলিত করিয়াছে, পুনরায় নিশানাথের রূপে সে মুগ্ধা হইয়াছে। হৃদয়ে হৃদয়ে মধু সন্ধান করাই তাহার বৃত্তি। বঙ্কিম মানব-হৃদয়ের এত বড় অধোগতি সহ্য করিতে পারেন নাই। কুন্দের সঙ্গে রোহিণীর ঐখানেই তফাৎ। প্রেমবিহ্বলা, গোবিন্দলালের আদরিণী ভ্রমর একান্তপ্রাণ স্বামীকে রোহিণীর প্রতি আসক্ত দেখিল—অভিমানজর্জ্জর হৃদয়ে সে স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিল। ভ্রমরের দুর্জ্জয় মান উভয়ের মধ্যে অগাধ বিচ্ছেদ রচনা করিল। ভ্রমরের পক্ষে অভিমান স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, যদিও তাহা গোবিন্দলালের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ভ্রমর তিলে তিলে শুকাইয়া গিয়াছে মনের অসহ্য দহন জ্বালায়। তাহার গভীর কৃষ্ণ আয়ত নেত্রের অশ্রুবিন্দু গোবিন্দলাল ও রোহিণীর পথকে পিচ্ছিলতর করিয়াছে—তাহার দীর্ঘশ্বাস উহাদের বিলাসকক্ষের বায়ুকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে।

গোবিন্দলালের স্বহস্তে রোহিণীর হত্যা—ইহাও মানব-হৃদয়ের প্রচণ্ড ঘৃণার রূপ। যাহার জন্য সে একান্তহৃদি স্ত্রী, সমাজ, সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত রূপ তাহার অন্তরে ক্রোধাগ্নির জ্বালা সৃষ্টি করিয়াছে।

'রজনী' উপন্যাস মানব-হৃদয়ের গোপন কক্ষের কাহিনী—সেখানে প্রেম লুক্কায়িত থাকে সামাজিক কর্ত্তব্যের অন্তরালে। লবঙ্গ বৃদ্ধ স্বামীকে কায়মনে ভালবাসে, সেবা করে। অমরনাথকে স্বহস্তে শাস্তি দিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে এক প্রচণ্ড প্রেম লুক্কায়িত ছিল। অমরনাথের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছিল ইহলোকে স্বামী ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষের চিন্তা সে করে না, তিনি মহাদেব হইলেও নয়। কিন্তু অমরনাথের "পরলোকে" প্রশ্নের উত্তরে সকল সামাজিক কর্ত্তব্যের আবরণ ভেদ করিয়া উত্তর আসিল তাহার হৃদয় দুর্ব্বল, সে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে বঙ্কিম জীবনে প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রফুল্লর দেবীচৌধুরাণী-গিরি ও ভবানী পাঠকের সকল শিক্ষার অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়াছে একটি স্বামীপ্রেমবিধুরা নারী হৃদয়। ভবানী পাঠকের নিষেধ অমান্য করিয়া সে একাদশীতে মাছ খাইত স্বামীর কল্যাণের জন্য। অহর্নিশ স্বামীগৃহ তাহার হৃদয়কে টানিয়াছে। রাণীগিরি তাহার মুহূর্ত্তের জন্য ভাল লাগে নাই। শেষ পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে—স্বামীগৃহে পূর্ণ মর্য্যাদায় তাহার অধিষ্ঠান হইয়াছে।

'সীতারাম' উপন্যাসে শ্রী একদিন স্বামীর প্রেমে জগৎ ভুলিয়াছিল—

স্বামীর কল্যাণের জন্য সে সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু বৈদান্তিকা জয়ন্তী তাহাকে হৃদয়ধর্ম্মহীনা শুষ্ক সন্ন্যাসিনীতে পরিণত করিল। সীতারামের প্রাণপূর্ণ মানবীয় আবেদন তাহার পদপ্রান্তে বারবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মানবীয় সহানুভূতির অভাব সীতারামকে হিংস্র ক্ষিপ্ত পশুতে পরিণত করিয়াছে ও রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বহির্জগতের রোমান্স বিশেষ স্থান পায় নাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব লেখক বিশ্লেষণ করিয়া গেছেন। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কমলা ও রমেশের মধ্যে একটি বিচিত্র জটিল সম্পর্ক গড়িয়া উঠিছিল। রমেশের নিকট হইতে কমলা তাহার প্রাপ্য স্নেহ পায় নাই। তাহার হৃদয় স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। রমেশের পত্রে নিজের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া কমলার অন্তরে বজ্রপাত ঘটিয়া গেল। তাহার প্রেমভিক্ষু হৃদয় স্বভাবতঃই রমেশের নিকট হইতে ঠেকিয়া প্রবলবেগে স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। দুটি স্রোত তাহাকে একমুখে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। একটি রমেশের সদাসঙ্কুচিত ব্যবহার, দ্বিতীয়টি হিন্দুনারীর যুগসঞ্চিত স্বামীপ্রেমের সংস্কার। অদৃষ্টচক্রের ক্রূর আবর্ত্তনে কমলার নারীহৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে—সকল বাধাকে ঠেলিয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রাণপণ ছুটিয়া গিয়াছে। অন্নদাবাবু স্নেহকাতর পিতৃহৃদয়ের এক মধুর চিত্র। ঈর্ষ্যাকাতর অক্ষয় রমেশের বিরুদ্ধে অন্নদাবাবু, যোগেন্দ্র ও হেমনলিনীর মন চালিত করিতে চাহিয়াছে। হেমনলিনীর প্রেমকে লাভ করার জন্য তাহার এই দুর্ব্বল প্রচেষ্টা করুণার উদ্রেক করে। নবীনকালী স্বার্থপর নারীচিত্তের ছবি দেখাইযাছে। স্বীয় স্বার্থের জন্য সে কমলাকে নিরাশ্রয়া জানিয়া আশ্রয় দিয়াছে। তাহার পর কমলার নিকট হইতে আশ্রয়ের পুরা দাম আদায় করিয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

'চোখের বালি' উপন্যাসে নারী ও পুরুষের দুইটি কারয়া রূপ চোখে পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাসনার প্রতিমূর্ত্তি—সে পুরুষের অন্তরবাসিনী উর্ব্বশী, অনন্তমোহিনী। আশা স্নিগ্ধা গৃহস্থবধূ—তাহার সান্নিধ্য হৃদয় তৃপ্ত করে, জ্বালা মিটায়। মহেন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল, ব্যক্তিত্বহীন, লুব্ধ; বিহারী প্রবল ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ, উদারহৃদয়। এই বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে জীবন্ত ও মানবীয় করিয়াছে। অতৃপ্তকামা বিনোদিনী আশাকে ঈর্ষ্যা করিয়াছে, মোহজাল বিস্তার করিয়া মহেন্দ্রকে বশীভূত করিয়াছে। মহেন্দ্র চিরদিন মায়ের আদরে

লালিত, না চাহিতেই পাইযাছে। বিনোদিনীর প্রখর রূপ এবং ব্যক্তিত্বের নিকট শান্তস্বভাবা, সহজপ্রাপ্যা আশা নিতান্তই বিস্বাদ হইযা গেল। মানব-হৃদযের চিরন্তন ধর্ম্মবশতঃ সে বিনোদিনীকে পাইতে চাহিল। অতৃপ্তকামা বিনোদিনীও তাহার দিকে হেলিযা পড়িল স্বভাবধর্ম্মে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মহেন্দ্রের প্রকৃত পরিচয উদ্‌ঘাটিত হইল। সে মহেন্দ্রকে বিদায দিল। অপ্রাপ্য বিহারীকে পাইবার তপস্যা সে সুরু করিযা দিল। এই পর্য্যন্ত বিনোদিনী মানবী—তাহার পরই অকস্মাৎ সে রোমান্স রাজ্যের অধিবাসিনী হইযাছে। রাজলক্ষ্মীর পুত্রসর্ব্বস্বতা এবং অভিমানপবাযণতা অতি স্পষ্টভাবে উপন্যাসে রূপ পাইযাছে। আশা ভারতের নারী—সেই দেশের জলহাওযায পরিবর্দ্ধিতা। অন্যাসক্ত স্বামীকে সে পুনরায ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিযাছে এবং তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিযাছে। আশার চরিত্রে দেশীয নারীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যটুকু পুরাপুরি ফুটিযাছে।১

'গোরা' উপন্যাসে ভারতের আত্মার রূপ ব্যক্ত হইযাছে। ভারত মানব-ধর্ম্মে বিশ্বাসী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আচারের গণ্ডীকে অতিক্রম করিযা অসহায মানুষকে আশ্রয দেয। গোরা অহিন্দু, আইরিস মাতার সন্তান। আনন্দময়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৌত্রী, ব্রাহ্মণবধূ। তিনি নিঃসহাযা বিপদগ্রস্তা অসহাযা বিদেশিনা নারীকে রক্ষা করিলেন। জাতি ও সমাজগত সকল আচাবকে পরিত্যাগ কবিযা মানবধর্ম্মের মহান্ ব্রতকে গ্রহণ কবিলেন। আর্ত্তা নারীব মৃত্যুতে তাহার অসহায শিশুটিকে মাতৃস্নেহে লালিত করিলেন।

সকল সমাজেই সঙ্কীর্ণচিত্ত এবং উদার হৃদযের সন্ধান পাওযা যায। আনন্দময়ী হিন্দুসমাজের এবং পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের হইযাও তাঁহারা একগোত্রায—ইঁহাদের ধর্ম্ম মনুষ্যধর্ম্ম। বরদাসুন্দরী, হারাণ ও পানুবাবু, কৃষ্ণদয়াল ও হরমোহিনী—ইঁহারা ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজের মানুষ। ধর্ম্মের সান্নিধ্য ইঁহাদের উদারতা শিখায় নাই—মানুষকে বড় করিযা দেখিতে শিখায় নাই—ধর্ম্মের নামে জীবনের চতুষ্পার্শ্বে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর তুলিযাছেন।

গোরা তাহার চারিপার্শ্বে শুষ্ক আচার-বিচারের প্রাচীর তুলিযা সংসারে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বেড়াইত। মানুষকে সে ভুলিযা গিযা দেশকে লইযা মত্ত হইল—সে বুঝিতে পারিল না অগণ্য কোটি মানুষ লইয়া দেশ গড়িয়া উঠে। বিনয়ের প্রেম তাহার মনে সাড়া জাগাইল, সুচরিতার প্রেম তাহাকে জাগ্রত করিল, অবশেষে নিজের জন্মপরিচয় এবং আনন্দময়ীর আচারহীন মহাধর্ম্ম,

অসহায় মানুষকে বুকে তুলিয়া লওয়া—তাহাকে মানবধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। সে অনুভব করিল ধর্ম্মের অতিভূমিতে উঠিলে সকল বন্ধন ঘুচিয়া যায় এবং ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ—মানবপ্রীতির আদর্শ গ্রহণ করা যায়।

ললিতার মধ্যে তেজস্বিতা, ব্যক্তিত্ববোধ ও কমনীয়ত্ব মিলিয়া নারীর এক অপূর্ব্ব পরিচয় আমাদের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষের উপর মানুষের কোন জুলুম বা অন্যায় দেখিলেই সে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। বিনয়কে সে গোরার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে স্বাধীন সত্তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিনয়কে সে ভালবাসিয়াছে কিন্তু তাহার প্রবল আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান বিনয়কে নামিতে দেয় নাই। বিনয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লয় নাই। সামাজিক প্রভেদকে অস্বীকার করিয়াও তাহাদের প্রেম জয়ী হইয়াছে, এই জয় মানবাত্মার জয় যাহা আত্মার স্বাধীন গতি কোনক্রমেই সঙ্কুচিত করে না। "তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম একথা তাহারা ভুলিল, তাহারা যে দুই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মনের মধ্যে নিষ্কম্প দীপশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।"

'চতুরঙ্গ' হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উপন্যাসে মনস্তত্ত্বমূলক রোমান্সের ভাগ বেশী হইয়া গেছে—উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে আমাদের সাধারণ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। দামিনী ও শচীশ, বিমলা, সন্দীপ ও নিখিলেশ, কুমু, অমিত ও লাবণ্য—ইহারা সকলেই যেন কোন সুদূর মায়ারাজ্যের অধিবাসী। তাহারা অস্পষ্ট ভাবের আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, মর্ত্ত্যের মাটি তাহাদের দেহে লাগে না, ঝরিয়া পড়ে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জগমোহন ছিলেন পূর্ণ নাস্তিক—কিন্তু তিনি মানুষকেই দেবতা করিয়া লইয়াছিলেন। কোন মিথ্যা, কোন লোভ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। মানুষই তাঁহার কাছে জীবন্ত দেবতা ছিল—সেই নরদেবতার সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। মানুষের লাঞ্ছনা বেদনা তাঁহার হৃদয়কে গভীর আর্ত্তিতে পূর্ণ করিত। সমাজচ্যুতা হতভাগিনী ননীবালাকে তিনি পরম স্নেহে, গভীর মর্য্যাদায় নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

দামিনীর মধ্যে বঞ্চিতা এবং অতৃপ্তকামা নারীর বাসনার হাহাকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। দামিনীকে স্বামী জবরদস্তি করিয়া ভক্তির পথে টানিতে চাহিয়াছে। স্বামীর সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা ঘটিতে পারে নাই, উপরন্তু ভক্তির জবরদস্তি তাহার চিত্তকে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। "যে সময় দামিনীর বাপ এবং

তার ছোট ছোট ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়ীতে ষাট সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাহাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।” লীলানন্দ স্বামীকে সে জোর করিয়া অস্বীকার করিয়াছে। আবার এই দামিনী শচীশের প্রেমে স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে—সেবায়, ভক্তিতে, প্রেমে তাহার পাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিযাছে। শচীশ তাহাকে ছাড়িয়া অরূপের সাধনায় মত্ত হইয়াছে। চিরবিদ্রোহিনী নারী প্রেমের স্পর্শে শ্রীবিলাসকে হৃদযে অনুভব করিযাছে। শচীশ তাহার ধ্যানের আদর্শ—মানবীর হৃদয় রক্তমাংসের প্রেমের পূর্ণতা পাইল শ্রীবিলাসের প্রেমে।

‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে বিমলার চিত্তে স্বামীপ্রেমের কঠিন ভিত্তি ছিল না। সন্দীপের ইমোশনাল বক্তৃতা তাহার স্বভাবধর্ম্ম আত্মমোহকে বাড়াইযা তুলিল। একদিকে সে নিখিলেশের ব্যথিত হৃদযের জন্য বেদনা অনুভব করিযাছে, আর একদিকে সন্দীপের মোহে সর্ব্বনাশের ক্ষেত্রে পা বাড়াইযাছে। তাহার জা-রা তাহাকে ঈর্ষ্যা করিত, তাহা বিমলার অসহনীয ছিল। কিন্তু তাহাদের দুঃখের দিকটা তাহার চোখে পড়িতে চাহিত না। নিখিলেশের সহানুভূতিপূর্ণ গভীর দৃষ্টি মানবহৃদযের গভীর বেদনা ও বঞ্চনার প্রতি সহজেই পড়িযাছিল। সন্দীপের মোহকরী বক্তৃতাজাল বিমলার আদিম নারীপ্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করিযাছিল। সে বলিযাছিল—“আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্য লোভ করব—আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব কুড়ব; আমার রাগ আছে আমি দেশের জন্য রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব কুটব, যার উপরে আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব; আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিযে মুগ্ধ হব।” নিখিলেশের আদর্শ ছিল ভিন্ন। মানুষের এই কামনার রূপকেই সে সত্য বলিতে পারিল না। ইহা মানুষের সহজ বৃত্তির কথা নহে। ইহাই পশুত্ব, যাহা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লুব্ধ করে, অন্নের গ্রাস কাড়িয়া খায। এই পশুত্বের পরিচযকে জোরগলায ঘোষণা করিবার মধ্যে সত্য নাই। অমূল্যর জন্য বিমলার মাতৃহৃদয জাগিযা উঠিযাছে। তাহার স্নেহকাতর হৃদয় অমূল্যকে সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচাইতে চাহিযাছে—অমূল্যর স্নেহেই সে পুনরায সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিযাছে।

মানবীয় রসসমৃদ্ধ আর একটি অপ্রধান চরিত্র ক্রমোজ্জ্বল হইযাছে—তাহা মেজরাণীর। আশৈশব একত্র লালিত মেজরাণী ও নিখিলেশের মধ্যে একটি মধুর কোমল স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠিযাছিল। মেজরাণী নিখিলেশের সকল

খেয়াল স্নেহভরে প্রশ্রয় দিয়াছেন—পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার অন্তর বাহির পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রচণ্ড সাংসারিক ঝড়ের দিনে তাঁহার সহানুভূতির অমৃতবারি নিষেকে নিখিলেশের প্রাণশক্তি সকল বেদনার মধ্যে সজীব রহিয়া গিয়াছে। বিমলার অন্তররাজ্য মেজরাণী নারীর সহজাত শক্তিবলে দেখিয়া ছিলেন।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু চরিত্রের চতুষ্পার্শ্বে একটি কবিত্বের পরিমণ্ডলী সর্ব্বদা বিরাজ করে। সে মনের মধ্যে স্বামীর একটা আদর্শ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। বাস্তবের রূঢ় সংঘর্ষে তাহার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বাস্তববোধহীন অতি সুকুমার এই আবেশ স্থায়ী হইতে পারিল না—স্বামীকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া গড়িয়া লইতে পারিল না। স্বপ্নভঙ্গে মূর্চ্ছাহত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে—জবরদস্তির নিকট নত হইয়াছে, কিন্তু সহজ সম্পর্ক গড়িতে পারে নাই। রক্তমাংসহীন আদর্শবাদের এইরূপ ব্যর্থ পরিণতি ঘটিয়া থাকে। মধুসূদনের মধ্যে ছিল স্থূল ভোগবাসনা। কুমুকে জয় করার অধৈর্য্য জবরদস্তিতে পরিণত হইল—প্রেমের দানের বদলে দস্যুবৃত্তি সেখানে স্থান পাইল। কুমু সন্তানের দায়ে স্বামীগৃহে ফিরিয়াছে। একদিকে পশুত্ব, দস্যুতা—অন্যদিকে অতি সুকুমার স্পর্শসঙ্কোচ—উভয়ের সম্পর্ক কি পথ ধরিয়া চলিল, তাহা সহজ মানবিকতাবোধের উপর স্থাপিত হইল কি না সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিরুত্তর রহিয়া যায়।

'শেষের কবিতা'য় কবিত্বের ভাগ অধিকতর। অমিত ও লাবণ্যের সম্পর্ক, তাহা রক্তমাংসের সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়া একটি সূক্ষ্ম মানসিক সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লাবণ্য শোভনলালের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। শোভনলালের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রেম লাবণ্যের হৃদয়কে গলাইয়াছে। সে নিজের অনুভূতি দিয়া শোভনলালের বেদনা অনুভব করিয়াছে—শোভনলালকে স্বীকার করিয়া সে জীবনের সুখদুঃখ ভাগ করিয়া লইয়াছে। কেটি অমিতের চঞ্চল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। এই আঘাত তাহার হৃদয়কে কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল। লাবণ্যের প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ অমিত তাহার সঞ্চিত বেদনাকে রূপ দিল। কেটির ফ্যাশনদুরস্ত মুখোশের অন্তরালে একটি প্রেমাতুরা মানবীর হৃদয় প্রকাশিত হইল। লাবণ্য কেটির হৃদয়ের রহস্য অনুভব করিল—অমিত দীর্ঘসঞ্চিত অবজ্ঞার মূল্য দিতে কেটির নিকট ফিরিয়া আসিল।

শরৎচন্দ্রের রচনায় মানুষের দুঃখ বেদনার দিকটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

হীন নিপীড়িতদিগের জন্য অকৃত্রিম বেদনাবোধ এবং সহানুভূতি উপন্যাসগুলিকে সম্পূর্ণ মানবীয় রসোজ্জ্বল করিয়াছে। জীবন্ত হৃদয়ের উপর নির্ভর করিয়া উপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মানুষ তাহার দোষগুণ লইয়া পূর্ণরূপে বর্ত্তমান—মানুষের পুরা পরিচয় মানুষরূপেই সেখানে পাই।

'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসে জ্ঞানদা চরিত্রের মধ্যে করুণ ট্রাজেডীর রূপের স্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাই। সমাজের হৃদয়হীন আচার মানুষের আর্ত্ত হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে না, ধর্ম্মের নামে অসহায় মানুষকে কোন্ অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করে। সামাজিক আইনের ভয়ে মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। দুর্গামণি জ্ঞানদার মৃত্যু কামনা করে, বিশ্বের দরবারে তাহাকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করে। চতুর্দ্দিকের অপমান, লাঞ্ছনা এই তরুণী হৃদয়ের সকল আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানকে বলি দিয়াছে। বিবাহের বাজারে আপনাকে বিক্রয় করিবার জন্য জ্ঞানদার স্বহস্তকৃত ব্যর্থ সজ্জা এই চরম অমর্য্যাদা, তীব্র লাঞ্ছনাকে দৃশ্যমান করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নারীহৃদয়ের মূক বেদনা আমাদের অন্তরে একটা তীব্র শিহরণ জাগাইয়া তোলে।

'বিরাজ-বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ' প্রভৃতি উপন্যাসে মানুষ সমাজের হস্তে অসহায় উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছে। সামাজিক শাস্তি বজ্রের মত তাহার মস্তকে নামিয়া আসিয়াছে যাহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে অতি তুচ্ছ কারণ বা ভ্রান্তির ছিদ্র দিয়া সমাজচ্যুতি ঘটিয়াছে।

'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিবার সাহস দেখাইতে পারে নাই সমাজের ভয়ে। পার্ব্বতী ভুবনবাবুর সংসারে গৃহিণী হইয়াছে—সম্মানের পাত্রী হইয়াছে। দেবদাস জীবনে একবার ভুল করিয়া তাহার পর অধঃপতনের স্রোতে তলাইয়া গেল। তাহার চরিত্রের মধ্যেই দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত ছিল তাহা পার্ব্বতীকে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে বোঝা যায়। দুর্ব্বলতা এবং ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত ঘটিয়াছে জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া। মানবহৃদয়ের এই করুণ বিয়োগান্ত পরিণতি, তাহার দুর্ব্বলতা আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে উপেন্দ্রের চরিত্র অনেকটা রহস্যাবৃত, মহত্ত্বসমৃদ্ধ। কিরণময়ী উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণোজ্জ্বল চরিত্র। স্বামীর পাণ্ডিত্যের বর্ম্মে তাহার প্রাণপরিপূর্ণা প্রকৃতি ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বামীর কাছে

তাহার দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটে নাই। অনঙ্গ ডাক্তারের নিকট তাহাকে হাত পাতিতে হইয়াছে দারিদ্র্যের দায়ে, কিন্তু সেখানে মন উপবাসী রহিয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রের চরিত্রের মহত্ত্ব তাহাকে আকৃষ্ট করিল—দিবাকরকে কাছে পাইয়া সে স্নেহক্ষুধা মিটাইতে চাহিল। উপেন্দ্র কিরণময়ীর বুভুক্ষার পরিচয় পাইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিল। কিরণময়ীর স্বাভাবিক বুভুক্ষা হিংস্র কামনায় পরিণত হইল। উপেন্দ্রকে শাস্তি দিতে সে দিবাকরকে লইয়া পাপের পথে পা বাড়াইল। তাহার অতৃপ্ত ক্ষোভ এবং কামনা তাহাকে সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সতীশের আগমন তাহাকে স্খলন হইতে রক্ষা করিল—কিন্তু উপেন্দ্রর মৃত্যুসংবাদ তাহার অতৃপ্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তিকে চিরকালের মত স্তব্ধ করিয়া দিল।

সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিল কিন্তু আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। অবস্থাবিপর্য্যয়ে, পারিপার্শ্বিকের চাপে সে পাপের পথে পা বাড়াইয়াছিল। অশুদ্ধ দেহকে সে প্রেমাস্পদের পূজায় ডালি দিতে পারিল না। যে অপরাধের জন্য সে ন্যায়তঃ দায়ী নহে, সেই অপরাধবোধ তাহার জীবনকে ফুলে ফলে শোভিত হইতে দিল না। উপেন্দ্রর সহানুভূতি তাহার ব্যর্থজীবনের শেষ পাথেয় ও সান্ত্বনা হইয়াছে কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের বোঝা তাহাকেই পুরাপুরি বহন করিতে হইয়াছে। সতীশ কোন ধার্ম্মিক লোক ছিল না। কিন্তু সমাজের বিচারে সে পুরুষ—তাই সরোজিনীকে গ্রহণ করিয়া নূতন জীবনপথে যাত্রা শুরু করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নায়ক বিচিত্র অবস্থান্তরে সংসারের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে। তাহার বাল্যসঙ্গী ইন্দ্রনাথ তথাকথিত ভাল ছেলে নহে—তাহার দৌরাত্ম্যের সীমা নাই। সে জেলেদের মাছ চুরি করে, লুকাইয়া বেদের পরিবারের সহিত মেলামেশা করে এবং বহুবিধ অপকর্ম্ম করে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি সুস্থ মানুষের মন ছিল। সে মাছ চুরি করিয়া বিক্রয় করিত, এবং সেই টাকা গোপনে দুঃস্থা অন্নদাদিদিকে দিত। মৃত্যুভয় তাহার ছিল না—"ও কিছু না সাপ" বা "শূযোর টুযোর হবে"—ইত্যাদি উক্তি তাহার মৃত্যুভয়হীন প্রাণের সরল উক্তি। সে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে, কিন্তু জানে রামনাম করিলে ভূত থাকে না। মৃত শিশুর দেহকে স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লয়, কেননা সহজ বিশ্বাসে সে মানে মৃতের জাতি নাই। ইন্দ্রনাথ একটি সহজ সরল আদিম মানুষের প্রতিমূর্ত্তি যাহাকে আধুনিক অতিভদ্র জীবনে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

অন্নদাদিদি সংসার, সমাজ সকল কিছু ত্যাগ করিয়াছিলেন—লোকনিন্দা

মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন স্বামীর জন্য। সেই স্বামীর হাতে তিনি শত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু একদিনের জন্য মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দেন নাই। একমাত্র ইন্দ্রনাথের নিকট সাহায্য হাত পাতিয়া লইয়াছেন। আবার স্বামীর প্রবঞ্চনা শত লাঞ্ছনার ভয়কে গায়ে না মাখিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুতে নিঃশব্দে বিশাল পৃথিবীতে কোথায় লুকাইয়া গিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী অবস্থার চাপে পড়িয়া দেহকে অশুদ্ধ করিয়াছে। বাল্য প্রণয়ী শ্রীকান্তকে কাছে পাইয়াও সে দূরত্ব বজায় রাখিয়াছে—সংসারের কাছে শ্রীকান্তকে ছোট করিতে পারে নাই। তাহার জন্মার্জ্জিত সংস্কার তাহার অন্তরে ঝড় বহাইয়াছে, ধর্ম্মের রীতি নিয়ম আচার পালনের মধ্যে সে জীবনকে ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু সকল কিছু অতিক্রম করিয়া শ্রীকান্ত তাহার নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে।

অভয়া চরিত্র মানুষের চিরকালীন সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়াছে। সে বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বামীর অনুগামিনী হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু স্বামীর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার তাহাকে বিদ্রোহিনী করিয়াছে। সে সমাজের চিরাচরিত প্রথাকে ভঙ্গ করিয়াছে, জবরদস্তিমূলক ভক্তিকে কাপুরুষতা ও মানসিক ক্লীবতা মনে করিয়াছে। অন্তরের সত্যকে চাপিয়া একান্ত দৈহিক সম্বন্ধকে গায়ের জোরে মানিয়া লইতে সে পারে নাই। স্বামীর সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া সে নূতন করিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। সে মনুষ্যধর্ম্মে পতিত নহে বুঝিতে পারি একটি ঘটনায়। রেঙ্গুনে প্লেগের প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে মুমূর্ষু শ্রীকান্তকে সে নির্ভয়ে নিজের নূতন সাজানো সংসারে আশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে মানবহৃদয়ের রহস্য বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাঁহার 'মা' উপন্যাসে আবেগচঞ্চল মানবপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আছে। পিতৃ-আদেশে অরিন্দম নিরপরাধিনী পত্নী মনোরমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। সে নিঃশব্দে আদেশ মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও নিরুদ্ধ বেদনা গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয়গহ্বরে সুগুপ্ত অন্তর্জ্বালা ব্রজরাণীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট গোপন থাকে নাই। সে বুঝিয়াছিল স্বামী নিঃশব্দে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান। সংসারে ব্রজরাণী সম্রাজ্ঞী হইয়াও অনুভব করিয়াছিল স্বামীর হৃদয়ের সকল মধুধারা প্রথমার উদ্দেশ্যে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। প্রেমের বঞ্চনার সহিত সন্তানহীন শূন্যক্রোড় ব্রজরাণীর হৃদয়ে একটা

অনুরূপা দেবী

তীব্র ক্ষোভ জাগাইয়া রাখিয়াছে। সংসারের নানা ঘটনার মাধ্যমে তাহার এই ক্ষোভ মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে। মনোরমার চরিত্র শান্ত সংযত, সেখানে হৃদয়ের সকল আবেগ ও উত্তাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। স্বামীর জন্য অগাধ প্রেম, কিন্তু স্বামীবিচ্ছেদে তাহার প্রেমের বহিঃপ্রকাশ নাই। অজিতের পিতৃস্নেহের কাঙাল চিত্ত মাতার নিরুত্তাপ অন্তরের আবেগহীন প্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার অভিমানক্ষুব্ধ উদ্বেল হৃদয় বারংবার পিতৃস্নেহের অংশী হইতে চাহিয়াছে—প্রচণ্ড আবেগ ও মনোক্ষোভের জলন্ত বিবরণ ও বিশ্লেষণ পাই।

'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে ঋষির ধ্যানলব্ধ মন্ত্রের অমোঘ শক্তির কথা পাই। কিন্তু সকল মন্ত্রশক্তির অন্তরালে দুইটি মানব-হৃদয়ের নিঃশব্দ দ্বন্দ্বের পালা চলিযাছে। বাণীর অম্বরনাথের প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভাগ্যের চক্রান্তে যাহাকে সে ঘৃণা করিত তাহাকেই পিতৃকুলের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পতিত্বে বরণ করিতে হইয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত বিবাহ বাণীকে প্রথম হইতেই বিদ্রোহিনী করিয়াছে। অম্বর নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে বাণীর সম্মুখ হইতে অন্তরালে সরিযা গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রিয়ার স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয় সেই অপরিমেয় সহের প্রতিমূর্ত্তির জন্য বেদনা অনুভব করিয়াছে। অম্বরও স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইযা বেদনার ভার লঘু করিয়াছে। অম্বরের প্রতিবাদহীন মৌন প্রেম আপনাকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়াছে। অবশেষে হৃদযভার অসহ্য হওয়ায় মুমূর্ষু অম্বর বাণীর উদ্দেশ্যে গভীর প্রেমের বাণী প্রেরণ করিয়াছে। সুদীর্ঘ নীরবতা ও অপরপক্ষের সহিষ্ণুতা বাণীর অন্তরের প্রস্তর কাঠিন্যকে দ্রবীভূত করিয়াছে—তুষার গলিয়াছে। বাণী ব্যাকুল হইয়া অবশেষে অম্বরের শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া আসিযাছে।

প্রধান কাহিনীর পাশাপাশি একটি ক্ষুদ্র কাহিনীর ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। অজা ও মৃগাঙ্কের দাম্পত্য জীবন নিরুত্তাপ অস্বাভাবিক আবেগহীন ভাবে চলিতেছিল। মৃগাঙ্ক জীবনে প্রেমের দায়িত্ব এতটুকু লইবে না, বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সেই সম্পর্কও রাখিতে চাহে নাই। কিন্তু অপর পক্ষের নীরব প্রতীক্ষা মৃগাঙ্কের অচঞ্চল হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়াছে। অবশেষে দুইটি হৃদয় একটি বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসে নীলিমা আবাল্য সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল। দারিদ্র্যের তীব্রতার সহিত পিতার স্বার্থসঙ্কুচিত

প্রকৃতি তাহাকে অবিরাম পীড়িত করিযাছে। স্বর্ণলতা একদিকে দারিদ্র্য অপরদিকে সঙ্কীর্ণচিত্ত অমানুষ স্বামীর চাপে পিষ্ট হইযা মৌন মূক সর্ব্বংসহা ধরণীর মতই কোনক্রমে জীবনের বোঝা বহিযা চলিযাছিলেন। নীলিমার স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় সুশীলের প্রেমের ছত্রছাযায শান্তি কামনা করিল। তাহার পিতার কদর্য্য ইতর ষড়যন্ত্র এবং সুশীলের বিরাগ তাহাকে অপমানে ধূলিতে মিশাইয়া দিল। সুশীলকে সে বিদায দিযাছে—অপমানিত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিযা ধর্ম্ম ত্যাগ করিযাছে।

সুশীলের চরিত্রে দৃঢ়তার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয। নিযমবদ্ধ অভিভাবক-শাসিত জীবনের বাহিরে স্বাধীন গতি সে ভাবিতে পারে না। নীলিমার প্রেমে তাহার অস্বীকৃতির কারণও এই স্বাধীনচিত্ততার অভাব—পিতার বিরক্তিভাজন হওযার ভয। তাহার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা কাপুরুষতারই নামান্তর।

'উত্তরাযণ' উপন্যাসে সলিলের মাতার জেদ ও আরতির তীব্র আত্মসম্মান-বোধ গভীর সমস্যার সৃষ্টি করিযাছে। মহামাযা সন্তানের হৃদয-বেদনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিযা নিজের জেদকে বজায রাখিবার চেষ্টা করিযাছেন। সলিলের প্রেমের তীব্রতা মাতার অসম্মতি রূপ বাধাকে ঠেলিযাছে কিন্তু আরতির রুগ্ন মস্তিষ্কের সন্দেহপ্রবণতা এবং আত্মসম্মানবোধ দ্বিতীয বাধা হইযাছে। সলিল স্বর্ণলতাকে জীবনসঙ্গিনী করিযাছে। কিন্তু স্বর্ণলতা নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টিবলে স্বামীর অন্তর-রহস্য অনুধাবন করিযাছিল। তাহার নারীপ্রকৃতি বুঝাইযা দিযাছিল সলিলের হৃদযের পূর্ণ ভাগ সে পায নাই। তাহার অতৃপ্ত ও অভিমানপ্রবণ হৃদয় রোগশয্যায অতি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিযাছে।

'পথহারা' উপন্যাসে সে কযটি চরিত্র আছে, তাহাদের বিশ্লেষণের মধ্য দিযা মানব-হৃদয়ের গভীর রহস্য ব্যক্ত হইযাছে। উৎপলা, অসমঞ্জ, বিমলেন্দু—ইহারা তরুণমতি কিশোর। বিপ্লবের অগ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়াছে, কিন্তু তাহার ভয়াবহ ভীষণতা অনুভব করিতে পারে নাই। উৎপলা স্বীয় নারীপ্রকৃতি চাপিয়া রাখিয়া কৃত্রিম পৌরুষের আচ্ছাদন পরিযাছিল। নারীর করুণা, দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল। সে ভ্রাতার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করিয়াছে—বিমলেন্দুও অন্তরতম বন্ধুকে হত্যার ভার লইয়াছে। কিন্তু মানবহৃদয় স্বভাবের এতখানি বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করিতে

পারে নাই। তাই উৎপলার মধ্যে অতর্কিত নারীত্বের বিকাশ ঘটিয়াছে। এই প্রচণ্ড আঘাত উৎপলার পৌরুষের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল—তাহার অন্তর্নিরুদ্ধ নারীপ্রকৃতি প্রস্তরকঠিন পৌরুষের অন্তরাল ফাটিয়া বাহিরে আসিল। মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার মধ্যে তাহার হৃদযে প্রেমের ও ভ্রাতৃস্নেহের যুগ্মস্রোত প্রবল ধারায় প্রবাহিত হইযাছে।

বিমলেন্দু অসমঞ্জকে হত্যা করিতে গিয়া দেখিল তাহার সংসারের একমাত্র স্নেহপাত্রী তারার স্বামীর প্রাণ সে লইতে আসিয়াছে। হৃদযের কোমলতম কেন্দ্রে আঘাত পড়িল, বিমলেন্দু নিজের জীবন দিযা ভ্রান্তির প্রাযশ্চিত্ত করিল।

রামদযালের চরিত্র এবং বাক্য অসমঞ্জকে পথ পরিবর্ত্তন করিতে প্রভাবিত করিযাছিল। রামদযাল বৈপ্লবিক পন্থার মধ্যে মঙ্গল দেখিতে পান নাই। দেশের দুর্দ্দশা, অনাহারক্লিষ্ট জীবন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহস্র মানুষকে তিলে তিলে চরম দুর্দ্দশার দিকে আগাইযা দিতেছে। ইহাদেব দুর্দ্দশা মোচনকেই রামদযাল সকল মানুষের কর্ত্তব্য বলিযা বিশ্বাস করিতেন। অসমঞ্জকেও তিনি এই ভ্রান্ত পথ, মানুষের জীবন লইযা খেলা হইতে নিবৃত্ত করিযা ছিলেন।

মঙ্গলা ঠাকুরাণীর চরিত্র এক বিচিত্র সৃষ্টি। তাহার স্বার্থসর্ব্বস্ব ভালবাসা বিমলকে একান্ত নিজস্ব করিতে চাহিল। সেই ভালবাসায কল্যাণবুদ্ধি থাকে নাই। ইন্দ্রাণীর প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য সে বিমলের ভালোমন্দও বুঝিতে চাহে নাই। তাহার চুরি করিযা খাওযার মধ্যে এই লোভ ও স্বার্থসর্ব্বস্বতার পরিচয পাই। কিন্তু তাহার স্বার্থসর্ব্বস্বতা বিমলকে ধরিযা রাখিতে পারে নাই। বিমল মঙ্গলাকে চিরকালের মত ত্যাগ করিযা গেছে। সকল দোষ সত্ত্বেও বিমলের জন্য তাহার প্রাণের কাতরতা—মানবহৃদযের দুর্ব্বলতার কারণ আমাদের অভিভূত করে।

তারাশঙ্কব আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার উপন্যাসে বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাহাদের স্বকীয বৈশিষ্ট্য লইযা আমাদের সম্মুখে আসিযা সার বাঁধিয়া দাঁড়াইযাছে। 'কবি' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর যাহাদের কথা বলিয়াছেন তাহারা আমাদের তথাকথিত ভদ্রসমাজের বাসিন্দা নহে। ইহাদের আমরা মনুষ্যজাতীয বলিযা ভাবি না—নিকৃষ্ট, অস্পৃশ্য, বোধশক্তিহীন পশু মনে করি। এই নিম্নস্তরের মানুষগুলির মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির আবেগ আছে সত্য, কিন্তু মানুষের শৈশব সারল্য ও প্রবল প্রাণশক্তি তাহাদের মধ্যে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিত্য বহমান। তথাকথিত সভ্য মানুষের বাঁধাধরা কৃত্রিম ভদ্রতার অন্তরালে সর্ব্বনাশা প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। নিতাই ডোমের ছেলে, কিন্তু সে দেবতার আশীর্ব্বাদে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছে। তাহার মনোরাজ্য অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ববোধ এবং বিচারশক্তি তাহাকে অন্যায় করিতে দেয় নাই। ঠাকুরঝির কল্যাণকামনায় সে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে।

বসন গণিকা, পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়িয়া তাহার নারীপ্রকৃতি বিকৃত হইয়াছিল, দেহের মত মনেও তাহার কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল। নিতাইয়ের দরদী প্রেমিক চিত্ত, প্রাণঢালা সেবা, মানুষের হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শ বসনের বিস্মৃত নারীর অন্তরকে জাগাইয়াছে। মানুষের সহজ সুন্দর সত্য পরিচয় সে পাইয়াছে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইয়াছে। নিতাইয়েব মানুষী সহানুভূতি তাহার হৃদয়ের অন্ধকার কক্ষে দীপ জ্বালাইয়াছে।

'পঞ্চগ্রাম' ও 'গণদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর যাহাদের কথা বলিয়াছেন তাহারা আমাদের গ্রামের হতভাগ্য পল্লীবাসী। প্রচণ্ড প্লাবন, অনাবৃষ্টি, জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার, অজ্ঞতা ও অশিক্ষা, মহামারী, অনাহার, মৃত্যু ইহাদের চির সঙ্গী। ইহারাই দেশকে অন্ন দিয়া বাঁচায়। আধুনিক সভ্যতা মানুষের সাধারণ স্বভাবধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়াছে। 'পঞ্চগ্রাম' ও 'গণদেবতা'য় সেই বিস্মৃত হতভাগ্য গ্রামবাসীদের চিত্র তারাশঙ্কর জীবন্ত চিত্রিত করিয়াছেন। দেবু পণ্ডিত এই হতভাগ্যদের দুঃখকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিল—গ্রামবাসীও তাহাকে সুখদুঃখের একান্ত বন্ধু বলিয়া মানিয়াছিল। বিলু ও খোকনের মৃত্যু তাহাকে গ্রামবাসীর সহিত আরও একাত্ম করিয়া দিয়াছে। বিশ্বনাথ গ্রামবাসীর সেবা করিতে চাহিয়াছিল। সে সমাজের সকল বিধিকে লঙ্ঘন করিয়াছে। তাহাকে গ্রামবাসী নিজেদের স্বগোত্র ভাবিতে পারে নাই। বিশুর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাহার সেবা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার সেবা হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎস হইতে উৎসারিত হয় নাই। সেখানে করুণা ও সমবেদনার দান গ্রামবাসীকে সঙ্কুচিত করিয়াছে।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে জীবনমশায়ের মানবদরদী চরিত্রের বিশ্লেষণ নানা ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনমশায় পিতৃপিতামহের শিক্ষা পাইয়াছিলেন। নানা ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্য দিয়া তিনি সেই আদর্শকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশ মহাশয়ের বংশ—দরিদ্র

ব্যাধিগ্রস্ত হতভাগ্য মানুষকে আশ্রয় দেওয়া, যন্ত্রণামুক্ত করার কার্য্য তাঁহাদের বংশপরম্পরা ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। অর্থ ও প্রতিপত্তিকে দূরে রাখিয়া এই অসহায় মানুষের সেবাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। পুত্র বনমালী সেই মহাশয়ত্ব অন্তরে অনুভব করে নাই। উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাসনা তাহাকে তিলে তিলে ক্ষয় করিযাছে। নিশ্চল হৃদযে তিনি পুত্রের পরিণাম বুঝিযাছেন এবং আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি ঘোষণা করিযাছেন। আত্মীয পরিজনের লাঞ্ছনা তাঁহার উপর তুমুলভাবে বর্ষিত হইযাছে। জীবনমশায অনুভূতিহীন ছিলেন না—নানা ঘটনায মানুষের প্রতি তাঁহার দরদ প্রকাশ পাইযাছে। গ্রামের অতি দরিদ্র মানুষগুলিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত।

'মন্বন্তর' উপন্যাসে মানুষের লোভ, আকাঙ্ক্ষা কতখানি প্রবল হইতে পারে, মানুষ কিভাবে পশুতে পরিণত হইতে পারে তাহারই জ্বলন্ত বিবরণ পাই। সুখময চক্রবর্ত্তীর পাপপ্রবৃত্তি তাহার বংশকে ব্যাধিগ্রস্ত ও মনকে জড়পিণ্ড করিযাছে। কানাই এই পারিপার্শ্বিককে ঠেলিযা সুস্থ সহজ মানুষের জীবন কামনা করিযাছে। মানুষের মধ্যে যে হিংস্র লোলুপ পশু বাস করে সে সময় বুঝিযা নখদন্ত প্রকাশ করে। তাহারই দংষ্ট্রাঘাতে গীতার জীবন অভিশপ্ত হইযাছে, তাহার পবিত্র দেহ সর্ব্বনাশের আগুনে কলুষিত হইযাছে। মানুষের লোভসৃষ্ট মন্বন্তর ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ ডাকিযা আনিযাছে। মানুষের অকল্যাণী শক্তি যে বোমার সৃষ্টি করে, তাহার ফল ভোগ করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ: ভীতা ত্রস্তা মাতার বক্ষে শিশু পিষ্ট হইযা মরে। চতুষ্পার্শ্বের লোভ, ক্ষুধা. হিংস্রতার মধ্যে মানুষ মাথা তুলিযা দাঁড়াইতে চায—সে এই পারিপার্শ্বিকতা, এই পশুত্বকে জয করিতে চায।

'কালিন্দী' উপন্যাসে মানুষের পাপ চেতনা তাহার অবচেতন স্তরে থাকিযা তাহার মনোবলকে ধ্বংস করে। পাপকে সে লুকায, কিন্তু পাপ তাহার অগোচরে থাকিযা তাহাকে ধ্বংসের পথে চালিত করে। রামেশ্বর নিরপরাধিনী স্ত্রী ও সন্তানকে বৃথা সন্দেহে হত্যা করে। স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অভিশাপ তাহার অবচেতন মনে গুপ্ত থাকিযা তাহাকে ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিযা তুলিল। ঘটনাচক্রে মহেন্দ্র ও অহীন্দ্রের শোচনীয পরিণাম রামেশ্বরকে তাহার ধারণায বিশ্বাস জন্মাইযাছে।

কালিন্দীর চর মানুষের সর্ব্বনাশী লোভকে জাগাইযাছে। আদিম প্রকৃতির সন্তান সরল সাঁওতাল মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থানকে দেহের রক্তজলকরা

পরিশ্রম দিয়া লোভনীয় করিয়া তুলিল। সেই চরকে কেন্দ্র করিয়া চাষী, জমিদার, মহাজন, পরিশেষে মিলওয়ালার মধ্যে লোভের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ বাধিয়াছে। এই দ্বন্দ্বে সাঁওতালরা হৃতসর্ব্বস্ব ও ভূমিহীন হইয়াছে, রক্তের নদী বহিয়াছে। মানুষের অবিচারের প্রতিকার করিতে গিয়া অহীন্দ্র মরণযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়াছে!

বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের উপন্যাস মুখ্যতঃ রোমান্সধর্ম্মী। অপুর চরিত্রে কল্পনাপ্রিয়তা, ভাবুকতা, প্রকৃতিপ্রেম এবং অধ্যাত্মদৃষ্টি একত্রিত হইয়া সাহিত্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। চরিত্রের এই সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও লেখক তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য অবাস্তব করিয়া তোলেন নাই। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' এই দুইখানি উপন্যাসকে ঘটনার পর ঘটনার স্রোত সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ করিয়াছে।

বৃদ্ধা, অশক্তা ইন্দির ঠাকুরাণীর প্রতি সর্ব্বজয়ার দুর্ব্যবহার, দুর্গার করুণাপূর্ণ ব্যবহার ও সমবেদনা, ইন্দির ঠাকুরাণীর অসহায়তা প্রথমেই আমাদের চিত্তকে মানবীয় রসে পূর্ণ করিয়া দেয়। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে অপু ও দুর্গার চঞ্চল শিশু চরিত্রের নানা দিক বিশ্লেষিত হইয়াছে। দুর্গা প্রকৃতির অন্দরমহলের রহস্যের চাবিকাঠি হাতে লইয়া ঘুরিয়াছে, অপুকে তাহার কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রে কোন আদর্শবাদের অত্যুক্তি নাই। লোভাতুরতা, চুরি, আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব তাহাকে সাধারণ গ্রাম্যবালিকার সঙ্গে একস্তর-ভুক্ত করিয়াছে। তাহার ধূলিমলিন রুক্ষ কেশগুচ্ছ, গাছকোমর করিয়া পরা ছোট শাড়িখানি, ধূলায় ধূসর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সব মিশিয়া চিরচঞ্চল শিশুকে মূর্ত্ত করিয়াছে। দুর্গার মৃত্যুর পর অপুর জীবনের ধারা বদলাইয়াছে। নিশ্চিন্তপুরের পল্লী ক্রোড় হইতে সে কাশীর নাগরিক জীবনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইখানে 'পথের পাঁচালী' শেষ হইয়াছে।

'অপরাজিত' গ্রন্থে অপুর জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম তাহাকে অধিকতর বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর সে অন্নের চিন্তায় ধনী গৃহে ভৃত্যবৃত্তি লইয়াছে। সেখানে লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্য দিয়া তাহার দিনগুলি অসহ্য অবস্থায় কাটিয়াছে। একমাত্র লীলার স্নেহ, তাহার বেদনার্ত্ত হৃদয়ে প্রলেপ দিয়াছে। মনসাপোতায় প্রত্যাবর্ত্তন, কলেজের পাঠ্যজীবনে দারিদ্র্যের সহিত অবিরাম সংগ্রাম তাহার হৃদয়ের অমৃতরসকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছিল। সংসারের রুক্ষ অকরুণতা, উদাসীন যান্ত্রিক সভ্যতা তাহার চিত্তকে পিষ্ট করিয়া দিতেছিল। অপর্ণার সহিত বিবাহ তাহাকে নারীপ্রেমের

স্নিগ্ধ শান্ত স্পর্শ দিয়াছে। জীবনে যে রুক্ষতা তাহাকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আর একটি হৃদয়ের স্নিগ্ধ শান্ত সাহচর্য্য অপুর সংসার-ক্লান্ত হৃদয়ে নূতন করিয়া প্রলেপ দিল। অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যু ও লীলার বিবাহ সংবাদ তাহাকে নিদারুণ মানসিক আঘাত দিয়াছে। আদর্শবাদের স্বর্গে রচিত ভূমি পদতল হইতে সরিয়া গিয়াছে। মর্ত্ত্যের ধূলিতে তাহার আদর্শবাদ, অধ্যাত্মধর্ম্ম, প্রকৃতিপ্রেম মিশিয়া গিয়াছে। দিল্লীযাত্রা, মধ্যভারতের অরণ্যের প্রাকৃতিক গম্ভীর রূপ অপুকে পুনরায় তাহার স্থির লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিয়াছে। অপুচরিত্র গভীর আবেগপূর্ণ, সংসারের বন্ধনমুক্ত, কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত এবং মানবীয়। তাহার সকল অনুভূতি তাহার বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি মুখ্য চরিত্র, মানুষ গৌণ। প্রকৃতির বিশাল রাজত্বে মানুষ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র জীবনযাত্রা লইয়াই ব্যস্ত। এখানে যে চরিত্র আছে তাহারাও প্রকৃতির ধর্ম্ম পাইয়াছে। মানুষের মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ও লোভ এখানে সঙ্কুচিত। এখানে মানুষ তাহার আদিম, শান্ত, স্বল্পতুষ্ট জীবন অতিবাহিত করে। কলহ বিবাদ আছে, কিন্তু তাহা অতিভদ্র কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতার মত জীয়ানো থাকে না। রাসবিহারী সিংহ ও নন্দলাল ক্রূর, কিন্তু তাহারা মুখোশের অন্তরালে সর্ব্বনাশ সাধন করে না। মানুষের সহজ সরল প্রকৃতিটি এখানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মহাজন ধাওতাল সাহু কুসীদজীবি—কিন্তু অর্থগৃধ্নু ও ধূর্ত্ত নহে। এখানে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু সন্তোষও আছে। অরণ্যের অধিবাসীগণ প্রকৃতির উদার ক্রোড়ে লালিত হইয়া মানুষের অন্তরের সম্পদে ধনী হইয়াছে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপটি এবং তাহারই ক্রোড়স্থিত হাজারী ঠাকুরের সরল পরিবারটির চিত্র পাই। রাণাঘাটের হোটেল পরিচালনায় নাগরিক জীবনের লোভ, ব্যবসাযবুদ্ধি এবং চাতুর্য্য উপন্যাসখানিকে মানবীয় স্পর্শ দিয়াছে।

প্রবোধ সান্ন্যালের 'আঁকাবাঁকা' উপন্যাসে দুই প্রেমিক হৃদয়ের দুই কুলভাঙ্গা প্রেমের কাহিনীর পাশাপাশি সংসারের বিচিত্র চরিত্রের শোভাযাত্রা চলিয়াছে। নানা খণ্ড ঘটনার মাধ্যমে মানবহৃদয়ের বিচিত্র রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। কঙ্কন ও মীনাক্ষী সংসারের অতি সাধারণ মানুষের গোত্রভুক্ত নহে। সংসারের মানুষ বড দুর্ব্বল, তাহার নিজের হৃদয়ে সেই দুর্ব্বলতার জন্ম। এ হেন সংসারে উহাদের আবির্ভাব আকস্মিক আবির্ভাব বলিয়া মনে হয়। তাহারা যেন কোন অজ্ঞাত

প্রবোধ সান্ন্যাল

রাজ্য হইতে আসিয়াছে। ইহারা সংসারে অপরিচিত হইলেও মানুষের দুর্ব্বলতার প্রতি তাহাদের সহানুভূতির অন্ত ছিল না।

সুধীর ও কমলা সমাজের ভয়ে সবলে নিজেদের মিলনের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। মনের দুর্ব্বলতা তাহাদের পাপের পথে টানিয়া আনিয়াছে। গোপন পাপ কমলার জীবনকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মীনাক্ষী ও কঙ্কর তাহাদের পাপকে বাধা দিয়াছে, তাহাদের পাপের বাসা ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বলতাকে তাহারা স্নেহের চক্ষে, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে। তাহাদের সহানুভূতি দুইটি পথভ্রান্ত মানবকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মিসেস্ রায় মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার সংবাদ জানিতেন। তিনি ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ইন্ধন যোগাইতেন এবং পাপ ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। ভদ্রবেশের অন্তরালে মানুষের হৃদয় ছিল না, সেখানে ছিল একটি ক্রূর সর্পের মত নিষ্ঠুরতা, যে মানুষের দুর্ব্বলতা লইয়া ছিনিমিনি খেলে। ইন্দুমতীর চরিত্র ব্যঙ্গাত্মক, কিন্তু তাহার একটি করুণ দুর্ব্বল দিক আছে। সে সংসারে কিছু পায় নাই। ভালবাসায় আশ্রয় ও অবলম্বনের জন্য কঙ্করকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিল। মীনাক্ষীকে কঙ্করের জীবন হইতে অপসৃত করিবার জন্য সে কুটিল ষড়যন্ত্র বিস্তার করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার ঈর্ষ্যানলের কালিমা তাহাকেই কলঙ্কিত করিয়াছে। ভ্রান্তির অপসারণে তাহার অনুতাপ ও প্রতীক্ষা সকল ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের অন্তরে করুণার সঞ্চার করে। কল্যাণীর কাহিনী মর্ম্মান্তিক। স্বামী, সংসার, সন্তান, কিছুই তাঁহার প্রথম প্রেমের জ্বালাময়ী স্মৃতিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। এই জ্বালাময়ী, সর্ব্বনাশী প্রেমের প্লাবনে সকল চিন্তা ভাসিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের আবেগ বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী সাধনাকে ধ্বংস করিয়াছে, নিজেও ধ্বংস হইয়াছেন। এই প্রচণ্ড আবেগ, সর্ব্বগ্রাসী দুরন্ত প্রেম মানবহৃদয়ের গুপ্ত গহ্বরে আলোকপাত করিয়াছে। এই সর্ব্বনাশা আবেগ এমনই ভীষণা, তাহার গতি এরূপ বিদ্যুৎশক্তিময়ী যাহা গৃহবধূকে গৃহের কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া প্রলয়ঙ্করী উন্মাদিনী ভীষণাতে পরিবর্ত্তিত করে।

'শ্যামলী' উপন্যাসে লেখক দেখাইয়াছেন সহানুভূতি ও স্নেহ মানুষকে জীবনের নিম্নতম স্থান হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত নীলাকাশে টানিয়া আনে। শ্যামলীর মধ্যে সুধাংশু প্রতিভার অপমৃত্যু দেখিয়াছিল। বিনয়ের লালসাকে প্রেম মনে

করিয়া সে ক্রমেই অধঃপতনের পথে দ্রুততর গতিতে নামিয়া চলিতেছিল। সুধাংশুর স্নেহ ও সহানুভূতি বারবার আহত হইয়াছে, বারবার সুধাংশু তাহাকে ঊর্দ্ধ জগতে টানিয়া আনিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের চাপে তাহার মন বিকৃত হইয়াছে ; সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবনকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনুষ্য-সমাজের পুঞ্জীভূত পাপ, গ্লানি ও স্বভাবের বিকৃতি বিনয় তাহাকে আকণ্ঠ পান করাইয়াছিল। সুধাংশুর স্নেহমন্দাকিনীর স্বচ্ছ ধারায় নিদারুণ ব্যাধির মধ্য দিয়া তাহার বিকৃত মনের মৃত্যু ঘটিযাছে। শ্যামলী নবজীবন লাভ করিয়াছে। এখন হইতে তাহার কাজ হইযাছে মানুষকে বিকৃত ক্ষুধার খাদ্য না যোগাইয়া সেবার অমৃত যোগান।

সুধাংশুর শাশুড়ীর মধ্যে স্বার্থলোলুপা, আত্মসর্ব্বস্ব চরিত্রের জীবন্ত চিত্র ফুটিয়াছে। পদ্মাবতীর নিরুত্তাপ, অতিমাত্রায় আত্মসচেতন জীবনে ঝড় তুলিযাছে শ্যামলী। নারীর সহজাত ঈর্ষ্যাবোধ তাহাকে সহজেই মানবী করিযা তুলিযাছে। নীনার পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে।

বনফুলের উপন্যাসে কাব্যের সুষমা ও রহস্যময় ভাবটি প্রধান। তাঁহার 'দ্বৈরথ' উপন্যাসে দুই যুদ্ধমান নাযকের অন্তরালে নিপীড়িত মানুষগুলির কথা পাই। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত পরস্পর পরস্পরকে জব্দ করিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধির লডাই চলে—তাহার ফলভোগী হয় নিরীহ মানুষের দল। দুধনাথ পাঁড়ের হাতটি যায়, গোকুলসাব সর্প ভয়াল আলিঙ্গনে বীভৎস মৃত্যু ঘটে। উগ্রমোহন এই বুদ্ধির খেলায মত্ত—কোন সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তি তাহাকে স্পর্শ করে না। বাণীর স্পর্শকাতর নিঃসঙ্গ চিত্ত ভাই ও স্বামীর দ্বন্দ্বে ব্যথাতুর হইয়া উঠে। তাহার কিশোরী চিত্তকে গঙ্গাপ্রসাদ শিক্ষার গর্ব্বে, দারিদ্র্যের গর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করে। স্বামীর স্থূল মনোবৃত্তি তাহার তৃষ্ণাকে মিটাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে প্রচণ্ড ক্ষুধার অগ্নিতে আহুতি হইয়াছে বাণী। এই আত্মদান দুই যুধ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বীকে কশাহত করিয়াছে। তাহাদের মানুষের জীবন লইযা ছিনিমিনি খেলার ফল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। উভযের সংসারের স্নেহপাত্রী চলিয়া গেল। হৃদয়ের তন্ত্রীতে টান পড়িল—দুইটি শোকাহত মানুষ প্রীতির অখণ্ড বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে।

বনফুল

বনফুলের 'বৈতরণীর তীরে' বিচিত্র উপন্যাস। মৃত প্রেতাত্মার মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিচিত্র বেদনা, লোভ ও ক্ষুধার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পাত্রপাত্রী সকলেই ইহলোকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। প্রত্যেকেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। এই আত্মহত্যার পশ্চাতে জীবনের বহু দুঃখ, বহু বঞ্চনা, নিরাশা, অতৃপ্ত কামনার দীর্ঘশ্বাসের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। মানুষের এই ভযাবহ পরিণতি, তাহার হৃদযের বহু গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

'জঙ্গম' উপন্যাসে মানুষের শোভাযাত্রা চলিযাছে। জ্যোতিষী করালীর নিঃসঙ্গ জীবন, বিচিত্র স্বভাব, ভণ্টুর সদাহাস্যময় চরিত্র যাহা দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ শুকাইতে পারে নাই, ধৈর্য্যশীলা স্নেহময়ী ভণ্টুর বৌদি, ভণ্টুর পিতার নির্লিপ্ত শিশুসুলভ চরিত্র, শঙ্করের দার্শনিকতা এবং প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অসহায় নিবারণবাবুর অবস্থা আমাদের মনে নানা বিভাবের উদ্দীপন করে। এখানে পাত্রপাত্রীর গভীর সমালোচনা নাই, চরিত্রের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ নাই, কিন্তু চলচ্চিত্রের মত গতিশীল মানবজীবন ও সমাজের একটা স্ন্যাপ ফটোগ্রাফ আছে।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে কবিত্বধর্ম্মই মুখ্য। 'তিথিডোর' উপন্যাসখানির ভাষা ও ভাব গদ্যের গণ্ডী ছাড়াইযা গেছে। উপন্যাসের অনেকখানি স্থান জুড়িযা আছে স্বাতী ও সত্যেনের প্রেমের কাব্যধর্মী বর্ণনা। অবশ্য তারই ফাঁকে ফাঁকে মানবচরিত্রের নানা দিক উদ্ঘাটিত হইযাছে। প্রথমেই স্নেহময পিতা রাজেন বাবু এবং জননীরূপিণী স্বাতীব জ্যেষ্ঠা ভগিনী শুভ্রা আমাদের অন্তরে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রীতিরসের সঞ্চার করে। হারীতের সুবিধাবাদী ও সুযোগান্বেষী চরিত্র, মজুমদারের স্বার্থজড়িত সহাযতা, স্বাতীর উদ্দেশ্যে লোলুপ ব্যগ্র বাহুবিস্তার, উদ্দেশ্য ভঙ্গে মজুমদারের নিঃসঙ্গ করুণ অবস্থা, শাশ্বতীর আধুনিক ও প্রাচীন জীবনের দ্বন্দ্বকে মিলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা, শাশ্বতীর ভোগলিপ্সা ও অতৃপ্ত জীবনের সুপ্ত ক্ষোভ ইত্যাদি মনুষ্যচরিত্রের নানা দিকের কথা জানাইযা দেয়।

বুদ্ধদেব বসু

'কালো হাওয়া' উপন্যাসে দেখিতে পাই অন্ধ সংস্কার, আত্মপ্রিযতা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করিযা ফেলে। উপন্যাসের মধ্যে ভাবের প্রাধান্যই বেশী। হৈমন্তী বরাবরই জেদী এবং আত্মপ্রিয়, এই আত্মপ্রিযতাই তাহাকে মা মহামায়ার ভক্ত করিয়াছিল। ধর্ম্মপালনের নামে সংসারকে সে রসাতলের গহ্বরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। অরুণ স্বার্থসর্ব্বস্ব মানুষরূপী পিশাচ। সন্তানের মৃত্যু তাহাকে এতটুকু বিচলিত করে নাই। হৈমন্তীর ধর্ম্মোন্মাদনা এবং অরুণের

স্বার্থপরতা উজ্জ্বলার শান্ত নম্র জীবনকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। তাহার ভীত সঙ্কুচিত নম্র হৃদয় নিঃশব্দে সকল বেদনাকে বহন করিয়াছে—কণ্ঠে ফেনায়িত রোদন সবলে বক্ষে চাপিযাছে। তাহার কোমল ভীতসঙ্কুচিত হৃদযের বেদনা আমাদের পীডিত করে। মিলিও মাতৃ আদর্শে গঠিত। বৈরাগ্যেব ভাণ করিযা ধর্ম্মেব নেশায় মাতিযা উঠিযাছে। বুলির সহিত নিরঞ্জনের প্রেমসম্পর্ক গড়িযা উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৈরাগ্যের মুখোস খসিযা গিযা ভিতরের স্বার্থপরাযণ অন্তরের রূপ প্রকাশ হইয়া পডিযাছে। বুলি ও অরিন্দম ইহাদের মধ্যে অবাধ প্রাণশক্তি লইযা আসিয়াছে। বুলি এই পরিবেশে মানুষ হইযাও পিতার জীবনেব উত্তাপ স্বজীবনে গ্রহণ করিযাছে। হতভাগিনী উজ্জ্বলা একমাত্র তাহাদের স্নেহেব অংশী হইযাছে। ধর্ম্মেব অন্ধ নেশা তাহাদেব দৃষ্টি রোধ করে নাই। সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাহাবা মানুষের হৃদযকে বুঝিযাছে। অরিন্দম অন্তর্দৃষ্টিবলে সংসারেব গতিকে অনুভব কবিযাছেন, বুলিকে নিরঞ্জনের হাতে তুলিযা দিযা তাহাকে এই অস্বাভাবিক পবিবেশ হইতে মুক্ত কবিতে চাহিযাছেন। কিন্তু হেমন্তের পদতলেব গুণে তাঁহাব জীবনেব উপব যবনিকা টানিযা দিযাছে। বুলি পিতাব আশীর্ব্বাদ মাথায লইযা নির্ভযে নিরঞ্জনেব সঙ্গিনী হইযাছে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেব জীবনকে সে ববণ কবিযা লইযাছে।

অচিন্ত্যবাবুব উপন্যাস 'যায যদি যাক্' পঞ্চাশের মন্বন্তরেব উপর ভিত্তি করিযা বচিত। দ্বিতীয মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর বাঙ্গালা দেশের মানুষের জীবন লইযা একটা মহা মরণযজ্ঞ শুরু করিযাছিল। সেই ক্ষুধার আগুনে মানুষের সমাজ, নীতিবোধ, মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সকলই হব্য হইযা জ্বলিযা যাইতেছিল। অতি মুষ্টিমেয দুই-একজন ইহাকে আঁকডাইযা ধবিতে চাহিযাছে কিন্তু সুধীন ও সেবার মত পুডিযা ছাই হইযাছে। বাবিধি লোভী মানুষেব নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। উহারা মানুষকে লোভ দেখায, মানুষের ধর্ম্ম নষ্ট কবে, নিজেদেব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুযের গলা টিপিযা ধবে। সেবাকে সম্ভোগ করিযা ভীরুর মত আত্মগোপন করিযাছে. সেবাকে লাঞ্ছনার পাঁক মাখাইযাছে। সুধীনের প্রেম তাহাকে মর্য্যাদা দিযাছে, আশ্রয দিযাছে সকল অপরাধ ও লাঞ্ছনাকে মুছিযা লইযা। একদিকে রাষ্ট্রীয বিপ্লব, দেশব্যাপী মন্বন্তর ও যুদ্ধ, আর একদিকে বারিধির মত সমাজহিতৈষী লুব্ধক সুধীনের সোনার সংসার ছিন্নভিন্ন করিযাছে। আধুনিক যুগের মুখোসধারী সভ্যতা মানুষের সকল আশ্রযকে এমন করিয়াই ধ্বংস করিতেছে।

অচিন্ত্যকুমার

'অনন্যা' উপন্যাস একটি অসাধারণ মেয়ের কথা—যে, জীবনে মহৎ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সেই স্বপ্নের প্রাসাদের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন পিতা মাতা। বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, পিতা মাতা ভ্রাতার স্বার্থপরতা, তাহার সেই বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের স্বপ্নঘোর ভাঙ্গিয়া দিল। বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে চমকিত হইয়া দেখিল সে সংসারের ভার বহনের যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। হরেন তাহাকে জীবনের ব্যর্থতার বিষয়ে সজাগ করিয়া দিয়াছে। সমরেশের প্রেম তাহার সুপ্ত নারীপ্রকৃতিকে নাড়া দিয়াছে। সংসারের কর্ত্তব্য এবং নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া তাহার হৃদয় আর্ত্তনাদ করিযাছে। অবশেষে পিতামাতার স্বার্থপরতা, সংযমহীনতা, নিজেদের সুখের জন্য বীথির জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চাপিবার নিষ্ঠুরতা তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে সবলে এই সঙ্কীর্ণ পরিবেশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিযাছে এবং সমরেশের জীবনসঙ্গিনী হইয়াছে।

'ঊর্ণনাভ' উপন্যাসে আভিজাত্যাভিমানী তথাকথিত অতিসভ্য ও শিক্ষিত সমাজের সৌখীন সাহিত্যচর্চ্চাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। সুশান্ত-জাতীয় ধনীরা নামের জন্য সখের সাহিত্য চর্চ্চা করে। সত্যকার শিল্প, জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা নিগূঢ় বেদনাবোধ হইতে জন্মায়। শিল্প তখনই সত্য রূপ ধরে যখন সে শিল্পীর হৃদয়কে মন্থন করিয়া আবির্ভূত হয়। সুধাংশুরা জীবনে কোনদিন অভাব বা বেদনা বোধ করে নাই। কমলার উদার দক্ষিণ হস্তের প্রসাদ চিরদিন তাহাদের জীবনপথ নিরুত্তাপ মসৃণ রাখিয়াছে। কুবের দারিদ্র্যের আঘাতে নিত্য পিষ্ট। তাহাকে সুধাংশু অতি আরামের, ভোগের জীবন দিয়াছে। কিন্তু শিল্প ফরমায়েসী বস্তু নহে, তাহা প্রাণ হইতে স্বতঃই উৎসারিত হয়। সুধাংশুর অতন্দ্র তীক্ষ্ণ অভিভাবকত্ব, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে গতিনিয়ন্ত্রণ, অভিজ্ঞতার অভাব, কুবেরের সাহিত্যপ্রেরণার উৎসমুখে পাথর চাপা দিয়াছে। বেবির আগমনে তাহার জীবনে তুমুল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। বেবি কুবেরের মনুষ্যচেতনাকে ঘা দিয়াছে, তাহার নির্জীবতাকে সে সহ্য করে নাই। আঘাত এবং বেদনা কুবেরকে পুনরায় সাহিত্যরচনায় প্রেরণা যোগাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সে সুধাংশুর কৃতজ্ঞতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

'কাকজ্যোৎস্না' ও 'আসমুদ্র' উপন্যাস অনেকখানি রহস্যমণ্ডিত, রক্তমাংসের মানুষের দেখা পাওয়া সেখানে ভার।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে উদ্ভট সমস্যার আরোপ আছে।

তাঁহার 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে গাউদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা-প্রণালীর খণ্ড চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত চিত্রটি বেশ স্পষ্ট আলোকে উজ্জ্বল হয় নাই। শশীর জীবনের সমস্যাও অনেকটা অসংলগ্ন। কুসুমের বিচরণ অনেকটা শূন্যলোকেই হইয়াছে। বিন্দুর দাম্পত্যজীবনও অস্বাভাবিক। কুমুদ ও মতির দাম্পত্য-জীবনও অনেকখানি অভিনব।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসখানি আগাগোড়া উদ্ভট ও অসংলগ্ন ঘটনা ও ভাবের সমষ্টি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্ত' উপন্যাসটি অতি আধুনিক মনের অতৃপ্তি ও বিকারের বিশ্লেষণ। আধুনিক মানুষের প্রতীক সত্যজিৎ। আধুনিক মানুষ নিজেই জানে না সে কি চায়। তাহার মন নূতনত্ব সৃজনে অক্ষম হইয়া পড়ে—বিবাহিত প্রেমে অতৃপ্তি আছে, মন নূতন সঙ্গ খোঁজে। ইহা মানব-মনের চলিষ্ণু ধর্ম্ম। সে চিরকাল ধরিয়া নিত্য আনন্দকে সন্ধান করিয়া বেড়ায়। তাই কোন অভ্যস্ত ব্যাপারই তাহাকে চিরকাল আনন্দ দেয় না। সত্যবান আধুনিক যুগের প্রতীক—বনানী ও সুরমাও তাহাই। আধুনিক যুগের মানুষ পারিপার্শ্বিকের নানা সমস্যাজালে আকীর্ণ হইয়া মানসিক সাম্য হারাইয়া ফেলিযাছে। কিসে তাহার তৃপ্তি সে নিজেই জানে না। আধুনিক মানুষের অবস্থা সুরমার মতই। সুরমা স্বামী ত্যাগ করিয়াছে, জীবনকে স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই স্বেচ্ছাগতি কিন্তু তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্ত করিযাছে। অবশেষে দুর্ব্বহ শ্রান্তি অনুগোপন করিয়া সে আত্মগোপন করিয়াছে। সত্যবান প্রথমে সুরমা, পরে বনানীর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছে—কিন্তু তাহার মনের চলিষ্ণু গতি সতীর পুরাতন প্রেমেই স্থিতি লাভ করিয়াছে। সে আবিষ্কার করিয়াছে স্ত্রীর প্রেমে যে স্বাতন্ত্র্য সে চাহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থ ও আত্মাভিমানসঞ্জাত। বনানী শিশিরের কর্ম্মসঙ্গিনী। শিশির অতি আধুনিক মানুষ। সে সমাজকে গঠন করিতেই ব্যস্ত, মানুষের হৃদয়ধর্মের মূল্য তাহার কাছে নাই। বনানী মুহূর্ত্তকালের মোহে সত্যবানের আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু অতৃপ্ত কামনা শিশিরের কর্ম্মসঙ্গিনী তাহাকে করিয়াছে। এই দ্বিধাবিভক্ত মন লইয়া সে জীবনে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক জীবনে মানুষ সমস্যাকে বড় করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সমস্যা ভূতের মত তাহার সকল কর্ম, চিন্তা, হৃদয়ধর্ম্মকে দুই কঠিন হাতে নিষ্পেষিত করিতেছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাস দেখাইয়াছে মানুষ সঙ্কীর্ণ মনোবিলাস স্বসৃষ্ট দুঃখ লইয়া মত্ত। সে সমস্যার পরিমাপে পা ফেলিয়া চলাকে পরিহার করিয়াছে। জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড প্রাণোন্মাদনা গ্রন্থের পাত্রপাত্রীদের রক্তে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। শৈলেন, সাতকড়ির মত জীবনের সঙ্কীর্ণ ভোগের মধ্যে নিজেদের তাহারা বদ্ধ রাখিতে পারে নাই। একদিকে যেখানে মানুষের দুঃখের অন্ত নাই, বেদনা আকাশস্পর্শী, সেখানে সমাজের সকল বিষকে ইহারা আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে চায়। ইহারাই প্রকৃত মানুষ। মানুষের বেদনা ইহাদের অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে, গৃহের উত্তপ্ত সুখশয্যাতল কণ্টকশয্যা হইয়াছে। উন্মাদের মত মানুষের জীবনের সকল দুঃখ লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে সংগ্রামে নামিয়াছে।

গোপাল হালদার

নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাস মানুষের লাঞ্ছনা বেদনা অপমানের ইতিহাস। আধুনিক সমাজে মুষ্টিমেয় নরদেহধারী পশু কর্ত্তা হইয়াছে। অর্থের কামনা, ভোগের কামনা, রূপের কামনা—চতুর্দ্দিকে কামনার বেড়াজাল। সেই বেড়াজালের রজ্জু অসহায় নিরীহ মানুষের গলদেশে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হয়। দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া মানুষ মানুষের মনুষ্যত্ব, কোমল সহজ বৃত্তিগুলি ক্রয় করিতেছে। হরনাথের নিদারুণ দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া গোবিন্দ মোক্তার জাল পাতে। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা মনুষ্যত্ব, পিতৃত্ববোধ লুপ্ত করিয়া দেয়। অর্থলোভী, কামুকের দেবতা গোবিন্দ মোক্তার হরনাথের পিতৃত্বকে লাঞ্ছিত করে। পিতৃত্ব ভুলিয়া হরনাথ কন্যাকে গোবিন্দ মোক্তারের কামনার বহ্নিতে দগ্ধ করে। মিলমালিকদের সর্ব্বনাশা প্রচণ্ড লাভের লোভ উমেশ ও গঙ্গার মত বিশ্বাস-ঘাতককে সৃজন করে। উহারা সামান্য অর্থ ও সুবিধালাভের জন্য মানুষকে হত্যা করে, বৃহত্তর শ্রমিক স্বার্থকে মিলমালিকদের হাতে তুলিয়া দেয়। শঙ্কর অসহায়া মাতার দেহবিক্রয়ের অর্থে লালিত হয়। সন্তানের মুখ চাহিয়া মা নারীর চিরযত্নের বস্তুকে বিসর্জ্জন দেয়। কবি তপন মানুষের জয়গান গাহিয়াছে, নূতন সৃষ্টির রূপ কল্পনা করিয়াছে ; কিন্তু অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়।

নবেন্দু ঘোষ

এই লোভ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের পাশেই অনমনীয় চরিত্র শেখরকে দেখি। শ্রমিকস্বার্থকে নিজের দায় মনে করিয়া প্রাণ দেয়—সে প্রাণবিসর্জ্জন শ্রমিককে,

হতভাগ্য দরিদ্র মানুষকে ভালবাসার ফল। প্রমথ সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আজীবন পথিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে চল্লিশকোটি নরনারীর দুঃখ নিজের করিতে। কল্যাণী সন্তানদের অন্তরে মানবপ্রেমের প্রেরণা যোগাইয়াছে। তাহারই সন্তানগণকে একে একে সে বৃহত্তর মানবের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসে আধুনিক শিল্পাঞ্চলের জীবনের একটি স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কারখানার মালিকগণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, লাভের আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন—সকলই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বৃষ্টির দিনে শ্রমিকদের বাসগৃহ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে, প্রচণ্ড উত্তাপে কাজ করিতে গিয়া শ্রমিক সংজ্ঞা হারায়—মালিকগণের দেহে ও মনে কোন আঁচড়ই পড়ে না। অথচ এই শ্রমিকদের রক্তজলকরা পরিশ্রমের উপরই যন্ত্রশিল্প দাঁড়াইয়া আছে। মালিক তাহার লাভের খতিয়ান দেখিতে গিয়া ভুলিয়া যায় উহারাও মানুষ। শ্রমিকরাও পরস্পর স্বার্থশূন্য নহে। মালিকদের প্ররোচনা ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধ সহজেই তাহাদের দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। অনিরুদ্ধ শ্রমিকস্বার্থকে—মানুষের সহজ বাঁচার দাযকে অস্বীকার করে। মন্দাকিনী দেবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও নিজ অভিজ্ঞতাবলে এই বৈষম্যকে স্বীকার করিতে পাবে নাই। মন্দার বিদ্রোহ স্বার্থলুব্ধ প্রস্তরীভূত অনিমেষের হৃদয়ের দুর্ব্বল কেন্দ্রকে নাড়িয়া দিয়াছে—সে ক্রমেই ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং অবশেষে অপসৃত হইয়াছে। দেবুর আদর্শ ও মানবতাবোধ মন্দাকে আকৃষ্ট করিল, কিন্তু নিরাশ ভগ্নহৃদয়ে সে জীবনের সমাপ্তি ঘটাইয়াছে। মানবধর্ম্মে বিশ্বাসী দেবু অতি সহজেই মন্দাকে বিস্মৃত হইয়াছে এবং অতি সাধারণ সংসারের মানুষ হইয়াছে—আদর্শবাদ ধুইয়া গিয়াছে। উপন্যাসের শেষাংশে অমলার হৃদয়ে অকস্মাৎ প্রেমের স্ফুরণ ও উভয়ের প্রেমোন্মুখ চিত্র কিছুটা অস্বাভাবিক এবং মানবীয় স্পর্শহীন হইয়াছে। দেবুর চরিত্র অতি মাত্রায় চঞ্চল এবং হৃদয়বোধহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাব, ভাষা, বর্ণনা, সাহিত্যের অঙ্গকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সাহিত্যের আসল কথা মানুষের সৃষ্টি। সাহিত্যে আমরা চাই মানুষের সেই আসল রূপ, মানবিক স্পর্শ। সুতরাং এযুগ সেযুগ সকল যুগেই সাহিত্যে আছে মানবীয় রস। এই মানবীয় রসের যোগানই সাহিত্যকে

চিরস্থায়ী আসন দান করে। মানবীয় রসের অভাব ঘটিলে তাহা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে না—তাহা নিতান্ত অবাস্তব, অসংলগ্ন এবং ভাবাতিরেক দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

একাদশ অধ্যায়

সাহিত্যে প্রাণধর্ম্ম

ওঁ প্রাণায় স্বাহা। যাহা কিছু জীবন্ত, যাহা কিছু চলিষ্ণু, তাহার মধ্যেই প্রাণ বিরাজমান। শিল্প, কলা, সাহিত্য, সঙ্গীতের মধ্যেও এই প্রাণের সাড়া না থাকিলে তাহা নিতান্ত গতানুগতিক এবং সহজেই কালের পথ হইতে অপসৃত হইয়া যায়। শিল্পী, কবি, গায়ক সকলেই তাঁহাদের হৃদয়ের রক্ত দিয়া, নিজের প্রাণ দিয়া তাহাকে রচনা করেন। সৃষ্টি স্রষ্টার প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিলে তবেই তাহা সার্থক, তবেই তাহা হৃদয়ের নিবিড় উত্তাপের স্পর্শ পাইয়া থাকে। যুগে যুগে সাহিত্যে এমনই নিবিড় প্রাণের উত্তাপ লাগে। পারিপার্শ্বিকের গতানুগতিক নিয়ম নিগড়ে বদ্ধ প্রাণহীন সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠে—প্রাণের উত্তাপে শতাব্দীর মোহনিদ্রা, জড়ত্ব টুটিয়া যায়। সম্মিলিত জাতির মিলিত উত্তাপ যখনই একজনের মধ্যে সংহত হয়, সেই বিশেষ মানুষের আবির্ভাব আসন্ন হয়। সেই প্রাণের মানুষ যখন আসিয়া দাঁড়ান, জগতের অন্তরে নূতন প্রাণস্পন্দন শঙ্খধ্বনিতে দিগদিগন্ত মুখরিত করে। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে—জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাণের সাড়া পড়িয়া যায়।

প্রাণের ধর্ম্ম

বৈষ্ণব সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইতে এমনই প্রাণবন্যার উন্মাদ কলরোল দূর ইতিহাসের তটভূমি হইতে ভাসিয়া আসিয়া বর্ত্তমানের তীরে আঘাত করে। মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ একদা নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও আহারের অন্বেষণে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাস বড় বিচিত্র! যুগে যুগে অভিযানকারীর দল এখানে আসিয়াছে, তারপর রাসায়নিক মিশ্রণে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। যেদিন দীর্ঘকায়, সুগৌর, পিঙ্গলকেশসমৃদ্ধ, আয়তনেত্র আর্য্যগণ ভারতে দলে দলে

বৈদিক যুগের সরলতা

প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের জীবনের ধারা অতি সরল ও সহজ ছিল। ধর্ম্ম সেদিন নিতান্তই প্রাণের বস্তু ছিল। প্রকৃতির নানা বিচিত্র রূপের মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত অসীম লীলা তাঁহারা অতি সহজে প্রত্যক্ষ করিতেন। উপনিষদের নানা কাণ্ডে বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে অসংখ্য কাহিনী আছে। এই সাহিত্যে মানুষের সহজ প্রাণের কথা। সেদিন জীবনযাত্রা সহজ ও সরল ছিল—জবালাপুত্র সত্যকাম সত্যের খাতিরে 'ভর্ত্তৃহীনা জবালার' সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী সত্যকাম মিথ্যার আশ্রয় লইবে না—ব্রহ্মর্ষি গৌতম তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। জীবনের মধ্যে যেমন সরল অনাড়ম্বর ধারা প্রসারিত ছিল, সাহিত্যেও সেই প্রাণের কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। জীবন্ত সাহিত্য জীবন্ত মানুষেরই প্রতিচ্ছবি।

সামাজিক জটিলতা

ক্রমেই বৈদিক সমাজ জটিলতর হইল। ধর্ম্মের নানা জটিল বিভাগ, সমাজের মধ্যে নানা স্তরভেদ দেখা দিল। ধর্ম্ম সহজ অনাড়ম্বর প্রাণের জিনিস রহিল না। রামায়ণ ও মহাভারতে সমাজজীবনের ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখা যায়। মহাভারতের যুগে অন্যায়, লোভ, পাপাচার ক্রমেই বাড়িতেছিল, কিন্তু মানুষের শুভ বুদ্ধি তখনও আচ্ছন্ন হয় নাই। ধর্ম্মের সহিত সাধারণ মানুষের প্রাণের যোগ ক্রমেই ছিন্ন হইতে লাগিল। মানুষ প্রাণের বেদনার আশ্রয় ধর্ম্মের মধ্যে আর পাইল না—প্রাণের ঠাকুর ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। মানুষ ধর্ম্মের মধ্যে শান্তি আর পাইল না। অর্থহীন নানা আচারের তাড়না চলিতে লাগিল। বলির নামে অন্তরের পাপকে বিসর্জ্জন না দিয়া নিরীহ পশুর রক্তে ধরণী সিক্ত হইয়া গেল। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতে লাগিল। রাজ্যের লোভে কৌশাম্বী, কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের মধ্যে হানাহানি, হিংসা, দ্বেষ পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। সাধারণ প্রজাকুলের দুঃখের অবধি রহিল না। একদিকে ধর্ম্মের প্রাণহীন শুষ্ক নানা যজ্ঞ প্রকরণ, অপরদিকে রাজপুরুষগণের মধ্যে আপনাপন স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ইহার মধ্যে পড়িয়া মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের নামে নানা ব্যভিচার ও পাপ প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। প্রীতি, প্রেম, দয়া, করুণা, মৈত্রী—সকলই পুস্তকগত ভাবে পরিণত হইল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা দৃষ্ট হয়। মানুষের হৃদয় বেদনার্ত্ত হইয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিল। একজন প্রাণের মানুষের জন্য দেশে দেশে দিকে দিকে আকুল ক্রন্দন ছুটিল,

আবির্ভূত হইলেন তথাগত বুদ্ধ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর জরবিকারগ্রস্ত উত্তপ্ত দেহে বারি সিঞ্চন করিতে শান্তির অমৃতধারার পূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া তিনি আসিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী দিকে দিকে প্রচারিত হইল। মদোন্মত্ত রাজন্যবর্গের উচ্চশির ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। মগধরাজ বিম্বিসার, অজাতশত্রু, কোশলরাজ উদয়ন, কাশীরাজ প্রসেনজিৎ উদ্ধত মস্তক বুদ্ধের চরণে অবনত করিলেন। অসংখ্য অস্পৃশ্য অন্ত্যজ মানুষের দল প্রাণের ঠাকুরের সন্ধান পাইল। দলে দলে তাহারা করুণাময়ের পদে আত্মসমর্পণ করিল—তাহাদের প্রাণের ভাষা বুদ্ধের বাণীর মধ্য দিয়া রূপ পাইল। সাহিত্যেও আসিল বিরাট পরিবর্ত্তন। সংস্কৃতের সন্ধিসমাসবদ্ধ মন্থর গতির পরিবর্ত্তে আসিল প্রাকৃত সাহিত্য। প্রাকৃত বা প্রকৃতিজনের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। ভাবের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল—বন্যার মত অজস্র বুদ্ধচরিত, জাতক কাহিনী, থেরী গাথা রচিত হইতে লাগিল। ইহার পর মৌর্য্যসম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ধর্ম্মবিজয়ের দুন্দুভি বাজাইয়া আসিলেন। বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বাণী পৃথিবীতে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পথভ্রান্ত তৃষিত মানবকে শুনাইতে পরিব্রাজকের দল সংসারের সঙ্কীর্ণ সুখকে পরিহার করিয়া ছুটিল। কেবল সাহিত্যে নহে, শিল্পেও অভিনব প্রাণস্পন্দন জাগিল। অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, নালন্দা, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নানা স্থানে শিল্পের নব জাগরণ দেখা দিল। প্রাণস্রোত আপনাকে কোন বিশেষ পাত্রে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দুর্ব্বার বেগে এই অফুরন্ত প্রাণের বেগ জীবনের সকল দিককে মহীয়ান্ করিয়া তুলিল।

সমাজে ও সাহিত্যে নবজাগরণ (বৌদ্ধ যুগ)

বৈচিত্র্যময় এই জগৎ। কিছুই এখানে চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না। বুদ্ধের অমৃতময়ী বাণীর মূল ভাব ক্রমেই বিকৃত হইতে লাগিল। জাতির মধ্যে আত্মকলহ, স্বার্থসর্ব্বস্বতা, নীচতা, ভেদজ্ঞান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মহারাজ হর্ষ এই অন্ধকারময় যুগে একটি দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। হর্ষের জীবনান্তে ভারতের ইতিহাস ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইতিহাসের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া সমগ্র ভারতের বুকে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায়, লোভ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি রচনাতেই ভারতীয় রাজন্যবর্গ ব্যস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ভারত একটি মিলনের সুরে ঐক্যবদ্ধ নহে, জাতিতে, রাজ্যে, সমাজে সর্ব্বত্রই বিভেদ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন

বিমল শুভ্র জ্যোতিঃ ব্যভিচার ও বিলাসের কৃষ্ণ ধূমে কলঙ্কিত। ধর্ম্মের নামে সমগ্র দেশ জুড়িয়া পিশাচ ও ভূতপ্রেতের তাণ্ডব চলিতেছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্মে অসংখ্য দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারগুলি পাপ কর্ম্ম এবং ব্যভিচারের গোপন সজ্ঘ হইযাছে। সজ্ঘ বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম্মাদর্শ বিস্মৃত হইযাছে—বুদ্ধের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইযাছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ধর্ম্মের নামে মানুষকে পাপের পথ দেখাইযাছে। কেবল তাহাই নহে, যে রক্তপাত বুদ্ধকে করুণায আর্দ্র করিযাছিল, যজ্ঞে নিরীহ পশু হত্যাকে যিনি পাপ বলিযা ঘোষণা করিযাছিলেন—বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সেই রক্তপাতকে ধর্ম্মপথের সহায বলিযা ঘোষণা করিলেন। জনসাধারণ চতুর্দ্দিকের বিচিত্র পরিবেশে বিভ্রান্ত হইযা পডিল। একদিকে স্বার্থলোলুপ রাজন্যবর্গের নিত্য দ্বন্দ্ব এবং মরণ-মহাযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান, অপর দিকে ধর্ম্মের নামে পশু হত্যা, নর হত্যা, ব্যভিচারের অবাধ স্রোত চলিতেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোন প্রাণ, কোন চাঞ্চল্য, কোন আনন্দের চিহ্ন নাই। অধিকাংশ লোক অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিযা গ্রহণ করিল তদানীন্তন সাহিত্যে, শিল্পে গতানুগতিক, নিষ্প্রাণ সৃষ্টি চলিতেছিল। মুষ্টিমেয মানুষ বিকৃতধর্ম্ম এবং খণ্ড ছিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণশক্তিকে প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টায ব্যাকুল হইল।

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, ধর্ম্মের নামে নানা কদাচার সমাজকে ধ্বংস করিতে লাগিল, তাহার প্রাণশক্তিকে ক্ষীণ করিযা ফেলিতে লাগিল। এমনই সমযে দণ্ড হস্তে আবির্ভূত হইলেন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য। ধর্ম্মের বিকৃতি, মিথ্যাচার, ব্যভিচার, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন, জাতি ও সমাজকে ক্রমেই ক্ষয করিয়া ফেলিতেছিল। ইহা ত প্রাণের ধর্ম্ম নহে, ইহা মৃত্যুর লক্ষণ। শঙ্কর সবলে সমাজের এই দ্রুত ক্ষযকারী কালবন্যাকে বাঁধ দিলেন। জাতিকে ব্রহ্মচর্য্য পালন, সন্ন্যাসের গৌরব, জীবনের অনিত্যতা এবং মাযার খেলা বিষযে সচেতন করিযা দিলেন। বদরিকা হইতে কুমারিকা, শ্রীক্ষেত্র হইতে দ্বারকা বিদ্যুতের গতিতে আচার্য্য সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জাতির মরাগাঙে প্রাণের জোযার আসিল। লক্ষ লক্ষ গেরুযা দণ্ডধারী ব্রহ্মচর্য্যপরাযণ যতির দল ভারতের সর্ব্বত্র সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কুমারিল ভট্ট, সাযনাচার্য্য, মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যের দল দর্শন ও সাহিত্যে নবীন প্রাণধারা বহন করিযা আনিলেন। লক্ষ লক্ষ গৃহ শঙ্কররচিত সুললিত স্তবগানে মুখরিত হইয়া উঠিল।

শঙ্করের আবির্ভাব ও সংস্কার

শঙ্করের মতবাদ অধিক দিন চলিল না। প্রকৃতি মানুষের অন্তরে থাকিয়া গোপনে কার্য্য করাইয়া লন। প্রকৃতির বিরোধিতা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সন্ন্যাসীর ব্রত পালন খুব বেশীদিন চলিল না। এদিকে রাষ্ট্রশক্তি ক্রমেই আত্মকলহে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িতেছিল। বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাজন্যবর্গের অবসানে তাঁহাদের দুর্ব্বল উত্তরাধিকারীগণ যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমেই শক্তিক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল। গুর্জর-প্রতীহার, পাল, সেন, চোল, চালুক্য, পল্লব, গঙ্গ প্রভৃতি বংশের মধ্যে হানাহানির ফলে সাধারণের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। অরাজকতার ফলে দেশের মানুষের প্রাণহানি শস্যহানি সম্ভ্রমহানি ঘটিতে লাগিল। মানুষ কোথাও আর দাঁড়াইবার দৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইল না। শঙ্করের মায়াবাদ মানুষকে বেশীদিন আকৃষ্ট করিতে পারিল না। শুষ্ক জ্ঞান, তর্কের কচকচি পণ্ডিতগণের আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। অদ্বৈতবাদের তর্ককণ্টকিত নানা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যজনিত উত্তাপ মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। একদিকে ধর্ম্মের শুষ্ক বহিরঙ্গ লইয়া তর্কের ঝড় বহিতেছে, অপরদিকে বিকৃত বৌদ্ধ, অনাচারী শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের সমন্বয়ে দেশ জুড়িয়া ব্যভিচারের বীভৎস লীলা চলিতেছে।

রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক দুর্দ্দশা

তন্ত্রসাধনার নামে তখন সমগ্র রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে গোপন কামলীলা চলিতেছে। এই ব্যভিচার সমাজের রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়াছে। ইহা শঙ্করের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যেন বিক্ষোভিত প্রতিবাদ। কিন্তু সেই প্রতিবাদ স্বাভাবিক সহজ গতি না পাইয়া কুৎসিত, অতি পিচ্ছিল পথে পদক্ষেপ করিল। মানুষ অবাধ যৌনতৃপ্তির মধ্যে জীবনে বিচিত্রতার স্বাদ অনুভব করিতে চাহিল। ধর্ম্মও বিকৃত হইয়া সমাজের এই কামলিপ্সার সহায়ক হইয়া উঠিল। তন্ত্রসাধনার নামে নারী-উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে চরিত্র-হীনতা ও অবাধ যৌনমুক্তি চলিতে লাগিল। সাহিত্যে, শিল্পে, সর্ব্বত্রই কদর্য্য রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবাধ ব্যভিচার জাতিকে বীর্য্যহীন ভ্রষ্ট-চরিত্র করিয়া ফেলিল। অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের প্রচণ্ড প্লাবন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

বিকৃত তন্ত্রধর্ম্ম

দেশব্যাপী এই ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলার মধ্যে নূতন সুরে বীণার ঝঙ্কার তুলিলেন কবি জয়দেব। পথভ্রষ্ট ব্যভিচারী মানুষ সেদিন অন্তর-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের প্রাণ বিশুদ্ধ প্রেমে জীবনের গানে আশ্রয়

চাহিতেছিল। বাঙ্গালার সমাজে সেদিন গৃহে গৃহে নারীদেহকে লইয়া বীভৎস কামলীলা চলিতেছিল। আখড়ায়, মোহান্তদের সেবাশ্রমে, তান্ত্রিকের আড্ডায়, বৈষ্ণবের কুঞ্জে, ধনীর উপবনে—সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে নির্লজ্জ ব্যভিচার চলিতেছে।

সমাজ যখন কর্ম্মে শক্তিতে ঐশ্বর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে—কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে প্রতিভার জাগরণ দেখা যায়। কিন্তু নিবীর্য্য, ক্ষীয়মান সমাজে তাহার সকল কর্ম্ম উৎস প্রাণশক্তির অভাবে শুকাইয়া যায়। এই অবনত সমাজ একবার শেষবারের মত কবি জয়দেবের মধ্য দিয়া তাহার মুমূর্ষু প্রাণকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষের মধ্য দিয়া সমাজের অবশিষ্ট প্রাণের প্রকাশ ঘটিল। ধর্ম্মের বিকৃতি সমাজকে দ্রুত অধোগতির পথে লইয়া যাইতেছিল, অধঃপতনের সময় আসন্ন হইয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃত প্রতিক্রিয়া হইতে ঘুণধরা সমাজকে রক্ষা করিতে আবির্ভূত হইলেন মহাপ্রভু। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সাহিত্যে সেই প্রাণময় প্রেমিক পুরুষের শুভ আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিলেন কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

দেহসাধনার ব্যভিচারের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাদেশ দেহসর্ব্বস্ব অধোগতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। কবি জয়দেব মুমূর্ষু, দেহবিলাসী জাতিকে শুনাইলেন দেহাতীত দিব্য প্রেমের কথা। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে মহাপ্রভু বিরাট বিপ্লব আনিয়া দিলেন। কল্পিত নানা সৃষ্ট আচার, ধর্ম্মের নামে কদাচার বাঙ্গালাকে প্রাণহীন, শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল—জাতি ও সমাজ এক সর্ব্বনাশা প্রচণ্ড জঙ্গলের সম্মুখীন হইয়াছিল। আর একদিকে প্রবল ইসলাম প্রচণ্ড বলে জাতি ও সমাজের উপর আঘাত হানিতেছিল। সমগ্র দেশ তুর্কশাসনের অধিকারে বীর্য্যহীন শক্তিহীন হইয়া স্বধর্ম্ম, আচার ত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মীতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। মহাপ্রভু আচণ্ডাল মানুষকে মানবতার অধিকার দান করিলেন। প্রাণহীন, শক্তিহীন দেশে তিনি আনিলেন এক প্রচণ্ড বিপ্লব। সেই বিপ্লবের অগ্রদূত কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

কবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে প্রেমের নূতন ইঙ্গিত দিলেন। বাংলার বিভ্রান্ত জনমানসে নূতন চেতনা জাগিয়া উঠিল। গৌড় ও মিথিলার ঐশ্বর্য্যময় বিলাসসঙ্কুল রাজদরবারের দুই সভাকবি মানুষের সহজ প্রাণের কথা

বৈষ্ণব কবিতার জন্ম

গাহিলেন। কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালার জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে নিবীর্য্য হইতে চলিয়াছে। জীবনের সকল উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সমাজের উচ্চ স্তরে

বিকৃত তন্ত্রসাধনার আড়ালে চলিতেছে নারীদেহ লইয়া বীভৎস টানাটানি নীচস্তরে কোন অন্তরালের প্রয়োজন হয় নাই—দিবালোকে পথে ঘাটে সুরাপায়ী মানুষ ও গণিকার অবাধ মিলন চলিতেছিল। জয়দেব তাহার বীণার ঝঙ্কারে মানুষকে প্রেমের আসল রূপের কথা শোনাইলেন। মানুষ অন্তরের তৃষ্ণায় বিভ্রান্ত হইয়া ভ্রান্তপথগামী হয়, কারণ তৃষ্ণার আসল রূপটি তাহার নিকট জ্ঞাত থাকে না। সেই তৃষ্ণাই মানুষের জীবনের চরম সত্য। তৃষ্ণার সুশীতল পেয়কে ভুলিয়া গিয়া উজ্জ্বল ফেনিল সুরাকে সে পিপাসা মিটানোর জন্য আকণ্ঠ পান করে। জয়দেব মানুষের সেই পিপাসার শান্তি দিলেন নির্ম্মল রস সৃষ্টি করিয়া। জয়দেবের রসসাধনা তৃষ্ণাতুর বাঙ্গালার চিত্তকে শান্ত করিল, ভবিষ্যতের মহান্ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিল।

জয়দেব এবং চণ্ডীদাস দুজনেই জীবনে একান্ত প্রেমের সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের সাধনাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইযাছে। সেইজন্যই গীতগোবিন্দ ও পদাবলী উভযই এত প্রাণধর্ম্মী। জীবনের অনুভূত সত্যকে তাঁহারা কাব্যে প্রকাশ করেন। সেই প্রেমসাধনাকে মহাপ্রভু ধর্ম্মে পরিণত করেন।

অজয়ের তীরে কবি জয়দেব বাঁশীর যে তান ধরিলেন তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিলেন মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি। গতানুগতিক নিয়মবদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের নিগড় ভাঙ্গিযা নূতন সুরে প্রাণের কথা বাজিল। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ অনুকরণ করিযা নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা এবং মিলনই একমাত্র লক্ষ্য রহিল না। মানুষের মনের গোপন রহস্য, মিলনের অসহ্য পুলক, বিচ্ছেদদীর্ণ হৃদয়ের নিবিড় বেদনা, অভিমানের বক্র কটাক্ষ এবং রক্তিম চাহনি জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনায় ছত্রে ছত্রে প্রাণস্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। বিভ্রান্ত মুমূর্ষু জাতি সুদীর্ঘকাল যেন ইহারই জন্য শবসাধনা করিয়া আসিতেছিল।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদাবলীর গীতি-উচ্ছ্বাস, বৈষ্ণব পদাবলীর খাত বহিয়া আসিয়া আধুনিক সাহিত্যের গীতিকাব্যের ফসলে রস যোগাইয়াছে। মহাপ্রভু তাঁহার শেষ জীবনে দিব্যোন্মাদাবস্থায় দিবারাত্র জয়দেবের পদাবলী আস্বাদ করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
দু হে শ্লোক গীতে প্রচুর করায় আনন্দ॥"

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আস্বাদিত হওয়ায় ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহাকে মহা সমাদরে

হৃদয়ে ধারণ করিলেন। মহাপ্রভু ভাবাবস্থায় গীতগোবিন্দের পদগুলি আস্বাদ করিয়া প্রমাণ করিলেন যে রাধার ভাব কেবলমাত্র কবিকল্পনা নহে, গীতগোবিন্দ ভক্ত কবির প্রাণের সামগ্রী। তাঁহার জীবনে গীতগোবিন্দের প্রভাব ওতোপ্রোতঃ ভাবে দেখিতে পাই। চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

গীতগোবিন্দের ধারা অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের এক বিপুল রত্নভাণ্ডার প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ গীতিকবিতার নূতন সুরে বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জ কলকণ্ঠে মুখর করিয়া তুলিলেন। গীতগোবিন্দের জন্ম না হইলে বাঙ্গালার বৈষ্ণবসাহিত্য এমন সমৃদ্ধশালী এবং প্রাণবন্ত হইত কি না সন্দেহ।

চণ্ডীদাস আরও সহজ কথায় সহজ ভাবে প্রাণের কথা বলিলেন। তাঁহার ভাবের পদগুলি দেশে ছড়াইয়া পড়িল। দেশের মানুষ প্রাণের এই সহজ কথাগুলির মধ্যে নিজেদের অন্তরের কথা শুনিতে পাইল।

কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের এই ত্রিধারা একটি স্রোতে তখন মিলিত হয় নাই। দেশের পরিস্থিতি তখনও এই ভাবমন্দাকিনীর ধারাকে কল্লোলিনী প্রাণবেগ-শালিনী সৃষ্টিসম্পদপূর্ণা সুরধুনীতে পরিণত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। দেশে নানা অনার্য্য দেবদেবী—মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম্মরায়, সত্যপীর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন। সাহিত্যেও তাঁহাদেরই পূজা প্রচার, মহিমাগান মহা দুন্দুভিরবে ঘোষিত হইয়াছে। মানুষ তাঁহাদের কৃপার পাত্র, তাঁহাদের অঙ্গুলী নির্দ্দেশ তাঁহাদের অসন্তুষ্টি বিধান মানুষকে দুর্দ্দশার চরমাবস্থায় নিক্ষেপ করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য বলিতে কিছু নাই—সে তাঁহাদের মর্ত্ত্যে পূজাপ্রচারের উপায়। এই দেবতার নকিববৃন্দও সাহিত্যে একই সুরে কূজন শুরু করিয়াছিলেন। কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে কবিদের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। এই সকল কাব্যে প্রাণের স্ফূর্ত্তি নাই, চিন্তার স্বাধীনতা নাই, কল্পনার উদ্দাম গতি নাই। কাব্যগুলির পুরুষ চরিত্র সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা নাই, দেবতার প্রসাদের জন্য হাহাকার আছে। জাতির বীর্য্যহীনতা, নিষ্প্রাণতা এবং নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব এই সকল সাহিত্যে ভাল করিয়াই লক্ষ্য করা যায়।

লৌকিক ধর্ম্মের প্রতাপ এবং সামাজিক দুরবস্থা

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে মুসলমান শক্তির প্রচণ্ড প্লাবনে অন্তর্দ্বন্দ্বে

ক্ষীণপ্রাণ রাজশক্তি এবং বিকৃত আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মসঙ্ঘ ধ্বংস হইল। দেশব্যাপী মহা বিশৃঙ্খলা, অবাধ হত্যা, লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। নিবীর্য্য জাতির অঙ্গুলী হেলনের ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। সাহিত্যসৃষ্টিও কিছুদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল।

মুসলমান আক্রমণ

ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকাল হইতে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিল। একটা প্রচণ্ড তাণ্ডবের পর দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। মুসলমান শক্তির মধ্যস্থায় আর্য্য অনার্য্য সভ্যতার মিলনে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নূতন প্রাণের আবির্ভাব ঘটিল। জাতির প্রাণের মূর্ত্তিমান প্রতীক "বাঙ্গালীর হিযা-অমিয় মথিযা" শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে বাঙ্গালী জাতি তাহার দোষ-গুণ ভাল-মন্দ সকল বৈশিষ্ট্য লইযা এক অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ দেখাইল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব

মুসলমান অভিযানে দেশে যে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল, সর্ব্বনাশের কবাল বন্যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে তলাইযা দিল। স্থানীয অনার্য্য মনোভাব ক্রমেই প্রসারিত হইতে লাগিল। আর্য্যেতর ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কার ক্রমেই মানুষের মনে দৃঢ় হইতে লাগিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয শোচনীয অবস্থা মানুষকে জ্ঞানের বন্ধুর পথে চলিবার শক্তি যোগাইল না। এই সকল দেবতার আশ্রিত সাহিত্যও রচিত এবং পঠিত হইতে লাগিল। মানুষ চতুষ্পার্শ্বের অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সহজেই মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ধর্ম্মরায প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ফলদাতা দেবতার শরণাপন্ন হইল। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এই সকল ছড়া পাঁচালী গাথার নীচে চাপা পড়িযা গেল।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একটি নিখুঁত বর্ণনা দিযাছেন।

"রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥

ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায।
এই মত জগতেব ব্যর্থ কাল যায ॥
যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহাবাহ না জানযে গ্রন্থ অনুভব ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তনে।
দোষ বিনা গুণ কার না কবে কথনে ॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥”

বাঙ্গালা সাহিত্যের পবিপূর্ণ এবং প্রাণময রূপ দিলেন মহাপ্রভু। তাঁহাব আবির্ভাব নিস্প্রাণ বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা দিল, বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রবল স্রোত বহিল। অলৌকিক দেবকাহিনীর পাশাপাশি লৌকিক দেবোত্তব মানবচবিত্রও সাহিত্যের বিষয় হইল। অপদেবতার পূজা ও সাধনা হইতে বাঙ্গালী মুখ ফিবাইল। তাহাবই ঘবে মানুষেব দেহে দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিল। মানুষেব সাধনা, প্রাণেব সাধনা বড হইযা উঠিল। রাইকানুর যে প্রেমকাহিনী নিতান্ত লৌকিক ও গ্রাম্য সাহিত্য ছিল, তাহাকে সার্ব্বজনীন সাহিত্যের রূপ দিতে আগাইযা আসিলেন অসংখ্য বিদগ্ধ ও ভক্তিমান্ কবি এবং সাধক। জযদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব পদেব অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও সম্মান দিলেন মহাপ্রভু। এই কবিত্রযকে মাথায রাখিযা কবিরা কাব্য রচনা করিতে বসিযা গেলেন। দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনা আর নয, দেবকল্প মহাপুরুষগণের জীবনকাহিনী রচিত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতির প্রাণান্ত চেষ্টায উন্মার্গগামী জাতিব পথ ঘুবিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতির ভাবোন্মাদনা বাঙ্গালীকে বৈষ্ণব করিযা তুলিল। বাঙ্গালা সাহিত্যেও বৈষ্ণবীয ভাবধারা স্বাধীন কল্পনা ও উন্মাদ প্রাণবন্যার কলবোল আনিয়া দিল। মরা দেশ দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগিযা উঠিযা শুনিল কুঞ্জে কুঞ্জে প্রভাতী সঙ্গীতেব কলগুঞ্জন।

মহাপ্রভুর জীবনেব প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে অলৌকিক দৈবীভাবে উজ্জ্বল হইযা উঠিযাছে, তাহা শত শত সাধক, ভক্ত ও কবিকে নবভাবে অনুপ্রাণিত করিযাছে। গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের দবীর খাস রূপ, সাকর মল্লিক সনাতন, সপ্তগ্রামের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজপুত্র রঘুনাথ তাঁহারই আদর্শে

অনুপ্রাণিত হইয়া রাজভোগ ঐশ্বর্য্য পথের ধূলির সম হীন জ্ঞান করিয়া বৈরাগীর কন্থাকে সমাদরে মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। রায় রামানন্দ তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস পশ্চাতে ফেলিযা নীলাচলে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম অধিকারী স্বয়ং প্রতাপরুদ্র তাঁহার নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের অগণ্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীগণ আপনাদের ধন, মান, গৌরব, আভিজাত্য বিসর্জ্জন দিয়া এই কৃচ্ছ্রসাধনকৃশ বহির্বাস-পরিহিত, ধূলিধূসর দণ্ডপাণি মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিযাছেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সনাতন, রূপ, নিত্যানন্দ, নরোত্তমদাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং সাধকবৃন্দ সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব আদর্শ এবং ধর্ম্ম প্রচার করিযা বেড়াইয়াছেন। জগাই-মাধাইযের মত সুরাপাযী কদাচারী মানুষ এই প্রাণের ঠাকুরের স্পর্শে ধন্য হইয়াছে—তাহাদের মোহাচ্ছন্ন চিত্ত প্রাণের আলোকে, প্রেমের আলোকে জাগিযা উঠিযাছে। এই প্রেমই ত প্রাণ—যে প্রেম কোন আঘাত, কোন মৃত্যুভয়ের সামনে অগ্রসর হইতে ভীত হয না। মৃত্যুঞ্জযী এই প্রচণ্ড প্রাণের বন্যার সম্মুখে পাষণ্ডের উদ্যত হস্ত, উদ্ধত শির পদপ্রান্তে লুটাইযা পড়ে, নূতন জন্ম হয। এমনই অগণ্য কোটি পথবিভ্রান্ত মানব তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র এবং উপদেশ, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিযা ধন্য হইয়াছে।

মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী কাব্যে ও নাটকে রচিত হইতে আরম্ভ হইল। সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইল। চৈতন্যমঙ্গল কাব্যগুলি দেখাইল মানুষও সাহিত্যের অবলম্বন হইতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন মামুলী পৌরাণিক আখ্যায়িকার একঘেয়ে রচনাতেই ব্যস্ত ছিল। ইহার পূর্ব্বে মানুষ সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হয় নাই। মুরারি গুপ্তের করচা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভুবনমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য মহাপ্রভুর অমানুষী লোকোত্তর চরিত্রকে স্পষ্ট করিয়াছে।

বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর প্রেমকে অমর্ত্ত্য ভাষায রূপ দেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। তাহার পূর্ব্বে এবং মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে যাঁহারা এই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা নিতান্ত গ্রাম্য এবং আদিরসাশ্রিত ছিল। দেহের একটি বিশেষ অঙ্গই, মনের একটা বিশেষ প্রবৃত্তিকেই তাঁহারা বড় করিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যে তৎকালীন ছাপ অতি স্পষ্ট। মহাপ্রভুর প্রভাব সেই গ্রাম্যসাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব ভক্তির স্পর্শ আনিয়া দিল।

রাধা গ্রাম্য আহীর বালিকা হইতে শাশ্বতীকালের চিত্তবল্লভা শ্রীমতী হইলেন। কৃষ্ণবিরহের তীব্র ব্যাকুলতা মহাপ্রভুর চরিত্রে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। যাহা এতদিন কবির কল্পনারাজ্যের সামগ্রী ছিল মহাপ্রভু নিজ জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইলেন। বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য আদিরসকে ত্যাগ করিয়া প্রাণের ঠাকুরের স্পর্শে প্রাণের কথা বলিয়া উঠিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপক অলঙ্কার যমকের রাজ্য ছাডাইয়া, নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনার বিচিত্র উপমাকে দূরে রাখিয়া, চণ্ডীদাসের পন্থা অনুসরণ করিয়া প্রাণের সহজ কথা সহজ সুরে বলিতে আরম্ভ করিল। প্রেমের জ্বালার পরিচয় পাইলাম, রাধাকৃষ্ণ অতি নিকট প্রাণের জন হইলেন। বৈষ্ণবের রাধার বিরহাশ্রু, মানের বক্রতা, মিলনের আত্মহারা বিহ্বলতা রবীন্দ্রনাথকে সংশয়ী করিয়া তুলিল রাধা মানবী কি না— বৈষ্ণব কবির মানসপ্রিয়া কি না! অখিলরসামৃতসিন্ধু মহাপ্রভুর প্রেমবৈচিত্র্য তাঁহারা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাই এমন করিয়া রাধার ছবি জীবন্ত তুলিতে আঁকিতে পারিয়াছিলেন।

আফগান শাসনের অবসান ঘটিলে দেশে অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মোগল শাসন দেশে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাঠানগণও সহজে মোগল শাসন মানিয়া লইল না। যুদ্ধবিগ্রহ, নানা অত্যাচার প্রভৃতিতে প্রজার ধনপ্রাণ স্বস্তিতে রহিল না। পাঠানশক্তি ক্রমে ক্ষয়মান হইতে লাগিল। বৃহৎ শক্তির অভাবে সকলেই মাথা তুলিতে লাগিল। অর্থের লোভ, সম্পত্তির লোভ, ভূমির লোভ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। রাজকর্ম্মচারী ও জায়গীরদারগণ রাজকোষ অর্থশূন্য দেখিয়া দরিদ্র প্রজাকে শোষণ করিতে লাগিল। অত্যাচারী লুব্ধ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা দেশকে শ্মশান করিয়া তুলিল।

পাঠান শাসনের অবসান

পাঠান রাজশক্তির ধ্বংসের ফলে কোচবিহার ও মল্লদেশ স্বাধীন হইল। এখানে শক্তিশালী রাজার আশ্রয়ে প্রজাকুল নির্ব্বিঘ্ন হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যও ইঁহাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া পুষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভাবে মল্লভূমিতে বৈষ্ণবতার বান ডাকিল। বৈষ্ণব রাজার আশ্রয়ে কৃষ্ণবিষয়ক পদের রচনা দীর্ঘদিন অব্যাহত চলিয়াছিল।

মোগল শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের সহায়তায় বাঙ্গালার সহিত সমগ্র দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু মোগল শাসন ক্রমেই

সে যোগ দুরায়ত্ত করিয়া তুলিল। নানা লাঞ্ছনা, অরাজকতা ক্রমেই মানুষের মনোবল ক্ষয় করিতে লাগিল। অতি সহজেই সাহিত্যের অবনতি সুরু হইল, স্বাধীন এবং প্রাণবান সাহিত্যের স্রোতে ভাঁটা পড়িতে লাগিল। পদাবলীর রচনাও ক্রমে গতানুগতিক ও প্রাণহীন হইয়া পড়িল। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ কেবলমাত্র শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া পদ রচনা করিতে লাগিলেন। সেখানে প্রাণের অবিশ্রাম গতি লক্ষিত হইল না। কবির ভক্তিরসে প্রাণের অভাব ঘটিল—গতানুগতিক পুনরাবৃত্তিপরায়ণ পদাবলী সকল নবীনত্ব এবং রস হারাইয়া ফেলিল।

পদাবলীর একঘেয়েমি

পদাবলীর ঐকান্তিক ভাবগভীরতা আর রহিল না, তাহার সুর ক্রমেই চটুল এবং লঘুরসাত্মক হইয়া উঠিল। কৃষ্ণলীলাকাহিনীতে আদিরসের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভবানন্দ হরিবংশে পূর্ব্বতন আদিরসের ধারাটি পুনরায লইয়া আসিলেন। দ্বিজ বাণীকণ্ঠের শ্রীকৃষ্ণচরিত অক্ষম কবির রচনা, আদিরসের ছড়াছড়ি। অনুবাদ সাহিত্য, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্য্যমঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, শনির পাঁচালী, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সুবচনীর পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতির চর্চ্চা পুনরায় পুরাদমে চলিতে লাগিল।

বিদেশী বণিকের দল এদেশে ব্যবসায় করিতে আসিয়াছে। তাহার ফলে এক নূতন ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি, ধর্ম্মবোধহীনতা এবং শিল্প ও রুচিবোধের অভাব তাহাদের আড়ম্বর এবং বিলাস ব্যসনে প্রবৃত্তি দিল। তাহাদের আশ্রিত সাহিত্যও নিতান্ত লঘু এবং চটুল হইয়া উঠিল।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্ষমতার লোভ বাড়িয়া উঠিল। শক্তিহীন মোগল শাসনকে অস্বীকার করিয়া প্রদেশগুলি স্বাধীন হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রদেশের সুবাদারগণও শুদ্ধ-চরিত্র ছিলেন না। মারাঠাজাতি ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শ ভুলিয়া লুণ্ঠক দস্যু হইয়া দাঁড়াইল। বন্যার জলের মত বারংবার বর্গীর অত্যাচার বাঙ্গালার নিরীহ প্রজাবর্গকে সন্ত্রস্ত ও নিদ্রাহীন করিয়া তুলিল। দেশময় অরাজকতা ; বর্গী, পিণ্ডারী, ঠগীর অত্যাচারে মানুষের ধন মান প্রাণ নিরাপত্তাহীন হইয়া পড়িল। দেশের শাসক প্রজার ধনপ্রাণের ব্যবস্থা না করিয়া খাজনার জন্য অত্যাচার করেন। বণিকের মানদণ্ড দেশের এই চরম

মোগল শাসনের পতন

দুর্দ্দশায় রাজদণ্ড হইবার সুযোগ খুঁজিতেছে। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, মনুষ্যের মনুষ্যত্বলোপের দিন অগ্রগামী হইল। অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙ্গালার মহা কলঙ্কের যুগ। একদিন নিবীর্য্য প্রজামণ্ডলী এবং ক্ষাত্রশক্তিহীন দণ্ডশক্তি ইসলামের প্রবল বন্যার মুখে ধূলিসাৎ হইয়া যায়—সেদিনও ক্ষমতার লোভ, রাজ্যের লোভ, ধনের লোভ মানুষকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। বাঙ্গালার স্বাধীনতা লুব্ধক বণিকের করতলগত হইল। তাহার সহায়তা করিল দেশীয় সম্রান্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং দেশের সম্রান্ত মুখপাত্রগণ।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

পদাবলী রচনার ধারা অব্যাহত রহিল। কিন্তু এযুগে পদাবলীর অকৃত্রিম স্বর্গীয় ভাবটি লুপ্ত হইল। কবিওয়ালাদের হাতে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা বিকৃত হইয়া পড়িল। খেউড়, টপ্পা এবং আখড়াই সঙ্গীতের প্রধান উপাদান ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী। কিন্তু এই অলৌকিক ভক্তিরসধৌত বৈষ্ণব পদাবলী অশ্লীলতা দোষদুষ্ট তথাকথিত আদিরসের স্রোতে তাহার পূর্ব্বতন সারল্য ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলিল।

অন্যান্য কাব্যেও স্বভাবের সুন্দর সহজ রূপ অলঙ্কারের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। কামনার সেবাই সমাজে, রাষ্ট্রপতিগণের গৃহে, ধনীর ও দেশনেতাগণের উদ্যানবাটিকায় চরম চরিতার্থতার বিষয় হইয়াছে। সাহিত্যেও কামনার লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে কেবল প্রাণহীন বর্ণনার ছড়াছড়ি—সেখানে উপমা আছে, বস্তু নাই—সাহিত্যের আদর্শ হইয়াছে ইন্দ্রিয়সেবা। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। কথার চমক, উপমার ঝক্‌ঝকানি, শ্লেষ-যমকের খেলা খুব নিপুণ—তাহা কাণকে আকৃষ্ট করে কিন্তু সেই কাণের কথা মর্ম্ম স্পর্শ করে না। যাঁহারা এই সাহিত্যকে আশ্রয় দিযাছিলেন তাঁহারা মর্ম্মগ্রাহী সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। বিদ্যা ও সুন্দরের বিহার বর্ণনা নগ্ন ও কুরুচিসম্পন্ন—তাহা দৈহিক উত্তেজনার উর্দ্ধে যাইতে পারে না। বিদ্যার রূপবর্ণনাও উৎকট—তাহা কেবল অতিশয়োক্তির খেলা। বিদ্যাসুন্দরে কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই—কবির হৃদয়ের উত্তাপ নাই বলিয়া বর্ণনা নিতান্তই প্রাণহীন হইয়াছে।

বিলাসসর্ব্বস্ব ও লালসামগ্ন ধনীদের রুচি অনুসারে বিকৃতরুচি ও পদলালিত্য কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ হইল। চন্দ্রকান্ত, কামিনীকুমার, জীবনতারা প্রভৃতি কাব্যগুলি এই জাতীয়। নারীচরিত্র অতি হীনবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। নারীর মর্য্যাদা তখন জাতি ভুলিয়া গিয়াছে। নারী তখন বিলাসের, ভোগের সামগ্রী

হইয়াছে। নারীর মহীয়সী মূর্ত্তি ক্রমেই জাতির চিত্তপট হইতে মুছিয়া যাইতেছিল। এই পুস্তকগুলিতে জাতীয় চরিত্রের অবনতির জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, কুৎসিত প্রবৃত্তির গান চলিতেছে। বিদ্যাসুন্দর কেবল পঠন-পাঠনেই সীমাবদ্ধ রহিল না—যাত্রার দলে গীত হইয়া দেশে ছড়াইয়া পড়িল। কবির গান, যাত্রাগান, আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি মহোৎসাহে চলিতে লাগিল। শান্তিপুর অঞ্চলে গ্রাম্য ভাষায় রচিত ও টপ্পার সুরে গীত আদিরসাত্মক কাহিনীমূলক খেউড় গান চলিত হইল। ললিত শব্দবহুল, কদর্য্যভাবপূর্ণ কবির গান, যাত্রাগান প্রভৃতির অগ্রগামী ও উৎসাহী নায়ক ছিলেন গোপাল উড়ে, দাশরথি রায় প্রভৃতি। কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল প্রভৃতি এই সকল গানের সঙ্গে চুটকি রাগিণী মিশাইতেন। অবশ্য মধ্যে মধ্যে রামনিধি রায়, রাম বসু, ভোলা ময়রা, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি কবিওয়ালার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা প্রবৃত্তির সেবা না করিয়া প্রাণের কথা শুনাইয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে।

সামাজিক কুপ্রথা ও রাজা রামমোহন রায়

নবাবী শাসনের অবসান ঘটিল। ইংরাজ বণিকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিল। দেশ হইতে অরাজকতা, মানহানি, প্রাণহানি, ধনহানির কারণ দূর করিল। ইংরাজ শাসন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিল। কিন্তু বহুকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় দুর্গতি, নানা অনাচার সমাজে বহু কুপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, সতীদাহ, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি ধর্ম্মের নামে দেশে গভীর শিকড় গাঁথিয়া বসিয়াছিল। অন্ধ ধর্ম্মবিচার মানুষের প্রকৃত কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সকল ভুলাইয়া দিয়াছিল। মানুষ সহজে সন্তানকে জলে দিতে পারিত, মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করিত—ইহার জন্য তাহার মনে কোন বিকার উপস্থিত হইত না। রাজা রামমোহন লর্ড বেন্টিঙ্কের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দেশ হইতে নানা কদাচার এবং বীভৎস ধর্ম্ম দূর করিলেন। তিনি আজীবন মনুষ্যত্বের বিরোধী এই সকল বিধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, সমাজ সকলের প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তিনি মজ্জমান মনুষ্যধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়াছেন। সাহিত্যেও বাঙ্গালা গদ্যের তিনিই একমাত্র পথিকৃৎ।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালাদেশের এক অপূর্ব্ব স্বর্ণযুগ। একদিকে সমাজে মুষ্টিমেয় গোঁড়া সমাজপতি জাতির কণ্ঠরোধ করিতেছে, আর একদিকে পশ্চিমী

সভ্যতার আকস্মিক দীপ্তি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণকে পথবিভ্রান্ত করিতেছে। গোঁড়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্যত হইলেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ভূদেব। শিক্ষিত আত্মঘাতী যুবকসম্প্রদায় পাশ্চাত্যের সকল কিছুই ভাল এই বিশ্বাসে মদ্যপান, স্বদেশীয় রীতিনীতি বর্জ্জন ইত্যাদির দ্বারা মনে প্রাণে সাহেব হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ যাঁহারা তাঁহাদের এইরূপ আচরণ সমগ্র সমাজকে বিভ্রান্ত করিল। বিভ্রান্ত বিমূঢ় সমাজ নির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান করিতে লাগিল—শ্রেয়ের পথ অন্বেষণে। বিভ্রান্ত জাতির প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে এক পবিত্র স্বচ্ছ মন্দাকিনীর ধারা ভূতলে নামিয়া আসিল। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মহতী বাণীকে ঘোষণা করিলেন। জাতির মধ্যে প্রাণের বিপুল স্পন্দন জাগিল। এই সরল বিশ্বাসী মায়ের শিশুর অমৃতময়ী বাণীতে পথভ্রান্ত জাতি হৃতবিশ্বাস ফিরিয়া পাইল, অমৃতের সন্ধান পাইল। সর্ব্বকামনামুক্ত গৃহী সন্ন্যাসীর চরণে ভূমিষ্ঠ হইল অগণ্য নরনারী—প্রাণের বেদনা ফুল হইয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁহারই উত্তরাধিকারী, মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবী ব্যাপিয়া মানুষের ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। মানুষ বুঝিল জীবের মধ্যেই নারায়ণের মহিমা—আর্ত্তের সেবাই চরম ধর্ম্ম। রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে এই সত্যধর্ম্ম—প্রাণের ধর্ম্ম বিস্তারিত হইল। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বামা ক্ষ্যাপা, ব্রহ্মানন্দ, শি[illegible]নন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সাধকগণও আবির্ভূত হইলেন একই সঙ্গে। ইংরাজীশিক্ষিত ধর্ম্মভ্রষ্ট যুবকগণ অন্ধ বৈদেশিক অনুকরণ স্পৃহা ত্যাগ করিয়া ইঁহার পদে প্রণত হইল। বঙ্কিম, গিরিশ প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট মানুষের দল এই একটি মানুষের প্রাণের মন্ত্রে অভিষিক্ত হইলেন, ধন্য হইলেন। প্রাণের স্পর্শে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব্ব বিকাশ দেখা দিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব

উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে ভাষায় ও ভাবে বাঙ্গালীর চিত্তে নবজাগরণের চাঞ্চল্য আনিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফৎ। গদ্যে প্যারীচাঁদ এবং পদ্য ও নাটকে মধুসূদন বিপ্লব আনিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে প্রাণে সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণের শিহরণ দেখা দিল। সেই অনুভূতিতে পরিপূর্ণ সার্থকতা দিতে চেষ্টা করিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি নিষ্ক্রিয় বাঙ্গালীকে ধর্ম্মে, সমাজজীবনে, সাহিত্যে, দেশপ্রেমে আগাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুষ্টি

সাহিত্যে নবজাগরণ

সাধনে তিনি ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তা মধুসূদনকে কাব্য রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাইযাছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের গঠনমূলেও তাঁহার প্রভাব ছিল। ভূদেব ইংরাজী শিক্ষার সহিত দেশীয় সংস্কৃতির উদার সম্মিলন ঘটাইলেন জীবনে ও সাহিত্যে।

সমসাময়িক যাত্রাগানের কদর্য্যতা এবং নাটকের তুচ্ছতা মধুসূদনকে সত্যকারের নাটক অর্থাৎ সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দিল। ইহারই ফল 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'। মানুষের রুচি, প্রবৃত্তির নিম্নগতি সাহিত্যের অবনতি ঘটায়। মানুষ তখন কুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে—সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়।

"কোথায বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢে, বঙ্গে
নিরখিযা প্রাণে নাহি সয।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে
তাহে হয তনু মন ক্ষয।"

(শর্ম্মিষ্ঠা নাটক)

এই যুগে বিকৃতরুচিসম্পন্ন সাহিত্যের ধারা প্রবহমান রহিযাছে। কবিগান, পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রভাবে মানুষের মানসিক তৃপ্তি ইহাদের দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিতেছিল। সেই কুরুচি অবশেষে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কুৎসাকে লইযা সাহিত্য রচনায প্রবৃত্ত হইল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে পরাধীনতার বেদনাবোধ জানাইল। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী' প্রভৃতি কাব্যে দেবতা বিষয় না হইয়া পুরাপুরি মানুষের কথাই স্থান পাইযাছে। রঙ্গলালের রচনা শিক্ষিত বাঙ্গালীর দেশ-গৌরববোধকে জাগ্রত করিল। যে বেদনাবোধ পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে জাগিবা উঠে তাহাই ক্রমে জাতীয়তাবাদে দানা বাঁধিয়া উঠিল। মধুসূদনের কাব্যে আমরা পাইলাম ভাষার অদ্ভুত বিচিত্র শক্তি। প্রাণের জোয়ার নামিয়াছে, পয়ার ও যতি নিগড়বদ্ধ ভাষা চিরন্তনী পথকে ভাঙ্গিয়া দুকূল ব্যাপিয়া চলিয়াছে। নব নব চিন্তা, নব নব ভাব কল্পনার প্রসারের পথ মুক্ত হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে স্বদেশের জন্য এই মুক্ত গতি, স্বচ্ছন্দ প্রাণবিহার মধুসূদন লইয়া আসিলেন। ভবিষ্যতের জন্য তিনি এক নূতন পথ মুক্ত করিলেন। অমিত্রাক্ষরও যেমন

অভিনব—'মেঘনানবধ কাব্য'ও তেমনই অপূর্ব্ব। এখানে দেবতার মহিমা নাই—রাবণ ও মেঘনাদের তেজপূর্ণ নির্ভীক অদম্য হৃদয, শত বিপদের ঝঞ্ঝাঘাত, অদৃষ্টের নিদারুণ ক্রূর চক্রান্ত—কিছুই মেরুদণ্ড নামিতে দেয না।

কবিতার যুগ শেষ হইয়া আসিল—মানুষ ক্রমেই সাহিত্যে ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। কেবল মহৎ মানুষের কথা নহে অতি সহজ সাধারণ মানুষের কথা—তাহাদের ভাবনা চিন্তা দৈন্য সমস্যা সাহিত্যে স্থান পাইল। এক কথায সাহিত্য প্রাণবান্ হইযা উঠিল। এই প্রাণের স্পর্শ সর্ব্বত্রই দেখা দিল। যুগসন্ধিক্ষণে উপন্যাসের জন্ম হইল—জীবন্ত মানুষ সেই উপন্যাসের বিষয হইল। কেবল ভালো বা মন্দ বিচার না করিযা মানুষের স্বরূপ, তাহার প্রাণশক্তির সীমা দেখানোই উপন্যাসের কাজ হইল। যেখানে চরিত্র যত জীবন্ত সেখানে উপন্যাসও প্রাণবান্।

বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগের সূত্রপাত হইযাছে। পশ্চিমী সভ্যতার চোখঝলসানো দীপ্তি শান্ত হইযা আসিল। দেশের মধ্যেও অরাজকতা দূর হইযাছে, শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হইযাছে। জাতীযতাবোধের জাগরণ, স্বাধীনতাস্পৃহার আকাঙ্ক্ষা জাতির জনমানসে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে জাতির মর্ম্মকথাটি প্রকাশ পাইতে লাগিল। জাতির জীবনে নব নব প্রাণোন্মাদিনী ভাবের বন্যা আসিয়া পড়িতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্থূল ই-সুলভ সাহিত্যিক রুচিকে পরিশুদ্ধ করিতে প্রাণপণ করিলেন। তিনি জাতির মানস ক্ষুধায় বিশুদ্ধ আহারের সংস্থান করিলেন—নির্ম্মল রসের প্রবাহ পুনরায প্রবর্ত্তন করিলেন। জাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয চেতনার উদ্বোধন করিলেন। কুৎসিত সাহিত্যকে নির্ম্মমভাবে সম্মার্জ্জনী হস্তে বিদায় করিয়া সাহিত্যে নীতি ও শালীনতাবোধকে ফিরাইয়া আনিলেন। কর্ম্মে জ্ঞানে চিন্তায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিযা তুলিতে বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে আত্মসম্মান-বোধ, পশ্চিমী সভ্যতার হীন অনুকরণ ত্যাগেচ্ছা, সমাজবোধ, ঐক্যহীনতা-বোধকে বঙ্কিম জাগাইযা তুলিলেন। ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপ করিয়া ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইলেন—স্বদেশের গোপন রত্নের ভাণ্ডার উপন্যাসে, প্রবন্ধে, রম্য রচনায মুক্ত করিলেন।

রাজশক্তির প্রকৃত স্বরূপ ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে লাগিল—শিক্ষিত বাঙ্গালীর আহত ও নবজাগ্রত আত্মসম্মানবোধ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর

প্রাণে ভাবের বন্যা আসিল—তাহারই কলকলনাদ শ্রুত হইল হিন্দুমেলায়। নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ইহাতে পূর্ণ সহযোগিতা করিলেন। জাতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল পশ্চিমী সভ্যতার তুলনায় প্রাচ্য সভ্যতাও হীন নহে। সমসাময়িক সাহিত্যে এই জাতীয় চেতনার ধারা প্রবাহিত হইল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারাযণ বসু ইতিপূর্ব্বেই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি, দেশের প্রতি শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' 'কর্ম্মদেবী', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' যাহার স্বাদ জানাইযাছিল তাহার মুখর প্রকাশ দেখা দিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। জাতির স্বাধীনতা-বোধ ক্রমেই জাগ্রত হইল। বিদেশী শাসকের অকথ্য অন্যায অত্যাচারের মুখর প্রতিবাদ সাহিত্যে জ্বালাময়ী কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

জাতীয়তাবোধের জাগরণ

হিন্দুমেলাকে আশ্রয় করিযা শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্তে জাতীযতাবোধ ক্রমেই জাগ্রত হইতে লাগিল। সাহিত্যে এই ভাব তীব্রতর হইতে লাগিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী এই আন্দোলনের মূলে প্রাণসঞ্চার করিযা আসিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী' প্রভৃতি নাটকে. তৎকালীন দেশের প্রাণের কথা ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে স্বদেশপ্রিয় শিক্ষিত যুবকদের পরাধীনতা দূর করার জন্য অসহ্য উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্ব্বাদ পাইযাছিলেন। তাঁহার 'রাবণবধ', 'দক্ষ যজ্ঞ', 'ধ্রুব চরিত্র', 'নলদমযন্তী', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর', 'জনা' প্রভৃতি নাটকে ভক্তিরসই মুখ্য—মানুষের মনোবৃত্তিকে একটা বড় রকম নাড়া তাহারা দিয়াছিল। দেশে প্রকৃত নাট্যরসের অভাব ছিল—নানা কদর্য্য ও ব্যক্তিগত কুৎসা যাত্রা ও প্রহসনের আশ্রয় ছিল। গিরিশচন্দ্রের নাটকের নূতন ভাব বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চকে রক্ষা করিল এবং দর্শকের রুচিকে সংস্কৃত করিল। পরমহংসদেব হিন্দুধর্ম্মে নবজাগরণের বন্যা বহাইলেন। বঙ্কিম সেই জাগরণকে সাহিত্যে ও প্রবন্ধে রূপ দিলেন। গিরিশচন্দ্র নাটকে পরমহংস ও বিবেকানন্দের বাণীকে জীবন্ত করিলেন। বাঙ্গালার নাট্যামোদী জনসাধারণ এই বাণীর জীবন্ত রূপ দেখিল এবং অনুভব করিল।

গিরিশচন্দ্র মানুষকে অতিক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়িয়া জীবনের বৃহত্তর আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিলেন।

অমৃতলাল বসু নাটকে ও প্রহসনে জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্ব্বলতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব, স্বার্থপরতা, হুজুকপ্রিয়তা প্রভৃতির দিকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্রই একটা সংস্কারের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবারপতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সিংহল বিজয়' প্রভৃতি নাটকে বাঙ্গালা দেশের সমসাময়িক উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, বাঙ্গালাদেশে চলিয়াছে বীরযুগ। এই যুগের কবি হেমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে জাতিকে আহ্বান করিলেন 'বাজ রে শিঙা বাজ' রবে। 'বীরবাহু' কাব্যে হিন্দুমেলা ও জাতীয় আন্দোলনের ভাব স্পষ্ট রূপ পাইয়াছে। কবির মনোবেদনা তীব্রভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

"এবে সেই দেশমান্য ভারত রক্ষেতে
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে।"

ভারত-সঙ্গীত কবিতায় দেশপ্রেমের ও জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজিত ও উচ্ছ্বসিত প্রকাশ হইয়াছে। হেমচন্দ্রের কবিতাগুলি বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে ফিরিত। বিবিধ কবিতায় ব্যঙ্গের ছলে দেশের [illegible] অসঙ্গতিকে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরাধীনতার মনোবেদনা ইহার পূর্ব্বে এমন প্রত্যক্ষ হয় নাই।

এযুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগরণের পালা চলিয়াছে, প্রাণের সাড়া দিকে দিকে দেখা দিয়াছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে ত্রুটি আছে, একঘেয়েমি আছে, কিন্তু প্রাণের নিবিড় স্পর্শ ও উত্তাপ ছন্দে, ভাবে, ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়াছে।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নবযুগের মূলমন্ত্র একটা মনুষ্যত্ববোধ—একটা আত্ম-মর্য্যাদাবোধ, একটা জাতীয়তাবোধ—একটা স্বাধীনতার শৌর্য্য-বীর্য্যের উন্মাদ বাসনা। * * * নবীন বাঙ্গালার ভিতরে জাগিয়া উঠিল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। * * কবি হেমচন্দ্রের সাহিত্যের ভিতরেও সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন—সেই জাতীয়তাবোধ—ব্যক্তিত্বের স্পন্দন—বীর্য্যের গরিমা।

* * * চারণ-কবির ন্যায় হেমচন্দ্র সেদিন সুপ্ত বাঙ্গালী জাতিকে ডাক দিয়াছিলেন।" (শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত)

"নবীনচন্দ্র হইতে কাব্যের ক্ষেত্রে অধিক সংযম, ভাষা ও ছন্দের অধিক নৈপুণ্য আজ আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি,—কিন্তু সেই স্পন্দনময় উন্মাদ প্রাণদেবতার সন্ধান যেন লাভ করিতে পারি নাই। সেই প্রাণদেবতার জীবন্ত বিগ্রহ নবীনচন্দ্র তাই আমাদের বরেণ্য ও নমস্য।" (শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত)

হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের প্রদর্শিত পথে ক্লাসিক কবিতার সৃষ্টি অব্যাহত গতিতে বহুদিন চলিয়াছিল। সাধারণ পাঠকের নিকট অর্থ গ্রহণেই কাব্যের পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অর্থ দিয়ে গণ্ডীবদ্ধত্ব-টুকুই কাব্যের শেষ কথা নয়—কাব্যের মধ্যে অর্থের উপরেও কিছু প্রয়োজন থাকে। সেই অর্থাতিরিক্ত বস্তুটি কাব্যের রস বা প্রাণ। এই রসকে প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য দীর্ঘ দিন আশ্রয় দিয়া আসিতেছিল। যুগের পরিবর্ত্তনে তাহা ক্রমেই বিকৃত হইয়া পড়ে। ক্লাসিক কবিতার নূতন সুর ঝঙ্কার মানুষের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করিল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেনের হাতে ক্লাসিক কবিতার নবীন রূপ এবং প্রাণপূর্ণ গতি একেবারে মানুষের প্রাণ মন কাড়িয়া লইল। কিন্তু ক্লাসিক ধারাও ক্রমে কৃত্রিম হইয়া পড়িল। বস্তু ও ঘটনায় মানুষের প্রাণের সহজ মর্ম্মকথাটি চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। এমনই সময়ে বহিরঙ্গমূলক ক্লাসিক কবিতার সুরের মধ্যে বিহারীলাল রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারাটিকে পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। জীবনের গভীরতম আনন্দ উপলব্ধির উৎস হইতে তাঁহার কাব্যধারা নিঃসারিত হইয়াছে। বিহারীলালের অনুসৃত পথ ধরিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাণের গোপন মর্ম্মকথাটি ব্যক্ত করিতে আসিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, গিরিন্দ্রমোহিনী, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায় প্রভৃতি।

গীতি কবিতার প্রবর্ত্তন

রোমান্টিক গীতিকবিতার সুরপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাগরসঙ্গমে আসিয়া পূর্ণ এবং অখণ্ড রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এক বিচিত্র আবির্ভাব। বাঙ্গালী প্রাচীনকাল হইতে গীতিকবিতার সুরে প্রাণের কথা বলিয়া আসিয়াছে, বৈষ্ণব কবিতা ও বাউলের গানে প্রাণের নিভৃত মর্ম্মবাণীটি শ্রুত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাবের গভীরতা কাহারও কাহারও নিকট দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। তিনি নিছক বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া ইমোশনের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির নূতন রূপ ফুটিয়া

উঠিল। শুধু নিছক নিসর্গবর্ণনা বা নিছক মানুষের দৈনন্দিন ঘটনার কাহিনী নহে—বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের লীলাকে তিনি মিলাইয়া লইলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে জীবনের গভীর আদর্শের কথা যেমন শুনা গেল, তেমনই প্রাণের বিচিত্র অভিব্যক্তিও রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রকবিতা কবির প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত জাগ্রত। কাব্যের ভাষা ও ভাবে গতিবেগ, মুখরতা আসিল, ছন্দ সকল কৃত্রিমতাকে পরিহার করিয়া উচ্ছলিত চরণে নৃত্যতালে চলিয়াছে। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি কাব্যে কবি জীবনের নানা বিচিত্র লীলাকে প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে কবি 'নৈবেদ্য' কাব্যে জাতিকে কর্ম্মে আহ্বান করিযাছেন। আচারের নামে, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের বশে মনুষ্যত্বের অবমাননা কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িযাছে। জাতির জীবনের গতিপথে এই সকল "পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল"কে কবি দূর করিতে চাহিয়াছেন। কবি অন্তর্দ্দৃষ্টি বলে জাতির দুর্ব্বলতা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহার প্রাণস্রোতের রুদ্ধ মুখ উন্মুক্ত করিতে চাহিযাছেন—তাহাকে কর্ম্মে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন—তাহার প্রাণের বাণী শুনাইয়াছেন।

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভযজাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে।"

শুধু কবিতায় নহে, গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কর্ম্মে কবি দেশের চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে ব্যস্ত হইলেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্ব্বও শুরু হইয়াছিল।

'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যদৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়াছে। মানুষের লোভের আগুনে সহস্র সহস্র মানুষ বলি হইতেছে—মনুষ্যত্ব অপমানিত হইতেছে। দুঃখ, দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা মানুষকে পুনরায় মনুষ্যত্বহীনতার পথে চালিত করিতেছে। বিশ্বযুদ্ধের প্রলয় তাণ্ডবে, মৃত্যুর সংহার লীলার মধ্যে কবি রুদ্রের আহ্বান শুনিলেন। কবি বিশ্বাস করিলেন এই ধ্বংসের উপর নূতন প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর হিংস্র নগ্ন মূর্ত্তি কবির নিকট প্রকট হইয়াছে। আলোকের অন্তরালে, সাজানো সভ্যতার পশ্চাতে

এক হিংস্র লুব্ধ দানব মানবের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আছে। সে মানুষের মনুষ্যত্ব, শান্তি, সুখ, খাদ্য হরণ করিতেছে। বঞ্চিত মানুষের নিরানন্দ ব্যর্থ নিষ্প্রাণ জীবনের দিকে কবির দৃষ্টি পড়িয়াছে। জীবনের এই অতিবাস্তব সত্য দিকটিকে কবি ভালো করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন—তাহার কথা সাহিত্যে রূপায়িত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কবি খেদ করিয়াছেন যে তিনি মানুষের জীবনের পূর্ণ পরিচয়, তাহার প্রাণের সকল কথা সাহিত্যে প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই। কবি 'জন্মদিনে' কাব্যে বলিয়াছেন —

"আমি পৃথিবীর কবি, সেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার উঠিবে তখনি।
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

তাঁহার ছোটগল্পে মানুষের কথা, প্রাণের নানা লীলার মধুরতম প্রকাশ হইয়াছে। মানুষের জীবনের সুখদুঃখের জীবন্ত চিত্র এখানে নাই। সেই প্রাণলীলার সঙ্গে বিশ্বের মহাপ্রাণ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে যাহারা একান্ত অনাবশ্যক তাহাদেব সরল প্রেম, সেবার কথা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'ব পর 'গোবা' উপন্যাসে ববীন্দ্রনাথ ভারতের আত্মাপুরুষের কথা রূপ দিলেন। সামাজিক বৈষম্য, অর্থহীন আচার, জাতিভেদের তুচ্ছতা এবং দারিদ্র্য জাতিকে তিলে তিলে ক্ষয় করিতেছে, তাহার প্রাণের মর্ম্মমূলে আঘাত হানিতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে পুনরায় হৃতপ্রাণশক্তি ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ঔদার্য্য তাহার লুপ্ত প্রাণক্রিয়াকে সজীব করিবে। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের আগমনী গাহিয়াছিলেন। দুঃস্থ দরিদ্র নিপীড়িত জাতির মর্ম্মবেদনা গোরার কণ্ঠে দীপ্তভাবে ঘোষিত হইয়াছে। নানা বিভেদের মধ্যে ঐক্যের আনন্দ, মিলনের সুর কবি আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে কবি জাতীয় আন্দোলনের মত্ততা ও উন্মাদনার বিষয়ে দেশকে সতর্ক করিয়াছেন। এই গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের মত্ততাকে বড় করিয়া তুলিলে তাহা যে দেশের কল্যাণকে বিনষ্ট করে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। উপন্যাসটির আগাগোড়া বিমলার মোহ, সন্দীপের বক্তৃতার চমক, তাহার ইচ্ছার সর্ব্বগ্রাসিত্ব ভাষার বিদ্যুৎচমকে প্রাণদীপ্ত হইয়াছে। 'চার-

অধ্যায়' উপন্যাসে জাতীয় আন্দোলনে হিংসাত্মক প্রচেষ্টার মারাত্মক ও সর্ব্বনাশী ভয়াবহ ভবিষ্যৎ চিত্র জীবন্ত অঙ্কিত হইয়াছে। সেই যুগে এলা ও অতীনের মত শত শত তরুণ মৃত্যুযজ্ঞে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়াছে, দেশের তরুণ প্রাণগুলি বলি হইয়াছে। তাহাদের আত্মদানে দেশ লাভবান হইল না, বরং বঞ্চিত হইল।

রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, নজরুল প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। ইঁহাদের রচনায় জাতির মর্ম্মকথা অনেকখানি প্রাণবন্ত রূপ পাইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের প্রবল প্রতাপ চলিতেছে—সুতরাং জাতীয় জাগরণ সহজেই কবিতায় মুখ্য স্থান লাভ করিল।

সত্যেন্দ্রনাথ 'সবিতা'র ভূমিকায় লিখিলেন—

"প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। * * আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্ত্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্ম্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি চাই।"

জাতীয় আন্দোলনের প্রাণমুখরতা সত্যেন্ দত্তের কবিতার ছন্দে উচ্ছলিত হইয়াছে। "আমরা বাঙ্গালী" আবৃত্তি করিয়া বাঙ্গালী তাহার হৃতগৌরব ও আত্মসম্মানবোধকে ফিরিয়া পাইল, তাহার বুক ফুলিয়া দশহাত হইল। "গান্ধিজী" "আভ্যুদয়িক" "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" প্রভৃতি কবিতায় দেশাত্মবোধ তীব্র হইয়াছে। করুণানিধান বাঙ্গালীকে শুনাইলেন প্রকৃতির নিভৃত সুর, মর্ম্মের কাহিনী—কুমুদরঞ্জন অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লীর ঘরে ঘরে যে মহৎ প্রাণ আছে তাহার পরিচয় দিলেন। যে পল্লী অনাদৃত হইয়াছিল তাহার রূপের ঐশ্বর্য্যে, মানুষগুলির সরল প্রাণের কথায় কুমুদরঞ্জনের কবিতা জীবন্ত হইয়াছে। মোহিতলালের কবিতায় বাঙ্গালী ভোগবাসনার তীব্র তৃষ্ণার স্বাদ পাইল। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী কবিতায় জাতির উদ্দেশ্যে সকল মিথ্যাচার ও ক্লীবতাকে দগ্ধ করিবার আহ্বান আছে। ভাববিলাসের স্বপ্ন ছাড়িয়া জীবনের খাঁটি সত্য যতীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় মহাযুদ্ধকালীন জাতির দুঃখদুর্দ্দশার নগ্ন রূপ ফুটিয়া উঠিল। নজরুল সেই দুঃখকে বাণী ত দিলেনই—তাহার সহিত অত্যাচারিত বিদ্রোহী জনচিত্তের অন্তরের কথাকে অগ্নিক্ষরা ভাষায় রূপ

দিলেন। তাঁহার 'অগ্নিবীণা' সমগ্র দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিয়াছিল। অত্যাচারী শাসক প্রাণমন্ত্রের এই অপূর্ব্ব ভৈরব নাদে ভীত হইয়া পুস্তক প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বেথুন, বঙ্কিম প্রভৃতি মনীষির প্রচেষ্টায় দেশে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইযাছে। নারীজাতির মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে—স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে, সরোজিনী নাইডু রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। নারীহৃদয়ের গোপন মর্ম্মকথা সাহিত্যে রূপ পাইল।

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের সহিত পরিচয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী পাঠক সাহিত্যে বিচিত্রতর স্বাদ পাইল শরৎচন্দ্র এবং তাহার পরেই তারাশঙ্করের উপন্যাসে। অবজ্ঞাত পল্লীসমাজ, তাহার যুগসঞ্চিতবেদনা, জাতিত্বের নামে অসহায়ের উপর অত্যাচার, সমাজপতিগণের স্বার্থসর্ব্বস্বতা প্রভৃতি জ্বলন্ত অক্ষরে সাহিত্যে ব্যক্ত হইল। শুধু তাহাই নহে মিথ্যাচারের উপর মানুষের প্রাণধর্ম্মের মূল্য অনেক বেশী সে বিষয়ে মানুষ সজাগ হইল। এই সকল মিথ্যাচার, অনাচার জাতির প্রাণধর্ম্মকে ক্ষয় করিতেছে, ধর্ম্মপালনের নামে জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের পরিপূরক। শরৎচন্দ্রের আবেগের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা তারাশঙ্করে নাই, কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে সর্ব্বব্যাপিনী মানবীয় সহানুভূতি আছে। সেই সহানুভূতির আলোকে ডোম, কাহার, বাউরী, বাগ্দী, চাষী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্তর হইতে মানুষের প্রাণের ঠাকুর বাহিরে আসিয়াছেন। তারাশঙ্কর এযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, জাতির জীবনে কাল দুর্য্যোগ লইয়া আসিয়াছিল। বাঙ্গালীর নীতি, মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, প্রাণ সকলই রসাতলের পথে। আর্ত্ত জাতির মরণ চীৎকার বাঙ্গালীর সাহিত্যে রূপ পাইল। বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণী আঘাতের পর আঘাতে পর্য্যুদস্ত—অন্নহীন গৃহ আচ্ছাদনের অভাবে অবাধে রৌদ্র জল সহ্য করে—মানুষের মর্য্যাদাও ধূল্যবলুণ্ঠিত, নারী লইয়া স্বার্থলোলুপ মানুষ ব্যবসায় শুরু করিয়াছে, মানুষের ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া মানুষকে পথের ভিখারী করিয়াছে। মানুষের লোলুপ হিংস্র করাল মূর্ত্তির বীভৎস রূপ, ক্ষুধার ক্রন্দন, নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ শাণিত আর্ত্তনাদ সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর', অচিন্ত্যকুমারের 'যায় যদি যাক', নবেন্দু ঘোষের 'ডাকদিয়ে যাই', সুশীল জানার 'কাণাগলি' এবং

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব

সমসাময়িক বহু উপন্যাসে মানুষের মহা অধঃপতনের ভয়াবহ সর্ব্বনাশের নিখুঁত চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

কেবল নিম্নশ্রেণীর মানুষই নয়, দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ম্মূল্যতা শিক্ষিত সভ্য মানুষের জীবনযাত্রাও বিকল করিয়া দিল। একদল স্বার্থলুব্ধ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবি মানুষ চিরকাল অন্যায়ের পথই চরম মনে করিয়াছে। যুগে যুগে তাহারাই দেশ ও জাতির কর্ণধার হইয়াছে, শোষণের চরম আদর্শ হইয়াছে। মানুষের প্রাণ, তাহার মনুষ্যত্ব, সকলই অর্থমূল্যে ক্রীত হয়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। নানা সমস্যাপীড়িত সাধারণ মানুষের দল উদ্‌ভ্রান্ত, বিচারশূন্য অবস্থায় উদ্ভট প্রতিকারের পথ খোঁজে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির রচনায এই চিত্তবৃত্তির সাম্যে আস্থাহীন মেরুদণ্ডহীন তথাকথিত সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কিত হইল। বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্ত্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, অজিত দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, মণাশ ঘটক প্রভৃতির কবিতায় জাতির বিশ্বাসহীন, ধৈর্য্যহীন, বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তির পূর্ণ পরিচয মেলে।

অদৃষ্টের স্রোতে গা-ভাসানোতেই মানুষের সার্থকতা নহে—মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায, তাহার প্রাণধর্ম্মের পরিচয় জ্ঞাপনেই তাহার পূর্ণতা সম্পাদন হইয়া থাকে। সাহিত্যেও মানুষের সেই আসল পরিচয়টুকু সুস্পষ্ট হইয়াছে। মানুষের আত্মাপুরুষ সকল তুচ্ছতার উর্দ্ধে মহত্তর বৃহত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্ন্যাল, বিভূতিভূষণ, গোপাল হালদার, নবেন্দু ঘোষ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনায় মানুষের প্রাণধর্ম্মের রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে।

আধুনিক যুগ শিল্পের যুগ। পরাধীনতার রাহুপাশ হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত, কিন্তু নবীন ভারতে সমস্যার কণ্টক, দুঃখ দুর্দ্দশা দৈন্যের প্রচণ্ড ভারে আজও মানুষ নিষ্পেষিত। বিজ্ঞানের সৃষ্টি যন্ত্র তাহার সকল ক্ষুধা, সকল সমস্যার সমাধান করে নাই।

শিল্প যুগ

যন্ত্রের কল্যাণ আজ মানুষের জীবনে অভিশাপ হইয়াছে। মানুষের দুর্নিবার লোভের নিকট নীতি, ধর্ম্ম, ন্যায় খেলার বস্তু হইয়াছে। দ্বিধাবিভক্ত দেশ ও জাতি অর্দ্ধাশন, অনশনে দিন যাপন করিতেছে—দৈন্য, মূঢ়তা, মর্য্যাদাবোধ-হীনতা তাহার স্থির বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতেছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে মানুষ অমৃতের পথ, কল্যাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে। তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক

উপন্যাসাবলী, শক্তিপদ রাজগুরুর রচনা 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' 'পঞ্চতপা', গজেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির উপন্যাসে বর্ত্তমানের মানুষের মধ্যে যে দেবাসুরের সংগ্রাম নিযত চলিতেছে তাহারই প্রাণবন্ত কাহিনীর কথা পাই।

সাহিত্য চিরদিনই প্রাণের তাগিদে রচিত হইযাছে। মানুষের মধ্যে যখনই প্রাণের আবেগ উচ্ছ্বসিত হইযাছে, তখনই ভাব ও ভাষার মাধ্যমে এই প্রাণবন্যার কল্লোল উদ্বেল হইযা উঠিযাছে। প্রাণধর্ম্মের প্রকাশ সাহিত্যের বিশিষ্ট পরিচয।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাহিত্যে অসুস্থতা

সাহিত্যের মূল তার প্রাণে নিহিত। সেই প্রাণরস যখন শুষ্ক হইযা আসে তখনই সাহিত্য তাহার মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইযা পড়ে। দেহ যখন সুস্থ থাকে তখনই দেহী পরিপূর্ণ প্রাণচঞ্চল রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয। সেই সুস্থতার অভাব দেহীকে ম্রিযমাণ ও নিষ্প্রাণ করিযা তোলে। সুস্থ না থাকাই অসুস্থতা। অসুস্থ জ্বরতপ্ত দেহের নানা বিকার লক্ষিত হয, সেগুলির কোনটিই সুন্দর এবং স্বাভাবিক নহে। সাহিত্যও মনের সৃষ্টি। সুস্থ মন যে সাহিত্য সৃষ্টি করে তাহা মঙ্গল ও সুন্দরের বাণী বহন করিযা আনে। সাহিত্যে মনোরাজ্যের ছবি প্রতিফলিত হয। অসুস্থ মন সাহিত্য সৃজন করিলে তাহা বিকারগ্রস্ত মনের প্রলাপ বলিযা মনে হয়।

আদি বা শৃঙ্গার রস জীবের চিত্তের প্রথম বিক্ষেপ। এই শৃঙ্গাররস সাহিত্যেও প্রথম দিন হইতে বিশিষ্ট স্থান লইযা আছে। এই রসেই সকল রসের মূল এবং অন্ত বলা চলে। আদিকবি বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম যে শ্লোক রচিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সেই আদি কবিতাটিও শৃঙ্গাররসাত্মক ছিল। প্রেমাবদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের কেলিবিলাস ব্যাধের নিষ্ঠুর শরাঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল—রক্তাক্ত প্রণয়ীর দেহ ঘেরিয়া প্রিয়বিয়োগবিধুরা ক্রৌঞ্চী আর্ত্ত ক্রন্দনে গগন পূর্ণ করিল। শৃঙ্গাররসের

আদিরস

এই চিত্র বাল্মীকির অন্তরে ভাবকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। বিরহীচিত্তের বেদনায় সমবেদনাতুর ঋষি কবির কণ্ঠে ঘোষিত হইল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকবধীঃ কামমোহিতম্॥"

'কামমোহিতম্' কথাটির মধ্যে শ্লোকটির সকল তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কামই শৃঙ্গাররসের বিভাব। বিরহবেদনাতুর ক্রৌঞ্চীর আর্ত্তি বাল্মীকিকে প্রেরণা যোগাইল—জগতের প্রথম কবিতা বা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল—তাহা হইল রামায়ণ। রামায়ণে মানুষের কর্ত্তব্য, প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রভৃতি সকলই আছে, কিন্তু কাহিনীর আদ্যন্ত রামসীতার সুগভীর প্রেমের কাহিনী লইয়া। নিষ্ঠুর রাবণ এবং হৃদয়হীন মনুষ্যসমাজ এই প্রেমকে ব্যাধের মতই বারে বারে আঘাত করিয়াছে। মহাকবি সেই প্রেমের কথা—চির বিরহের কথাই জানাইয়াছেন। পৃথিবীর সকল জীবসৃষ্টির মূলে এই রতি—সেই রতিকে স্বর্গীয় সুষমা দিয়াছেন কবি ও সাহিত্যিক। সেই রতি সাহিত্যে আদিরসে পরিণত হইয়াছে, কেননা সাহিত্যের ধর্ম্ম লৌকিককে অলৌকিক রসে পরিণত করা। যাহা নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনের ব্যাপার তাহাকে অপূর্ব্ব রূপে রসে গন্ধে কবি কেমন করিয়া পূর্ণ করিয়া দেন। আহার, নিদ্রা প্রভৃতিও নিতান্ত জৈবিক ব্যাপার, কিন্তু তাহা রসবস্তু হইয়া উঠে নাই। আহার, নিদ্রার মূলে হৃদয়গত কোন বৃত্তি নাই—কিন্তু রতিক্রিয়ার পশ্চাতে দুইটি উন্মুখ মিলনোৎসুক চিত্তের আকুতি আছে। সেই আকুতির প্রকাশ দেহধর্ম্মের মাধ্যমে, কিন্তু সেইখানেই তাহার শেষ সীমারেখা টানা যায় না। সেই আকুতির পিছনে থাকে মানুষের আত্মা-পুরুষের সঙ্কীর্ণ বন্ধন হইতে বৃহত্তর মুমুক্ষা। মানুষ ভালবাসিয়া নিজেকে ভুলিতে চায়, ভালবাসিয়া সে পরের জন্য নিজেকে বিসর্জ্জন করিতে চায়। সুস্থ সহজ প্রাণের ধর্ম্ম এই ভালবাসা—আত্মবিসর্জ্জন। 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য বলিয়াছিল —"ভালবাসায় আমি মরিতে পারি।" ভালবাসার ধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম।

সাহিত্যে মানুষের প্রাণের লীলাই স্ফুট হইয়াছে। সাহিত্যেও এই রতি বিভাব আদিরস হইয়াছে। সাহিত্যের কারবার রতিলীলা বর্ণনামাত্রেই পর্য্যবসিত নহে, তাহার ঊর্দ্ধে প্রেমের বিচিত্র বক্রগতিই তাহার অবলম্বন। যেখানে নিছক দেহের ধর্ম্ম, কামনার উৎসব মুখ্য, সেখানে তাহা সাহিত্য হয় নাই। প্রেমের রূপ মানুষ ভেদে, পাত্র ভেদে পার্থিব জগতেও বৈচিত্র্যময়। কেহ কেহ দেহের উন্মাদনা, ঘন চুম্বন, আশ্লেষ, আলিঙ্গনেই প্রেমের চরমতম সীমা

বলিয়া মনে করেন। দেহরতির আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটিলে অনেকেই প্রেমের শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভাবেন। প্রেমে দেহের মিলনের কথা তুচ্ছ বা নগণ্য নহে, কিন্তু তাহাই সর্ব্বস্ব নহে। চিত্তবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি মানেই প্রেমের সমাধি ঘটিয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না। দেহজ মিলনের আকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রের রক্তমাংসের মধ্যেই আছে। তাহা যিনি অস্বীকার করেন তিনি মিথ্যাবাদী, কিন্তু এই দেহের বন্ধন, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকেই সর্ব্বস্ব বলা চলে না। আহার, নিদ্রা যেমন জীবের স্বভাবধর্ম্ম, দেহজ মিলনও তেমনই একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া।

দেহজ কামনার অস্বাভাবিক রূপ সাহিত্যে অনেক সময় দৃষ্ট হয়। সাহিত্য-মুকুরে জাতির মানস প্রতিফলিত হয়। অন্নেব অভাব যখন দেশে দেখা দেয়, মানুষের আহার নামক স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষেব নিকট নিজের উদরান্নের সংস্থান বড হইয়া উঠে। অখাদ্য, কুখাদ্য, খাদ্যাখাদ্য-বিচার লোপ পায়—মানুষ যাহা পায় তাহাই ক্ষুধাব আগুনে আহুতি দেয়। জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, দেহধর্ম্মের প্রধান নীতি চলিযা যায। খাদ্যাখাদ্য-জ্ঞান লোপকে কোন মতেই সুস্থ এবং স্বাভাবিক বলা চলে না। তাহা ত' ক্ষুধাব অন্ন নহে, তাহা ক্ষুধার বিকৃতি। মানুষেব স্বভাব তখন প্রবল হইযা মানুষেব উপর রাজত্ব করে, মানুষ অমানুষে পরিণত হয।

মানুষের তৃতীয় বৃত্তিটির বিষযেও এই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। জাতীয় জীবনে সঙ্কট এবং অতৃপ্তি আসিলেই অসুস্থ মনোবিকার দেখা যায। দেশের জীবনযাত্রাব মান যখন সুস্থ থাকে, মানুষ যখন জীবনের মূল কেন্দ্রে গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন জাতির মেরুদণ্ড ক্লীবত্ব ও বীর্য্যহীনতায অবনমিত হয না। সাহিত্যেও অবাধ ইন্দ্রিয়সেবার সঙ্গীত শোনা যায না। জাতি যখন নীতিজ্ঞানহীন হয, অবাধ ইন্দ্রিয মুক্তির সঙ্গীতের চর্চ্চা করে, অতিরিক্ত রসচর্চ্চায মনের ভাবকেন্দ্র টলমল হয়, তখন সহজেই সাহিত্যে আদিরস গাঁজিযা উঠে। শৃঙ্গার রসের স্বচ্ছ নির্ম্মল অমৃতধারার পরিবর্ত্তে মানুষ আকণ্ঠ সুরাপান করিতে থাকে।

সাহিত্যে বিকারের কারণ

সাহিত্যে অসুস্থ মনোবিকারের প্রধান দুইটি কারণ আমরা দেখিতে পাই—প্রথম জাতীয জীবনে সঙ্কট, দ্বিতীয অতৃপ্তি। সাহিত্যের ধারা বিচার করিলে দেখা যায ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের নিবিড় যোগ রহিয়াছে। যখনই দেশে অন্ধকারময় যুগ চলিয়াছে, তখনই সাহিত্য মানুষকে ঐ পথে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বুদ্ধ ভারতে

যখন তাঁহার অমৃতময়ী বাণী প্রচার করিলেন, সেই সদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে তৃষ্ণার্ত্ত জনগণ দলে দলে ছুটিয়া আসিল। বুদ্ধ শরণ, সত্য শরণ এবং ধর্ম্ম শরণের অভয়মন্ত্রে সঞ্জীবিত জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিল। বুদ্ধ যে সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়া গেলেন, বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামগুলি দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই সদ্ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই নানা পরিবর্ত্তন ঘটিল।

কাল নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের পর ভারত ক্রমেই ক্ষুদ্র বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ছিন্নভিন্ন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। অশান্তি, দুঃখ, যুদ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জের নিত্য সহচর হইল। বহির্ভারতে নব শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ইসলাম এক হস্তে কোরাণ এবং অপর হস্তে তরবারি লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। মহম্মদের শিষ্যগণ নবীন উৎসাহে ভারতের পশ্চিম উপকূলে রণদুন্দুভি বাজাইলেন। সিন্ধুরাজ দাহীর পরাস্ত হইলেন, ভারতের বক্ষে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা প্রথম প্রোথিত হইল।

ইসলাম আক্রমণ ঐখানেই স্থির হইল না। ঐক্যহীন রাজ্যগুলির আত্মকলহ ইসলামের অগ্রগতিকে দ্রুততর করিয়া আনিল। রাষ্ট্রের এবংবিধ বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন অবস্থা, নবীন বৈদেশিক আক্রমণের উপর্য্যুপরি তরঙ্গাঘাত প্রভৃতি সহজেই জাতির অবস্থা অনুমান করায়। বিপর্য্যস্ত জাতির ধন, প্রাণ, মান লুণ্ঠিত হয়; দণ্ডধর রাজশক্তি নির্বীর্য্য, আত্মকলহে শক্তিহীন। জাতির অভ্যন্তরে শক্তিসঞ্চয়ের তাগিদ আসিল না, অর্থহীন আচারের আবর্জ্জনা সমাজের বক্ষে জমিয়া উঠিয়া দূষিত হইয়া উঠিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে—শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রসচর্চ্চায়, সুকুমার ভাবের চর্চ্চায় জাতি আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিল। ইসলামের রণহুঙ্কার তাহার মোহাচ্ছন্ন চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে পারিল না।

বুদ্ধ যে ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রস্তুত করিয়া যান, ভারতের ইতিহাসের প্রত্যূষে জাতির জীবনে সন্ন্যাসব্রতধারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর পবিত্র ব্রহ্মচারী জীবন নবীন আদর্শ ও কর্ম্মোন্মাদনা যোগাইয়াছিল। কিন্তু আদর্শে ক্রমেই শিথিলতা দেখা দিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ আদর্শের উন্মাদনায় বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ যাঁহারা পালন করেন, জীবসেবার জন্য আত্মসুখ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেন, তাঁহারা উচ্চকোটির মানুষ। সাধারণ সহজ মানুষের দল প্রকৃতির স্বভাবধর্ম্মকে অত সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় নানা

দুর্গতি জীবনযাত্রার মানকে কঠোর করিয়া তুলিল। অনেকেই জীবনের কঠোর সংগ্রাম হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের আশ্রয় লইল। কিন্তু এক ক্ষুধার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে গিয়া দ্বিতীয় ক্ষুধার খাদ্যের প্রযোজন হইল। যাহা ছিল একান্ত নিষেধমূলক তাহাই গোপনে চলিতে লাগিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারে রত হইলেন, বৌদ্ধ বিহারগুলি পাপাশ্রয়ের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে রাষ্ট্রীয় দুর্গতি, নিরাপত্তাহীন দণ্ডশক্তি, ধর্ম্মের নামে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর অবাধ মিলন ও পাপাচার, জাতিকে ধ্বংসের পিচ্ছিল পথে আগাইয়া দিল। শক্তিমান ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত বৌদ্ধ বিহারগুলিকে সহজেই ধূলিসাৎ করে। জাতির দুর্দ্দিনের পরিচয়, তাহার নীতিহীনতার জ্বলন্ত চিত্র, তাহার বিকৃত মানসের কুৎসিত রূপ ইদানীন্তন কালের সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমের নামে সাহিত্যে যে সঙ্গীত, যে চিত্র আমরা পাই তাহা মানুষের একটি বিশেষ বৃত্তিকেই উদ্দীপিত করিয়া তোলে। তাহাকে আমরা যতই বিশেষ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করি না কেন, আজিকার দিনের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহার উপর যতবড় মহৎ প্রলেপই দিই না কেন—তাহার সত্যকার রূপকে লুকান যায় না। এই অন্ধকার যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসই উজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছেন কিন্তু আর সকলই তুচ্ছ ও রুচিহীন রচনা। এই সকল ব্যর্থ সাহিত্যের মূলে তৎকালীন জনরুচির তাগিদ ছিল ইহা নিশ্চয়ই অনুমেয়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এই বিষয়ে অগ্রগণ্য বলা যাইতে পারে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচনায় রসাবেশের আধিক্য ঘটিয়াছে, কাব্যের মধ্যে অধ্যাত্মসুষমার পরিবর্ত্তে বর্ণনার সাহায্যে পাঠককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র মধ্যে স্থূল এবং অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় স্পষ্টতর। আদিরসের এক অতি স্থূল এবং কদর্য্য ধারা তৎকালীন জনসাধারণকে আনন্দ দান করিত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' চটুল ছন্দে, লঘু সুরে সেই আদিরসের সম্ভোগের কাহিনী আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের রাধাসম্ভোগের জন্য যে আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিতান্তই জৈবপ্রবৃত্তির উত্তেজনা বলিয়া মনে হয়। রাধার প্রেমহীন বাধ্যতামূলক

আত্মসমর্পণ মনে অস্বস্তি আনে। রতি উপভোগ সফল করাই প্রেমের উদ্দেশ্য দেখা যায়।

"গএ গদাধর প্রেযাগে মাধব
তোকে আলিঙ্গন মাঙ্গে ॥
* * *
এ রূপ যৌবন সব থীর নহে
মনে ভাব গোআলী।
রতি উপভোগে সফল কর
পবিতোষ বনমালী।"

রাধার কৃষ্ণসম্ভোগেচ্ছার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মুখর হইয়াছে। কৃষ্ণ "আহ্মে দেব বনমালী" ঘোষণা করেন, রাধাকে সেই কারণেই তাঁহাব ভজনা করিতে হইবে এইরূপ কারণ দেখান। প্রেমের দ্বারা জয় না করিয়া দেহ-সম্ভোগের প্রবল বাসনা এবং গোলকবিহারীর দৈবী ক্ষমতাই ঘোষিত হইয়াছে। দেহের রূপ বর্ণনায় কৃষ্ণ মুখর; রাধিকার তীব্র বাদানুবাদ এবং অসম্মতিতে কৃষ্ণ কর্ণপাত করেন নাই। রাধিকা যেখানে বারবার বলিযাছে—

"দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।
কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন ॥
রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন।"
"ছাডহ নিলজ কাহ্নাঞি হেন পাপাবানী।
আহ্মে শিশু মতী রতি কথাহো না জানী ॥
* * *
উনমত সদৃশ কেহ্নে বোলহ বচন।
এহা বুঝি নিবারিযা থাক নিজ মন ॥"

কৃষ্ণ সেখানে উন্মত্তের মতই নারীদেহ সম্ভোগকেই কামনা করিয়াছে।

"কিকে তো নাগরি রাধা উপেখসি মুখ।
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ ॥
উন্নত পযোধরে ধরি মোরে চাপ।
পালাউ আহ্মার বিরহ সন্তাপ ॥"
"কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।
তোর দুই তনে লাগু রসের হিলোল ॥"

এমন কি নিজের কামবাসনাকে তৃপ্ত করিতে ধর্ম্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি দিতেও ছাড়ে নাই। স্বভাবতঃই এই জাতীয় দৃষ্টান্ত হইতে অনুমিত হয় ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার জাতির রক্তকণিকায় মিশিয়া গিয়াছিল।

"তোহ্মার বচন বাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহিঁ মুনীর সমত ॥
* * * *
নিজ পরনারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপনা সব মিছা জান তারে ॥"

তাম্বূলখণ্ড হইতে হারখণ্ড পর্য্যন্ত দেহসম্ভোগের নানা বিচিত্র বর্ণনা পাই—পরস্পরের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার কথা আছে, কিন্তু তাহা দেহমিলনেই আবদ্ধ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' বিভিন্ন খণ্ডে কৃষ্ণের অভিলাষ, রাধার প্রতিবাদ, কথোপকথন ও দৃপ্তভাবে কথাকাটাকাটি সহজেই তৎকালীন প্রাকৃতজনের রুচিকে একান্তভাবে পরিতৃপ্ত করিত। তাম্বূলখণ্ডে বড়ায়ির সহিত রাধার কলহ, কৃষ্ণের উপহৃত বস্তু নিক্ষেপ, দানখণ্ডে বড়ায়ির রাধাকে সম্ভোগে উৎসাহ দান প্রভৃতি নিশ্চয়ই জনরুচিকে উদ্দীপিত করিত। সাহিত্যে জাতির মানসিক গতির প্রবণতা ফুটিয়া উঠে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দেহরতির যে উদ্দাম উৎসব চালিয়াছে, তাহাতে মনে হয় নানা বিধিনিষেধের চাপে নিষ্পেষিত জাতি সাহিত্যের মধ্য দিযা ধর্ম্মের অন্তরালে আপনার অতৃপ্ত ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিত।

জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদে কালকে অতিক্রমের চেষ্টা দেখা যায়। অনাগতকালের মহৎ পদধ্বনি তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনায় যুগের ছাপ কিছু কিছু পড়িয়াছে। অলঙ্কারের দীপ্তি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা বর্ণনা, মিলনের বৈচিত্র্য এবং সম্ভোগ বর্ণনার মধ্যে যুগের প্রভাব পড়িয়াছে। উমাপতিধরের গীতিকাব্য, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শৃঙ্গার রসাত্মক পদগুলিতে প্রাকৃত প্রেমলীলার আদর্শই মুখ্য হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের শেষ পরিণতি সম্ভোগে—ইহার বাহিরে প্রেমের সার্থকতা কবিরা পান নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বর্ণনায় মানবীয় সম্ভোগের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'এ কবি বারে বারে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় পারস্পরিক মিলনের অভীপ্সা স্ফুট হইয়াছে। রাধার কৃষ্ণবিরহে "হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্" অবস্থা

হইয়াছে—তিনি উন্মাদিনীর মতই ব্যবহার করিয়াছেন। বিরহের মধ্যে তিনি কৃষ্ণমিলনের যে সকল পূর্ব্বস্মৃতি আলোচনা করিযাছেন তাহা সকলই সম্ভোগমূলক।

"নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতযা নিশি রহসি নিলীয বসন্তম্
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্।
সখি হে কেশিমথনমুদারম্
রময ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্॥"

মান এবং পুনর্মিলনের ছত্রগুলির মধ্যে গভীরতর প্রেমরাজ্যের ইঙ্গিত আছে, ভক্ত ও সাধকের অনুভূতির কথা আছে। কিন্তু যুগের প্রভাব সেখানেও হস্তক্ষেপ করিযাছে। তাই ভগবান কেশবের প্রেমের সঙ্গীত গাহিতে যাইযা কবি জযদেবের কাব্যে আদিরসের স্রোত কিছু অধিক পরিমাণে উচ্ছলিত হইযাছে। জযদেবের গীতগোবিন্দে মধুররসাশ্রিত কোমলকান্ত পদে কেলিবিলাসের যে সঙ্গীতের স্থচনা পাই, বিদ্যাপতির পদে তাহারই পূর্ণ বিকাশ ঘটিযাছে।

বিদ্যাপতি কৃষ্ণকে নারাযণ এবং ত্রিভুবনপতি বলিযা স্মরণ করাইয়া দিযাছেন। জযদেব এবং বিদ্যাপতি উভযেই ছিলেন রাজকবি। স্থতরাং রাজরুচিকে তৃপ্তি দিবার জন্য বর্ণনার ঘটা এবং সম্ভোগের লীলা কিছু প্রখর হইযাছে। ইহা তৎকালীন রাষ্ট্রীয অবস্থা এবং রুচির ক্রমাবনতি নির্দ্দেশ করে। বিদ্যাপতির পদে ভাষার লালিত্য, ছন্দের চাতুর্য্য অনেকখানি। জযদেব এবং বিদ্যাপতির পদে রাধার দেহের বর্ণনাই মুখ্য, হৃদযের অংশ গৌণ। রাধাকৃষ্ণ অনেক সময় উপলক্ষ্য হইযাছেন—আদিরসাত্মক বর্ণনা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবিদের প্রধান লক্ষ্য হইযাছে। রাধার প্রেমে বেদনা আছে, কিন্তু সেখানে বেদনায কিছু কৃত্রিমতাও আছে, দেহতৃষ্ণাই প্রবল। রাধা বেদনার্ত্ত হৃদযে সখীর নিকট দেহমিলনের কথাই বলিয়াছে। রাধার দেহ যৌবনলাবণ্যে পরিপূর্ণ, দেহকে নানা উপচারে সজ্জিত করিযা প্রিয়ের নিকট যৌবনের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে রাধা অধীর প্রতীক্ষমানা। ইন্দ্রিয়ের সীমানার মধ্যে, দেহসৌন্দর্য্যের গণ্ডিতে, বাসরশয্যাতেই প্রেমের চরমত্ব টানা হইয়াছে।

বিদ্যাপতির "রচনারীতি ও মানসভঙ্গী রাজসভার রুচি ও তাগিদের দ্বারা অধিকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা উপলক্ষ্যে যে রাজপরিবারের দাম্পত্য প্রেমের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন ও রাজদম্পতির উপর

রাধাকৃষ্ণের গৌরবের কিয়দংশ আরোপে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা তাঁহার ভণিতায় রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের নামের পুনঃ পুনঃ সম্ভ্রমের উল্লেখে পরিস্ফুট।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি নানা মঙ্গলকাব্যের উত্থানও এযুগে। দুর্ব্বল রাষ্ট্রশক্তি ও প্রবল ইসলামের আক্রমণ জাতিকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় উপনাত করিয়াছিল। বিভ্রান্ত নীতিহীন জাতি জীবনের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া মানুষ একান্তভাবেই দৈবকৃপার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ইত্যাদি আধুনিক সংস্কৃত পুরাণগুলি কিছু পূর্ব্বে রচিত হয়। এই পুরাণ এবং লৌকিক ধর্ম্মের যোগসাধনে এই সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইল। পূজার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও রচিত হইতে লাগিল।

মঙ্গলকাব্য

সংস্কৃত পুরাণগুলির নীতিবোধ যুগের আবহাওয়ায় শিথিল হইয়া যায়। সমাজের দূষিত পরিবেশ সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণে মঙ্গলকাব্যগুলিতে অশ্লীলতা দোষ খুব বেশী রকম চোখে পড়ে।

ধর্ম্মের নামে নানা অনাচার, বৈদেশিক মুসলমান শাসনের পীড়ন, সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে এই মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুদৃঢ় শান্তিপূর্ণ শাসনের পরিবর্ত্তে ধন-মান-প্রাণের অনিশ্চিত অবস্থা এবং পীড়ন উপদ্রব জাতির জীবনযাত্রা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার, শৌর্য্যহীনতা, কর্ম্মবিমুখতা, গতানুগতিক চিন্তাধারাই সকল জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উচ্চতর ভাব, আদর্শকে ত্যাগ করিয়া দুঃখ দারিদ্র্য অপমান লাঞ্ছনার জন্য অসংখ্য দেবদেবী ষোড়শ উপচারে তুষ্ট করাই একমাত্র ধর্ম্মসাধনা হইয়া দাঁড়াইল।

"জাতীয় জীবনের অধোগতির ছাপ মঙ্গলকাব্যে পড়েছে। এই কাব্যে তাই শৌর্য্য ও গৌরবের চেয়ে কাপুরুষতা ও অপরিসীম দৈন্য, প্রেম ও ভক্তির চেয়ে ভয় ও ভিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দৈবের সাথে দ্বন্দ্বে পুরুষকারের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।" (তুলসীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রে দেবত্বমহিমা পাওয়া বড় দুষ্কর। দেবী মনসা ক্রূর চরিত্র এবং খলতার জন্য আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারেন না। চণ্ডীও সামান্য কলহপরায়ণা রমণীর মতই ইতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দেবাদিদেব মহাযোগী সংহারকর্ত্তা মহাদেবের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিও আমরা দেখিতে পাই না। তিনি প্রাকৃত জনগণের মতই কামোন্মত্ত। এই সকল দেবচরিত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই তৎকালীন গ্রামপ্রধানদের ছায়া পড়িয়াছে। "এই সব চরিত্রের পরিকল্পনায় নিজ নিজ গ্রামের জুলুমবাজ জমিদার, ঘুষখোর রাজকর্ম্মচারী, হীনচরিত্রা গ্রাম্য ডাইনী প্রভৃতির আদর্শ লুকানো আছে কি না সেকথাও অনুমান করা যেতে পারে।" (নন্দগোপাল সেন)

কাহিনীর মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়। লখীন্দরের জন্ম, লখীন্দরের প্রথম পত্নী সম্ভাষণে কামার্ত্ততা, সনকার চরিত্রে সন্দিগ্ধ পিতাপুত্রের কুৎসিত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের হীনতাই স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিহার বর্ণনার নামে পুঙ্খানুপুঙ্খ রতিক্রীড়ার বর্ণনাও রুচিহীনতার পরিচয় দেয়। লখীন্দরের জীবনপ্রাপ্তির পরেও বণিক সমাজপতি-গণের বেহুলার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ নিঃসন্দেহে সামাজিক সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচয় দেয়। যে নারী মৃত পতিকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনে তাহার সতীত্ব পরীক্ষার চিন্তা যাহার মস্তকে আসে তাহাকে উন্মাদ ভাবাই উচিত। এমন কি লখীন্দরও জীবনপ্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞ না হইয়া প্রথমে সন্দিহান হইয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গলেও ধনপতির শয্যার অংশগ্রহণের জন্য সপত্নীদ্বয়ের কলহ অতি ইতরসুলভ।

ষোড়শ শতাব্দীতে হোসেন শাহ সুলতান হইলে বাংলায় পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল। মহাপ্রভুর প্রভাবে দেশে বহু জীর্ণ প্রাচীন কুসংস্কার ভাসিয়া গেল। জাতির জীবনে প্রাণশক্তির বন্যা বহিল। ইহলোকের সুখান্বেষণ মাত্র ধর্ম্মের লক্ষ্য রহিল না—ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ মানুষ চিনিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরবময় যুগ সুরু হইল।

কিন্তু ক্রমেই মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মে বিকৃতি প্রবেশ করিল। মহাপ্রভু এবং ঋষিকল্প ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ পার্ষদগণের জীবনীর নানা বিকৃত প্রচার সুরু হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে তন্ত্রকে মিলাইয়া এক সহজ ধর্ম্মের চলন হইল। রসচর্চ্চার নামে দেশে পুনরায় অবাধ ব্যভিচার সুরু হইল। সহজ সাধন, কিশোরী ভজন, পরকীয়া তন্ত্র, কর্ত্তাভজা, নবরস প্রভৃতি নাম দিয়া মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে যথেচ্ছাচার চলিতে লাগিল। বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রথা ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে লাগিল। অসংখ্য নারী এই কৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে বলি হইল। সমাজে একদিকে নানা

বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃতির প্রভাব

বিধিনিষেধের কঠোরতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রঘুনন্দনের স্মৃতির শাসন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে পুনরুত্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট ও কঠোর হইল। অন্যদিকে সমাজের কঠোর বিধিনিষেধে জর্জ্জরিত, অতৃপ্তকাম জনচিত্ত ধর্ম্মের নামে বীভৎস রসচর্চ্চায় আত্মসমর্পণ করিল। রাষ্ট্রেও নানা দুর্গতি সুরু হইয়াছিল। পাঠানশক্তি পরাস্ত হইল—মুঘলশাসনও দেশে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল না। বারো ভুইঞার দল ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যাইতেছিল। মগ ও পর্ত্তুগীজ হার্ম্মাদের দল দেশের উপর অনবরত হামলা চালাইতেছিল। মানুষের নিরাপত্তা-বোধ লুপ্ত হইল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের দৃঢ়মুষ্টি অধিকতর শিথিল হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাপুঞ্জের কঠোর শাস্তি বিধান প্রজার মনোবল চূর্ণ করিতে লাগিল। বন্যার তরঙ্গবেগের মত উপর্য্যুপরি দস্যুর আক্রমণ জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ধন, প্রাণ, নারীর সম্মান সকলই খেলার বস্তু হইয়া উঠিল। বর্গীর আক্রমণ দেশে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইল। রসচর্চ্চাতুর জাতি বর্গীর আক্রমণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না।

জাতীয় জীবনে দুর্নীতি

জাতীয় চরিত্রের অবনতি কতদূর নামিতে পারে তাহা আলিবর্দ্দী খাঁয়ের মৃত্যুর পরেই বোঝা গেল। আলীবর্দ্দীর আদরে পালিত দৌহিত্র সিরাজের চরিত্র যুগের সকল দোষ গ্রহণ করিয়াছিল। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী মৃত্যুকালে যে সকল বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গের উপর সিরাজের ভার দিয়া গেলেন তাঁহারাই সিরাজের কণ্ঠরোধ করিলেন। জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, মীরজাফর, মীরণ, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ সকলেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া ইংরাজকে সিংহাসন দিতে সাহায্য করিলেন। মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়াও বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করিল; পলাশীর আমবাগানে নীতিজ্ঞানভ্রষ্ট বীর্য্যহীন জাতির চরম পরিণতি ঘটিল। জাতির এই মহাসর্ব্বনাশের দিনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিষ্প্রাণতা ও গতানুগতিকতা লক্ষিত হয়। সাহিত্যে রসচর্চ্চার অবিরাম পঙ্কিল স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিল।

সাঁই ও সহজপন্থীদের রচিত নানা ছোটবড় নিবন্ধ দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইগুলির মধ্যে সহজিয়া ধর্ম্মসাধনের অন্তরালে নানা কুৎসিত ব্যভিচারের কথা পাওয়া যায়। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির রচনা একান্ত গতানু-গতিক হইয়া পড়িল। লেখকের রচনায় ভক্তিরসের অভাব ঘটিল—রসবিকৃতির ফলে রচনায় পূর্ব্বতন নবীনতার পরিবর্ত্তে প্রাচীন সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি চলিতে

লাগিল। জনসাধারণ ধর্ম্মের গুরুত্ব ও প্রকৃত মূল্যবোধ ভুলিয়া গেল। তাহারা নিজ প্রবৃত্তি তৃপ্তর্থ্যে এই লঘু রচনাগুলিকে সমাদর করিয়া লইল। ভবানন্দের 'হরিবংশ', দ্বিজ বাণীকণ্ঠের 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত', ভবানীদাস ঘোষের 'রাধাকৃষ্ণ বিলাস' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনার নিদর্শন। মধ্যে মধ্যে কিছু উন্নততর রচনার নমুনা এযুগে চোখে পড়ে, কিন্তু অধিকাংশই নিকৃষ্ট শ্রেণীর, গতানুগতিক এবং রুচিহীন।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'কে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা বলা চলে। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচি খুব বেশী উঁচু স্তরের ছিল না। মুসলমান দরবারের দুর্নীতিগুলি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনুসরণ করিযাছিলেন। তিনি স্বযং গ্রাম্য তামাশা ও ইতর কৌতুকে প্রীতি অনুভব করিতেন। তাঁহার কৌতুকজ্ঞান সুরুচি, সংযম ও ভদ্রতার ধার ধারিত না। কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচিকে তৃপ্ত করিতে কবিকে যত্ন লইতে হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন। দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলনে নবরসের চর্চ্চা ব্যাপকভাবে চলিতেছিল।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে উপমা এবং অতিশযোক্তি অলঙ্কারের ছড়াছড়ি দেখা যায। ভারতচন্দ্রের রচনায চরিত্রের কোন উৎকর্ষ, কোন শুদ্ধতা দেখা যায না। বিদ্যা, সুন্দর প্রচণ্ড কামপরাযণ নরনারী—তাহাদের প্রে· বিহার বর্ণনাই পাতার পর পাতা ধরিযা চলিযাছে। মালিনী চরিত্রের সৃষ্টিও জাতীয চরিত্রের দুর্ব্বলতা সূচিত করে। মহাযোগী মহাদেবের চরিত্র কামপরাযণ বেদিযার মত অঙ্কিত হইয়াছে। সকল দেবচরিত্রই দেবত্ব হারাইযাছে, মনুষ্যত্বের মানদণ্ডও অতি নিম্নস্তরের বলিযা মনে হয।

কেবল 'বিদ্যাসুন্দর' নহে—'চন্দ্রকান্ত', 'কামিনীকুমার', 'জীবনতারা', জযনারাযণ সেনের 'চণ্ডী' প্রভৃতি নানা কদর্য্যরুচিপূর্ণ কাব্য দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইযাছিল।

দেশব্যাপী এই কুশ্রীতা, কুরুচি এবং কদর্য্যতার পঙ্কিল স্রোতে একটি শুভ্র শতদলের মধুর সৌরভ এবং সুষমা আমাদের নযনমনকে স্নিগ্ধ করে, তাহা সাধক রামপ্রসাদের মাতৃ সঙ্গীত।

দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন যাত্রা ও পালাগানের প্রচলন বহুদিন হইতেই ছিল। কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যযাত্রা, চণ্ডীযাত্রার পরিবর্ত্তে বিদ্যাসুন্দর পালা

ক্রমেই গীত হইতে লাগিল। যুগের প্রভাবে এই সকল পালায় ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি পাইল, নির্ম্মলতার পরিবর্ত্তে কদর্য্যভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচিত হইতে লাগিল।

যিনি প্রকৃত কাব্য রচনা করেন তাঁহাকেই আমরা কবি আখ্যা দিতে পারি। কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ আনন্দ দান করা, রসানন্দে চিত্তকে পরিপূর্ণ করা। পাঠকের চিত্তে কবি তাঁহার কাব্য দ্বারা, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং অলৌকিক আনন্দ প্রকাশ করেন। কবি তাঁহার সৃষ্টিদ্বারা পাঠককে আনন্দ দান করেন। শ্রেষ্ঠ কবি কাব্য রচনা করেন প্রাণময় বা মনোময় শরীরের ঊর্দ্ধে নিজ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হইযা। কাব্য মানুষের পরিমিত ব্যক্তিত্বের অন্ততঃ আংশিক অবসান ঘটাইযা তাহার সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত আনন্দ-চৈতন্যের ক্ষণিক প্রকাশরূপ কাব্যানন্দ দান করে।

কবিওযালাদের রচিত কবিতায এই লোকোত্তর অনির্ব্বচনীয আনন্দের প্রকাশ পাওযা যায না। তাঁহাদের কবিতাব বিষযবস্তু বা ভাববস্তু অত্যন্ত স্থূল। জনসাধারণেব স্থূল রুচিকে তৃপ্ত কবিযাই তাহা ক্ষান্ত হইত। কবিওযালাদের লইযা সমগ্র দেশ মাতিযা উঠিল। অনুপ্রাস এবং যমকের অলঙ্কারশিঞ্জন শ্রোতার কর্ণকে সহজেই আকৃষ্ট কবিল এবং জনচিত্তকে অধিকার কবিযা বসিল। অতি সাধারণ বিষযবস্তু এবং তাহা লইযা কথার পব কথার খেলা দেখাইযা সহজেই তাঁহারা জনসাধারণকে মাতাইযা তুলিতেন। শব্দচাতুর্য্যকে অতিক্রম করিযা কোন এক বিশেষ রসের দ্যোতনা বা উচ্চ ভাবরাজ্যের সামগ্রী সৃষ্টি তাঁহারা করিতে পারেন নাই। অতি অশ্লীল এবং রুচিবিগর্হিত বর্ণনার জারকরসে তাঁহারা শ্রোতাকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

কবিওযালা

গোপাল উড়ে, শ্যামলাল, কৈলাস বারুই প্রভৃতি পালাকারগণ এই জাতীয পালার অভিনয়ে কৃতিত্ব লাভ করিযাছিলেন। লঘু, তরল ভাব ও চুটল ভাষা সহজেই জনচিত্তকে আকৃষ্ট করিল। দাশু রাযের রচনাতেও স্থূল আদিরস, ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা, ভাষার চাতুর্য্য লক্ষিত হয। অত্যন্ত স্থূল রুচিপূর্ণ কদর্য্যভাব-সমন্বিত খেমটা, কবিগান ও তরজার লড়াই-এর প্রবল প্রতাপ চলিতে লাগিল। নাগরিকগণ এই জাতীয় গানকে খুব বেশী রকম সমাদর করিতেন। কবিগান, যাত্রাগান রচয়িতাগণের মধ্যেও কেহ কেহ নির্ম্মল রুচির পরিচয় দিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

ইংরাজশাসন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষিত জাতি নানা ভাবের আদান-প্রদানে লাভবান হইল। জাতির চিত্ত সংস্কৃত হইল। রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, অক্ষয়চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ধর্ম্মগুরু এবং মনীষির প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের মূল উৎপাটিত হইল। জাতির মনের গতির মোড় ফিরিল। উচ্চতর ভাব এবং আদর্শ, নির্ম্মল কৌতুকরস এবং প্রীতির সঙ্গীত প্রাণে প্রাণে ঝঙ্কার তুলিল। জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান জাতিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিল। বহু শক্তিশালী লেখক এবং কবি সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, কাব্যে, গল্পে সাহিত্যের বহুমুখী উন্নতি সাধন করিলেন। জাতির চিন্তার স্ফূর্ত্তি এবং প্রাণধর্ম্ম সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইল।

ইংরাজ শাসন

বৈদেশিক শাসনের পেষণতা এবং স্বার্থপরতা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। করভার প্রপীড়িত জনসাধারণ অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইল—কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি নানা বৃত্তিপরায়ণ প্রজাবৃন্দ খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, অর্থাভাব, চিকিৎসাভাবের দায়ে ক্রমেই ঋণের ভারে ডুবিয়া গেল। শ্রমলব্ধ ফসল খাজনার দায়ে বিকাইয়া যায়, এককণা হতভাগ্য সন্তানের মুখে তুলিতে পারা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কেরাণীত্ব লাভই জীবনের চরমলক্ষ্য ও আদর্শ হইয়া পড়িল। সেই চাকুরীও দুর্লভ বস্তু হইয়া উঠিল। বিপ্লববাদের মন্ত্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বিদেশী শাসনকর্ত্তার চরম রোষদৃষ্টিতে পড়িল, অত্যাচারের মুষ্টি দৃঢ়তর হইল।

বৈদেশিক শোষণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যে প্রচণ্ড আঘাত হানিল তাহার ফলে সকল নীতির শিকড় আলগা হইয়া গেল। মানুষের অন্তরবাসী গুহাশ্রয়ী পশু তাহার স্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। মহাযুদ্ধের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিল, এক শ্রেণীর অতি লোভী মানুষ বিদেশী শাসকের সহায়তায় মানুষের ক্ষুধার অন্ন ও নারীর মর্য্যাদা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত লোভ, আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন পশুতে পরিণত করিল। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ভয়াবহ বিভীষিকা। অগণ্য মানুষ অনাহারে পথে মৃত্যু বরণ করিয়া লইল—মৃতের স্তূপে পথ চলা দায় হইল। যেটুকু খাদ্য পাওয়া গেল তাহা দুর্ম্মূল্য—মানুষের

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাত

ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। গরু ভেড়া ছাগলের মত নারীর মর্য্যাদাও বিক্রীত হইল। নারীমেধ যজ্ঞ সুরু হইল—পশুও বোধ হয় মানুষের পশুত্ব দেখিয়া লজ্জিত হইল। বিশুদ্ধ খাদ্য, রোগীর ঔষধ সকলই ভেজালদুষ্ট হইয়া জাতির স্বাস্থ্যকে চিরতরে ধ্বংস করিয়া দিল। নীতিবোধ, ধর্ম্মভয়, পাপবোধ জাতির অন্তর হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া গেল। মানুষের খাদ্যে, রোগীর ঔষধে যখন নির্ব্বিকার চিত্তে বিষ মিশাইতে পারে তখন সেই জাতি মনুষ্যত্বের সকল সীমা ছাড়াইয়া পিশাচসিদ্ধির মন্ত্র গ্রহণ করে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গী মহামারী দেশের মধ্যে তাণ্ডব বাধাইয়া দিল। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষাভাব, চিকিৎসাভাবে জাতির অন্তরে সীমাহীন বিক্ষুব্ধ সাগর গর্জ্জিয়া উঠে। সর্ব্বত্র অসন্তোষ, সর্ব্বত্র অতৃপ্তি, প্রচণ্ড দুঃখের আঘাত মানুষকে ধর্ম্মে, ঈশ্বরে প্রবল অবিশ্বাসী করিয়া তুলিল।

দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, মহামারীর ধাক্কা কাটাইবার পূর্ব্বেই আর এক মহা সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদেশী শাসক ভারতের একতাকে খণ্ড করিয়া দেশে আগুন জ্বালাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, জাতির দুর্ব্বলতার রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করিল। হিন্দুমুসলিম কলহের যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, তাহার সর্ব্বনাশী প্রলয়ঙ্করী রূপ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে দেখা দিল। সেদিন জাতির ইতিহাসে যে চরম বর্ব্বরতা, লজ্জার কাহিনী লেখা হইল, তাহা শত সমুদ্রের জলেও ধৌত হইবার নহে। নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলা, নররক্তে হোলি লীলা এবং নারীমাংস লইয়া পশুত্বের হিংস্র উল্লাস মানুষকে অতি বর্ব্বর আদিমতম যুগে লইয়া গেল। সকল শিক্ষা, সভ্যতা এক মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া গেল, হিংস্র তাণ্ডবে জাতি মাতিয়া উঠিল।

পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার ধীরে ধীরে অবসান ঘটিল—একটি ক্ষণভঙ্গুর সূক্ষ্ম প্রলেপ সকল কিছু কুশ্রীতার উপর আবরণ টানিয়া দিল। দাঙ্গার পরিণতি ভারতবিচ্ছেদ—কিন্তু সেই বিচ্ছেদের মর্ম্মান্তিক ফল জাতিকে ভোগ করিতে হইল। মান প্রাণ বাঁচাইতে স্রোতের মতই উদ্বাস্তু নরনারীর দল ছুটিয়া আসিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অসংখ্য মানুষের মাথা গুঁজিবার স্থান জুটে না, চাকুরী জুটে না, সন্তানের সুশিক্ষা জুটে না। অন্নাভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ভেজাল খাদ্য জাতির প্রাণশক্তিকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে আগাইয়া দিতেছে। বেকার নরনারী উদরান্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে। নারী গৃহের মর্য্যাদা, নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া স্বামী সন্তান ভ্রাতা ভগিনী বৃদ্ধ

পিতামাতার জন্য জীবিকান্বেষণে ব্যাকুল হইয়াছে। উদরান্নের সংস্থান নাই, বসবাসের স্থান নাই, মানুষের দ্বিতীয় ক্ষুধা সকল দিক হইতে বঞ্চিত হইয়া উদগ্র হইয়া উঠে। নরনারীর অবাধ মিলন, ব্যভিচার প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন, ধর্ম্মহীন জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়াছে।

রাষ্ট্র এবং সমাজের পটভূমিকা যখন এমনই ভয়াবহ তখন সাহিত্যেও মহৎ সৃষ্টির আশা করা যায় না। শক্তিশালী সাহিত্যিক যুগের চিত্রকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। মানুষের লোভের, মনুষ্যত্বহীনতার জলন্ত চিত্র প্রকাশ হইল—সমস্যার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর হইল প্রাণহীনতা, গতানুগতিকতা। বেকার নরনারী জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত, আশাহীন নিরন্ধ্র জীবনে আলোকের, মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ রুদ্ধ। নারী দেহবিনিময়ে সংসারের হাহাকার মিটায়। অতৃপ্ত কামনার তাড়নায় মানুষ সাহিত্যে তৃপ্তির পথ খুঁজিতে লাগিল। সাহিত্যে অবাধ যৌনমুক্তির গান অবিরাম বহিয়া চলিল। নিরর্থক রচনার আবর্জ্জনায় কালের প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিল। বিশেষ কয়েকটি মাসিক পত্র এবং সিনেমা পত্রের চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অভিনেত্রীর যৌবনোচ্ছল দেহের নানা বিচিত্র তরঙ্গিত ভঙ্গি সাগ্রহে পাঠকেরা দেখেন। উপন্যাসেও যৌনকামনার নগ্ন বর্ণনা মানুষের অবচেতন মনের নিদ্রিত পশুকে জাগাইয়া তোলে। মনোরাজ্যের গভীরতর প্রদেশে চলে বিশ্লেষণ—যাহা ছিল অন্তরালে, প্রখর দিবালোকে সহস্র চক্ষুর সম্মুখে তাহার নির্ল্লজ্জ উদঘাটন চলে। নারীর মর্য্যাদা সমাজে উপেক্ষিত ; আধুনিক সাহিত্যেও নারীর পরিচয় একটি—সে কামবিবশা, সে যে-কোন মুহূর্ত্তে সংসারের পবিত্র প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। স্বামী সন্তান কেহই তাহার আবেগ মুহূর্ত্তে গৃহে ধরিয়া রাখিতে পারে না। একটি বা দুটি মুহূর্ত্তের বিচারে তাহার জীবনের বোঝাপড়া শেষ হইয়া যায়। রাষ্ট্রীক দুর্গতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা নারীর চিত্তে চাঞ্চল্য তুলিয়াছে। সে আজ সমাজের চক্ষে, আধুনিক সাহিত্যিকের বিচারে অবিশ্বাসিনী। উপন্যাস পাঠে নারীচরিত্রের স্থিতি ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। নারীচরিত্রের এমন সর্ব্বনাশী রূপ, এমন ভয়াবহ পরিণতি ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

সাহিত্য বিকৃতি

আধুনিক উপন্যাস অনেকক্ষেত্রে অতি দুর্ব্বোধ্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। লেখকের বক্তব্য কি তাহা কিছুই বোঝা যায় না। পাত্রপাত্রীর মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে

সন্দেহ জন্মায়। তাহারা কি চায় তাহা নিজেই জানে না। ধোঁয়াটে, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চলে তাহাদের আলাপ। নায়ক নায়িকার বক্তৃতায় অনেক বড় বড় কথা, জীবনদর্শন নিয়া বড় বড় আলোচনা থাকে, কিন্তু আসল কথা তাহার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত লেখক পাঠককে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড করাইয়া প্রস্থান করেন। সামাজিক জীবন আজ ধ্বংসের পথে, পারিবারিক জীবনের সাম্য নষ্ট হইযাছে, আধুনিক মানুষ পথের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত হইযা ঘুরিতেছে।

আধুনিক কবিতাও অনেকখানি দুর্ব্বোধ্য বস্তু। কবিতা পডিতে গিযা পাঠকের প্লীহা চমকিত হইযা উঠে। বিভ্রান্ত পাঠক হতবুদ্ধির মত কবিতার রস আহরণে ব্যর্থ হইযা এভোল্যুশনের কণ্টকে হুঁচট খাইযা পড়েন। ভবিষ্যতে আধুনিক কবিতা না পডার প্রতিজ্ঞা করিযা স্বস্থানে ফিবিযা আসিযা ঘর্ম্ম মোচন করেন। অপরিচিত বিদেশী ভাব, ভাষা এবং কাহিনী লইযা বাংলাভাষায এক জগাখিচুডী উপহার দিতে তাঁহারা উদ্যত হইযাছেন। বাচ্যার্থ এত সূক্ষ্ম যে পাঠককে গালে হাত দিযা ভাবিতে হয।

কি উপন্যাস, কি কাব্য উভযতঃই চলিযাছে আমিত্বের বডাই, সবজান্তার ভান,—যাহা কিছু পুরাতন তাহাতেই নাসিকাকুঞ্চন। এই সকল অপথ্যকে সাহিত্য নাম দেওযা অনধিকার চর্চ্চা—তাহাবা ফক্কুডি—জাতির সঙ্কটময জীবনের এক প্রচণ্ড ভ্যাংচানি। যে সাহিত্য মানুষকে মহত্তর বৃত্তির কথা শুনায় না, মঙ্গল ও প্রেযের পথ দেখায না তাহা কুসাহিত্য। সাহিত্যের প্রথম কর্ত্তব্য রস বিতরণ অর্থাৎ আনন্দসৃষ্টি। যে সাহিত্য মানুযের জঘন্য পশুবৃত্তিকেই প্রকৃত সত্য বলিযা দেখাইতে চায তাহা মানুষের শত্রু। মানুষের জীবনে দুর্দ্দিন আসে, চরিত্রে ভাঙ্গন ধরে—কিন্তু পথভ্রান্ত মানুষ পথের সন্ধান চায সাহিত্যে। সাহিত্য যদি তাহাকে উপযুক্ত পথ না দেখায, মানুষকে তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাহিরে মুক্তির আবহাওযা আনিযা না দেয়, তাহা অন্ততঃ রস সৃজন করে না। মানুষ নিরন্তর ক্ষুদ্রতা, দৈন্য, হীনতার দ্বারা পীড়িত হইতেছে—সেই পীডার কিছুটা উপশম সাহিত্যে মানুষ খোঁজে। কিন্তু মানুষ যদি সাহিত্যেও সেই কুশ্রীতা, মানবজীবনের কদর্য্যতাটুকুই স্পষ্টতর দেখে তখন মানুষ ভবিষ্যতের জন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাহিত্যরসের নিত্যতা

রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দুর্গতির ফলে সাহিত্যেক্ষেত্রে বহু অতৃপ্তি, বিক্ষোভ ও অশান্তি পুঞ্জীভূত হয়। শক্তিমান লেখক সেই বিক্ষোভের একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ দেন এবং তাহারই মধ্যে মানুষ সাহিত্যরসকে আস্বাদন করে। একটা লোকোত্তর আনন্দ মানুষকে তাহার দৈনন্দিনের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি দেয়। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বহু অক্ষম লেখকেরও আবির্ভাব হয় যাহারা সাহিত্যে কুশ্রীতা, হীনতা, পশুত্বকে বড় করিয়া দেখায়। অনেক সময় সেই প্রভাব শক্তিমানদের রচনাতেও পড়ে। বৈষ্ণব এবং আধুনিক উভয় সাহিত্যেই নগ্নতা দৃষ্টিতে পড়ে। অক্ষম লেখক নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যে ঐ বিশেষ দিকটি স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। সাহিত্যে যে সকল বিকৃত চিন্তার কুশ্রী রূপ দেখি তাহার মূলে থাকে বিকৃত মন। ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি দেশে যখন সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দুর্গতি দেখা দিয়াছে, তখন জনচিত্ত বিকৃত হইয়াছে। সেই বিকৃতির প্রভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে রূপ পাইয়াছে কিন্তু দেশের ঘোরতর দুর্দ্দিনেও সাহিত্যে চিরন্তন সাহিত্যরস, লোকোত্তর আনন্দের অভাব ঘটে নাই। মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান সাহিত্যশিল্পী কম্পমান বাত্যাতাড়িত দীপশিখাটিকে প্রবল ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস দেখাইয়াছেন।

সাহিত্যে লোকোত্তর রসের অস্তিত্ব

সেন-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালায় নৈতিক চরিত্রের মানের অবনতি ঘটে। রাষ্ট্রীয় নানা দুর্গতি জাতির অঙ্গাভরণ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং রুচিহীনতার পরিচয় মেলে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তাম্বূল হইতে বাণখণ্ড পর্য্যন্ত কেবল আদি-রসের অবাধ স্রোত বহিয়া গিয়াছে। গ্রাম্যতা দোষও বহু স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বাণখণ্ড হইতে আমরা আপনার অজ্ঞাতসারে অন্য এক রাজ্যের সন্ধান পাই। সে রাজ্যে তরল উত্তেজক পানীয়ের প্রভাব নাই, বিরহখিন্না নারীর ব্যাকুল চিত্তদৈন্যের সংবাদ আছে

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

তাম্বূল ও দান খণ্ডে যে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের লালসায় এবং অসহায়া নায়িকার বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণে, কোন এক ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রস্পর্শে তাহা মনোরাজ্যের উচ্চতর স্তরের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। রাধা-বিরহ খণ্ডে এক নূতন চিত্তোন্মাদক সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহা সসীমতার দিক হইতে অসীমতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে।

"কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া দিয়াছেন ; সেই বাঁশীর সুরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।"

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈ কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥"

বংশীখণ্ডের এই অপূর্ব্ব পদটি সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে এক অলৌকিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। শ্যামরূপী অন্তরাত্মা, অহরহ আমাদের রাধারূপী জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার আহ্বানে সংসারের অসংখ্য বন্ধন আপনি খুলিয়া যাইতেছে, তাঁহার দর্শন লালসায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

"আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশার শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশা বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিছিব আপনা ॥"

বাঁশীর মধুকরী সঙ্গীত চণ্ডীদাসের আগে এমন করিয়া কেহ বলে নাই—রাধার কর্ণে এ বাঁশীও এত প্রাণোন্মাদিনী হয় নাই।

বংশী ও বিরহ খণ্ডে রাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমের বিরহে সে মেঘদুর্দ্দিনে ঘনান্ধকার রজনীতে অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছে, পূর্ব্বের প্রেমবিমুখতার শত সহস্র স্মৃতি তাহার বেদনাশয্যাকে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে। সাত্ত্বিক ভাবের বিকারে তাহার মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতেছে। বিরহের তীব্রতার অন্তরালে তাহার প্রাণের আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বংশী ও বিরহ খণ্ডে রাধিকার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য যে আকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে পদাবলী সাহিত্যের শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের সহিত তাহার নিকট

সাদৃশ্য আছে। যে অশিক্ষিতা চন্দ্রাবলী রাহীর সহিত তাম্বূলখণ্ডে সাক্ষাৎ ঘটিল বিরহখণ্ডে তাহাকেই শ্রীমতী রাধা রূপে দেখি। তাহার অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার।

তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের প্রেমোপহার লাঞ্ছিত হয়, দর্পিতা রাধা বড়াযিকে পদাঘাত করিয়া প্রেমসম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে কটূক্তি করে—

"ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল
তা সমে কি মোর নেহা॥"

কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের কোন পন্থা না পাইয়া রাধিকা দানখণ্ডে অসহায়ভাবে বিলাপ করিয়াছে।

"পাখি জাতি নহোঁ বড়াযি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞির মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ॥
হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥"
"আন ডাক দিআঁ বড়াযি নাপিতের পো।
কানডী খোঁপা বড়াযি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
* * *
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥
* * *
হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী॥"

সেই রাধিকা পূর্ব্বের সকল স্মৃতি স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে।

"ডালী ভরী ফুল পানে।
মোরে পাঠায়িল কাহ্নে।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাতে॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে।
তোক মাইলোঁ চড়ে॥"

কৃষ্ণের জন্য রাধা পাগলিনী হইয়াছে—সংসার সুখ তাহার নিকট বিষতুল্য।

"কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিণী হআঁ
বেডায়ি বোঁ নানা দেশে।"

বিরহখণ্ডে রাধা তাহার বিরহবেদনায় ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল, ক্ষণে উন্মাদ, ক্ষণে বড়ায়িকে কাতর মিনতি করিতেছে দয়িতের সন্ধান করিবার জন্য। রাধিকার চিত্তদৈন্য, কাতর অশ্রুসম্পাত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অলৌকিক রসের সঞ্চার করিয়াছে।

গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দেও অলঙ্কারের আডম্বর আছে, কেলি বিলাসের মধুর বর্ণনা আছে, রতিকালে নূপুরের নিক্বণটি শ্রুত হইযাছে, কিন্তু সকলের উদ্ধে আছে লোকোত্তর রস। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে সহস্র গোপিনীর প্রেমপাশে বদ্ধ দেখিযাও বলে "কৃষ্ণ আমারই", প্রেমের গভীর বিশ্বাস কিছুতেই টলে না।

"সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তমুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥"

কবি জযদেব কেলিবিলাস লীলার মধ্যে প্রেমের অসীমত্ব, দূরে থাকিযাও নিকটকে অন্তরে অনুভব করিযাছেন। কৃষ্ণ রাধাবিরহে বনে বনে ঘুরিতেছেন। বিরহের মধ্যেও তিনি রাধার সঙ্গ অনুভব করিতেছেন।

"তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্তাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষযাসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥"

রাধার প্রগাঢ় মান ভঞ্জনকালে কৃষ্ণ দুটি অপূর্ব্ব শ্লোক বলিয়াছেন। সেই শ্লোক দুটিতে জগতের নিখিল প্রণয়ীর অন্তরের মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইযাছে।

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥"
"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥"

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির রচনারীতিতে রাজকীয় রুচি এবং প্রণয়কলা চাতুর্য্যের কথাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির প্রতিভা গভীর আবেগের মুহূর্ত্তে লোকোত্তর রস সৃজন করিয়াছে। বিদ্যাপতির প্রার্থনাতে পদগুলিতে মাধবের পদে ব্যাকুলভাবে ভক্ত বৈষ্ণবের গভীর আত্মসমর্পণের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥"

তাঁহার মাথুরের পদেও শ্রীরাধার কণ্ঠে মাধবের জন্য এমনই বিরহ ব্যাকুলতা জাগিয়া আছে। মাধবশূন্য গৃহে শ্রীমতী উৎকণ্ঠাখিন্নচিত্তে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন।

"সখি হামারি দুখেরি নাহি ওর।
এ ভরা বাদর এ মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥"

ভাবসম্মিলনে বিদ্যাপতির নবীনা চপলা রাধার কণ্ঠে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গীতলহরী ধ্বনিত হইয়াছে—

"আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়লু,
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥"

বিদ্যাপতির পদে অলঙ্কারবাহুল্য এবং চিত্রধর্ম্ম খুব বেশী কিন্তু উপমা-অলঙ্কারের রাজ্য ছাড়াইয়া বিদ্যাপতির পদ শ্রোতাকে ঊর্দ্ধতর জগতে লইয়া যায়। তাঁহার পদে যে অনুভূতি, হৃদয়ের নব নব উল্লাসের কথা পাই, তাহা

মহারাজ শিবচন্দ্রের রাজ্যের সীমানাকে অতিক্রম করিয়া অনন্তকালের পাঠক ও শ্রোতার হৃদযবীণায় - ঝঙ্কার তুলিযাছে। বিদ্যাপতিব নব নব ভাবোল্লাস, প্রেমের 'নিতুই নব' অনুভূতি এক একটি পদে সংহত হইযা আছে।

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয॥
জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ
নযন না তিরপিত ভেল।"

সমসাময়িক কালে যে সব মঙ্গলকাব্য রচিত হয সেগুলি দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক কাব্য। দেশব্যাপী অরাজকতা, নৈরাশ্য, পীডন, অনিশ্চযতা, নৈতিক চরিত্রের দুর্ব্বলতা এইগুলিতে পরিস্ফুট হইযাছে। দৈবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পুরুষকারের জয ঘোষিত হইযাছে। কিন্তু গতানুগতিক এই কাব্যগুলি, জাতীয অধোগতির চিহ্ন বক্ষে লইযাও চরিত্র সৃজনে লোকোত্তর ভাব আবোপ করিযাছে।

মঙ্গলকাব্যে লোকোত্তর রস

মনসামঙ্গলে বেহুলা একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তেজস্বিতা ও মৃদুতার সমাবেশে তাহাকে কবি গরিমামণ্ডিত করিয়াছেন। নানা বিপৎপাতে বেহুলার সতীত্ব উজ্জ্বলতর হইয়াছে, সুখে দুঃখে তাহার চরিত্রে স্নেহ মমতা দযা প্রভৃতি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বেহুলার দুঃখের করুণ কাহিনী শ্রোতার চিত্তকে বিগলিত করে। মনসার দেবীমাহাত্ম্য অন্তরালে ঢাকা পড়িযা যায়। চাঁদের দৈবের সহিত সংগ্রাম এবং অনমনীয় দার্ঢ্য তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিযাছে। নানা সংগ্রামের মধ্য দিযা চাঁদের অটল দৃঢ়তা পাঠকের হৃদয়কে বিচিত্র ভাবতরঙ্গে অভিভূত করিয়া দেয়।

মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের বন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রের উষর মরু প্রাণদাযিনী শস্যক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জে অসংখ্য পাখী কূজন আরম্ভ করিল। সেই কূজনের অব্যাহত গতিতে ভাঁটা পড়িয়া আসিল। সাহিত্যও ক্রমে গতানুগতিক এবং একঘেয়ে হইয়া পড়িল। পদসঙ্কলন এবং বৈষ্ণব কবিতা নিতান্ত গতানুগতিক এবং আদিরসাশ্রিত হইতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বত্র নৈরাশ্য এবং

সাহিত্যে গতানুগতিকতা

অনিশ্চযতা দেখা দিল। এইরূপ অনিশ্চিত আবহাওযায সাহিত্যের প্রাণরসও শুকাইযা আসিল। কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই প্রাণরস পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করিযা লোকোত্তর রসে পরিণত হইযাছে। মুকুন্দরামের সহৃদয কবিচিত্ত মানুষের মনের কথাটিকে তুলিযা ধরিযাছে। জীবনে বহু দুঃখ পাইয়াও কবি সাহিত্যরচনায কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেন নাই। বাঙ্গালী গৃহের দুঃখের চিত্র, সমাজচিত্র সকলই নিপুণভাবে অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত হইযাছে।

মুকুন্দরাম

বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে একমাত্র ঘনশ্যামদাসের পদে কিছু নবীনত্ব আছে। মুসলমান পদকর্ত্তাগণের পদে প্রাণের সরল অভিব্যক্তিটুকু ব্যক্ত হইযাছে। তাহা গতানুগতিক পদাবলীর ধারাকে পাশ কাটাইযা প্রাণের ভাষায কথা বলিযাছে। সৈযদ মর্ত্তুজা, নসীব মামুদ, ওহাব, খলিল, গোলাম হুছন, সৈযদ আলী, জালালউদ্দী, নিযামত, বদিযুদ্দিন, মতাহির, মুচ্ছা, হুছন প্রভৃতির পদে সরল সুরে হৃদযের মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত মূর্চ্ছিত হইযাছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে নূতনত্ব

বাউল কবি মুচ্ছা প্রেমের জ্বালার কথা বলিযাছেন।

"রসিক চিনিযা প্রেম করিতে হয।
ওগো অরসিকে প্রাণ দিলে আযু থাকতে মরতে হয॥
বন্ধুরে রসিক জানি হইযাছিলাম উদাসিনী
এগো প্রেমানলে জ্বলে হিযা মরণের আর বাকী নয॥
নিষ্ঠুর বন্ধের প্রেমানলে সদায মোর অঙ্গ জ্বলে
এগো আশায আশায দিন গেল রজনী প্রভাত হয॥"

কবি বদিযুদ্দিন সাঙ্কেতিকভাবে পদ রচনা করিলেন, কিন্তু তাহা গভীর ভাবপূর্ণ ও আবেগমণ্ডিত।

"দেখা দিযা জুড়াও পরাণ।
অবলা মন্দিরে বসি প্রাণের নাথ বাজায বাঁশী
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত॥
অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ না মানে প্রাণে,
আকুল করিযা নারীর চিত।

শুনিয়া মোহন বাঁশী হইলুম তোমার দাসী
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে ॥

* * * *

তোমার কৃপা ফলে মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
ওই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নীতিহীনতা এবং বিলাসসর্ব্বস্বতা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা প্রভৃতি আদিরসাত্মক রচনা দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া পড়িল। রুচির নিম্নতা সাহিত্যের গতিকে অধোগামী করিল। বৈষ্ণব কবিতার নির্ম্মল ধারা আদিরসাশ্রিত হইয়া পঙ্কিল হইয়া পড়িল। সাহিত্যের এই কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গীতিকবিতার নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। দেশের রুচিহীনতা এবং কদর্য্যতার উর্দ্ধে তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল।

কবি রামপ্রসাদ সেন

কবি রামপ্রসাদ সেন এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার মাতৃবিষয়ক মধুর সঙ্গীত তৃষিত প্রাণ শীতল করে। শিশুর মতই সরল হৃদয়ে রামপ্রসাদ মায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। গানের প্রতি ছাত্রে জগজ্জননীর অঞ্চলের আশ্রয় লইয়া তিনি ঘুরিতেছেন দেখা যায়। মা ও ছেলের এমন বাৎসল্য রসের লীলা শ্রোতার চক্ষে অশ্রুর বন্যা বহিয়া আনে।

আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে ?
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে শিব (ও পদ) বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে ॥

দেশব্যাপী অরাজকতা। সংসারযাত্রানির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ। অত্যাচার ও বিপদ মানুষের চিত্তকে দুর্ব্বল করিয়া

ফলিতেছে। এমনই সময় রামপ্রসাদ শুনাইলেন যে আমরা অভয়ার সন্তান। যমেরও সাধ্য নাই আমাদের ছুঁইবার। রামপ্রসাদের গানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত জাতি লুপ্ত প্রেম, নির্ভরতা ও বিশ্বাস ফিরিয়া পাইল।

"আমি কি আটাশে ছেলে ?
ভয়ে ভুলব না কো চোখ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধবে যা হৃদ্-কমলে।
ও মা, আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি সব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তবেজ, ওগরাইব মিছিল-কালে ॥
মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥"

"এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাবগো দীন দয়াময়ি।
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় গো মা-খেকো ছেল।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটার একটা করে যাব ॥
ডাকিনী, যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা চড়াব ॥
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কলে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি পদ্মে বসাইয়া, মনো মানসে পূজিব ॥
যদি বল, কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব,
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব,
তা'তে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

বাংলা সাহিত্যে এযুগে প্রকৃত কাব্যের সন্ধান পাওয়া ভার। একমাত্র

কবিওয়ালার দলই বাঙ্গালা কাব্যের শূন্য আসন জাঁকাইয়া বসিয়া ছিলেন। এই কবিওয়ালার রচনাকে প্রকৃত কাব্যের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। কবিওয়ালাগণ কোন গভীরতর রসের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কিন্তু কাহারও কাহারও রচনায় যুগকে অতিক্রমের চেষ্টা দেখা যায়।

কবিওয়ালা

দাশরথি রায়ের রচনায় অনেক স্থলেই গ্রাম্যতা এবং রুচিহীনতার স্পর্শ আছে। কিন্তু ইঁহারই কোন কোন গান উচ্চ ভাবরাজ্যের সমগ্রী হইয়াছে।

"যদি বল রাখাল প্রেমে,
বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি।"

এই জাতীয় কয়েকটি গানের মধ্যে শুভ্র সরলতা এবং গভীর ভাবের সমন্বয় হইয়া তাহা কানের জিনিস না হইয়া প্রাণের জিনিস হইয়াছে।

ভোলা ময়রা স্পষ্টবাদী কবিওয়ালা ছিল। সমাজের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া সে শ্লেষপূর্ণ গান বাঁধিত। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।"

রামমোহন বসুকে কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর প্রভৃতি গানে শব্দচাতুর্য্যের ঘটা নাই। গানগুলিতে উচ্চতর ভাবরাজ্যের সামগ্রী আছে। এই গানগুলি প্রাণকে সহজে স্পর্শ করে, পাঠকচিত্তে লোকোত্তর আনন্দের স্পর্শ আনিয়া দেয়।

রামনিধি রায়ের রচিত সঙ্গীতগুলি "নিধুবাবুর টপ্পা" নামে পরিচিত। ইঁহার প্রেমসঙ্গীতগুলি সম্পূর্ণ লৌকিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভাবের দিক দিয়া সমসাময়িক বহু কবির রচনার উর্দ্ধে। রুচিসম্পন্ন এবং সংহত ভাবের ফলে গানগুলি রসঘন হইয়াছে। প্রেমের দুঃখের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য গানগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই শতাব্দীতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য শেষবারের মত পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস, ভরত-মিলন, নন্দহরণ, সুবলসংবাদ প্রভৃতি পালায় ভাব এবং ভাষার অলৌকিক

সম্মেলন ঘটিয়াছে। তাঁহার 'রাই উন্মাদিনী' মহাপ্রভুর অলৌকিক দিব্যোন্মাদ অবলম্বনে রচিত। প্রেমের নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ যে চিত্রটি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কৃষ্ণকমল তাহাকে পুনরায় চিত্রিত করিলেন।

ইউরোপীয় সভ্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি সংস্কারমুক্ত চিত্তে জীবনকে গ্রহণ করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার উত্তাল বন্যা দেশের সকল শিক্ষা সংস্কৃতির মূলকে উৎপাটিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু রাম-

রামকৃষ্ণের প্রভাব

কৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব ও বঙ্কিমের প্রভাব স্বদেশীয়ভাবধারাবিমুখ জাতিকে ফিরাইয়া আনিল। সাহিত্যক্ষেত্রে রঙ্গলাল, মধু, হেম, বঙ্কিম, নবীন প্রভৃতির আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ী প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তীকালে বহু শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটিল। জীবনের নানা সমস্যার দিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিযাছেন এবং মানুষের মহত্তর মূল্য নির্ণয় করিয়াছেন।

কিন্তু জাতির প্রতিভা ক্রমেই ক্ষীয়মান হইয়া আসিল। সাহিত্যে নব নব উন্মেষিণী প্রতিভার সঙ্কোচ ঘটিল। মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গৃহবিবাদ, শ্রমিকসমস্যা, বঙ্গবিভাগ, উদ্বাস্তুসমস্যা প্রভৃতি একের পর এক আসিযা জাতির ভাগ্য লইযা মহা পরিহাসের খেলা সুরু করিল। অতৃপ্তকাম, দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির মনের বিক্ষোভ সাহিত্যে পুঞ্জীভূত হইল।

কবিতারাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। ছন্দ, ভাব, ভাষা—সকল কিছুই অস্বীকার করিয়া ধোঁয়াটে অর্থহীন বৈদেশিক এভোল্যুশনের কচ্‌কচি পূর্ণ ছিন্ন বাক্য কবিতা নামে অভিহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যক্ষেত্রে মহা অরাজকতা উপস্থিত হইল। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' জাতির জীবনে প্রবল হইযা উঠিল। সুকান্তর কবিতায় "আধখানা

কবিতার মান পরিবর্ত্তন

চাঁদ" যেন "ঝলসানো" রুটি বলিযা মনে হইতে লাগিল। জীবনের সকল মাধুর্য্য ঝরিয়া আছে—সত্য কেবল রূঢ় নির্ম্মম বাস্তব। কবির কাব্যে জীবনের প্রতি কোন বিশ্বাস রহিল না। তিনি জীবনের সকল সুকুমার বৃত্তির পশ্চাতে প্রবৃত্তির তাড়না দেখিলেন, রূপসী নারীর দেহের অন্তরালে দেখিলেন কঙ্কালের খট্‌খটি। এমন শঙ্করবাদী, নির্ম্মোহ দৃষ্টি আধুনিকতার পরিচয় বলিয়া খ্যাত

হইল। কিন্তু তাহাই কি সত্য? বিকৃত জীবনযাত্রার ফলে মন আজ বিকৃত। সেই বিকৃত মন আজ নর্দমা, পাঁক, কুষ্ঠব্যাধি, লালসাকেই সত্য বলিতে চায়। কিন্তু বিকৃতিকে কি জীবনের সত্য বলিতে হইবে? যাহা দর্শনে মানুষ আনন্দিত হয় না, তৃপ্ত হয় না তাহাকে কি করিয়া সত্য বলা চলে। সুখের বিষয় কবিমাত্রেই তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচনায় জীবনের এই সকল মিথ্যা বিকৃতিকে অতিক্রমের চেষ্টা আছে। তাঁহারা জীবনের এই সকল বিকৃতি দেখাইয়াছেন, কদর্য্যতাকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, বাস্তবের জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন কিন্তু এখানেই মানুষের সভ্যতার সীমারেখা টানিতে প্রস্তুত নহেন। এই বিকৃতি ও কদর্য্যতাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন, সমাজের সত্যকার রূপকে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা আশা পোষণ করিয়াছেন সকল পাপ, কদর্য্যতা ও ধ্বংসের উপর নূতন দিনের সূর্য্যোদয় ঘটিবে।

উপন্যাসক্ষেত্রেও অবাধ যৌনতা সংক্রামিত হইল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে অতৃপ্তচিত্ত জনসাধারণ, তরলমতি তরুণের দল এই সকল উপন্যাসকে সাগ্রহে গ্রহণ করিল। যৌনতৃপ্তিই মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এমনতর উদ্ভট যুক্তিও অনেকের রচনায় স্থান পাইল। যৌন-মিলনের বিকৃত ও কদর্য্য বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের বিহার-বর্ণনার মতই নগ্ন হইয়া উঠিল। যৌন-স্বাধীনতাই মানুষের আকাঙ্ক্ষণায় এই জাতীয় সর্ব্বনাশা মনোভাব অনেকে ছড়াইতে লাগিলেন। মন্বন্তর মানুষের নীতির মেরুদণ্ডকে নমিত করিয়া দেয়। কিন্তু একটিমাত্র বৃত্তি প্রবল হইয়া চিরদিন সাহিত্যে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না। তাই মন্বন্তরের সর্ব্বনাশা দিনগুলির পরিচয় যখন মহাকালের দরবারে শোণিতে লিখিত হইতেছিল, সাহিত্যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকের দল মানুষের নিত্য পরিচয়টুকু জানাইয়াছেন। লোভমত্ত, মনুষ্যত্ববোধশূন্য মানুষের সঙ্গে হাত মিলায় না এমন মানুষের পরিচয় তাঁহারা জানাইয়াছেন। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাস, অচিন্ত্যকুমার ও ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাস এবং আরও অনেকের রচনায় আমরা দেখিতে পাই ক্ষুধার তাড়নাকে সহ্য করিয়াও মানুষ নিজের আত্মাকে অপমানিত করিতে পারে নাই। গোপাল হালদারের 'একদা', নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই', সুশীল জানার 'কানাগলি' প্রভৃতি নানা উপন্যাসে মানুষের মহৎ অন্তর্লোকের পরিচয় রচিত হইয়াছে। নবেন্দু ঘোষের

উপন্যাসে অবাধ যৌনতা

'ফিয়ার্স লেন' প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জ্বালাময়ী বীভৎস চিত্র। মানুষের আত্মাপুরুষ মানুষের এবংবিধ লালসামত্ত উন্মত্ত পশুশক্তির পরিচয় পাইয়া ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মানুষের সকল সভ্যতার অবসান ঘটিয়াছে মনে হয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি উজ্জ্বল চরিত্র আপনার অন্তর্লোকের মহৎ জ্যোতিতে দীপ্যমান। তাহারা মানুষ, পশুত্বের ভয়াল বীভৎস ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের মধ্যে তাহাদের ধীর প্রশান্ত অভয় কণ্ঠ মানুষকে তাহার ভাবীদিনের কথা শুনায়।

সাহিত্যরস নিত্য, তাহার ক্ষয় নাই। যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবেশে তাহার বহিরাবরণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুর্গতি সাহিত্যের রুচিকে নিম্নগামী করিয়াছে কিন্তু সকল যুগেই অনুসন্ধান করিলে সাহিত্যের লোকোত্তর রসটিকে আবিষ্কার করা যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শেষ কথা

আমাদের আলোচনার বিস্তারিত বিষয় সম্বন্ধে বহু কথাই বলা হইল। আলোচনার মূল তত্ত্ববস্তুটি এইবার দেখা প্রয়োজন। প্রাচীন যুগ হইতে অত্যাধুনিক কাল পর্য্যন্ত দেশের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শাসকের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নানা প্রথা ও সংস্কার লুপ্ত হইয়াছে, সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। মানুষের চিত্তবৃত্তিরও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কয়েক ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নূতনে রদবদল হয় নাই। তাহা মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, প্রাণীজগতের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। এই বৈশিষ্ট্যটুকুই মানুষকে আদিম পশুত্বের পর্য্যায় হইতে নরত্বের স্তরে উন্নীত করিয়াছে। (মানুষ সুন্দরের পূজারী। এই রূপজ্ঞান, সৌন্দর্য্যমুগ্ধতাই মানুষকে প্রকৃতির অন্যান্য জীব হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। এই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আনন্দে। এই আনন্দের স্বরূপটি কি? সৌন্দর্য্য ত' দেখার বিষয়—পশুপক্ষী সৌন্দর্য্য বুঝে না। কিন্তু মানুষ সুন্দর বস্তু পাইলে তাহাকে সযত্নে নিরীক্ষণ করে এবং রক্ষা করে। আদিম মানুষ বিস্ময়ফুল্ল নয়নে ফুলের শোভা দেখিয়াছিল। আদিম নর নারীকে পুষ্প

উপহার দিত, নারী নরের মনোহরণার্থ পুষ্পাভরণে সুসজ্জিত হইত। ক্রমেই সৌন্দর্য্যের পরিধি বাড়িল—আনন্দপ্রকাশের বিচিত্র পন্থা আবিষ্কৃত হইল। মানুষ পর্ব্বতগাত্রে চিত্র আঁকিয়া মনের অলৌকিক আনন্দকে স্ফুরণের পথ দিল। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজার পশ্চাতে ভয় ক্রিয়া করিয়াছিল, আবার উদার মুক্ত গগন, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সবিতা, মৃদুকিরণসম্পাতকারী চন্দ্রমার পূজার আড়ালে ছিল সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ দৃষ্টি।

মানুষের সভ্যতার জয়যাত্রা সুরু হইল। আত্মরক্ষার তাগিদে একত্রিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ করিল। এই প্রীতির রসে সিক্ত হইয়া সমাজ, গোষ্ঠী, রাজ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। মানুষের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রেমের বন্ধন প্রয়োজন হইল। পরস্পরের মঙ্গলকামনা, প্রেমের দৃষ্টি সমাজকে সুস্থ রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল।

মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার সৃষ্টি হইল। সেই ভাবকে ভবিষ্যতের নিকট পৌঁছাইতে, দূরের জনের নিকট উপস্থিত করিতে লিপির আবিষ্কার হইল। মানবজাতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনার সৃষ্টি হইল। লিপির মাধ্যমে মানুষের চিন্তা অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত মানুষের নিকট তাহার গোপন কাহিনী প্রকাশ করিল।

সাহিত্য মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির কথা জানাইয়া দেয়। মানুষের সৌন্দর্য্যপিপাসী চিত্ত সাহিত্যে এই আনন্দলোকের সৃষ্টি করে। এই আনন্দের জন্ম সত্য ও মঙ্গলের মধ্যে। সত্য—অনেকের বিশ্বাস—নিত্য নহে, তাহা আপেক্ষিক। তাঁহাদের সত্য সম্বন্ধে ধারণা ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ। মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ যেখানে সেখানেই সত্য, শিব ও সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। সুন্দর এবং সত্য পরস্পর আবদ্ধ। যেখানে মানুষের মনের কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত, স্বার্থকে ছাড়িয়া আত্মসুখকে ছাড়িয়া বৃহতের জন্য প্রীতি অনুভব করে, সেখানেই সুন্দর ও সত্যের দেখা পাই। স্বার্থবুদ্ধি বড় হইলে—লালসা, হিংসা, মিথ্যা, কদর্য্যতায় যখনই দেশ ভরিয়াছে, দণ্ডশক্তি যখনই প্রজার কল্যাণসাধন ভুলিয়া ক্ষুদ্র আত্মসুখে বিহ্বল হইয়াছে, তখনই মানুষের জীবনে আনন্দ লুপ্ত হইয়াছে। বিহ্বল, ভীতত্রস্ত মানুষ আনন্দকে হারাইয়াছে, জীবন হইতে সুন্দর বিদায় লইয়াছে, সাহিত্যেও কুশ্রীতা, মিথ্যা, কদাচারের রাজত্ব চলিয়াছে।

সাহিত্য সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকিবে—তাহার কুশ্রীতা ও কদর্য্যতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবে, কিন্তু মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তিকে নিম্নগামী করিবে না।

সেই কুশ্রীতা ও কদর্য্যতা উর্দ্ধলোকে মানুষকে উন্নীত হইবার মহৎ প্রেরণা যোগাইবে সাহিত্য। সকল অন্যায়, পাপ, মত্ততাকে সাহিত্য ধ্বংস করিবে— সাহিত্যে এই অন্যায়, পাপের বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠ ধ্বনিত হইবে। সাহিত্য প্রচারমূলক বা নীতিবাদী হইবে না। তাহা হইলে সাহিত্য পত্রিকা হইবে— লোকোত্তর রস সৃষ্টি করিবে না।

বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র সকলই পরিবর্ত্তিত হইযাছে। সাহিত্যের বহিরঙ্গে তাহার ঘটনাবিন্যাসে, মনোবিশ্লেষণে অনেক অভিনবত্ব দেখা দিযাছে। কিন্তু সাহিত্যের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব ঘটিলে সাহিত্য লোকোত্তর রস পরিবেশন করিতে পারে না। অথচ এই লোকোত্তর রস সৃজন ও পরিবেশনই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত সাহিত্যরসের সন্ধান পাওযা শক্ত। অনুবাদ সাহিত্য, পাঁচালা এবং মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়িযা আছে। অনুবাদ সাহিত্যের কথা ছাড়িযা দিলে পাঁচালী এবং মঙ্গল-কাব্যগুলিতে গতানুগতিকতা, নিষ্প্রাণতা এবং একঘেযে বর্ণনাই মুখ্য হইয়া আছে। (একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্য দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনা এবং গতানুগতিক বাঁধাধরা পথ অতিক্রম করিয়া সাহিত্যে অভিনব আ॰ র সঞ্চার করিয়াছে।) বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত আধুনিক সাহিত্যের বহিরঙ্গমূলক বহু বিভেদ আছে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহারা বিপরীত ধর্ম্মী। বৈষ্ণব সাহিত্য নিছক ঐশ্বরিক প্রেমের উপর স্থাপিত। কিন্তু "তটস্থ হইযা বিচারিলে আছে তর তম"।

বৈষ্ণব সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য উভযেই লোকোত্তর রসের সৃষ্টি ঘটিয়াছে। উভয সাহিত্যের জন্মকালীন ইতিহাস এবং পুষ্টির মূলগত কারণ এক রূপ দেখা যায। বৈষ্ণব এবং আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটিবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় এক চরম দুর্গতির দিন সুরু হইয়াছিল। অতৃপ্ত, বঞ্চিত, দুর্দ্দশাপীড়িত জনচিত্তে মানসিক বিক্ষোভ সঞ্চিত হইতেছিল। নিখিল মানবহৃদযের বেদনার মূর্ত্ত বিকাশ ঘটিয়াছিল দুই যুগাবতারের মধ্যে— শ্রীমদ্ মহাপ্রভু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দুই যুগেই সাহিত্যে, জীবনে, রাষ্ট্রে প্রাণের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়াছিল—সাহিত্য প্রাণমন্ত্রে অভিষিক্ত

হইয়াছিল। পূর্ব্বতন ইতিহাস সমাজে, রাষ্ট্রে, জনচিত্তে এই অপূর্ব্ব আবির্ভাবের প্রস্তুতির কার্য্য গোপনে করিতেছিল।

প্রেম সাহিত্যে লোকোত্তর আনন্দ সৃজন করে। মঙ্গলকাব্য এবং বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্যে প্রেমের যে পরিচয় আছে তাহা মুখ্যতঃ শৃঙ্গারমূলক। রতিক্রীড়ার নানা উন্মাদিনী বর্ণনা কবির রচনায় স্থান পাইয়াছে, অলঙ্কারের মুখরতা প্রাণের নিভৃত রাগিণীকে শ্রুতিগোচরে আনিতে দেয নাই। রতি মানুষের স্বভাবধর্ম্ম, কিন্তু সাহিত্য এই রতিরূপ বিভাবে অলৌকিক রসের স্থাপনা করে। দেহকে অতিক্রম করিয়া প্রেম বড় হয়—দেহচিন্তা দূরে যায়। প্রীতির অখণ্ড রসে দুইটি প্রাণ দেহভেদ ভুলিয়া মিলিয়া যায়। সেই মিলনের বাঁশী সংসারে শতধারে ঝরিয়া পড়ে। উন্মত্ত দেহক্রীড়া সার না হইয়া প্রেম পরের জন্য দুঃখকে ভোগ করে, স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেয়। সেই প্রীতির মন্ত্রে সংসারে মঙ্গল এবং কল্যাণের শঙ্খ ধ্বনিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য উভয়েই সেই অলৌকিক প্রেমের কথা—দেহাশ্রয়ী হইয়াও দেহাতিরিক্ত ভাবের কথা।

বৈষ্ণব সাহিত্য সৃজনের পূর্ব্বে সাহিত্যে মানুষের কথা শুনিতে পাই না। সাহিত্যে মানুষ আসিয়াছে দেবতার মহিমা প্রচারের যন্ত্র হইয়া। তাহার সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেমের মূল্য নাই—সমাজপ্রচলিত লৌকিক দেবতা এবং অর্থহীন আচার পালনের জন্যই তাহার অস্তিত্ব। বৈষ্ণব সাহিত্য সেই যুগসঞ্চিত ধারণার প্রতিবাদ জানাইল। সাহিত্যে মানবীয় ভাবের স্পর্শলাভ ঘটিল। সাহিত্য মানুষের রচনা, সেখানে মানুষ স্থান না পাইলে, তাহার হৃদয়ের নানা বিচিত্র ভাবতরঙ্গের আন্দোলন না থাকিলে তাহা হৃদয়কে স্পর্শ করে না। আধুনিক সাহিত্যে এই মানুষের কথাই আরও বিচিত্র, আরও ব্যাপক হইয়াছে।

একদেশদর্শী তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য-সমালোচক রোমান্টিকতাকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। রোমান্টিকতা বলিতে কি বোঝা যায়। রোমান্টিকতাই সাহিত্যের লোকোত্তর রস সৃষ্টি করে। সংসারে মানুষ মানুষীকে ভালবাসে, সংসারধর্ম্ম পালন করে। তাহা অতি বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এই অতিবাস্তব ঘটনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করিতে গেলে তাহার মধ্যে রস সৃজন করিতে হইবে। এই রসের অভাব ঘটিলে তাহা সংবাদ হইবে, সাহিত্য হইবে না। আধুনিক সাহিত্যে এই রোমান্টিকতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বৈষ্ণব

সাহিত্যও মানবীয় বৃত্তিগুলি কতদূর যাইতে পারে তাহা দেখাইয়াছে। মর্ত্ত্যের ধূলিতে স্বর্গীয় উপাদানের মিশ্রণ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য রোমান্টিক হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্য বাস্তব হইয়াও সেই স্বর্গীয় প্রীতির ধারাটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিকগণ, যাঁহারা রোমান্টিক সাহিত্যকে কোণঠাসা করিতে চান, তাঁহাদের সাহিত্যও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহাদের রচনায় রোমান্টিকতা নাই, তাঁহাদের সৃষ্টি ব্যর্থ হইয়াছে—কালের বিচারে তাহা পতিত হইবে।

সাহিত্যের পরিচয় তাহার প্রাণধর্ম্মে। সাহিত্যের মধ্যে জাতির প্রাণস্পন্দন, ধমনীর গতি অনুভূত হইবে। ব্যক্তিমানসের যে ভাবই সাহিত্যে রূপ পাক তাহা প্রাণবন্ত হওয়া চাই। এই প্রাণধর্ম্মের অভাব ঘটিলে সাহিত্য চিরস্থায়ী হয় না, তাহা মনের ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটায় না। রাষ্ট্রে ও সমাজে বীর্য্যহীনতা, প্রাণহীনতা, মোহ দেখা দিলে তৎকালীন সাহিত্যও অর্থহীন বাক্যের বোঝা হয়—মনের তৃপ্তি ও আশ্রয় হয় না। সাহিত্যে যাহাই বলা হউক না কেন তাহা প্রাণের ভাষায় রচিত হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই প্রাণের কথা ফুটিযা উঠিয়াছিল। নির্ব্বিকার শূন্যবাদী বৌদ্ধ, মায়াবাদী অদ্বৈতপন্থী যতি, কঠোর শুষ্ক ধর্ম্মহীন প্রাণশূন্য আচার, নিষ্ঠুরহৃদি তান্ত্রিক কাপালিক প্রভৃতির বেষ্টনীর মধ্যে অতৃপ্ত জনসমাজের হৃদযে বিক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছিল। একদিকে অতিরিক্ত বন্ধন, অন্যদিকে ধর্ম্মের নামে কুৎসিত পঙ্কিলতা—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য তথা সহজ সাহিত্যের জন্ম হয়। সন্ন্যাস এবং মোক্ষ—ভারতীয় সাধনমার্গেব সংসার-উদাসীন এই মতবাদকে বৈষ্ণবধর্ম্ম মূল ধরিয়া নাড়া দিল। বৈষ্ণব সাহিত্য দেখাইল সংসারের সহজজীবনের মধ্যে, দৈনন্দিন নানা সম্পর্কের মাধ্যমে অসীম অনন্তের স্পর্শ মিলে। সংসারকে বৈষ্ণব ভগবানের লীলাস্থল বলিয়া মানিয়া লইল। আধুনিক সাহিত্যে বহু কদর্য্যতা এবং একঘেয়েমী আছে—সমাজে এবং রাষ্ট্রে বহু অন্যায় আছে, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যে অনেকক্ষেত্রে কুরুচি, অসুস্থতা, নগ্নতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইহার জন্য দায়ী সমাজ এবং রাষ্ট্র। জাতীয় জীবনে সঙ্কট এবং অতৃপ্তি আসিলেই অসুস্থ মনোবিকার দেখা যায়। বৈষ্ণবযুগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি এবং আধুনিক যুগের পূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর, কবিওয়ালা প্রভৃতির আবির্ভাব এই মতকে সমর্থন করে। সাহিত্যে

দুর্নীতি যুগে যুগে দেখা দিয়াছে। অক্ষম লেখকের লেখনী সাহিত্যে নগ্নতাকে চিত্রিত করিয়াছে, সাহিত্যিকের বিকৃত মন বিকৃত চিন্তাকে রূপ দিয়াছে। ইহার কারণ উভয়তঃই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দুর্গতি। কিন্তু এই সকল অসুস্থতাকেই সাহিত্যে সত্য বলা চলে না। যুগের প্রভাব সাহিত্যকে সাময়িক কলুষিত করিলেও তাহাই সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয় নহে। সাহিত্যের রস চিরন্তন এবং সত্য। কল্যাণ এবং আনন্দের বাণী বহন করা, মানুষকে তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহত্তর জীবনে যুক্ত করাই সাহিত্যের সাধনা।

শেষ